৪৫তম বিসিএস
লিখিত

সাহিত্য ৩০
ব্যাকরণ ৩০
মোট ৬০

শীকর

বাংলা সাহিত্য পাঠ

[বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তর]

মোহসীনা নাজিলা

CamScanner

©Nazmus Sadat

পঞ্চম সংস্করণ : মে, ২০২৩

প্রকাশক
শীকর পাবলিকেশন্স
৩৭/২, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৯
পঞ্চম সংস্করণ : মে, ২০২৩

স্বত্ব: লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য: ৩০০/- (তিনশত) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাবাজার, ঢাকা।

সুমনা বইঘর	প্রমিজ বুকস	দি বুক সেন্টার

নীলক্ষেত, ঢাকা।

মামুন বুক হাউজ	আলম বুকস	মাইশা বকুস	সোহেল লাইব্রেরি
নাফিস লাইব্রেরি	তাজ লাইব্রেরি	নাহার বুক হাউজ	উদয়ন লাইব্রেরি
তপন বুক হাউজ	জহির লাইব্রেরি	বইক্রয়.কম	

[লেখকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এ বইয়ের কোন অংশ হুবহু বা আংশিক পরিবর্তন করে কপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ]

CamScanner

©Nazmus Sadat

সূচিপত্র

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ	
১.	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	৩৭
	প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)	
১.	চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন? *[৪৪তম বিসিএস* 'চর্যাপদ' কত সালে এবং কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়? *[৩৪তম বিসিএস]* চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? *[৩৩তম বিসিএস]*	৩৭
২.	চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে একজন বাঙালি চর্যাকারের পরিচয় দিন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	৩৮
৩.	চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*	৩৮
৪.	চর্যাপদে বিধৃত বাঙালিজীবনের পরিচয় দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*	৩৯
৫.	বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। *[৪১তম]*	৩৯
৬.	বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়। *[৪০তম, ৩৮তম]* 'সান্ধ্য ভাষা' কী? এ ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*	৪০
৭.	চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন। *[৩৬তম]* চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির পরিচয় দিন। *[৩১তম বিসিএস]*	৪১
৮.	চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন। *[৩৫তম]*	৪১
৯.	চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৩০তম বিসিএস]* চর্যাপদ কী? তিন জন পদকর্তার নাম লিখুন। *[২৪তম, ২০তম]*	৪২
১০.	চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন। *[২৯তম বিসিএস]*	৪২
১১.	'চর্যাপদ' গ্রন্থে কোন পদকর্তার সর্বাধিক এবং কতটি পদ রয়েছে? *[১৩তম বিসিএস]* কাহ্নপা কে ছিলেন? *[১০তম বিসিএস]*	৪৩
১২.	চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে লিখুন।	৪৩

CamScanner

©Nazmus Sadat

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১৩.	চর্যাপদের নামকরণের বিষয়টি সংক্ষেপে লিখুন।	৪৩
১৪.	সহজিয়া বলতে কী বোঝায়?	৪৪
১৫.	চর্যাপদে নারীদের স্থান ও ভূমিকা তুলে ধরুন।	৪৪
১৬.	'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥'- এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।	৪৫
১৭.	'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী॥'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।	৪৫
১৮.	চর্যাপদে বিধৃত সাধনতত্ত্বের পরিচয় দিন।	৪৫
১৯.	চর্যাপদের ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কে লিখুন।	৪৬
২০.	চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।	৪৬
২১.	চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লিখুন।	৪৭
২২.	চর্যাপদের ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কে লিখুন।	৪৮
২৩.	চর্যাপদ নেপালের রাজদরবারে পাওয়ার কারণ কী?	৪৮
২৪.	চর্যায় প্রাপ্ত পুঁথিতে গানের সংখ্যা কত ছিল?	৪৯
২৫.	চর্যাপদের বর্ণিত প্রবাদ বাক্যগুলো কী কী?	৪৯
২৬.	'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' গ্রন্থের পরিচয় দিন	৪৯
	মধ্যযুগ	
১.	কোন তিন কবির নাম যথাক্রমে কবিকণ্ঠহার, কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকর। *[৩৩তম বিসিএস]*	৫০
২.	মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা সম্পর্কে লিখুন।	৫০
৩.	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের অবদান লিখুন।	৫১
	অন্ধকার যুগ	
১.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। *[৪৩তম বিসিএস]* বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ' বলতে কি বুঝায়? *[৩০তম বিসিএস]*	৫১
২.	অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন।*[৩৭তম]*	৫২
৩.	ডাক ও খনার বচনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*	৫২
৪.	জয়দেব রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *[১৩তম বিসিএস]*	৫৩
৫.	রামাই পণ্ডিত বা শূন্যপুরাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	৫৩

CamScanner

©Nazmus Sadat

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৬.	সেকশুভোদয়ার পরিচয় দিন।	৫৩
৭.	খনা কে? তাঁর পরিচয় লিখুন।	৫৪
৮.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খনার বচনের গুরুত্ব লিখুন	৫৪
	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য	
১.	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পাণ্ডুলিপি কে, কখন এবং কোথা থেকে উদ্ধার করেছিলেন? *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	৫৪
২.	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৪০তম বিসিএস]* বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কাব্যের নাম লিখুন। *[৩৩তম, ২২তম, ২০তম, ১০তম বিসিএস]*	৫৫
৩.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। *[৩৬তম বিসিএস]*	৫৫
৪.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৩১তম]* অথবা, বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন। *[২৯তম বিসিএস]*	৫৬
৫.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে বড়াই চরিত্রের বর্ণনা দিন।	৫৬
৬.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নাট্যগুণ বিচার করুন।	৫৭
৭.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মানবিক আবেদন আলোচনা করুন।	৫৭
৮.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্র রাধার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।	৫৭
৯.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।	৫৮
১০.	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত সমাজ চিত্র আলোচনা করুন।	৫৮
	মঙ্গলকাব্য	
১.	মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। *[৪০তম]*	৫৯
২.	ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। *[৩৬তম]*	৫৯
৩.	তিনটি মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*	৬০
৪.	'মনসামঙ্গল' কাব্যের যে কোনো একজন কবির পরিচয় লিখুন। *[৩১তম]* বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার দুজন বিখ্যাত কবির নাম লিখুন, প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নামসহ। *[২৭তম বিসিএস]*	৬০
৫.	মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন? *[৩০তম বিসিএস]*	৬১
৬.	'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। *[২৮তম]* অথবা, মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।	৬১

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৭.	ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাম কী? কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি কী বলেছেন? *[২০তম বিসিএস]* অথবা, 'অন্নদামঙ্গল' কার রচনা? *[১১তম বিসিএস]*	৬২
৮.	মঙ্গলকাব্যকে এ নাম দেয়ার কারণ কী? *[১৮তম বিসিএস]* অথবা, মঙ্গলকাব্যের নামকরণ সম্পর্কে লিখুন।	৬২
৯.	'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে? কোন শতাব্দীর রচনা? *[১৭তম]*	৬৩
১০.	ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন? *[১৩তম বিসিএস]*	৬৩
১১.	মঙ্গলকাব্য কী?	৬৩
১২.	মঙ্গলকাব্যের গঠন সম্পর্কে লিখুন।	৬৪
১৩.	মঙ্গলকাব্যের ছন্দ সম্পর্কে লিখুন।	৬৪
১৪.	মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত অন্ত্যজশ্রেণির পরিচয় দিন।	৬৫
১৫.	মঙ্গলকাব্যে নারী চরিত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করুন।	৬৫
১৬.	মনসামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	৬৫
১৭.	মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।	৬৬
১৮.	মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে কবি কঙ্কন উপাধি দেওয়া হয় কেন?	৬৬
১৯.	মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে দুঃখের কবি বলা হয় কেন?	৬৭
২০.	চাঁদ সওদাগরকে মধ্যযুগের প্রতিবাদী চরিত্র বলা হয় কেন?	৬৭
২১.	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পতিপ্রাণা চরিত্রের পরিচয় দিন।	৬৮
২২.	ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।	৬৮
২৩.	অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাব্যগুণ বিচার করুন।	৬৯
২৪.	'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- ব্যাখ্যা করুন।	৬৯
২৫.	'ভারতচন্দ্র রায় মূলত নাগরিক কবি' উক্তিটির যথার্থতা লিখুন।	৭০
২৬.	যাবনী মিশাল ভাষা কী?	৭০
২৭.	বারমাস্যা বা বারমাসি বলতে কী বুঝায়?	৭০
২৮.	চৌতিশা বলতে কী বুঝায়?	৭১
২৯.	বাইশা বলতে কী বুঝায়?	৭১
	বৈষ্ণব পদাবলী	
১.	বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের মৌলিক পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	৭১
২.	বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪১তম বিসিএস]*	৭২

CamScanner

©Nazmus Sadat

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৩.	ব্রজবুলি কী ? *[৩৬তম বিসিএস]*	৭২
৪.	বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন। *[৩৫তম]*	৭৩
৫.	'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী? *[৩৪তম বিসিএস]*	৭৩
৬.	বৈষ্ণব পদাবলির তিনজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার নাম লিখুন। *[৩৩তম]* বিখ্যাত চারজন বৈষ্ণব পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। *[৩২তম]* দু'জন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিন। *[৩০তম, ২৫তম বিসিএস]*	৭৪
৭.	বৈষ্ণব পদাবলি কী? এগুলো কোন শতাব্দীর রচনা? *[২৯তম]* অথবা, পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়।	৭৪
৮.	বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাস লিখুন।	৭৫
৯.	বৈষ্ণব পদাবলির আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।	৭৫
১০.	গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।	৭৬
১১.	বৈষ্ণব পদাবলির মানবিক আবেদন লিপিবদ্ধ করুন।	৭৬
১২.	বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পগুণ/সাহিত্যগুণ/কাব্যগুণ নির্ণয় করুন।	৭৬
১৩.	পদাবলী সাহিত্যের চতুষ্টয় বলা হয় কাদেরকে?	৭৭
১৪.	বিদ্যাপতি কিভাবে বাংলার কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন?	৭৭
১৫.	আধুনিক কবিদের মধ্যে কোন কবি পদাবলি রচনা করেছেন?	৭৮
	জীবনী সাহিত্য	
১.	শ্রীচৈতন্য দেব কে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বের কারণ ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস]* বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।*[৩৫তম]* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব কেন স্মরণীয়? *[২৯তম]*	৭৮
২.	জীবনী সাহিত্য বলতে কি বুঝেন? *[৩০তম বিসিএস]*	৭৯
৩.	ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা লিখুন	৭৯
	নাথ সাহিত্য ও মর্সিয়া সাহিত্য	
১.	নাথ সাহিত্য কাকে বলে? এ সাহিত্যের প্রধান কবি কে? *[৩০তম]*	৮০
২.	'গোরক্ষ বিজয়'-এর আদি কবির নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*	৮০
৩.	মর্সিয়া সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।	৮০
৪.	'মানিক রাজার গান' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখুন।	৮১
	অনুবাদ সাহিত্য	
১.	চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ সম্পর্কে লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*	৮১

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
২.	'ইউসুফ-জোলেখা' ও 'লাইলী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যানসমূহ কোন দেশের? *[১৭তম বিসিএস]*	৮১
৩.	'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কী? কোন ভাষায় লেখা? *[১৭তম বিসিএস]*	৮২
৪.	আলাওলের 'পদ্মাবতী' কোন ভাষার, কোন কবির এবং কোন গ্রন্থের অনুবাদ? *[১৩তম বিসিএস]*	৮৩
৫.	প্রথম কোন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করেন? *[১১তম বিসিএস]* অথবা, চন্দ্রাবতীর পরিচয় লিখুন।	৮৩
৬.	'মধুমালতী' কাব্যের অনুবাদক কে? এটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে? *[১১তম বিসিএস]*	৮৪
৭.	বাল্মীকির রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	৮৪
৮.	মধ্যযুগের কোন কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়।	৮৪
৯.	মহাভারতের অনুবাদ সম্পর্কে লিখুন।	৮৫
১০.	মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' বলা হয় কেন?	৮৫
	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	
১.	রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক? *[৩৭তম বিসিএস]* অথবা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন। *[৩৫তম বিসিএস]*	৮৬
২.	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন এমন দুই জন লেখকের নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*	৮৭
৩.	আলাওলকে 'পন্ডিত কবি' বলা হয় কেন? *[৩২তম বিসিএস]*	৮৭
৪.	রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কী ধরনের সাহিত্য রচিত হয়? সে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। *[২৯তম বিসিএস]*	৮৭
৫.	আলাওল রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[২৫তম বিসিএস]* অথবা, আলাওলের সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।	৮৮
৬.	দৌলত কাজী কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? *[২২তম বিসিএস]*	৮৮
৭.	'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? কাব্যটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত? *[১৭তম বিসিএস]*	৮৮
৮.	দৌলত কাজীকে লৌকিক ধারার প্রথম কবি বলা হয় কেন?	৮৯

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৬.	শায়েরদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।	৯৬
৭.	কোন পটভূমিতে কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটেছিল?	৯৭
৮.	জঙ্গনামা কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	৯৭
৯.	বাংলা টপ্পা গানের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন।	৯৭
১০.	এন্টনি ফিরিঙ্গির পরিচয় দিন।	৯৮
১১.	'বটতলার সাহিত্য' বলতে কী বুঝায়?	৯৮
	লোকসাহিত্য	
১.	চন্দ্রকুমার দে এবং দীনেশচন্দ্র সেনের নাম কেন লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে? *[৩৮তম বিসিএস]*	৯৯
২.	লোকসাহিত্য বলতে কী বুঝেন? এর প্রধান শাখা কী কী? *[৩২তম]*	৯৯
৩.	'মৈমনসিংহ গীতিকা' কী? এর অন্তত দুটি পালার নাম বলুন। *[২০তম বিসিএস]*	৯৯
৪.	মনসুর বয়াতী কে? তাঁর কাব্যের নাম কী? *[১৭তম বিসিএস]* গীতিকা হিসেবে 'দেওয়ানা মদিনা'র সার্থকতা বিচার করুন।	১০০
৫.	লোকসাহিত্য ও মরমীসাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কী?	১০১
৬.	গীতিকা বলতে কী বুঝায়?	১০১
৭.	গীতিকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	১০২
৮.	মৈমনসিংহ গীতিকার সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১০২
৯.	মহুয়া পালার শিল্পরূপ বিচার করুন।	১০২
১০.	মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।	১০৩
১১.	মনসুর বয়াতির 'হারামনি' সম্পর্কে লিখুন।	১০৩
১২.	রূপকথা বলতে কী বুঝায়? রূপকথার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।	১০৪
১৩.	বাংলাদেশের লোকসাহিত্য চর্চা বা গবেষণা সম্পর্কে লিখুন।	১০৪
	আধুনিক যুগ	
১.	মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য কী? *[২৯তম বিসিএস]* বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য লিখুন?	১০৫
২.	বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত সম্পর্কে লিখুন।	১০৫
৩.	বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?	১০৬

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৪.	ডিরোজিও কেন বিখ্যাত?	১০৬
৫.	ইয়ংবেঙ্গল সম্পর্কে লিখুন।	১০৭
৬.	আধুনিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় বলতে কী বোঝায়?	১০৭
	বাংলা গদ্যের উন্মেষ ও বিকাশ	
১.	বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কতখানি? *[৪৪তম বিসিএস]*	১০৮
২.	কোন উদ্দেশ্যে কোন বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন? *[২৮তম]* ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল। *[২৭তম, ১৮তম বিসিএস]*	১০৮
৩.	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়? *[২৪তম বিসিএস]*	১০৯
৪.	বাংলা গদ্যের সূচনা সম্পর্কে লিখুন।	১০৯
৫.	বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা লিখুন।	১০৯
৬.	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতদের নাম লিখুন	১১০
৭.	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন	১১০
৮.	বাংলা গদ্যের বিকাশে পত্রিকা ও সাময়িকপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ণ করুন	১১১
৯.	বাংলা গদ্যের বিকাশে উইলিয়াম কেরীর অবদান লিখুন	১১১
১০.	উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।	১১২
১১.	কেরী সাহেবের মুন্সি কাকে এবং কেন বলা হয়?	১১২
	বাংলা উপন্যাস	
১.	বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম লিখুন।*[৩৩তম]*	১১২
২.	উপন্যাস রচনার প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে হ্যানা ক্যাথেরিনের অবদান লিখুন	১১৩
৩.	বাংলা উপন্যাসের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১১৩
	বাংলা কাব্য	
১.	মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস]*	১১৪
২.	বাংলা ভাষায় যারা আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান। এই পাঁচজন কবির নাম লিখুন। *[৩৮তম]*	১১৪
৩.	মহাকাব্য কী? বাংলা মহাকাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১১৫
৪.	আধুনিককালে মহাকাব্য রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না কেন?	১১৫

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৫.	গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিন।	১১৫
৬.	গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য লিখুন	১১৬
৭.	আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভব ও বিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।	১১৬
৮.	বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তর কাব্যধারার পরিচয় দিন। অথবা, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যধারা সম্পর্কে লিখুন।	১১৭
৯.	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ধারা সংক্ষেপে লিখুন	১১৭
	বাংলা কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার	
১.	সনেট কি? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। *[৩৮তম]*	১১৮
২.	বাংলা কবিতার ছন্দ কত প্রকার ও কী কী?	১১৮
৩.	অমিত্রাক্ষর ছন্দ কী? এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।	১১৯
৪.	চতুর্দশপদী কবিতা বলতে কি বুঝায়?	১১৯
৫.	অলংকার কাকে বলে? অলংকার কয়টি ও কী কী?	১২০
৬.	রুবাই সম্পর্কে লিখুন।	১২০
৭.	রস কাকে বলে? বাংলা সাহিত্যে রস কয়টি ও কী কী?	১২০
	বাংলা নাটক	
১.	বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের নাম লিখুন। *[৩৩তম]* বাংলাদেশের তিনজন নাট্যকার ও তাঁদের একটি করে নাটকের নাম লিখুন। *[২৪তম বিসিএস]*	১২১
২.	বিয়োগান্ত নাটক কাকে বলে? বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য কি? *[৩০তম বিসিএস]*	১২১
৩.	পথ নাটক কাকে বলে? নাট্যকারের নামসহ দুটি পথ নাটকের নাম লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*	১২১
৪.	অ্যাবসার্ড নাটক কী? বাংলাদেশে যে সব নাট্যকার অ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন তাঁদের নামোল্লেখ করুন। *[২৯তম বিসিএস]*	১২২
৫.	বাংলা প্রহসনের বিষয়াঙ্গিক আলোচনা করুন।	১২২
৬.	বাংলা নাটকের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১২৩
৭.	বাংলা নাটকে গেরাসিম লেবেদফের অবদান মূল্যায়ন করুন? অথবা, বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখুন।	১২৩
৮.	'গণনাট্য সংঘ' সম্পর্কে লিখুন।	১২৪
৯.	বিজন ভট্টাচার্যের 'নবনাট্য আন্দোলন' সম্পর্কে লিখুন।	১২৪

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১০.	রূপক বা সাংকেতিক নাটক কী?	১২৪
১১.	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কাব্যনাট্য রচনা নিয়ে লিখুন।	১২৫
১২.	আবদুল্লাহ আল মামুনের 'কোকিলারা' নাটকের বিষয়বস্তু লিখুন	১২৫
	প্রবন্ধ সাহিত্য	
১	প্রবন্ধ বলতে কী বোঝায়?	১২৬
	বাংলা গল্প ও ছোটগল্প	
১.	'পিঁজরাপোল', 'জেগে আছি' এবং 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থ তিনটির লেখকদের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*	১২৬
২.	ছোটগল্প বলতে কী বুঝায়?	১২৭
৩.	বনফুলের 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পের মূল বক্তব্য তুলে ধরুন।	১২৭
৪.	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের স্বরূপ সংক্ষেপে লিখুন	১২৮
	কবি–সাহিত্যিকদের বর্ণনা	
	অদ্বৈত মল্লবর্মণ	
১	'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের উপজীব্য বর্ণনা করুন।	১২৮
	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	
১.	'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। *[৩৭তম]*	১২৯
২.	আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন। *[৩১তম]*	১২৯
৩.	আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনার উপজীব্য লিখুন।	১৩০
৪.	'খোয়াবনামা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী?	১৩০
৫.	আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের 'চিলে কোঠার সেপাই'র বিষয়বস্তু লিখুন	১৩১
৬.	'সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।	১৩২
৭.	আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পের মূলবক্তব্য লিখুন	১৩২
৮.	আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের স্বরূপ নির্ণয় করুন।	১৩৩
	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	
১.	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*	১৩৩
	আবু ইসহাক	
১.	'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।	১৩৪
	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	
১.	'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন	১৩৪

CamScanner

©Nazmus Sadat

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
	আবুল মনসুর আহমদ	
১.	আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' গ্রন্থের ব্যঙ্গরূপ বিশ্লেষণ করুন।	১৩৫
২.	'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' সম্পর্কে লিখুন।	১৩৫
	আবুল হাসান	
১.	'পৃথক পালঙ্কে'র লেখক কে? তিনি কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন? *[৩৪তম বিসিএস]*	১৩৬
	আল মাহমুদ	
১.	'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কার রচনা? তাঁর রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*	১৩৬
২.	কবি আল মাহমুদের কবি মানসের পরিচয় দিন।	১৩৬
৩.	'সোনালী কাবিন' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১৩৭
৪.	'নোলক' কবিতায় কবি হৃদয়ের কী আকুতি ফুটে উঠেছে?	১৩৭
	আলাউদ্দীন আল আজাদ	
১.	'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১৩৮
২.	গল্পকার হিসেবে আলাউদ্দীন আল আজাদের পরিচয় লিখুন?	১৩৮
	আহমদ ছফা	
১.	'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' কী? এর লেখক কে? *[৩৪তম বিসিএস]*	১৩৯
২.	'ওঙ্কার' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।	১৩৯
৩.	আহমদ ছফার 'অলাতচক্র' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৪০
	আহমদ শরীফ	
১.	প্রাবন্ধিক হিসেবে আহমদ শরীফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। *[৩১তম]*	১৪০
	আহসান হাবীব	
১.	আহসান হাবীবের কবিমানসের স্বরূপ সংক্ষেপে লিখুন।	১৪১
	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	
১.	'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' কে? কেন বলা হয়? *[৩১তম, ১৭তম]*	১৪১
২.	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' বলা হয় কেন?	১৪২
৩.	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবি প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১৪২
৪.	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'স্ববিরোধী কবি' বলা হয় কেন?	১৪৩
	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	
১.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন। *[৪০তম]*	১৪৩

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
২.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩৬তম বিসিএস]*	১৪৪
৩.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন? *[৩৪তম বিসিএস]*	১৪৪
৪.	বাংলা গদ্যের জনক কে? *[৩৩তম বিসিএস]* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। *[২৯তম বিসিএস]* বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কাকে? বাংলা গদ্যে তিনি কী সংযোজন করেন? *[১৫তম বিসিএস]*	১৪৫
৫.	বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান নির্দেশ করুন। *[৩১তম বিসিএস]* অথবা, নারীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান লিখুন।	১৪৫
৬.	সাহিত্য কর্ম ও সমাজকর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটির জন্য বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। *[২৮তম]*	১৪৬
৭.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কী এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়। *[২৭তম বিসিএস]* অথবা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কার লেখা? *[২৫তম বিসিএস]*	১৪৬
৮.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' ইংরেজি কোন বইয়ের অনুবাদ? *[২৫তম বিসিএস]* শেক্সপীয়র রচিত কোন নাটকটি বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেন এবং অনূদিত গ্রন্থটির বাংলা নাম কী? *[১৩তম বিসিএস]* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।	১৪৬
৯.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থটির নাম লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]* বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের কলমযুদ্ধের বর্ণনা দিন।	১৪৭
১০.	বাংলা গদ্য বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা লিখুন।	১৪৭
১১.	বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।	১৪৮
১২.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কোন উপাধি লাভ করেন।	১৪৮
১৩.	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে লিখুন।	১৪৯
১৪.	বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' গ্রন্থের উপজীব্য কী?	১৫০
১৫.	বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৫০

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
	কাজী আবদুল ওদুদ	
১.	প্রাবন্ধিক হিসেবে আবদুল ওদুদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।*[৩১তম]*	১৫১
২.	'নদীবক্ষে' কার রচনা? *[১১তম বিসিএস]*	১৫১
৩.	কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙলার জাগরণ' প্রবন্ধের মূলভাব লিখুন	১৫১
৪.	'শাশ্বত বঙ্গ' প্রবন্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৫২
	কাজী ইমদাদুল হক	
১.	'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখুন।	১৫৩
	কাজী নজরুল ইসলাম	
১.	কাজী নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন', 'যুগবাণী' ও 'চক্রবাক' কী জাতীয় গ্রন্থ? *[৪৪তম বিসিএস]*	১৫৩
২.	'অগ্নিবীণা' কাব্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ উল্লেখ করুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	১৫৪
৩.	একুশ শতকের বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস]*	১৫৪
৪.	কাজী নজরুল ইসলামকে কেন 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে অভিহিত করা হয়? *[৪৩তম বিসিএস]* নজরুলের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন।*[২৮তম বিসিএস]*	১৫৫
৫.	কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন। *[৪১তম বিসিএস]*	১৫৬
৬.	কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৮তম]*	১৫৬
৭.	কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূলবক্তব্য কী? *[৩৭তম]*	১৫৭
৮.	কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন। *[৩৬তম]*	১৫৭
৯.	নজরুল কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন। *[২৯তম বিসিএস]*	১৫৮
১০.	নজরুলের জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*	১৫৮
১১.	কাজী নজরুল ইসলামের কোন কোন গ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। *[২৪তম বিসিএস]*	১৫৯
১২.	কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বই এর নাম কি? *[২৩তম]*	১৫৯
১৩.	কাব্য আমপারা কে লিখেছেন? *[২৩তম বিসিএস]*	১৫৯
১৪.	কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। *[২১তম]*	১৬০

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১৫.	কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের মূলবক্তব্য লিখুন। *[২০তম বিসিএস]*	১৬০
১৬.	'কুহেলিকা' গ্রন্থটির আঙ্গিক কী? রচয়িতা কে? *[১৫তম বিসিএস]*	১৬১
১৭.	নজরুল কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?	১৬১
১৮.	কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১৬১
১৯.	কাজী নজরুল ইসলামের 'দোলনচাঁপা' কাব্যের ভাবধারা লিখুন	১৬২
২০.	কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি গল্পগ্রন্থের নাম লিখুন।	১৬২
২১.	কথাসাহিত্যে নজরুলের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।	১৬৩
২২.	কাজী নজরুলের সাহিত্যে সমাজ ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১৬৩
২৩.	কাজী নজরুলের সাহিত্যে দেশপ্রেম নিয়ে আলোচনা করুন।	১৬৪
২৪.	'নজরুল প্রেম ও দ্রোহের কবি' ব্যাখ্যা করুন।	১৬৪
২৫.	নজরুল সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার পরিচয় দিন।	১৬৫
২৬.	'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৬৫
২৭.	শিশু সাহিত্যে নজরুলের অবদান লিখুন।	১৬৬
২৮.	কাজী নজরুলের 'নৃত্যপাগল ছন্দ' বলতে কোন ছন্দকে বুঝায়?	১৬৬
	কায়কোবাদ	
১.	কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী? তাঁর লেখা 'অশ্রুমালা' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন। *[৩২তম বিসিএস]* অথবা, 'অশ্রুমালা' কাব্যের রচয়িতা কে? *[২৫তম বিসিএস]*	১৬৬
২.	কায়কোবাদের মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' সম্পর্কে লিখুন।	১৬৭
	কালীপ্রসন্ন সিংহ	
১	'হুতোম প্যাচার নকশা' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৬৭
	গিরিশচন্দ্র সেন	
১	বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র সেনের অবদান মূল্যায়ন করুন।	১৬৮
	গোবিন্দচন্দ্র দাস	
১	গোবিন্দচন্দ্র দাসকে 'স্বভাব কবি' কেন বলা হয়?	১৬৮
	গোলাম মোস্তফা	
১.	কবি গোলাম মোস্তফার তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[১৮তম]*	১৬৯
	জসীমউদ্‌দীন	
১.	জসীমউদ্‌দীনের একটি কাহিনিকাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন। *[৪১তম]*	১৭০

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
২.	কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। *[৩৮তম বিসিএস]* জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় ও প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। *[২১তম বিসিএস]*	১৭০
৩.	'জসীমউদ্‌দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।' কেন? *[২৮তম]*	১৭১
৪.	জসীমউদ্‌দীনের তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*	১৭১
৫.	জসীমউদ্‌দীন কোন অর্থে পল্লিকবি? *[২৪তম বিসিএস]*	১৭১
৬.	জসীমউদ্‌দীন কী আসলেই 'পল্লীকবি'?	১৭২
৭.	জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের বিষয়বস্তু লিখুন।	১৭২
৮.	জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার সারমর্ম লিখুন।	১৭২
	জহির রায়হান	
১.	'হাজার বছর ধরে' কার লেখা? কী বিষয়ে কোন আঙ্গিকে লেখা? *[২০তম বিসিএস]* জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি? *[১০তম বিসিএস]*	১৭৩
২.	বাংলা কথাসাহিত্যে জহির রায়হানের অবদান তুলে ধরুন।	১৭৩
	জাহানারা ইমাম	
১	জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন	১৭৪
	জীবনানন্দ দাশ	
১.	বাংলা কবিতার 'পঞ্চপাণ্ডব' কারা? কেন এরূপ বলা হয়? *[৪৩তম]*	১৭৪
২.	আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। *[৪০তম বিসিএস]*	১৭৫
৩.	'অবসরের গান' কবিতাটি কার রচনা? *[৩৩তম বিসিএস]*	১৭৫
৪.	জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার উপস্থিতি তুলে ধরুন। *[৩১তম বিসিএস]*	১৭৫
৫.	'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য কে রচনা করেন? তাঁর কবি মানসের পরিচয় দিন। *[৩০তম, ১০ম বিসিএস]*	১৭৬
৬.	জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।*[২২তম, ২০তম]*	১৭৬
৭.	জীবনানন্দ দাশকে 'রূপসী বাংলার কবি' কেন বলা হয়?	১৭৭
৮.	জীবনানন্দ দাশকে 'ধূসরতার কবি' বলা হয় কেন?	১৭৭
৯.	জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।	১৭৮

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১০.	জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১৭৮
১১.	জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১৭৯
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	
১.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।	১৭৯
২.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন।	১৮০
৩.	তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের বিষয় ভাবনা আলোচনা করুন।	১৮০
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
১	'সাজাহান' নাটকের পটভূমি ও উপজীব্য লিখুন।	১৮১
	দীনবন্ধু মিত্র	
১.	'সধবার একাদশী' কি সার্থক প্রহসন? আলোচনা করুন। *[৩২তম]* 'সধবার একাদশী' কার লেখা ও কী ধরনের বই? *[১৩তম বিসিএস]*	১৮১
২.	'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি। মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*	১৮২
৩.	'নীলদর্পণ' কে লিখেছেন? তাঁর একটি বিখ্যাত প্রহসনের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*	১৮২
৪.	বাংলা নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান বর্ণনা করুন।	১৮৩
৫.	'নীলদর্পণ' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করুন।	১৮৩
	নবীনচন্দ্র সেন	
১	নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।	১৮৪
	নির্মলেন্দু গুণ	
১	নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয় কেন?	১৮৪
	নীলিমা ইব্রাহিম	
১	নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' সম্পর্কে লিখুন।	১৮৪
	নূরুল মোমেন	
১.	'নেমেসিস' কোন শ্রেণির রচনা? রচয়িতার নাম কী? *[১১তম]*	১৮৫
২.	নূরুল মোমেনের নাটকের স্বরূপ তুলে ধরুন।	১৮৫
	প্যারীচাঁদ মিত্র	
১.	বাংলা কথ্যরীতিতে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন কে? তাঁর এ গ্রন্থের নাম লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]* 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৮৬

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
২.	বাংলা গদ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের সফলতা সংক্ষেপে আলোচনা করুন	১৮৬
৩.	আলালি ভাষা কী? সংক্ষেপে এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।	১৮৭
	প্রমথ চৌধুরী	
১.	'বীরবলী গদ্যে'র স্রষ্টা কে? এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। *[২৯তম বিসিএস]*	১৮৭
২.	প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কি? *[২৫তম বিসিএস]*	১৮৮
৩.	প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক বলা হয় কেন?	১৮৮
৪.	প্রমথ চৌধুরী রচিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।	১৮৮
৫.	প্রমথ চৌধুরীর 'সাহির্ত্যে খেলা' প্রবন্ধের মূলবক্তব্য লিখুন।	১৮৮
	ফররুখ আহমদ	
১.	ফররুখ আহমদের দুটি কাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]* ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য সম্পর্কে লিখুন। ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১৮৯
২.	ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, কাহিনিকাব্য এবং কাব্যনাট্যের নাম লিখুন। *[২০তম বিসিএস]*	১৯০
৩.	ফররুখ আহমদ রচিত সনেট গ্রন্থের নাম কী? *[১৭তম বিসিএস]*	১৯০
৪.	কবি ফররুখ আহমদকে ইসলামী রেঁনেসার কবি বলা হয় কেন?	১৯১
৫.	ফররুখ আহমদের কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।	১৯১
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
১.	'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস অবলম্বনে কপালকুণ্ডলার রূপের বর্ণনা দিন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	১৯২
২.	বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের নাম লিপিবদ্ধ করুন। *[৩৪তম]* বঙ্কিমের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*	১৯২
৩.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কেন? *[৩০তম বিসিএস]*	১৯৩
৪.	'বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমান্সমূলক'।- বিষয়টি অল্পকথায় বুঝিয়ে দিন। *[২৮তম বিসিএস]*	১৯৩
৫.	বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাংলার স্কট' বলা হয় কেন?	১৯৪
৬.	'দুর্গেশনন্দিনী' কেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস?	১৯৪
৭.	'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।	১৯৫

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৮.	রোমান্টিক উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'র সার্থকতা আলোচনা করুন	১৯৫
৯.	'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।	১৯৬
১০.	'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	১৯৬
১১.	বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা করুন।	১৯৭
	বিহারীলাল চক্রবর্তী	
১.	কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিশেষত্ব নিরূপণ করুন। [৪৪তম] অথবা, আধুনিক গীতিকবিতায় বিহারীলালের অবদান লিখুন।	১৯৭
২.	বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? এ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। *[৩৮তম বিসিএস]* বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? কেন তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলা হয়েছে? *[৩৪তম বিসিএস]*	১৯৮
৩.	বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	১৯৮
৪.	বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' সম্পর্কে লিখুন।	১৯৯
	বুদ্ধদেব বসু	
১.	বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*	১৯৯
	বেগম রোকেয়া	
১.	নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন। *[৪৪তম বিসিএস]* অথবা, রোকেয়াকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কেন বলা হয়?	২০০
২.	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন। *[৪১তম বিসিএস]*	২০০
৩.	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের বিষয়বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। *[৪০তম বিসিএস]* 'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত? *[২৭তম বিসিএস]*	২০১
৪.	'নারী জাগরণের অগ্রদূত' বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করুন। *[৩২তম বিসিএস]*	২০১
৫.	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন। *[৩১তম বিসিএস]*	২০২
৬.	'বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক' কথাটি বুঝিয়ে দিন। *[২৮তম বিসিএস]*	২০২

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৭.	নারী মুক্তি আন্দোলনে বেগম রোকেয়ার গৃহীত পদক্ষেপ লিখুন।	২০৩
	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১.	'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশটির নামকরণের তাৎপর্য লিখুন। *[৪১তম বিসিএস]*	২০৩
২.	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। *[৩৮তম বিসিএস]*	২০৪
৩.	'আরণ্যক' উপন্যাসের রচয়িতার নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*	২০৪
৪.	বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করুন।	২০৫
৫.	'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অঙ্কিত প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করুন।	২০৫
	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	
১.	'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক কে এবং কেন? *[৪৪তম বিসিএস]*	২০৬
২.	মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।*[৪১তম]*	২০৬
৩.	আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুদূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন। *[৪০তম]* অথবা, মধুসূদন দত্তকে বাংলা কবিতার আধুনিকতার জনক বলা হয় কেন?	২০৭
৪.	'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের পরিচয় দিন।*[৩৭তম]*	২০৭
৫.	'মেঘনাদবধ' কাব্যের সর্গ সংখ্যা কত এবং কী কী? *[৩২তম]*	২০৮
৬.	বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনটি অবদানের বর্ণনা দিন। *[৩০তম বিসিএস]* বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলোর একটি প্রসঙ্গে লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*	২০৮
৭.	মধুসূদন দত্তের একটি মহাকাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]* অথবা, মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের নাম কী? *[১০তম বিসিএস]*	২০৯
৮.	মধুসূদন দত্তের একটি পত্রকাব্য ও একটি নাটকের নাম লিখুন। *[২৭তম]*	২০৯
৯.	'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচয়িতা কে? এ নাটকের গুরুত্ব কী? *[১৫তম]*	২১০
১০.	বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটকের পরিচয় দিন।	২১০
১১.	মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন?	২১০
১২.	মহাকাব্য হিসেবে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কতটা সফল?	২১১
১৩.	মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	২১১
	বাংলা নাটকে মধুসূদন দত্তের অবদান বর্ণনা করুন।	২১১

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১৪.	'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?	২১২
	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
১.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৩তম]*	২১৩
২.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লিখুন।	২১৩
৩.	'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।	২১৪
৪.	'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে 'পুতুল' আসলে কারা?	২১৪
৫.	'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য বর্ণনা করুন।	২১৫
	মাহমুদুল হক	
১	'জীবন আমার বোন' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।	২১৫
	মীর মশাররফ হোসেন	
১.	মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রধান তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	২১৬
২.	নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেনের পরিচয় লিখুন। *[৪৩তম]*	২১৬
৩.	'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। *[৪১তম, ৩৫তম বিসিএস]*	২১৭
৪.	'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা? এটি কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম? *[৩১তম, ১১তম বিসিএস]*	২১৭
৫.	'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ কি? *[৩০তম বিসিএস]*	২১৮
৬.	'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ নামের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন। *[২৮তম বিসিএস]*	২১৮
৭.	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের পরিচয় লিখুন।	২১৮
৮.	বাংলা গদ্যে মীর মশাররফ হোসেনের অবদান লিখুন।	২১৯
৯.	'জমিদার দর্পন' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন?	২১৯
১০.	সাংবাদিক মীর মশাররফ হোসেনের অবদান লিখুন?	২২০
	মুকুন্দদাস	
১	মুকুন্দদাসকে চারণ কবি বলা হয় কেন?	২২০
	মুনীর চৌধুরী	
১.	নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পরিচয় দিন। *[৪৪তম বিসিএস]*	২২১
২.	মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের বিষয় কি? *[২৩তম বিসিএস]*	২২১
৩.	'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের বিষয় লিখুন। *[২১তম বিসিএস]*	২২২
৪.	মুনীর চৌধুরী কী জন্য বিখ্যাত? *[১১তম বিসিএস]*	২২২

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	
১.	মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-ভাবনার পরিচয় দিন। *[৩৭তম]*	২২২
২.	মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ সম্পর্কে লিখুন	২২৩
৩.	প্রাবন্ধিক হিসেবে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মূল্যায়ন করুন	২২৩
	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	
১.	'তাপস কাহিনী', 'মহর্ষি মনসুর' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী? *[১৮তম বিসিএস]*	২২৪
২.	'জোহরা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখুন।	২২৪
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস]*	২২৫
২.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বলাকা' কাব্যের বিশেষত্ব লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]* রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের প্রথম প্রকাশ কোন সালে? *[১০তম]* 'বলাকা' কাব্য অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিন।	২২৫
৩.	জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*	২২৬
৪.	বাংলাদেশে রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*	২২৬
৫.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন। *[৪১তম বিসিএস]* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি নাটকের নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*	২২৭
৬.	'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী? *[৩৭তম]*	২২৭
৭.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন। *[৩৩তম]*	২২৮
৮.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখ করুন। *[৩১তম বিসিএস]*	২২৮
৯.	'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী-ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। *[২৯তম বিসিএস]*	২২৯
১০.	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? *[২৮তম বিসিএস]*	২৩০

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১১.	রবীন্দ্রনাথ কত সালে কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *[২৭তম, ২১তম বিসিএস]* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।	২৩০
১২.	রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের গ্রন্থ? *[২৪তম]* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' কাব্য নাকি উপন্যাস?	২৩১
১৩.	রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যের নাম কি? *[২৩তম বিসিএস]*	২৩২
১৪.	রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি? *[২০তম]*	২৩২
১৫.	শেষের কবিতার তিনটি পঙ্‌ক্তি লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]*	২৩২
১৬.	ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম? এই ছদ্মনামে কোন গ্রন্থটি রচিত হয়? *[১৭তম বিসিএস]*	২৩২
১৭.	রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?	২৩৩
১৮.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন।	২৩৩
১৯.	রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীমুক্তি ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।	২৩৪
২০.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় কী কী শিরোনামে বক্তব্য দেন?	২৩৪
২১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের পরিচয় দিন।	২৩৫
২২.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতিধর্মী উপন্যাসের পরিচয় লিখুন।	২৩৫
২৩.	'চোখের বালি' উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।	২৩৫
২৪.	গদ্য কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান লিখুন।	২৩৬
২৫.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।	২৩৬
২৬.	'মানসী' কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের অনুবিশ্ব বলা হয় কেন?	২৩৭
২৭.	'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাবনা তুলে ধরুন।	২৩৭
২৮.	রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যটির বিশেষত্ব লিখুন।	২৩৮
২৯.	বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করুন।	২৩৮
৩০.	'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	২৩৯
৩১.	রূপক নাটক হিসেবে 'ডাকঘর' নাটকের সার্থকতা বিচার করুন।	২৩৯
৩২.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে লিখুন।	২৪০
৩৩.	'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	২৪০
৩৪.	'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	২৪১
৩৫.	'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের সভ্যতার সংকট সম্পর্কে লিখুন।	২৪১
৩৬.	বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করুন।	২৪১
৩৭.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।	২৪২

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৩৮.	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানবজীবনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে লিখুন।	২৪৩
৩৯.	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে কি গীতিধর্মী বলা যায়?	২৪৩
৪০.	'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অতিপ্রাকৃত উপাদান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।	২৪৩
৪১.	রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের মূল বক্তব্য লিখুন।	২৪৪
৪২.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের মূলবক্তব্য লিখুন।	২৪৪
৪৩.	ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' কতটা সফল লিখুন।	২৪৫
৪৪.	'ছিন্নপত্রের' চিঠিগুলো রবীন্দ্রনাথ কাদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন	২৪৫
	রশীদ করীম	
১.	রশীদ করীমের চারটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*	২৪৬
২.	'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।	২৪৬
	রামমোহন রায়	
১.	বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন রায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।	২৪৭
২.	সতীদাহ প্রথা নিয়ে রামমোহন রায়ের কলমযুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন।	২৪৭
	রিজিয়া রহমান	
১	'বং থেকে বাংলা' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*	২৪৮
	শওকত আলী	
১	শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসের পরিচয় দিন।	২৪৮
	শওকত ওসমান	
১.	শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।*[৪০তম]* মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শওকত ওসমানের দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন *[২১তম বিসিএস]*	২৪৯
২.	'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্থ ব্যাখ্যা করুন*[৩৭তম]*	২৪৯
৩.	ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	২৫০
৪.	শওকত ওসমানের গল্পে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ তুলে ধরুন।	২৫০
৫.	শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় লিখুন	২৫১
৬.	শওকত ওসমানের 'জননী' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী'র তুলনামূলক আলোচনা করুন।	২৫১
	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
১.	'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি কার লেখা? *[২২তম বিসিএস]*	২৫২

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
২.	শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন লেখায় কী কী ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন?	২৫২
৩.	শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ লিখুন।	২৫২
৪.	'প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গৃহদাহ এক সুস্পষ্ট প্রতিবাদ।' আলোচনা করুন।	২৫৩
৫.	শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' সম্পর্কে লিখুন	২৫৩
৬.	শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল কেন?	২৫৪
৭.	শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প 'মহেশ' সম্পর্কে আলোকপাত করুন।	২৫৪
	শহীদুল্লা কায়সার	
১	'সংশপ্তক' কার লেখা? *[২৩তম বিসিএস]* অথবা, শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসের বিষয়ভাবনা কী?	২৫৫
২	শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' উপন্যাস কী অর্থে স্বতন্ত্র?	২৫৫
	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	
১.	'কাঞ্চনগ্রাম' কার লেখা? *[২৩তম বিসিএস]*	২৫৬
২.	'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির রচয়িতা কে? *[১৮তম বিসিএস]*	২৫৬
	শামসুন্নাহার মাহমুদ	
১	নারী মুক্তি আন্দোলনে শামসুন্নাহার মাহমুদের ভূমিকা লিখুন।	২৫৬
	শামসুর রাহমান	
১.	কবি শামসুর রাহমানের চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।*[৩৮তম*	২৫৭
২.	'মজলুম আদিব' কে? এ নামে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? *[৩৪তম বিসিএস]*	২৫৭
৩.	শামসুর রাহমানের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিন? *[২৯তম বিসিএস]*	২৫৮
৪.	শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যের নাম কী? *[২২তম বিসিএস]*	২৫৮
৫.	শামসুর রাহমানের কবিতায় কীভাবে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে?	২৫৮
৬.	শামসুর রাহমানের কবিতায় দেশ ও সমকাল প্রসঙ্গে লিখুন।	২৫৯
৭.	শামসুর রাহমানকে 'নাগরিক কবি' বলা হয় কেন?	২৫৯
	শাহেদ আলী	
১.	শাহেদ আলীর সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।	২৬০
	সত্যেন সেন	
১.	সত্যেন সেনের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[২১তম বিসিএস]*	২৬০

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
	সাঈদ আহমদ	
১	নাট্যকার সাঈদ আহমদের পরিচয় দিন।	২৬১
	সুকান্ত ভট্টাচার্য	
১	সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যভাবনা সম্পর্কে লিখুন।	২৬১
	সেলিনা হোসেন	
১.	সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' সম্পর্কে লিখুন	২৬২
২.	সেলিনা হোসেনের গল্পের বিষয়ভাবনা সংক্ষেপে লিখুন।	২৬২
	সেলিম আল দীন	
১.	নতুন নাট্যধারার প্রবক্তা হিসেবে সেলিম আল দীনের অবদান লিখুন	২৬৩
২.	সেলিম আল দীনের যে কোন একটি নাটক সম্পর্কে লিখুন।	২৬৩
	সৈয়দ আলী আহসান	
১.	গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*	২৬৪
	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	
১.	উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওলীউল্লাহর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করুন। *[৪৪তম বিসিএস]* ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন। *[৪১তম]*	২৬৪
২.	'লালসালু'র লেখক কে? *[১০তম বিসিএস]* অথবা, 'লালসালু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখুন।	২৬৪
৩.	'চাঁদের অমাবস্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির লেখক কে? *[১৩তম বিসিএস]*	২৬৫
৪.	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করুন।	২৬৫
৫.	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে সমকালীন সমাজচিত্রের বর্ণনা দিন	২৬৬
৬.	'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে বিধৃত চেতনা প্রবাহরীতি আলোচনা করুন	২৬৬
৭.	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক সম্পর্কে লিখুন	২৬৭
৮.	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বহিপীর নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন	২৬৭
	সৈয়দ মুজতবা আলী	
১.	সৈয়দ মুজতবা আলীর চারটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*	২৬৮
২.	সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক পরিচয় দিন।	২৬৮
৩.	সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন	২৬৯

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
	সৈয়দ শামসুল হক	
১.	সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন। *[৪০তম]* অথবা, 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কেন সফল? *[৩৭তম]*	২৬৯
২.	'নুরলদীনের সারা জীবন' নাটকের পরিচয় দিন।	২৭০
৩.	সৈয়দ শামসুল হকের গল্প-চারিত্র্য বিশ্লেষণ করুন।	২৭০
৪.	বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়।	২৭১
	হাসান আজিজুল হক	
১.	হাসান আজিজুল হকের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন। *[৩১তম]*	২৭১
২.	হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।	২৭২
৩.	হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন।	২৭২
৪.	হাসান আজিজুল হকের গল্পের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।	২৭৩
	হাসান হাফিজুর রহমান	
১.	বাংলা সাহিত্যে হাসান হাফিজুর রহমান কেন স্মরণীয়?	২৭৩
২.	হাসান হাফিজুর রহমান কী অর্থে যন্ত্রণাদগ্ধ কবি?	২৭৩
৩.	হাসান হাফিজুর রহমানের 'আর্ত শব্দাবলি' কাব্যের মূলকথা লিখুন	২৭৪
৪.	হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্পের স্বরূপ তুলে ধরুন।	২৭৪
	হুমায়ুন আজাদ	
১.	প্রাবন্ধিক হিসেবে হুমায়ুন আজাদের কৃতিত্ব আলোচনা করুন *[৩৩তম বিসিএস]*	২৭৫
২.	'হুমায়ুন আজাদ প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক' ব্যাখ্যা করুন	২৭৫
	হুমায়ুন আহমেদ	
১.	বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?	২৭৬
২.	হুমায়ুন আহমদের 'দেয়াল' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন।	২৭৬
	বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্র	
১.	কুবের, কপিলা, শশী, কুসুম চরিত্রসমূহ কোন উপন্যাসের অন্তর্গত? উপন্যাস দুটির রচয়িতা কে? *[৩৮তম বিসিএস]*	২৭৭
২.	'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের 'রোহিনী' চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।*[৩৭তম]*	২৭৭
৩.	রবীন্দ্র-ছোটগল্পভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন।*[৩৫তম*	২৭৭
৪.	সংক্ষেপে কপালকুন্ডলা চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করুন। *[৩২তম]*	২৭৮

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৫.	'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*	২৭৯
৬.	জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। *[২৩তম বিসিএস]*	২৭৯
৭.	গফুর, মহিম ও মজিদ কোন উপন্যাসের/গল্পের চরিত্র? *[১৮তম]*	২৭৯
৮.	'বীরাঙ্গনা' কাব্যের যে কোন একটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন। *[৩১তম]*	২৮০
৯.	'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।	২৮০
১০.	'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা কোন অর্থে বীরাঙ্গনা?	২৮১
১১.	'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রামীলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।	২৮১
১২.	'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের 'ঠকচাচা' সম্পর্কে লিখুন।	২৮২
১৩.	দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের 'আয়েষা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৮২
১৪.	'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের 'কুবের' চরিত্রের বর্ণনা দিন।	২৮৩
১৫.	'পদ্মা নদীর মাঝি'র হোসেন মিয়া চরিত্রের বিশ্লেষণ করুন।	২৮৩
১৬.	'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশী চরিত্রের দ্বন্দ্ব জটিলতা ব্যাখ্যা করুন	২৮৪
১৭.	শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'ইন্দ্রনাথ' চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।	২৮৫
১৮.	শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'শ্রীকান্ত' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৮৫
১৯.	শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নারী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করুন।	২৮৬
২০.	পথের দাবী উপন্যাসের 'সব্যসাচী' চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।	২৮৬
২১.	দেবদাস উপন্যাসের 'পার্বতী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৮৭
২২.	রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৮৮
২৩.	'দেনাপাওনা' গল্পের 'নিরুপমা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৮৮
২৪.	রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র গল্পের 'মৃণাল' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৮৯
২৫.	রবীন্দ্রনাথের 'চন্দরা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৮৯
২৬.	রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৯০
২৭.	পোস্ট মাস্টার গল্পের পোস্টমাস্টার ও রতন চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন	২৯০
২৮.	'শেষের কবিতা' উপন্যাসের 'লাবণ্য' চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।	২৯১
২৯.	'চোখের বালি' উপন্যাসের 'বিনোদিনী' চরিত্রের ব্যাখ্যা লিখুন।	২৯১
৩০.	'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের 'বিমলা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৯২
৩১.	'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'দামিনী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৯৩
৩২.	চার অধ্যায় উপন্যাসের 'এলা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৯৩

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
৩৩.	ডাকঘর নাটকের 'অমল' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৯৪
৩৪.	পথের পাঁচালী উপন্যাসের অপু চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৯৪
৩৫.	হাজার বছর ধরে উপন্যাসের 'টুনি' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৯৫
৩৬.	লালসালু উপন্যাসের 'মজিদ' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৯৬
৩৭.	লালসালু উপন্যাসের 'জমিলা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন	২৯৬
৩৮.	সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাসের 'জয়গুন' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।	২৯৭
৩৯.	হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্ট চরিত্র হিমু ও মিসির আলী সম্পর্কে লিখুন	২৯৭
	পত্রিকা ও সাময়িকপত্র	
১.	বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৩৫তম, ৩১তম* 'কল্লোল-যুগ' বলতে কী বোঝেন? এ যুগের সাহিত্যকে কেন 'ত্রিশোত্তর সাহিত্য' বলা হয়? *[২৯তম বিসিএস]*	২৯৮
২.	'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? *[৩৪তম বিসিএস]*	২৯৮
৩.	বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র' পত্রিকার অবদান সম্পর্কে লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*	২৯৯
৪.	মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত ও পাক্ষিক বেগম পত্রিকার সম্পাদকের নাম লিখুন। *[২২তম বিসিএস]*	২৯৯
৫.	'সমকাল' পত্রিকা বিশ শতকের কোন দশকে প্রকাশিত হয়? এর সম্পাদকের নাম কি? *[২১তম বিসিএস]* 'সমকাল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*	৩০০
৬.	'সংবাদ প্রভাকর' কত সালে, কার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়? *[১৩তম বিসিএস]* ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*	৩০০
৭.	'কল্লোল' কী? *[২৪তম বিসিএস]* 'কল্লোল' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়? *[১১তম বিসিএস]* 'কল্লোল' পত্রিকার পরিচয় দিন।	৩০১
৮.	বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র সম্পর্কে ধারণা দিন।	৩০১
৯.	বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র সম্পর্কে লিখুন।	৩০১
১০.	'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা দিন।	৩০২
১১.	'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা দিন।	৩০২
১২.	'শিখা' পত্রিকার পরিচয় দিন।	৩০৩
১৩.	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখুন।	৩০৩

CamScanner

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
১৪.	বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা সম্পর্কে লিখুন।	৩০৪
১৫.	'লাঙ্গল' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?	৩০৪
১৬.	বাংলা পত্রিকার প্রথম মহিলা সম্পাদকের নাম কি?	৩০৪
১৭.	বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম লিখুন।	৩০৫
১৮.	'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো কী কী?	৩০৫
	বাংলা গান ও চলচ্চিত্র	
১.	শাহ আবদুল করিমের গান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। *[৪৩তম]*	৩০৫
২.	সিলেটের মরমী গীতিকারদের সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪৩তম]*	৩০৬
৩.	সাম্প্রতিক বাংলাদেশে লোকধারার গানের জনপ্রিয়তার কারণ লিখুন।*[৩৫তম]*	৩০৭
৪.	বাংলাদেশের সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।*[৩৫তম]*	৩০৭
৫.	বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকসংস্কৃতির সংযোগ বর্ণনা করুন।	৩০৮
৬.	বাউল গানের সাহিত্যগুণ বিচার করুন।	৩০৮
	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য	
১.	'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। *[৪৩তম]* অথবা, হাসান হাফিজুর রহমানের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক সংকলন গ্রন্থের নাম কি? *[২৩তম বিসিএস]*	৩০৯
২.	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক তিনটি গল্পের নাম লিখুন। *[৩৬তম]* ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব রচিত যে কোনো একটি ছোটগল্পের পরিচয় বিধৃত করুন। *[৩১তম বিসিএস]*	৩০৯
৩.	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক দুটি কবিতার নাম লিখুন। *[৩৩তম]*	৩১০
৪.	'একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতায় অন্তহীন প্রেরণার উৎস'- এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]* অথবা, বাংলা কবিতায় ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন লিখুন।	৩১০
৫.	বাংলা উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব আলোচনা করুন।	৩১১
৬.	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন।	৩১২
৭.	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একটি নাটকের মূল্যায়ন করুন।	৩১২
	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য	
১.	লেখকের নামসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	৩১৩

ক্রম	সাহিত্য	পৃষ্ঠা
২.	মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন। *[৩৬তম]* মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। *[৩২তম, ২৯তম বিসিএস]*	৩১৩
৩.	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করুন। *[৩৫তম]*	৩১৪
৪.	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*	৩১৪
৫.	মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা একটি স্মৃতিকথার নাম লিখুন। *[২২তম]*	৩১৫
৬.	বাংলা উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব বর্ণনা করুন।	৩১৫
৭.	বাংলা কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।	৩১৬
৮.	বাংলা ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।	৩১৬
৯.	'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।	৩১৭
	বিবিধ	
১.	'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে কী বোঝেন? *[৪৩তম বিসিএস]*	৩১৭
২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত তিনটি গ্রন্থের প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*	৩১৮
৩.	'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ প্রকাশের পটভূমি লিখুন। *[৪৩তম]*	৩১৮
৪.	বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।*[৩৬তম*	৩১৯
৫.	বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ও কবে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? *[৩৪তম বিসিএস]*	৩১৯
৬.	বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সম্পর্কে তিনটি বাক্য রচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।	৩২০
৭.	পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা গদ্যানুবাদকের নাম লিখুন *[২২তম বিসিএস]*	৩২০
৮.	বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।	৩২০
৯.	'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।	৩২১
১০.	বাংলা একাডেমি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।	৩২১
১১.	বাংলাদেশে নাট্যচর্চার সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে লিখুন।	৩২২
১২.	'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কোন কবির বাণী?*[১৫তম]*	

ক্রম	ব্যাকরণ	পৃষ্ঠা
	বাংলা লিপি ও ভাষা	
১.	বাংলা লিপির উৎস কি? *[৩৪তম বিসিএস]*	৩২৩
২.	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*	৩২৩
৩.	বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত? *[২৩তম বিসিএস*	৩২৩
৪.	বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে, কোন ভাষায়, কোথায় রচনা করেন? *[১৫তম বিসিএস]*	৩২৩
	শব্দ গঠন	
১.	শব্দ কাকে বলে?	৩২৪
২.	অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। *[৪৪তম বিসিএস]* অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন। *[৩৮তম]*	৩২৪
৩.	উৎস অনুসারে বাংলাভাষার শব্দসম্ভারকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। *[৪৪তম (পেশাগত)]*	৩২৫
৪.	উদাহরণসহ ষ-ত্ব ও ণ-ত্ব বিধি আলোচনা করুন। *[৪৪তম (পেশাগত)]*	৩২৬
৫.	সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। *[৩৬ তম বিসিএস]* গঠন অনুসারে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।	৩২৭
৬.	শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন। [৩৫ তম বিসিএস]	৩২৮
৭.	শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস]* বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপায়গুলো কী কী? সমাস দ্বারা শব্দগঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস]* বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপায়গুলো কী কী? প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের উপায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম (পেশাগত)]* শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। *[৪০ তম, ৩৫ তম বিসিএস]*	৩২৮
৮.	বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।	৩২৯
৯.	উপসর্গ বলতে কী বোঝায়? উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।	৩৩০
১০.	খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি? খাঁটি বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন লিখুন।	৩৩০

CamScanner

ক্রম	ব্যাকরণ	পৃষ্ঠা
১১.	তৎসম উপসর্গ কয়টি? তৎসম উপসর্গযোগে শব্দ গঠন লিখুন।	৩৩১
১২.	বিদেশি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন লিখুন।	৩৩২
১৩.	নিচের প্রতিটি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দগঠন করুন। *[৪১ তম]*	৩৩৩
১৪.	'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে' ব্যাখ্যা করুন।	৩৩৪
১৫.	সন্ধি কাকে বলে? সন্ধির গঠন প্রক্রিয়া লিখুন	৩৩৪
১৬.	শব্দ গঠনে সন্ধির ভূমিকা কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।	৩৩৫
১৭.	সমাস কাকে বলে? সমাস কত প্রকার ও কী কী?	৩৩৫
১৮.	দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে? দ্বন্দ্ব সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন লিখুন।	৩৩৬
১৯.	বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন	৩৩৭
২০.	সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।	৩৩৭
২১.	প্রত্যয় কাকে বলে? প্রত্যয় কত প্রকার ও কী কী?	৩৩৮
২২.	প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের ছয়টি নিয়ম উল্লেখ করুন।	৩৩৮
২৩.	দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞার্থ লিখুন। প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিন। *[৩৭ তম বিসিএস]*	৩৩৯
২৪.	বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার বিশেষ্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।	৩৪০
২৫.	বিশেষণ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের পরিচয় লিখুন।	৩৪০
২৬.	বিশেষণের অতিশায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করুন।	৩৪১
২৭.	সর্বনাম কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার সর্বনামের পরিচয় লিখুন।	৩৪২
২৮.	অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন। *[৩৭ তম বিসিএস]*	৩৪৩
২৯.	ক্রিয়াপদ কাকে বলে? ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিন্যাস লিখুন।	৩৪৪
৩০.	ক্রিয়া বিশেষণ কাকে বলে? ক্রিয়া বিশেষণের প্রকারভেদ লিখুন।	৩৪৬
৩১.	অক্ষর কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।	৩৪৭
	বানান/বানানের নিয়ম	
১.	বানানগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: *[৪৪তম বিসিএস]*	৩৪৭
২.	বানান শুদ্ধ করে লিখুন: *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*	৩৪৮
৩.	বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের নিয়ম লিখুন। *[৪৩তম]*	৩৪৮
৪.	বাংলা বানানে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস(কারিগরি/পেশাগত)]*	৩৪৮

CamScanner

ক্রম	ব্যাকরণ	পৃষ্ঠা
৫.	বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের সূত্রসমূহ দৃষ্টান্তসহ লিখুন। *[৪১তম, ৩৬তম]* বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। *[৩৮তম*	৩৪৯
৬.	বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। *[৪০, ৩৫ তম]*	৩৫০
৭.	নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন। *[৩৮ তম বিসিএস]*	৩৫১
৮.	বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে ৫টি বিবিধ বানানের নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।	৩৫১
৯.	বাংলা ভাষার শব্দের শেষে 'ই' ও 'ও' ব্যবহারের দুটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরো।	৩৫২
১০.	বাংলা ভাষার 'না' ও 'নি' ব্যবহারের নিয়মগুলো আলোচনা করুন।	৩৫২
১১.	প্রমিত বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।	৩৫৩
১২.	বাংলা বানানে উ-কার (ু) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।	৩৫৩
১৩.	বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম লিখুন।	৩৫৪
১৪.	বাংলা ভাষায় ণ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ণ-ত্ব বিধানের বিধানগুলো আলোচনা করো।	৩৫৪
১৫.	ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ষ-ত্ব বিধানগুলো আলোচনা করুন।	৩৫৫
১৬.	বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী 'রেফ' 'বিসর্গ' ও 'হস চিহ্ন' সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম লিখুন।	৩৫৬
১৭.	প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে ই, ঈ, উ, ঊ প্রয়োগের নিয়ম লিখুন	৩৫৬
১৮.	বাংলা বানানে রেফ (র্) ও অনুস্বার (ং) ব্যবহারের নিয়ম লিখুন।	৩৫৭
১৯.	প্রতিবর্ণীকরণ কী? উদাহরণসহ পাঁচটি প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম লিখুন	৩৫৭
২০.	বাংলা বানানের নিয়মানুসারে বাংলা ভাষায় 'কি' ও 'কী' ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করুন।	৩৫৮
২১.	প্রমিত বাংলা বানানরীতির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।	৩৫৮
	বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম।	৩৫৯
	বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	৩৬৪
	প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ	৩৯৮
	গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা	৪১৯
	বাক্যগঠন	৪৩১

CamScanner

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

১. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।*[৪৪তম (পেশাগত)]*

উত্তর : সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ নির্ধারিত হয়েছে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা হয়-

- ✓ প্রাচীন যুগ (৬০০-১২০০)। প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হলো 'চর্যাপদ'।
- ✓ মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০)। মধ্যযুগের শুরুতে ১২০১ থেকে - ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে কোন কোন গবেষক বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন।
- ✓ আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান সময় পর্যন্ত)। আধুনিক যুগ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে কয়েকজন সমালোচক মতপ্রকাশ করেছেন। বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আধুনিক যুগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-
    ১. উন্মেষ পর্ব (১৮০১-১৮৬০)
    ২. বিকাশ পর্ব (১৮৬১ - বর্তমান)।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা করেন উইলিয়াম কেরী ও তার সহযোগী কয়েকজন সংস্কৃত পন্ডিত। এরপর একে একে আগমন ঘটে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকদের।

প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)

১. চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন? *[৪৪তম বিসিএস]*
'চর্যাপদ' কত সালে এবং কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়? *[৩৪তম বিসিএস]*
চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটির নাম The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যাবার পর তৎকালীন বৃটিশ সরকার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের

CamScanner

প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রদত্ত তালিকার সূত্র ধরেই ১৮৯৭ (প্রথম বার) ও ১৮৯৮ সালে (দ্বিতীয় বার) নেপাল ভ্রমণ করেন। তৃতীয় বারের মতো ১৯০৭ সালে নেপালে গিয়ে রাজদরবারের 'নেপাল রয়্যাল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। এ সময় তিনি চর্যাপদের সাথে 'সরহপাদের দোঁহা', 'কাহ্নপাদের দোহাঁ' ও 'ডাকার্ণব' নামে আরো তিনটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। উল্লেখ্য তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ছিলেন এবং কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অর্থায়নে নেপাল গিয়েছিলেন।

২. চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে একজন বাঙালি চর্যাকারের পরিচয় দিন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : অনুমান করা হয় ভুসুকুপা পূর্ব বাংলার কবি। তার আসল নাম শান্তিদেব। পিতৃপ্রদত্ত নাম শান্তিবর্মা। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজা কল্যাণবর্মার পুত্র ছিলেন। খুব সম্ভব ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে তিনি বেঁচে ছিলেন। সেটি ছিল ৭৭০-৮৫০ সাল। তিনি নিজের কুটিরে সর্বক্ষণ গোপনে অধ্যয়ন করতেন বলে অন্য ভিক্ষুরা মনে করতেন, তিনি অলস, সব সময় আহার এবং নিদ্রায় সময় কাটান। এই কারণে ভিক্ষুরা তাকে ভুসুকু (ভু=ভক্ষণ, সু=সুপ্তি, কু=কুটির) নামে ডাকতেন। চর্যাপদে তাঁর রচিত পদের সংখ্যা ৮টি। এগুলো হলো- ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯। তার পদগুলোতে পদ্মা (পঁউআ) খাল, বঙ্গাল দেশ ও বঙ্গালীর কথা আছে। এছাড়া একটি পদে তিনি নিজেকে বাঙালি কবি বলে দাবি করেছেন।

'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী॥'

এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি বাঙালি কবি। শেষ জীবনে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করেন।

৩. চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। চর্যাপদের ভাষা কিছুটা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। এর অর্ধেক বুঝা যায়, অর্ধেক বুঝা যায় না। তাই চর্যার ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সান্ধ্যভাষা বা আলো-আঁধারির ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চর্যার কবিদের এরূপ ভাষা ব্যবহারের কারণ হলো- কবিরা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। তাছাড়া গোঁড়া ব্রাহ্মণরা সহজিয়া বৌদ্ধদের প্রতি প্রসন্ন ছিলো না। তাদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চর্যার কবিগন আলো-আঁধারি রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তা বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চর্যাপদে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া ভাষার কিছু শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত

হয়। প্রাকৃত ভাষা থেকে জন্ম নেওয়া এ ভাষাগুলোর শব্দে বেশ মিল ছিল। ফলে অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতগণও চর্যাপদকে নিজেদের ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে দাবি করেন। কিন্তু পণ্ডিতদের এ দাবি শেষ পর্যন্ত টিকে নি। কারণ দু'একটি শব্দের প্রয়োগ কিংবা শব্দগত কিছু সাদৃশ্য দেখে কোনক্রমেই একটি ভাষার ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সার্বিক বিচারে চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ।

৪. চর্যাপদে বিধৃত বাঙালিজীবনের পরিচয় দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যার বিষয় ধর্মকেন্দ্রিক ও তত্ত্বহুল হলেও তার বাহ্যিক রূপটি লৌকিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চর্যায় বাঙালি সমাজের, বিশেষত ব্রাহ্মণ্যপীড়িত অন্ত্যজ সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ডোম, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার নানা তথ্য এই পদগুলি থেকে জানা যায়।

তৎকালীন সমাজের মূল অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। তবে নদীতটবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির ডোমনীরা খেয়া নৌকায় পারাপার করত। আবার কাঠুরিয়া কাঠ বিক্রি করে, জেলে মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করত। কড়িই ছিল প্রচলিত মুদ্রা। ভাত মাছ ছিল সাধারণ খাবার। হরিণের মাংস ছিল তাদের প্রিয়। সাধারণভাবে বিদ্বান ব্যক্তিরা সমাজে সম্মান পেতেন। ধর্মানুষ্ঠান বেশ ঘটা করে পালিত হত। কাহ্নপাদের একটি পদে সেকালের বিবাহ-অনুষ্ঠানের চিত্র ধরা পড়েছে। সে যুগের খেলাধুলা, নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদের চিত্রও চর্যাকারগণ এঁকেছেন। তাছাড়া নাচ-গানের প্রচলনও ছিল সে সমাজে। বীণাপাদের ১৭তম পদটিতে আছে-

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই ॥"

(অর্থাৎ- বজ্রযান নাচছেন, দেবী গাইছেন আর বুদ্ধনাটক অভিনীত হচ্ছে।)

যৌথ পরিবার ও সামাজিক বন্ধনের কথা উল্লেখ আছে। বিত্তানুসারে সমাজে বিভাজন ছিল। ধনী আভিজাতরা সমাজের কেন্দ্রে বাস করত। নিম্নবর্গের প্রান্তিক শ্রেণি ছিল টিলাবাসী। তাদের দৈন্য-দুঃখ ও করুণ জীবনের পরিচয় মেলে। এছাড়াও সে যুগের সাজসজ্জা, তৈজসপত্র, বাদ্যযন্ত্র, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্যপানীয় সবই চর্যার গানগুলিতে টুকরো টুকরো ছবি আকারে ধরা পড়েছে।

৫. বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। *[৪১তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যার পদগুলোতে বাংলা কবিতার প্রাচীন রূপটি রক্ষিত আছে। চর্যাপদ পাওয়া না গেলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হতো ত্রয়োদশ শতক থেকে। বস্তুত চর্যাপদেই বাঙালির গীতিকাব্যের সূচনা। চর্যার ভাষা বাংলা ভাষার একমাত্র প্রাচীন উপকরণ। পদ্য

CamScanner

হলেও এর শব্দগঠন ও চরণবিন্যাস থেকে বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের ব্যাকরণ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া যায়। এই উপকরণ না হলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত বিকাশের স্তর ব্যাখ্যা করা দুরূহ হতো। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে চর্যার পদে বিধৃত সমাজ ও মানুষের ছবির গুরুত্ব অতুলনীয়। নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সঙ্গে চর্যার জীবনচিত্রকে মিলিয়েই বাঙালির ফেলে আসা দিনকে জানা যায়। প্রাচীন কৃষিকাজের নানা স্মৃতি, ফসল ও ফুল, গৃহ-আসবাব, সামাজিক আচার, খাদ্য, অলংকার, ক্রীড়া, নদী-নগর, যানবাহন; এমনকি চুরি বা পরকীয়া প্রণয়ের কথাও রয়েছে এই পদগুলোতে। চর্যার পদগুলো প্রাচীন বাংলা গানের নমুনা হিসেবেও মূল্যবান, যাতে রাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। এভাবে বাঙালির প্রাচীনতম সাহিত্য-ঐতিহ্য চর্যাপদ এখনো গুরুত্বপূর্ণ।

৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়। *[৪০তম, ৩৮তম]*

'সান্ধ্য ভাষা' কী? এ ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যাপদের ভাষা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। সে কারণে চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'সন্ধ্যাভাষা'র আভিধানিক অর্থ সাংকেতিক ভাষা। তিব্বতি ভাষায় এর অর্থ 'প্রহেলিকাচ্ছলে দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা'।

চর্যাপদ মূলত ধর্মচর্চার প্রকাশ। এটি বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সহ অন্যান্য বিরোধীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিগণ ধর্মীয় গূঢ় তত্ত্ব সম্বলিত এ পদগুলো রচনায় আলো-আঁধারি রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন। ফলে এর অর্থ হয়ে পড়ে দুর্বোধ্য- কিছু অংশ বোঝা যায়, কিছু অংশ যায় না। বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারটিকে সন্ধ্যার অল্প আলো অল্প অন্ধকারের সাথে তুলনা করে এর ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' বলে অভিহিত করেছেন।

- ✓ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন- *'সন্ধ্যাভাষা মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যাঁহারা ভজন-সাধন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। অর্থাৎ এই সকল ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে।'*
- ✓ ড. সুকুমার সেন বলেন- *'সন্ধ্যা ভাষার শব্দের বাহ্য অর্থ এক, আর ভিতরের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য।'*

৭. চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন। *[৩৬তম]*
চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির পরিচয় দিন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়ারা ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে রচনা করলেও এতে তৎকালীন সমাজের নিম্নবর্গীয় বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের বেশির ভাগ কবিতায় নীচ ও অন্ত্যজ শ্রেণির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও দরিদ্র জীবনের বেদনা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চর্যাপদের কবিগণ ভাষা, পেশা, তৈজসপত্র, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতির মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় বা দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এতে যেসকল নিম্নবর্গীয় বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রয়েছে- ডোম, চণ্ডাল, কুলি-কামিন, মাঝি, শিকারি, জেলে, তাঁতি, কাঠুরে প্রভৃতি। এসব নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ, হাট-বাজার, নৌকা পারাপার, পশু শিকার, কাঠ বিক্রি, মদ বিক্রি প্রভৃতি কাজ করত। এরা লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ে বাস করত। কেউ আবার যাযাবরের মতো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভ্রমণ করত। বিভিন্ন উৎসব পালন ও অতিথি আপন্যায়নসহ সামাজিক নানা রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদের ৩৩নং পদে ঢেণ্ডণ পা বলেছেন-

'টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥'

(অর্থাৎ- 'টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।')

চর্যার এক একটি পদে খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে এসকল দরিদ্র্য জনগোষ্ঠির জীবনচিত্র পাওয়া যায়।

৮. চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন।*[৩৫তম]*

উত্তর : চর্যাপদ প্রকাশিত হবার পর এর ভাষা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। চর্যার ভাষায় হিন্দি, অহমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ভাষার কিছু শব্দ থাকায় সে ভাষার পণ্ডিতগণ চর্যাপদকে তাদের ভাষার সাহিত্য বলে দাবি করলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এটি হাজার বছরের পুরানো বাংলায় রচিত বলে অভিমত দেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দাবিকে সমর্থন করেন। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাষাবিদের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিচার করেন নি।

১৯২০ সালে ভাষাতত্ত্ববিদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাদের দাবি অস্বীকার করে চর্যা ও অন্যান্য কবিতাগুলির সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্বন্ধের দাবি নস্যাৎ করার চেষ্টা করেন। তিনি ভাষার ব্যাকরণগত দিক থেকে বিচার না করে বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ ধরে দেখিয়েছেন চর্যার ভাষায় হিন্দি ও উড়িয়া ভাষার প্রভাব বেশি। উল্লেখ্য ভারতীয় আর্য

CamScanner

ভাষার অপভ্রংশ স্তরের ভাষা- বাংলা, আসামি, উড়িয়া, মগধী, মৈথিলী ও ভোজপুরিয়া- এর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে চর্যাগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। ১৯২৭ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিস থেকে প্রকাশিত "Les chants Mystique de Saraha et de Kanha" গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মত গ্রহণ করেন। অন্যান্য ভাষার বিদ্বজ্জনেরা এ রকম সুস্পষ্ট ও সুসংহত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

৯. চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৩০তম বিসিএস]*
চর্যাপদ কী? তিন জন পদকর্তার নাম লিখুন। *[২৪তম, ২০তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদের কবির সংখ্যা নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম আছে।
- ✓ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির নাম পাওয়া যায়।

তাই বলা যায়, চর্যার কবির সংখ্যা ২৩ মতান্তরে ২৪ জন। কবিরা হলেন- 'আর্যদেব পা, কঙ্কণপা, কম্বলাম্বরপা, কাহ্নপা, কুক্কুরী পা, গুণ্ডরীপা, চাটিল্লপা, জয়নন্দীপা, ঢেণ্ডণপা, ডোম্বীপা, তন্ত্রীপা, তাড়কপা, দারিক পা, ধর্মপা, বিরুপা, বীণাপা, ভাদেপা, ভুসুকুপা, মহীধরপা, লাড়িডোম্বী, লুইপা, শবরপা, শান্তিপা, সরহপা।

১০. চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা বিধৃত হয়েছে। চর্যাপদে সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার বাণী ও আদর্শ নিয়ে মতভেদ হয়। ফলে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান নামে দুটি দল বিভক্ত হয়ে যায়। মহাযান সম্প্রদায় আবার বজ্রযান ও সহজযান এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। এই সহজযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনার সংগীত হলো চর্যাপদ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য চর্যাপদে রূপায়ণ করেছেন। ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

CamScanner

১১. 'চর্যাপদ' গ্রন্থে কোন পদকর্তার সর্বাধিক এবং কতটি পদ রয়েছে? *[১৩তম]*
অথবা, কাহ্নপা কে ছিলেন? *[১০তম বিসিএস]*

উত্তর : কাহ্নপাকে চর্যাপদের প্রধান কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাহ্নপার প্রকৃত নাম কৃষ্ণাচার্য পাদ। কৃষ্ণাচার্য নামটিই অপভ্রংশে হয়েছে কাহ্নপা। তিনি অষ্টম শতকে ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি পরিণত বয়সে সোমপুর বিহারের আচার্য্য ছিলেন। রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে সেখানে অবস্থান করেন। তার রচিত পদের সংখ্যা ১৩টি। এগুলো হলো- ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ নং পদ পাওয়া গিয়েছে। ২৪ নং পদটি পাওয়া যায় নি।

ঐতিহাসিকগণ কাহ্নপাকে উড়িষ্যার অধিবাসী বলে মনে করলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গবেষক জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া তাঁর 'নেত্রকোনা : অতীত বর্তমান' গ্রন্থে কাহ্নপাকে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানার কৃষ্টপুর গ্রামের অধিবাসী বলে প্রমাণ করেছেন। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের নায়ক চর্যাপদের কবি এই কাহ্নপা।

১২. চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। ধারণা করা হয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল। সে হিসেবে ধরা যায়, পাল আমলে চর্যাপদের রচনা শুরু হয়।

চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত-

- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ৬৫০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে রচিত।
- ✓ রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে- অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত।
- ✓ ড. সুকুমার সেনের মতে- পদগুলো ৯০০-১৩৫০ সালের মধ্যে রচিত।
- ✓ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে- ৯৫০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে।

১৩. চর্যাপদের নামকরণের বিষয়টি সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আবিষ্কৃত পুঁথিটি ১৯১৬ সালে প্রকাশকালে নামকরণ করেন 'চর্যাপদ'। সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন- "১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কতকগুলি পুঁথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়। উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্য্যাপদ।" পুঁথিটিতে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নাম যেমন ছিল তেমনি প্রথম বন্দনা শ্লোকে 'আশ্চর্য চর্য্যাচয়' শব্দটিও পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ মনে করেন পুঁথিটির আসল নাম ছিল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। যে গ্রন্থে সিদ্ধাচার্যদের 'চয্যা' অর্থ আচরণীয় এবং 'অচয্যা' অর্থ অনাচরণীয় বিষয় নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা হয়েছে তার নাম চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়ই হবে বলে তারা মনে করেন।

CamScanner

১৪. সহজিয়া বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সহজিয়া একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়। গৌতম বুদ্ধের অবর্তমানে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান-এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। মহাযান থেকে কালক্রমে উৎপত্তি হয় বজ্রযান, কালচক্রযান। বজ্রযান থেকে সহজযানের উৎপত্তি। সহজযান পন্থিরা সহজিয়া নামে পরিচিত। স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজ পন্থায় সাধনা করত বলে এদের সহজিয়া বলা হয়। সহজিয়াগণ তাত্ত্বিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত বলে ধর্মসাধনায় তারা দেহকে বাদ দেয় নি। কায়িক এবং আধ্যাত্মিক কোন পথকেই তারা অস্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সমস্ত সত্য দেহের মধ্যেই অবস্থিত, সেই সত্যই সহজ। সরহ পাদ বলেছেন, সহজের মধ্যে দ্বৈততা নেই, মনের অদ্বৈত অবস্থায় তা অনুভব বেদ্য, সহজের অনুভবই সাধকের লক্ষ্য। চর্যাপদগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। বৌদ্ধদের মতো বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ও ছিল। তারা বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বাউলদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

১৫. চর্যাপদে নারীদের স্থান ও ভূমিকা তুলে ধরুন।

উত্তর : চর্যাপদ বিশ্লেষণ করলে সমাজের নানা বিষয়ের পাশাপাশি নারীদের সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। চর্যাপদে সমাজের উচ্চশ্রেণির জীবনযাপনের তেমন বর্ণনা না থাকায় ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণীয় নারীদের অবস্থা জানা না গেলেও সমাজের নিচুতলায় নারীদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তারা স্বেচ্ছায় পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার রাখত। এছাড়া নারীরা ঘরে-বাইরে পুরুষের পাশাপাশি নানা ধরনের শ্রম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত। কাহ্নপা ১০ নং পদে জানিয়েছেন, এক ডোমিনী নগরে তাঁত ও চেঙারি বিক্রি করত। তাঁত বোনা, নৌকা বাওয়া, চাঙারী বোনা, মদ বিক্রী, নাচ-গান-অভিনয় প্রভৃতি পেশায় নারীদের অংশগ্রহণই ছিল প্রধান। ডোম্বীপা রচিত চর্যার ১৪নং পদে আছে-

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই॥"

(অর্থাৎ- গঙ্গা যমুনা মাঝেরে বয় নৌকা। তাতে চড়িয়া চণ্ডালী ডোবা লোককে অনায়াসে পার করে ॥)

সমাজের নিচু শ্রেণির নারীগণ উঁচু শ্রেণির দ্বারা শোষিত হতে দেখা যায়- ডোম্বিরা নিচু বর্ণের হওয়ায় ব্রাহ্মণরা তাদের ছুতো না, নগরের বাইরে রাখত কিন্তু অবৈধ যৌনচারের আশায় এই ব্রাহ্মণরাই আবার লোকচক্ষুর আড়ালে ডোম্বির দুয়ারে ঘুর ঘুর করত। চর্যাপদের নারীদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট যে নারীরা তখন অন্তঃপুর বাসিনী ছিল না।

১৬. 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥'- একথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : চর্যাপদের ৩৩নং পদে ঢেণ্ডণ পা বলেছেন-

'টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥'

(অর্থাৎ- 'টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।')

সাধন সঙ্গীত হিসেবে রচিত চর্যাপদের সাধকগণ বাস করতেন সমাজের প্রান্তে। অধিকাংশ পদে তাদের কথাই এসেছে। চর্যায় যে সমাজের মানুষের কথা বলা হয়েছে তারা দরিদ্র গৃহহীন, অন্নহীন। ঢেণ্ডনপার এ পদে দারিদ্র্যের চিত্র উঠে এলেও বিষয়টির মৌল প্রতিপাদ্য গভীর ও তাৎপর্যবহুল। ধর্মহীন ব্যক্তির অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। যার দেহমন্দিরে ধর্মভাব নেই, এমন ধর্মহীন ব্যক্তির দেহভাণ্ডে রজঃবীর্যের অভাব, সাধক রূপ প্রতিবেশীও তার নেই। অথচ প্রতিনিয়ত সে কামে আবেশী হয়ে ওঠে। এমন ধর্মহীন ব্যক্তির অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা বৃথা।

১৭. 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ॥'- এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : চর্যার ৪৯ নং পদে ভুসুকু পা বলেছেন-

'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ॥'

(অর্থাৎ- 'আজ ভুসুকু বাঙালি হয়ে গেল। নিজ গৃহিণীকে চণ্ডালে নিয়ে গেল'।)

কবি এখানে সাধক হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সাধক কবি (ভুসুকু পা) নিজেকে অজ্ঞান কামুক জ্ঞান করেছেন। নীচ জাতীয় স্ত্রীর সাথে সে সাধনায় রত। দেহরূপ বজ্র নৌকায় চড়ে নারী জননাঙ্গ পার হয়ে কবি সাধকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে সাধক হয়ে উঠেছেন। চিত্তকে স্থির করেছেন। শূন্যতা ও করুণার চেতনা অবলুপ্ত হয়ে মহাসুখে স্থিত। তাই সাধনার ক্ষেত্রে জীবিত-মৃতে কোন ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় না।

১৮. চর্যাপদে বিধৃত সাধনতত্ত্বের পরিচয় দিন।

উত্তর : সিদ্ধাচার্যগণ অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী হলেও তাঁরা মূলত ছিলেন সাধক। বৌদ্ধ সহজযানী চিন্তা, দর্শন ও সাধনপদ্ধতি তাই চর্যাপদের উপজীব্য হয়ে ওঠে। চর্যার পদগুলিতে সন্ধ্যা ভাষার আবরণে দ্বৈত অর্থ সম্বলিত উচ্চ স্তরের ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের চর্চা করা হতো। সহজিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকরা চর্যাপদের মধ্যে তাদের তন্ত্র

CamScanner

সাধনার মন্ত্র গোপনে বেঁধে রাখতেন। যারা তান্ত্রিক সাধনা করেন, কেবল তারাই সেই মন্ত্র বুঝতে পারতেন। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব মতে, মানবদেহে মেরুদণ্ডের নিম্ন দেশে রয়েছে মূলাধার চক্র। এই মূলাধার চক্র সুষুম্না নাড়ীর একটি গ্রন্থি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্রে সুষুম্না হলো যোগীনির প্রতীক। সুষুম্না নাড়ীর বাম দিকে ইড়া ও ডান দিকে পিঙ্গলা নামক আরও দুইটি নাড়ী রয়েছে। ইড়া ও পিঙ্গলা যথাক্রমে শক্তি ও শিবের প্রতীক। মানবদেহে সঞ্চারমান প্রাণবায়ু ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে সতত চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ইড়া ও পিঙ্গলাকে সংযত করার সাধনাই তন্ত্র সাধনা। ইড়া ও পিঙ্গলাকে সাধনার মাধ্যমে সুষুম্নাতে মিশিয়ে দিতে পারলে সুষুম্না সহস্রায় বা মহাসুখ চক্রে পরিণত হয়। আর সেখানেই আছে মহা সহজানন্দ, অর্থাৎ সেখানেই শক্তি ও শিব রূপী জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে নির্বাণ সুখ লাভ হয়।

১৯. চর্যাপদের ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : চর্যাপদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির গোপন কথা প্রকাশের মাধ্যম ছিল চর্যাপদ। তথাপিও এসব রচনায় সমকালীন ভৌগোলিক উপাদান উঠে এসেছে। চর্যাপদে খাল-বিল, নদী-নালা, বিশেষত নৌকা যাত্রার উল্লেখ থাকায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়া সাঁকো, কেড়ুয়াল, গুণ টানা, দাঁড় টানা, পাল তোলা, সেঁউতি, কাছি, খুন্টী, উজান বাওয়া প্রভৃতি বারবার চর্যায় উল্লিখিত হয়েছে। ৫নং পদে চাটিল লিখছেন-

"ভবণই গহণগম্ভীরা বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন ঠাহী।"

(অর্থাৎ- ভবনদী গহন ও গম্ভীর অর্থাৎ প্রবল বেগে প্রবহমান। তার দুইতীর কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল।)

চর্যার ৩৮তম পদে দেখা যায়-

'কাঅ ণাবড়ি খান্টি মন কেড়ু-য়াল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল ॥'

অর্থাৎ- কায় ছোট নৌকাখানি, মন কেরোয়াল। সদ্‌গুরু-বচনে পতবাল (পাল) ধর।
(অনুবাদঃ সুকুমার সেন)

এছাড়া পাহাড়, পর্বত ও জঙ্গলের কথারও উল্লেখ রয়েছে চর্যাপদে।

২০. চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : চর্যার বিষয় ধর্মকেন্দ্রিক হলেও এর সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। চর্যাকারেরা দার্শনিক পরিভাষা ও তন্ত্রের বিশেষ শব্দের সাহায্যে তত্ত্বদর্শনকে প্রকাশ করতে গিয়ে নানা চিত্রকল্প, উপমা, রূপকের প্রয়োগ করেছেন। অনেক পদেই রূপকের আড়ালে ধর্মকথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সজীবতা ও পার্থিব সুবাস তাকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর

কাব্যচিত্ররূপে তুলে ধরেছে। প্রকৃতি ও মানুষের কাব্যময় চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে চর্যাপদে। শবরপাদের একটি পদে দেখা যায় নরনারীর প্রেমের এক অপূর্ব চিত্রণ। কোনও কোনও পদে নিছক দর্শনকথা অসামান্য চিত্ররূপের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। যেমন ৫নং পদে চাটিল লিখছেন-

"ভবণই গহণগম্ভীরা বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন ঠাহী ॥"

(অর্থাৎ- ভবনদী গহন ও গম্ভীর অর্থাৎ প্রবল বেগে প্রবহমান। তার দুইতীর কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল।)

আবার কখনও বা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে প্রহেলিকার অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলিও অসামান্য সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ২নং পদে কুক্কুরীপা লিখেছেন-

"দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ ॥"

(অর্থাৎ- মাদী কাছিম দোহন করে দুধ পাত্রে রাখা যাচ্ছে না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খাচ্ছে।)

তত্ত্বদর্শন প্রকাশে চর্যাপদ যেমন অনন্য মূল্যবান গ্রন্থ, তেমনি সাহিত্যের বিবিধ বিষয় নির্মাণে ভূয়সী প্রশংসার দাবীদার।

২১. চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লিখুন।

উত্তর : যে রচনা ইতিহাসের তথ্যের সমাবেশে শৈল্পিক বিচারে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিবেচনায় চর্যাপদ ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন-

-চর্যাপদ প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন।

-চর্যাপদের রূপক প্রতীকগুলোর মধ্যে তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এর মাধ্যমে জানা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজ বাস্তবতায় শ্রেণিবিভাজনের কথা, টিলাবাসী প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কথা।

-চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। এই গ্রন্থের ভাষা মাগধী অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম করে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা রূপে সদ্য উদ্ভূত বাংলাভাষার প্রামাণ্য উপকরণ।

চর্যাপদ সাধন বিষয়ক রচনা হলেও মানব জীবনের সুখ-দুঃখের ভিত্তিতেই এর প্রতিষ্ঠা। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত উপমা ও রূপকল্পগুলি তৎকালীন বাংলার সমাজজীবন, পরিবারজীবন ও প্রাকৃতিক উপাদান থেকে সংগৃহীত। গভীর মর্ত্য প্রীতি ও জীবন রস রসিকতা তাদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রূপ ও অরূপ জগত চর্যাপদে একাকার হয়ে গেছে। এই কারণে তৎকালীন বাংলার ভূগোল ও সমাজ সম্পর্কে যে স্পষ্ট ছবি চর্যাপদ থেকে পাওয়া যায়, তা সেই সময়কার বাঙালির ইতিহাস রচনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

CamScanner

২২. চর্যাপদের ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : পদকর্তাগণ আধুনিক ছন্দ বিচার করে চর্যার পদ লেখেননি। তবে চর্যাপদের ছন্দ নিয়ে আধুনিক ছান্দসিকগণ বহু গবেষণা করেছেন। অধিকাংশ ছান্দসিক মনে করেন, চর্যার পদগুলি প্রধানত পয়ার ও ত্রিপদী পদে রচিত। এতে মাত্রাবৃত্তছন্দের প্রভাবও দেখা যায়। ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহারই এখানে বেশি। তবে সর্বত্র নির্দিষ্ট মাত্রারীতি দেখা যায়নি। ছন্দপংক্তির পর্বসংখ্যাগত বৈচিত্র্যও এই পদগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন,

> *"তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা এবং তাকে ব্রাহ্মণ সমাজের শ্যেনদৃষ্টি থেকে গোপন করা- এই দিকে পদকর্তারা এবং সিদ্ধাচার্যরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে কবিতার আঙ্গিকের দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাননি। তবে একটা কথা সত্য, চর্যাগানেই সর্বপ্রথম পয়ার-ত্রিপদীর আদিসুর ধ্বনিত হয়েছে। সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দও এর প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি।"*

চর্যাপদের ছন্দে সংস্কৃত পজঝটিকা ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চর্যায় অনুপ্রাসের প্রয়োগ ব্যাপক। প্রায় প্রতিটি পদই অন্ত্যমিলযুক্ত। অন্তানুপ্রাসও প্রচুর। যেমন:

'বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইলা উদারা'।

চর্যায় উল্লিখিত ছন্দ ও অলংকারগুলি পরবর্তীকালের কবিদের পথপ্রদর্শকস্বরূপ হয়েছিল।

২৩. চর্যাপদ নেপালের রাজদরবারে পাওয়ার কারণ কী?

উত্তর : প্রাচীনকালে পাল বংশ দীর্ঘসময় বাংলা শাসন করে। পালরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের আমলেই চর্যাপদ লিখা হয়। পালদের ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসে সেন বংশ। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী পাল রাজাদের বিদায় এবং হিন্দুধর্মের অনুসারী সেন রাজাদের আগমন ঘটে। সেনরা বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন নিয়ম জারি করে। এমনকি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমরা ক্ষমতায় আসার পর বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজের পীড়ন এবং মুসলমান শাসনে ধর্মচ্যুত হবার আশংকায় বাংলার বৌদ্ধগণ তাঁদের ধর্মীয় পুঁথিপত্র নিয়ে শিষ্যদেরকে সঙ্গী করে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে পলায়ন করেন। বৌদ্ধদের সাথে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের গানগুলোও নেপালে তিব্বতে চলে যায়। এসব কারণে চর্যাপদের পুঁথিটি নেপালে পাওয়া গেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

CamScanner

২৪. চর্যায় প্রাপ্ত পুঁথিতে গানের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদ মূলত মুণিদত্ত নামক এক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকাসহ সংকলন। মুণিদত্তের টীকা সম্বলিত পুঁথিতে পদ পাওয়া গিয়েছিল সাড়ে ৪৬টি। এর মধ্যে ২৩ নং পদের শেষাংশ (১০ লাইনের মধ্যে প্রথম ৬টি লাইন পাওয়া গেছে, শেষ ৪টি লাইন পাওয়া যায় নি), ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি। এতে মুণিদত্ত ১১নং পদের ব্যাখ্যা করেন নি। চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কীর্তিচন্দ্র। ১৯৩৮ সালে এ অনুবাদ আবিষ্কার করেন ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী। তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার পরই জানা যায় চর্যার পদ ছিল মোট ৫১টি।

২৫. চর্যাপদের বর্ণিত প্রবাদ বাক্যগুলো কী কী?

উত্তর : চর্যাপদে সাহিত্যের নানা গঠনগত উপকরণ- যেমন ছন্দ, অলংকার ও চিত্ররূপের পাশাপাশি প্রবাদ-প্রবচন ও নানা বাক্‌রীতির ব্যবহার রয়েছে। চর্যাপদে মোট ৬টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়। এগুলো হলো-

- ✓ আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (৬নং পদ, ভুসুকু পা) অর্থ- হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
- ✓ হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন। (৩২ নং পদ, সরহপা) অর্থ- হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না।
- ✓ হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। (৩৩ নং পদ, ঢেণ্ডণ পা) অর্থ- হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে।
- ✓ দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়। (৩৩ নং পদ, ঢেণ্ডণ পা) অর্থ- দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
- ✓ বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দেঁ। (৩৯ নং পদ, সরহপা) অর্থ- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
- ✓ আন চাহন্তে আন বিনধা। (৪৪নং, কঙ্কণপা) অর্থ- অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট।

২৬. 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' গ্রন্থের পরিচয় দিন।

উত্তর : বৌদ্ধধর্ম ও বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে জানার জন্য ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ (১ম বার) ও ১৮৯৮ সালে (২য় বার) নেপাল ভ্রমণ করেন। তখন কিছু পুঁথির নকল নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন। ১৯০৭ সালে (৩য় বার) নেপালে গিয়ে রাজদরবারের 'নেপাল রয়্যাল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। এ সময় তিনি চর্যাপদের সাথে 'সরহপাদের দোঁহা', 'কাহ্নপাদের দোহাঁ' ও 'ডাকার্ণব' নামে আরো তিনটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের পর ৯ বছর পর্যন্ত এর উপর গবেষণা ও নানা পাঠোদ্ধার করে চর্যাপদ (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়) ও তিনটি পুঁথি একত্রিত

CamScanner

করে ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' (৪৭টি পদ বিশিষ্ট) নামে প্রকাশ করেন। তার সম্পাদিত গ্রন্থে দুই ধরনের বিষয় ছিল- একটি ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ বিষয়ক কিছু গান, অন্যগুলো দোঁহা। ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধগুলোর নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। অর্থাৎ ধর্ম সাধনার ব্যাপারে কোনগুলো আচরণীয় এবং কোনগুলো বর্জনীয় তারই নির্দেশ। তিনি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের নাম দেন চর্যাপদ। এর মধ্যে চর্যাপদই ছিল বাংলা ভাষার সম্পদ। বাকী তিনটি পশ্চিম অপভ্রংশ ভাষায় লেখা।

মধ্যযুগ

১. কোন তিন কবির নাম যথাক্রমে কবি কণ্ঠহার, কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকর। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের তিন কবির উপাধি যথাক্রমে কবি কণ্ঠহার, কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকর।

বিদ্যাপতির উপাধি 'কবি কণ্ঠহার'। রাজা শিবসিংহ তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়া তিনি মিথিলার কোকিল, অভিনব জয়দেব, পদাবলীর কবি নামেও খ্যাত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি 'কবিকঙ্কণ'। তিনি ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি। জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে তিনি বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ রঘুনাথ রায় তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। কবিকঙ্কণ মানে যে কবি হাতে পায়ে ঘুঙুর পরে গান করতেন। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের পেশাদার গায়ক।

ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি 'রায়গুণাকর'। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্য প্রতিভার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে 'গুণাকর' (সকল গুণের আধার) উপাধি দেন। এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখেছেন-

'কবি রায় গুণাকর খ্যাতি সমর্পিয়া,
ভারতেরে আজ্ঞা দিল গীতের লাগিয়া।'

২. মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক কাব্য। দেবদেবীর গুণকীর্তন করাই ছিল এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। মধ্যযুগের সাহিত্যে কয়েকটি ধারা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- ✓ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- ✓ মঙ্গলকাব্য
- ✓ অনুবাদ সাহিত্য

CamScanner

- ✓ আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য
- ✓ নাথ সাহিত্য
- ✓ মর্সিয়া সাহিত্য
- ✓ বৈষ্ণব সাহিত্য
- ✓ কবিয়াল ও শায়ের
- ✓ লোকসাহিত্য

মধ্যযুগের আরও কিছু লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় ঃ ১. পত্র ২. দলিল দস্তাবেজ ৩. আইন গ্রন্থের অনুবাদ। তবে এগুলো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের অবদান লিখুন।

উত্তর : মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধ্যযুগে মুসলমান রচিত কাব্যগুলোকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়; কাহিনিকাব্য, ধর্মীয় কাব্য, সংস্কৃতিবিষয়ক কাব্য, শোকগাঁথা, জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক কাব্য এবং সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক কাব্য। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। প্রাচীনতম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনার মাধ্যমে এ ধারার সূচনা করেন। এর আগে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সাধন পদ্ধতির কথা ও দেব-দেবীদের ক্রিয়াকলাপ। মানবীয় বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচিত হয় নি। মুসলমান কবিগণই প্রথম মানুষকে বাংলা সাহিত্যের উপজীব্য করেন। তখন দেবস্তুতির বদলে মানবিক আচরণ-অনুভূতি বাংলা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে প্রধান্য লাভ করে। বিশেষ করে আরাকান রাজসভার তিন জন প্রতিভাবান কবি- দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও আলাওলের সাধনায় বাংলা সাহিত্যের গতি মানুষের দিকে ধাবিত হয়। মানবিক কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনায় তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। মানুষের জীবন, প্রেম, সুখ, দুঃখ রূপায়ণ করেন গভীর মমতায়। বাংলাদেশের প্রচলিত রূপকথা, বঙ্গীয় উপাদান, ভাষা দেশপ্রেম নিয়ে সাহিত্য ধারা সৃষ্টি করে তারা বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

অন্ধকার যুগ

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ' বলতে কি বুঝায়? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের শুরুর সময়টাকে (১২০১-১৩৫০) কেউ কেউ 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেন। ড. হুমায়ুন আজাদ 'লাল নীল দীপাবলী' গ্রন্থে লিখেছেন-

'১২০১ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়না বলে এ-সময়টাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ।'

CamScanner

রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা ছিল পট পরিবর্তনের যুগ; মুসলিম শাসকদের ভিন্নতর রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এক নতুন পরিবেশ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। উক্ত সময়ের মধ্যে বিশেষ কোন গ্রন্থ যে লিখিত হয় নি তা বলা যায় না। তখন লেখা হত তালপাতায়। ফলে সংরক্ষণ করার উপায় ছিল না। এ বিষয়ে ওয়াকিল আহমদ 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন-

> *"বাংলা সাতিহ্যের কথিত 'অন্ধকার যুগ' মোটেই সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের যুগ ছিল না। ধর্ম-শিক্ষা শিল্প চর্চার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তারা সীমিত আকারে হলেও শিক্ষা সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে, কি হিন্দু কি মুসলমান কেউ লোকভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেননি। বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন না থাকার এটাই মুখ্য কারণ।"*

যেহেতু ১২০১ থেকে ১৩৫০ এর মধ্যে সীমিত আকারে হলেও সাহিত্য চর্চা হয়েছে বা সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাই এ সময়টিকে অন্ধকার যুগ বলা যথার্থ হবে না।

২. অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩৭তম]*

উত্তর : ১২০১ থেকে ১৩৫০ সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার পালাবদল প্রভৃতি কারণে দেশের অভ্যন্তরে সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করায় স্বাভাবিক জীবন যাপনের পাশাপাশি সাহিত্য চর্চাও বিঘ্নিত হয়েছিল। অর্থাৎ এ সময়ে তেমন কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি বলে মনে করা হয়। তাই এ সময়কে ঐতিহাসিকেরা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। আর এক দল গবেষকদের মতে প্রচুর না হলেও এ সময় অল্প কিছু সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ড. এনামুল হকের মতে, ডাক ও খনার বচনের রচনাকাল মধ্যযুগের প্রথমভাগ। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভাষা বিচারে ধরা পড়ে যে, এ কাব্যটি ১৩৫০-এর কাছাকাছি সময়ে রচিত। এসময়ের আবিষ্কৃত আরও কিছু সাহিত্য নিদর্শন হচ্ছে: ১. প্রাকৃত ভাষার গীতি কবিতার সংকলিত গ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ২. রামাই পন্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ' (গদ্যপদ্য মিশ্রিত) ৩. হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' (গদ্যপদ্য মিশ্রিত) ৪. ডাক ও খনার বচন। উল্লেখ্য যে, 'নিরঞ্জনের উষ্মা' শূন্যপুরাণ এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

৩. ডাক ও খনার বচনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : ডাক বৌদ্ধদের জ্ঞানীপুরুষ। বৌদ্ধ সমাজে ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল। 'ডাকার্ণব' গ্রন্থটি ডাকের বৌদ্ধত্বের প্রমাণ। ডাকের বচন এককালে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। কৃষক ও বউঝিরা এসব কণ্ঠস্থ করে রাখতেন।

বৌদ্ধ সমাজে যেমন ডাকের বচনের উৎপত্তি হয়েছিল তেমনি হিন্দু সমাজে খনার বচনের সৃষ্টি হয়েছিল। খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। অনেকের মতে, খনা নামে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচিত ছড়া এগুলি।

CamScanner

৪. জয়দেব রচিত একটি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন দুইজন- জয়দেব ও হলায়ুদ মিশ্র। কবি জয়দেব রচিত সংস্কৃত ভাষার কাব্য 'গীতগোবিন্দ'। কাব্যটি দ্বাদশ শতকে রচিত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এ কাব্যের মুখ্য বিষয়। ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২টি সর্গে এটি রচিত। উল্লেখ্য, ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজী বাংলায় আসলে জয়দেব পালিয়ে যান।

৫. রামাই পণ্ডিত বা শূন্যপুরাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের (১২০১-১৩০০) সাহিত্য নিদর্শন রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্যপুরাণ। ত্রয়োদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত। এটি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত চম্পু কাব্য। বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বংসের মুখে হিন্দুধর্মের সাথে মিলন সাধনের জন্য বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণে রামাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মপূজার। শূন্যপুরাণ ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ। ভাষা বিচারে দেখা গেছে যে, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা এটি। কাব্যটিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনার সাথে মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রাতারাতি ধর্মান্তরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে এতে মুসলমানদেরকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্য শাসন অবসানে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। শূন্যপুরাণ কাব্যে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামে একটি কবিতা রয়েছে। কবিতাটি বাংলা ভাষায় রচিত। শূন্যপুরাণ এবং রামাই পণ্ডিত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে এ কবিতাটির জন্যই বিখ্যাত।

৬. সেক শুভোদয়ার পরিচয় দিন।

উত্তর : বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন দুইজন- জয়দেব ('গীতগোবিন্দ' এর লেখক) ও হলায়ুদ মিশ্র। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজী বাংলায় বিজয় করলে জয়দেব পালিয়ে যান। আর হলায়ুদ মিশ্র তাদের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে লিখেন 'সেক শুভোদয়া'। হলায়ুদ মিশ্রের গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য 'সেক শুভোদয়া'। এ কাব্যে নানা ঘটনার মাধ্যমে সুফি-সাধকদের চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে শেখ জালাল উদ্দিন তাবরীজীর (র.) অলৌকিক জীবন মাহাত্ম্য। প্রাকৃত ভাষা থেকে অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে আসামী, উড়িয়া, ভোজপুরিয়া এরূপ বহু প্রাচ্য ভাষার সংমিশ্রণে 'সেকশুভোদয়া' রচিত বলে ভাষাবিদদের ধারণা। এ গ্রন্থের প্রথম দিকে কয়েকটি

CamScanner

বাংলা গান ও চর্যার উল্লেখ আছে। এর কোনটি মাহাত্মা গান, কোনটি প্রেমমূলক। এ কাব্য সম্পর্কে ড. এনামুল হক বলেছেন-

'সেক শুভোদয়া খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকের রচনা।'

৭. খনা কে? তাঁর পরিচয় লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগের প্রাপ্ত সাহিত্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে ডাক ও খনার বচন উল্লেখযোগ্য। খনার বচনের রচয়িতা খনা। জনশ্রুতি আছে- লঙ্কাদ্বীপের রাজকুমারী লীলাবতী মতান্তরে রাক্ষসকবলিত কোন এক রাজ্যের অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারীর নাম লীলাবতী যিনি খনা নামে পরিচিত। খনা অর্থ বোবা। জিব কর্তনের পর এ নামটি প্রতিষ্ঠা পায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যর নবরত্ন সভার পণ্ডিত বরাহমিহিরের পুত্র মিহির খনার স্বামী। কথিত আছে- জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার ফলে রাজা বিক্রমাদিত্যর সভার দশম পণ্ডিত হিসেবে খনা আসন লাভ করেন। এতে অপমানিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পণ্ডিত বরাহমিহির পুত্রকে খনার জিব কেটে দেওয়ার আদেশ দেন। জিব কেটে দেওয়ার আগে তাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন খনা কৃষি, আবহাওয়া-তত্ত্ব সম্পর্কে বহুবিধ কথা বলে যান। পরবর্তীকালে সেসব কথাই 'খনার বচন' নামে পরিচিত।

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খনার বচনের গুরুত্ব লিখুন।

উত্তর : খনার বচন কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। এসব বচনে কৃষি ও ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে খনার বচনের সৃষ্টি। আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। অনেকের মতে খনা নামে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচিত ছড়া এগুলি। কৃষিকাজে যখন বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল না, তখন ডাক ও খনার বচন বাংলার কৃষককুলকে জানিয়ে দিয়েছে ফসল বপনের সময়, রীতিনীতি ইত্যাদি। ডাক ও খনার বচনে এদেশের কৃষিকাজের ও দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো ছন্দাকারে ধৃত হয়েছে, যা যুগ থেকে যুগে প্রবহমান। খনা সম্পর্কে খ্যাতি প্রচলিত থাকলেও গবেষকদের মতে, খনা কোন ব্যক্তির নাম নয়। লোকসাহিত্য হিসেবে এসবের সাহিত্যমূল্য যাই থাকুক না কেন, সমাজজীবনে খনার বচনের প্রায়োগিক মূল্য অপরিসীম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পাণ্ডুলিপি কে, কখন এবং কোথা থেকে উদ্ধার করেছিলেন? *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া

©Nazmus Sadat CamScanner

জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামের বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘরের টিনের চালার নিচ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য উদ্ধার করেন। এ কাব্যের প্রথম, মাঝখানের ও শেষের দিকের কয়েকটি পাতা পাওয়া যায় নি। ফলে এর নাম, কবির পরিচয় ও রচনাকাল অজানাই থেকে যায়। রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও প্রাক চৈতন্য যুগের (১৪শ শতক) বলে মনে করা হয়। ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) রসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। পুঁথির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেন। যদিও এতে প্রাপ্ত চিরকুটে লেখা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। এজন্য কারো কারো মতে গ্রন্থটির নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। বর্তমানে এ গ্রন্থটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় রোডস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৪০তম বিসিএস]*

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কাব্যের নাম লিখুন। *[৩৩তম, ২২তম, ২০তম, ১০তম]*

উত্তর : বাংলা ভাষার দ্বিতীয় প্রাচীনতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান কাহিনি ভাগবত থেকে নিয়েছেন। কিছু পংক্তি ও কাব্যবস্তু নিয়েছেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য থেকে। কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং শেষে বৃন্দাবন ও রাধা উভয়কে ত্যাগ করে কৃষ্ণের চিরতরে মথুরায় অভিপ্রয়াণ- এই হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল উপজীব্য। কাব্যের মূল আকর্ষণ রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় কবি পৌরাণিক ভাব ধারার তুলনায় লোকসমাজে প্রচলিত ধারাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তার রচনায় রাধাকৃষ্ণের দেবলীলা হয়ে উঠেছে মানবলীলা। যদিও বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য জীবকুল ব্যাকুল হয়ে থাকে। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এ ধরনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বহির্ভূত। এতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা মূখ্য বিষয়।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। *[৩৬তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের চিত্রও এতে উঠে এসেছে। কাব্যটি হিন্দু দেবকথা নিয়ে রচিত হলেও গ্রাম্য হিন্দু সমাজের বাস্তব সমাজ চিত্র পাওয়া যায়। এর পটভূমি ও প্রবণতা উভয়ই গ্রামীণ। এ কাব্যের রাধা গোপ পরিবারের বধু। রাধাকে শাশুড়ি, স্বামী ও ননদের ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হত। রাধা ঘুটে দিত, রান্না

করত। বাড়ির কাজ সব করার পর তাকে দুধ-দই বিক্রি করার জন্য মধুরার হাটে যেতে হত। এ যেন গ্রামীণ বাঙালি বধুর দৈনন্দিন জীবনের গল্প। এ কাব্য শুধু ব্যক্তি রাধার নয়, ভাগীরথী নদীর তীরের অশিক্ষিত গোপ পল্লির এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। পাশাপাশি তখনকার সমাজের কুমার, তেলী, নাপিত, মাঝি, নৌকা তৈরির মিস্ত্রি প্রভৃতি পেশাজীবির পরিচয় পাওয়া যায়। রাধাকে কেন্দ্র করে এ কাব্যে গ্রামীণ আবহ তৈরি হয়েছে।

৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় দিন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী। আসল নাম অনন্ত, কৌলিক উপাধি বড়ু এবং গুরুপ্রদত্ত নাম চণ্ডীদাস। তিনি চতুর্দশ শতকের বাঙালি কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তিনি নিজেকে অনন্ত বড়ু হিসাবে ভণিতা দিয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী দেবীর উপাসক ছিলেন। বীরভূমের নানুরে এই দেবীর মন্দির আছে। দেবীমন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে তাঁর 'চিত্রনাটগীতি' পরিবেশনের নাট্যশালা ছিল। এই বাসলী দেবী প্রকৃতপক্ষে শক্তিদেবী চণ্ডী অথবা মনসার অপর নাম। সম্ভবত বাসলী দেবীর বাৎসরিক পূজায় গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। তিনি ১৪৩৩ সালে মারা যান।

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে বড়াই চরিত্রের বর্ণনা দিন।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তিনটি প্রধান চরিত্রের একটি বড়াই। বড়াই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। পায়ে শক্তি নেই বলে এঁকেবেঁকে চলে, ভাল করে চোখেও দেখে না। সে পদুমা অর্থাৎ রাধার মায়ের পিসী। যুবতী রাধাকে পাহারা দেওয়া তার দায়িত্ব। বড়াই কাব্যটির ব্যস্ততম চরিত্র। সমগ্র কাব্য জুড়ে যে ঘটনাগুলি ঘটে, তার প্রায় সবগুলোই এই বড়াই চরিত্রের প্ররোচনায় ও পরামর্শে। বড়াই জানে কৃষ্ণ দেবতা। তাই সে কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাবস্বরূপ ফুল-তাম্বুলাদি রাধার কাছে পৌঁছে দেয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুঘটক হিসেবে দুজনের দেখা সাক্ষাতের সব ব্যবস্থা করে দেয়। পরবর্তীতে বড়াই-এর পরামর্শেই রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে। বিরহ ব্যাকুল রাধার কাছে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যের সূচনায় বড়াইকে কুট্টিনী চরিত্ররূপে আঁকতে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে স্নেহ-প্রীতি-মমত্ব ভরা এক মানবিক চরিত্র হিসেবে পূর্ণতা দিয়েছেন। আর এখানেই বড়াই চরিত্রের সার্থকতা ।

CamScanner

৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নাট্যগুণ বিচার করুন।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অধিকাংশ পদ নির্মাণ কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিলে একে নাট্যকাব্য বলাই সংগত। প্রচুর নাটকীয় উপাদান রয়েছে এতে। কবি রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের উক্তি সংলাপ-প্রতিসংলাপের মাধ্যমে নাট্যকাব্যের মত রস, গুণ ও ভাবগুলোকে বর্ণনা করেছেন। শুধু জন্ম খণ্ড বর্ণনা আকারে বিধৃত। এছাড়া সমগ্র কাব্যই রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের কথোপকথন ও সংলাপে গঠিত। নাটকের প্রধান গুণ বাস্তবধর্মিতা। কবি কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রাম্যজীবনের বাস্তব চালচিত্র তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ। আর এ কাব্যের সর্বাধিক সক্রিয় চরিত্রদ্বয় নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আবর্তিত। নাটকে মানবজীনের প্রায় সব রসেরই স্ফূরণ ঘটে, এ কাব্যে সব ধরনের রসের স্বাদ পাওয়া যায়। গঠনের দিক দিয়েও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগুণসম্পন্ন। কাব্যের আরম্ভ ক্রমব্যাপ্তি চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব-গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার এ পর্যায়গুলো নাটকের আদলেই অতিক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আধুনিক বিচারে নাটক নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের কাব্য জগতে নাটকীয় ভঙ্গিতে রচিত কাব্যনাট্য।

৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মানবিক আবেদন আলোচনা করুন।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মানবতা মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের একটি সম্পদ। এ মানবতা দেহ ও প্রাণ উভয়কেই বেষ্টন করে আছে। কবির মতে আত্মা দেহকে কেন্দ্র করেই। রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ দেহবোধের পরিচয় দিয়েছেন। একটি বাস্তব পরিবেশে নরনারী যেভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার চিত্র পাওয়া যায়। গোটা কাব্যখানি দৈহিক আকর্ষণে টানটান, জৈবিক রসে সিঞ্চিত এবং মানবীয় আবেদনে আকর্ষণীয়। এ কাব্যের বিভিন্ন খণ্ডে কৃষ্ণের লাম্পট্য, শঠতা, কুলবধুর সতীত্বনাশ ইত্যাদি অশালীন হলেও তা একান্তই বাস্তব ও মানবিক। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে দেহঘটিত যে দ্বন্দ্ব চলেছিল তাতে মনের কোন সাড়া ছিল না। কিন্তু মন দেহকে বাদ দিয়ে নয়। তাই কৃষ্ণ রাধার দেহকে যতই ভোগ করেছে, আন্তরিক বিরাগ সত্ত্বেও রাধার চিত্ত কৃষ্ণের প্রতি ততই আকৃষ্ট হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এ কাব্যের মানবিকতা প্রমাণ করা যায়। এ কাব্যের বেদনা বা আনন্দের মধ্যে মানবিকতা স্পষ্ট। জীবনবিমুখতাকে পরিহার করে এ কাব্য হয়ে উঠেছে মানব জীবনমুখী তথা মানবিক।

৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্র রাধার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম প্রধান চরিত্র রাধা। দেশকালের প্রচ্ছদে গোপবালিকা রাধার চরিত্র অঙ্কিত। আইহনের বিবাহিতা স্ত্রী রাধাকে কৃষ্ণ যখন প্রেম উপহারস্বরূপ ফুল, তাম্বুলাদি পাঠায় তখন সে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ রাধা সামাজিক অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত। কৃষ্ণ রাধাকে রতিদানে বল প্রয়োগ করলে, সে

CamScanner

নিজেকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলে। তার স্বামীর বীরত্বের ভয় দেখায়, কংসের হুমকি দেয়। এ সময়ে রাধার মধ্যে বাঙালি শাশ্বত নারীর সতীত্বের মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেই পরবর্তীতে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। দান খণ্ডে কৃষ্ণের আচরণ তার কাছে অত্যাচার মনে হলেও নৌকা খণ্ডে এসে আর অত্যাচার মনে হয় না। রাধার চরিত্রের রূপান্তর দেখা যায়। শেষে কৃষ্ণ বিরহে রাধা একা হয়ে যায়। তার মনে হয়েছে মিথ্যার সাথে রফা করতে গিয়ে জীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট করেছে। রাধাকে দেবী হিসেবে পূজা যেমন দেয়া যায়, তেমনি মানবী হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। রাধা চরিত্রের এই সুখ-দুঃখ, দ্ব্যর্থতা বা বিবর্তনই তাকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য তেরটি খণ্ডে বিধৃত। কাব্যের কাহিনি কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই- এই তিনটি চরিত্রের সক্রিয়তার মধ্যে পরিণতি পেয়েছে। কৃষ্ণ চরিত্র আপাদমস্তক কামুক চরিত্র। তার ঝোঁক কেবল রাধার দেহের উপর। রাধা চরিত্র এ কাব্যের সর্বোজ্জ্বল চরিত্র। প্রথমে কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেও ধীরে ধীরে সেও কৃষ্ণের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বড়াই এ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মাধ্যম হিসেবে সক্রিয়। তার মানবিক আচরণ আমাদের মুগ্ধ করে। কাব্যের অধিকাংশ পদ রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রতক্তির মাধ্যমে নাট্যসংলাপ গুণধর্মী। কিছুটা পথ নাটকীয় চঞ্চলতা ও দ্রুততা থাকলেও কাব্যের শেষদিকে গীতিকবিতার গভীরতার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। কবি এ কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে উপমা যেমন নিয়েছেন, তেমনি পল্লির জীবনযাত্রা থেকেও উপমা সংগ্রহ করেছেন। জন্ম খণ্ড হতে রাধাবিরহ পর্যন্ত শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ কোন রসেরই অভাব নেই। এর একটি ত্রুটি হল অতিকথন বা পুনরাবৃত্তি, যা কিছুটা বিরক্তির উদ্রেক করে। কাব্যে অতিকথন দোষ বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনি গ্রন্থনের পারঙ্গমতা, চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, রস, উপমা, নাটকীয়তা, গীতিধর্মিতা মিলে এটি একটি সার্থক কাব্য।

১০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত সমাজ চিত্র আলোচনা করুন।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে সমকালীন সমাজের অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে। কাব্যের প্রধান চরিত্র রাধার জন্ম গোপ পরিবারে বলে সঙ্গত কারণেই গোপ সমাজের বর্ণনা বেশি আছে। গোপ জাতের মেয়ে ও পুত্রবধুরা জীবিকার উদ্দেশ্যে দধিদুগ্ধের পসরা নিয়ে হাটে যেত। গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবীর পরিচয় পাওয়া যায়। হিসাবনিকাশ কড়ি দিয়ে করা হত। কড়ির বিনিময়ে কাজের শ্রমিক/কুলি পাওয়া যেত। সমাজে রাজার শাসন বিরাজমান ছিল। প্রজাদের প্রতি কংস রাজার অত্যাচারের বিষয়টিও স্পষ্ট। রাজকর ও বিভিন্ন শুল্ক আদায়ের রীতি ছিল। বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ নেতবস্ত্র

CamScanner

সহযোগে পৌছাবার রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আতিথেয়তায় পান-তামাকের ব্যবহার পাওয়া যায়। সমাজে বাল্যবিবাহ রীতির কথা জানা যায়। মন্ত্রতন্ত্রেও লোকের বিশ্বাস ছিল। যেমন-মূর্ছিতা রাধাকে ঝাড়ফুকের দ্বারা জাগ্রত করা হয়। বাড়ির বাইরে যেতে বাধা পাওয়া, টিকটিকি ডাকা, হাঁচি আসা প্রভৃতি কুসংস্কার অমঙ্গলে লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। সাল, তারিখ গণনার জন্য পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাওয়া যায় তা পরিমাণে বেশি না হলেও তার মূল্য কম নয়।

মঙ্গলকাব্য

১. মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। *[৪০তম]*

উত্তর : মনসামঙ্গলের প্রধান চরিত্র এবং চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা। সর্পদেবী মনসার আক্রোশে বিবাহ-রজনীতে লৌহবাসরে সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর পুনর্জীবন কামনায় বেহুলা কলাগাছের ভেলায় স্বামীর শব নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেসে দেবপুরীর উদ্দেশ্যে এক অজানা দুর্গম পথে যাত্রা করে। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দেবতাকে তুষ্ট করে স্বামীর পুনর্জীবন প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। সতী ধর্মের মহিমা কীর্তনের জন্য বেহুলা চরিত্র অনেকটা সাবিত্রির আদর্শে অঙ্কিত হয়েছে। স্বামীর জীবনের জন্য দেবসভায় বেহুলার নৃত্য পরিবেশন ও দেবতাদের মনোরঞ্জন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। শোকাহত বেহুলার দেবসভার এই নৃত্য স্বামীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসর্গ। এত বড় পরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে কোন নারী চরিত্রের দিতে হয় নাই। বাঙালি সনাতন নারী সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র এই বেহুলা। এর মাধ্যমে বাঙালি নারীর শাশ্বত স্বামীভক্তির এক অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে বাংলার সহনশীল ও কোমলস্বভাব নারীদের মধ্যেও যে একটি সুপ্ত বিদ্রোহ ক্রিয়াশীল, তারও প্রকাশ ঘটেছে বেহুলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নারীত্বের মহিমায় বেহুলা সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মতোই বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল চরিত্র।

২. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। *[৩৬তম বিসিএস]*

উত্তর : মঙ্গলকাব্য তথা মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। সেকালের রুচি ও পরিবেশ তার কাব্যে অবলীলায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে দেবতার স্থলে মানুষকে স্থান দিয়েছেন। দেবভাষার পরিবর্তে শুধু মানুষের মুখের ভাষা, দেব-দেবীর মাহাত্ম প্রচারের অন্তরালে মর্তের মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি তুলে আনলেন। আরবি, ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষায় তাঁর কৃতিত্ব দেখানোর জন্যই বোধ হয় 'যাবনী মিশাল' বাংলা ভাষার অবতারণা করেছিলেন। তবে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাহিনিকে কাব্যের

CamScanner

উপজীব্য করেছেন বলেই তিনি মধ্যযুগের কবি। অন্যথায় ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, ভাষা ব্যবহার, বিদ্রুপাত্মক বাণী বিন্যাসে তিনি আধুনিক। ভারতচন্দ্রের যা কিছু কৃতিত্ব তা সব শব্দ-ছন্দে। কেবল শেষাক্ষরে নয়, শেষাক্ষরের পূর্বেও তিনি ছন্দের মিল দিয়েছেন। তার অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বহুলাংশে ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের কারণেই। তিনি রসেরও প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

৩. তিনটি মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ধর্মনির্ভর বিশেষ এক শ্রেণির আখ্যান কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। যে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কাব্যটি রচিত সে দেবতার নামানুসারে কাব্যগুলোর নামকরণ করা হয়। তিনটি মঙ্গলকাব্য হলো-

✓ মনসামঙ্গল: মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীনতম ধারা হল মনসামঙ্গল কাব্য। মনসা দেবীর পূজা প্রচার এবং গুণকীর্তন রূপায়িত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে। মনসামঙ্গল কাব্যকে পদ্মপুরাণও বলা হয়। মনাসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্ত।

✓ চণ্ডীমঙ্গল: চণ্ডীদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এ কাব্যধারার প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

✓ অন্নদামঙ্গল: দেবী অন্নদার গুণকীর্তন করে যে কাব্য রচনা করা হয় তাই অন্নদামঙ্গল কাব্য। অন্নদামঙ্গল কাব্য ধারার প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

৪. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের যে কোনো একজন কবির পরিচয় লিখুন। *[৩১তম]*
অথবা, বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার দুজন বিখ্যাত কবির নাম লিখুন, প্রত্যেকের একটি করে কাব্যের নামসহ। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : মনসামঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্ত। তাঁর রচিত কাব্য- পদ্মপুরাণ। তিনি মনসাদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে (আনুমানিক ১৪৯৪ সালে) এ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের জন্য তিনি 'মহাকবি' উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৪৫০ (আনুমানিক) সালে বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে (বর্তমান আগৈলঝড়া উপজেলার গৈলা গ্রাম) জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতকেরই শেষ দিকে মারা যান।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তার রচিত বিখ্যাত কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল'। জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ রঘুনাথ রায় তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। তিনি ১৫৪০ (আনুমানিক) সালে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাঢ়ীয় বংশজাত ব্রাহ্মণ 'হৃদয় মিশ্র' তাঁর পিতা এবং মাতার নাম দৈবকী। তিনি ১৬০৪ (আনুমানিক) সালে মারা যান।

CamScanner

৫. মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য:

- ✓ সাধারণত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন বলে কবিগণ উল্লেখ করেন।
- ✓ মঙ্গলকাব্যের প্রথমেই দেবতার বন্দনা, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, সৃষ্টিরহস্য, কথন প্রভৃতি প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের সূচনা অংশে দেখা যায়।
- ✓ মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কবিদের ভনিতা ব্যবহার। এই অংশে কবির নাম, পদবী, আশ্রয়দাতা পৃষ্ঠপোষকের নামের উল্লেখ থাকে।
- ✓ প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকা স্বর্গচ্যুত দেবদেবী। দেব মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাদের মর্ত্যে আগমন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণির চরিত্রের মহিমা প্রচারিত হতো।
- ✓ এ কাব্যের আখ্যানভাগ নায়কের সাথে দেব-দেবীর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিপুলায়তন পায়।
- ✓ এ কাব্যের ছন্দ সাধারণত পয়ার ও ত্রিপদী।
- ✓ মনসামঙ্গল ছাড়া সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।
- ✓ কোন কোন কাব্যে মানব চরিত্র অঙ্কন করতেও দেখা যায়। এছাড়াও সুখ-দুঃখের বারমাসী গান, চৌতিশা, স্তুতি, নারীর প্রতি নিন্দার বর্ণনা, রন্ধনশিল্প বর্ণনা, ফলফুল, পশুপাখির বর্ণনা পাওয়া যায়।
- ✓ মঙ্গলকাব্য পর্বে প্রহেলিকা, ধাঁ ধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, লোকশ্রুতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৬. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। *[২৮তম]*
অথবা, মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

উত্তর : বঙ্গ দেশ ছিল অনার্যদের দেশ। উন্নততর আর্যধর্ম ও সভ্যতার প্রবল প্রাধান্যে বাঙালি আংশিকভাবে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। তবে সাধারণ মানুষ নিজেদের দেবদেবীকেন্দ্রিক ব্রত-পূজা ত্যাগ করেনি। সেন রাজারা বঙ্গ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার-প্রসার করতে গিয়ে যুগযুগান্তরের বঙ্গীয় ধর্ম ব্যবস্থার উপর অত্যাচার শুরু করে। সে সময়ই বঙ্গীয় বৃহৎজনগোষ্ঠী লৌকিক ধর্ম রীতি-নীতিকে নতুন করে গঠনের চেষ্টা করে। বখতিয়ার খলজী তথা মুসলমানদের নদীয়া বিজয়ের ফলে বাঙালি দেবতার নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিপদমুক্তির পথ খুঁজেছিল। তাই লোকদেবতা মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম উপাসনা ক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। আর তখনই কবিগণ লৌকিক আখ্যানের সঙ্গে শাস্ত্র পুরাণের গঠনরীতি মিশিয়ে, স্বীয় কল্পনারসে জারিত করে রচনা করলেন মঙ্গলকাব্য। এই কাব্য শ্রবণের ফল জাগতিক ও

CamScanner

পারলৌকিক মঙ্গল হয়। সেন শাসনামলে লোকভাষা ও লোকদেবতা নিষিদ্ধ ছিল; বৈদিক দেবতা ও সংস্কৃত ভাষা ছিল পূজ্য ও রাজমহিমান্বিত। সুতরাং এই সময়ে সাম্প্রদায়গুলো নিজ নিজ উপাস্য দেবতার প্রাধান্য বিস্তার করতে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করে। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান শাসনকালেই মঙ্গলকাব্যগুলো সৃষ্টি হয়েছিল।

৭. ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাম কী? কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি কী বলেছেন? *[২০তম বিসিএস]*
অথবা, 'অন্নদামঙ্গল' কার রচনা? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য ধারার প্রধান কবি। দেবী অন্নদার গুণকীর্তন করে যে কাব্য রচনা করা হয় তাই অন্নদামঙ্গল কাব্য। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র- ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী।

কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ছিলেন সর্বভুক। কোনো কিছু না ভেবে শুধু তাঁর রচনাকে রসাল ও প্রসাদগুণ সমৃদ্ধ করার জন্য যে কোনো ভাষার শব্দকেই তিনি সযত্নে ব্যবহার করেছেন। বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে তিনি রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য প্রথা ভেঙে বাংলা ভাষাকে শাপমুক্ত করেছেন। কাব্যে আরবি-ফারসি ভাষার মিশালকে তিনি 'যাবনী মিশাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তিনি বলেছেন-

'না রবে প্রসাদগুণ না রবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥'

ভারতচন্দ্রের বহু কবিতা আছে যেখানে তিনি একই সাথে সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দি (উর্দু) ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৮. মঙ্গলকাব্যকে এ নাম দেয়ার কারণ কী? *[১৮তম বিসিএস]*
অথবা, মঙ্গলকাব্যের নামকরণ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মঙ্গলকাব্যের নামকরণ নিয়ে নানা মত বিদ্যমান। যেমন-

- ✓ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত এই কাব্যের কাহিনি পাঠ করলে ও শ্রবণ করলে মঙ্গল হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। এমনকি গৃহে রাখলেও গৃহের সব অকল্যাণ দূর হয়, তাই মঙ্গলকাব্য।
- ✓ এক মঙ্গলবার থেকে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত গানগুলি গাওয়া হয়, তাই মঙ্গলকাব্য।
- ✓ প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্য মাত্রই ছিল গেয়। তাই যে গান মঙ্গলসুরে গাওয়া হয়, তাই মঙ্গলকাব্য।

©Nazmus Sadat
CamScanner

✓ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- প্রাচীন বাংলায় বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই মঙ্গলরাগ বলা হতো। পরে এর অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে দেবদেবীর বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর বাংলায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছে।

৯. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে? কোন শতাব্দীর রচনা? *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। চণ্ডীদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। এর রচনাকাল ১৫৪৪ সালের কাছাকাছি সময় বলে ধারণা করা হয়।

১০. ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন? *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায় ১৭১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ভুরসুট পরগণার পেড়ো (পান্ডুয়া) গ্রামের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্র রায়ের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে কাব্যচর্চার উপযুক্ত স্থান নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে 'গুণাকর' (সকল গুণের আধার) উপাধি দেন। তিনি ১৭৬০ সালে মারা যান।

১১. মঙ্গলকাব্য কী?

উত্তর : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ অবধি এ ধারার কাব্য রচিত হয়। দেবমাহাত্ম্যমূলক সমাজচিত্রভিত্তিক এ কাব্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনিকাব্য। মঙ্গলকাব্য পালা হিসেবে গীত হতো, তবে এতে সুর অপেক্ষা কাহিনিই বেশি প্রাধান্য পেত। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু। বিশেষ কোন দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার জন্য শাপগ্রস্ত হয়। তারপর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্বিচারে যে কোন মানবীয় গর্ভে জন্ম নিয়ে মর্তের মাটিতে বিশেষ কোন দেবপূজা প্রচারে সচেষ্ট থাকে। পূজা প্রতিষ্ঠার পর শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করে। কাব্যগুলোর নামকরণ করা হতো যে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কাব্যটি রচিত সে দেবতার নামানুসারে। মঙ্গলকাব্য প্রধানত দুই প্রকার- পৌরাণিক ও লৌকিক মঙ্গলকাব্য। একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যের ৫টি অংশ থাকে- বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্তখণ্ড, শ্রুতিফল।

CamScanner

✓ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- প্রাচীন বাংলায় বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই মঙ্গলরাগ বলা হতো। পরে এর অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে দেবদেবীর বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর বাংলায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছে।

৯. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে? কোন শতাব্দীর রচনা? *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। চণ্ডীদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। এর রচনাকাল ১৫৪৪ সালের কাছাকাছি সময় বলে ধারণা করা হয়।

১০. ভারতচন্দ্র কোন রাজসভার কবি ছিলেন? *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায় ১৭১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ভুরসুট পরগণার পেড়ো (পান্ডুয়া) গ্রামের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্র রায়ের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে কাব্যচর্চার উপযুক্ত স্থান নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে 'গুণাকর' (সকল গুণের আধার) উপাধি দেন। তিনি ১৭৬০ সালে মারা যান।

১১. মঙ্গলকাব্য কী?

উত্তর : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ অবধি এ ধারার কাব্য রচিত হয়। দেবমাহাত্ম্যমূলক সমাজচিত্রভিত্তিক এ কাব্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও নিজস্ব কাহিনিকাব্য। মঙ্গলকাব্য পালা হিসেবে গীত হতো, তবে এতে সুর অপেক্ষা কাহিনিই বেশি প্রাধান্য পেত। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু। বিশেষ কোন দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার জন্য শাপগ্রস্ত হয়। তারপর স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্বিচারে যে কোন মানবীয় গর্ভে জন্ম নিয়ে মর্তের মাটিতে বিশেষ কোন দেবপূজা প্রচারে সচেষ্ট থাকে। পূজা প্রতিষ্ঠার পর শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করে। কাব্যগুলোর নামকরণ করা হতো যে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কাব্যটি রচিত সে দেবতার নামানুসারে। মঙ্গলকাব্য প্রধানত দুই প্রকার- পৌরাণিক ও লৌকিক মঙ্গলকাব্য। একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যের ৫টি অংশ থাকে- বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্তখণ্ড, শ্রুতিফল।

CamScanner

১২. মঙ্গলকাব্যের গঠন সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যের মোট ৫টি খণ্ড থাকে। এই ৫টি খণ্ডের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো-

- ✓ প্রথম খণ্ড 'বন্দনা'-অর্থ প্রশংসা। এতে দেবদেবী ও সকল শ্রেণির মানুষের বন্দনা করা হয়।
- ✓ দ্বিতীয় খণ্ড 'আত্মপরিচয়'। এতে কবি কেন এ কাব্য রচনা করেছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা, নিজের পরিচয়ও তুলে ধরেন।
- ✓ তৃতীয় খণ্ড 'দেবখণ্ড'। এই অংশে কাব্য-কথাকে পৌরাণিক দেবদেবীর রূপাধারে অলৌকিকত্ব প্রদান ও আভিজাত্য দেবার চেষ্টা করা হয়।
- ✓ চতুর্থ খণ্ড 'নরখণ্ড' বা মূল কাহিনি বর্ণনা। এতে দেবতার পূজা প্রচারের জন্য কোনো কোনো দেবতা ও স্বর্গবাসীর শাপগ্রস্থ হয়ে নরলোকে জন্মগ্রহণের বর্ণনা আছে। তাছাড়া রয়েছে নায়ক নায়িকার প্রথাগত রূপ-বর্ণনা, কুলকামিনীর পতিনিন্দা, রন্ধন-বিবরণ, নায়িকাকে বারমাসের সুখদুঃখের কথা 'বারমাস্যা', বিপন্ন নায়কের বর্ণানুক্রমে চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব 'চৌতিশা' ইত্যাদি।
- ✓ পঞ্চম খণ্ড 'শ্রুতিফল'। এই অংশে মঙ্গলকাব্য শ্রবণ করলে কি ফল পাওয়া যায় তার বর্ণনা।

মঙ্গল কাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনি কতগুলি পালায় বিভক্ত করে গাওয়া হতো। সাধারণত আট দিনের ষোলো পালায় অর্থাৎ আট টি দিবা পালা ও আট টি রাত্রি পালায় কাহিনি বিভক্ত হতো। তবে বিষয়ানুযায়ী মঙ্গল কাব্যের পালা বিভাগ স্বতন্ত্র হতো।

১৩. মঙ্গলকাব্যের ছন্দ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মঙ্গলকাব্য প্রধানত অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দেই লিখিত। এই ছন্দকে মধ্যযুগে পাঁচালী ছন্দও বলা হতো। পয়ার বা পাঁচালী ছাড়া মঙ্গলকাব্যের আরেকটি প্রধান ছন্দ ত্রিপদী। এই ত্রিপদী প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ত্রিপদী। একে অনেক ক্ষেত্রে লাচারী ছন্দও বলে। ত্রিপদী ছন্দের একটি বিশেষ রূপকে ললিত ছন্দ বলে। এটিও মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে পয়ার ত্রিপদীর পাশাপাশি একাবলী ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পয়ার ত্রিপদী, একাবলী ছন্দ ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। তোটক, তুনক প্রভৃতি ছন্দের বাংলা অনুবাদ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়।

©Nazmus Sadat

CamScanner

১৪. মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত অন্ত্যজশ্রেণির পরিচয় দিন।

উত্তর : মঙ্গলকাব্য বর্ণিত যে সমস্ত জাতি উপজাতির বর্ণনা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই সমাজের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এসব অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে ছিলো- কর্মকার, কিরাত, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, গোয়ালা, তন্তু বণিক, তাম্বুল বণিক, তেলি, ধোপা-নাপিত, বাগদি, নমশূদ্র, বাউরি, বৈদ্য, ব্যাধ, সূত্রধর, কাংস্য বনিক, সুবর্ণকার, হাড়ি, সদগোপ, পাটনী, কোচ, মোদক, বাইতি প্রভৃতি। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এবং বর্ণহিন্দুদের অবজ্ঞা-অবহেলা-ঘৃণার পাত্র হিসাবে নিম্নবর্গীয় সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় জাতিগোষ্ঠী গুলি বর্তমানে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্গত। তারা আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জাতি। সমাজের নিম্নবর্গীয় জনজাতির নিজস্ব কিছু লোকাচার, লোকধর্ম, লোকসংস্কার ও সংস্কৃতি থাকে যা মেনে চলতে হয়।

১৫. মঙ্গলকাব্যে নারী চরিত্রের অবস্থান পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যের নারীদের তুলনায় মঙ্গলকাব্যের নারীরা বৈচিত্র্যময়ী। বেহুলা মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র। সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যু হলে বেহুলা কলাগাছের ভেলায় স্বামীর শব নিয়ে এক অজানা দুর্গম পথে যাত্রা করে। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দেবতাকে তুষ্ট করে স্বামীর পুনর্জীবন লাভ করে। এর মাধ্যমে বাঙালি নারীদের স্বামীভক্তির এক অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা সঞ্জয় কেতুর কন্যা, কালকেতুর স্ত্রী। সে পতিব্রতা ও বিদ্রোহী নারী। এ কাব্যের খুল্লনা চরিত্র ধনপতি আখ্যানের রোমান্টিক নায়িকা। সে চতুরা ও গার্হস্থ্য-পারিবারিক ক্ষেত্রে দক্ষ। দেবতার পূজা প্রচারের দায়িত্ব তার কাঁধে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে তাকে সতীত্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র দেবী অন্নদা। এই অন্নদা প্রথমে সতী, তারপর পর্বত দুহিতা উমা এবং পার্বতী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ভাস্বর নারী চরিত্র রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা ও বর লাভের মধ্য দিয়ে কবিরা তার সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটান। শিবায়নের নায়িকা পার্বতী চরম ধৈর্যশীলা রমণী। স্বামী শিবের আর্থিক টানাপোড়েনের সময় সে চরম ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

১৬. মনসামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন হচ্ছে 'মনসামঙ্গল কাব্য'। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দেবতা সর্পদেবী মনসা। মনসা দেবীকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের ধারায় যে সমস্ত কাব্য রচিত হয়েছিল তাই মনসামঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত। কবি কানা হরিদত্ত হচ্ছেন মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি।

CamScanner

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি হলো- মর্ত্যে মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয়দের পূজা দরকার। চম্পকনগরের নেতৃস্থানীয় বণিক চাঁদ সদাগর শিবের ভক্ত। সে মনসার পূজা দিতে নারাজ। মনসা দেবী ক্রোধান্বিত হয়ে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করে, সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা ডুবিয়ে দেয়। পরবর্তীতে চাঁদ সদাগর উজানী নগরের কন্যা পরমাসুন্দরী বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে দিলে বাসরঘরে সর্পদংশনে লখিন্দর মারা যায়। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে ভেলায় ভেসে বহু বাঁধা উপেক্ষা করে স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরে পায়। তবে বেহুলাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসার পূজা করাতে হবে। পুত্রবধু বেহুলার কাতর আবেদনে অবশেষে চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে সম্মত হন, শেষে পিছন ফিরে বাম হাতে পূজা দেন। এভাবেই মর্ত্যের লোকসমাজে মনসার পূজা প্রতিষ্ঠিত হল।

১৭. মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তর : মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাকে মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলার কারণ-

- ✓ **নারীর প্রতিবাদ:-** মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নারীর প্রতিবাদী চরিত্র তার কাব্যে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সমসাময়িক কোন কবি তো নয়ই, আধুনিক অনেক কবিও তাদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তাঁর কাব্যে ফুল্লরা তার স্বামীকে বলে-

  "পিপিলীকার পাখা উঠে মরিবার তরে।
  কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে"

- ✓ **লৌকিক জীবনের কথা:-** লৌকিক জীবনকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার কাব্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করছেন। মধ্যযুগে অন্য কোন কবি সেভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি।

- ✓ **পাণ্ডিত্য জ্ঞান :** মুকুন্দরামের কবিত্ব শক্তির চেয়ে পাণ্ডিত্য শক্তি অনেক বেশি ছিল। তিনি কাব্যে উপন্যাসের বীজ বপন করে গেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য এ ধরনের কাব্য রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

তার সম্পর্কে আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচকদের মন্তব্য-

'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগে জন্ম গ্রহণ না করে আধুনিক যুগে জন্ম গ্রহণ করলে কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন।'

১৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে কবি কঙ্কন উপাধি দেওয়া হয় কেন?

উত্তর : ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানব রসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা। তিনি জমিদার

CamScanner

পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। রঘুনাথ রায় জমিদার হলে কবি তাঁর সভাসদ নিযুক্ত হন। রঘুনাথ রায়ের অনুরোধেই তিনি বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ রঘুনাথ তাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেন। কবিকঙ্কণ মানে যে কবি হাতে পায়ে ঘুঙুর পরে গান করতেন। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের পেশাদার গায়ক।

১৯. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে দুঃখের কবি বলা হয় কেন?

উত্তর : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দুঃখের কবি। তার কাব্যে সে দুঃখের প্রভাব লক্ষণীয়। অন্য কবিরা যেখানে কাল্পনিক সুখ সমৃদ্ধি বর্ণনা, আনন্দময় ভবিষ্যৎ রচনায় ব্যস্ত মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তখন প্রত্যাহিক জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা বর্ণনা করেছেন। তার কাব্যে তিনি দৈব প্রসাদতৃপ্ত আনন্দময় জীবনের চেয়ে বাস্তব জীবনের দুঃখ কাহিনিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই দেবীর আশ্বাসবাণী অপেক্ষা পশুগণের দুঃখ বর্ণনায় তিনি বেশি ব্যাকুল ছিলেন। এই জন্যই মনে হয় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ', 'ফুল্লরার বারমাস্যা', 'হরগৌরীর দারিদ্র্যচিত্র', 'বনের পশুদের দুঃখ নিবেদন' প্রভৃতির উল্লেখ করে দুঃখবাদী মনোভাবের প্রমাণ দিতে চেয়েছেন। দুঃখ বর্ণনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে তাকে দুঃখের কবি বলা হয়। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন-

> *"কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গু নদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখসঙ্গীতের মর্মস্পর্শী আর্তধ্বনি শুনা যায়।"*

তবে উপখ্যানে দুঃখের বর্ণনা করুণভাবে উপস্থাপন করলেও তার চিন্তাভাবনায় তিনি দুঃখবাদী ছিলেন না। বরং তিনি ভোগবাদী ও জীবনবাদী কবি ছিলেন।

২০. চাঁদ সওদাগরকে মধ্যযুগের প্রতিবাদী চরিত্র বলা হয় কেন?

উত্তর : চাঁদ সওদাগর মনসামঙ্গল কাব্যধারার একটি কিংবদন্তি চরিত্র। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের চম্পক নগরের একজন ধনী ও ক্ষমতাশালী বণিক। তিনি বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র। তাকে প্রতিবাদী চরিত্র বলার কারণ-

✓ শিব পূজারি চাঁদ সওদাগর মনসা দেবীকে পূজা দিতে অস্বীকার করেন।

✓ মনসা দেবী তার ছয় সন্তানকে মেরে ফেললেও তিনি মনসার প্রার্থনা না করে মহাজ্ঞানী শিবের প্রার্থনা করতেন।

✓ চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যে গিয়ে বিপুল মুনাফা করে ফেরার সময় মনসা দেবীর কথা না শুনলে দেবী তার নৌকা ঝড়ে ডুবিয়ে তার সব লাভের মালামাল পানিতে ডুবিয়ে দেবার পাশাপাশি তাকে ডুবিয়ে মারতে চাইলেও তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং নদীতে মনসাদেবীর প্রাণ রক্ষাকারী কাঠখণ্ড আঁকড়ে না ধরে নদীতে ভেসে ভেসে অনেক কষ্টে তীরে উঠতে সক্ষম হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

✓ চন্দ্রকেতু চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু চাঁদ তাতে সম্মত হন না। তাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি শিবদুর্গার পূজা করে চলেন।

এভাবে নিজ সিদ্ধান্তে অটল যে দেবীকে পরোয়া করে না এমন মানব চরিত্র শুধু মধ্যযুগ নয় পুরো বাংলা সাহিত্যেই বিরল।

২১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পতিপ্রাণা চরিত্রের পরিচয় দিন।

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে পতিপ্রাণা চরিত্র হলো বেহুলা। বেহুলা মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র। উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা এবং চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের স্ত্রী। বাসর রাতে মনসা দেবীর নির্দেশে মনসার দূত সাপ লোহার তৈরি বাসর ঘরে ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করলে লখিন্দর মারা যায়। মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় করে নদীতে ভাসতে ভাসতে একসময় স্বর্গের ধোপানী নেতাই ধোপানীর ঘাটে উপস্থিত হয় এবং তার কাছে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চায়। নেতাই বেহুলাকে স্বর্গের দেবতাদের নিকট নিয়ে যায়। এভাবে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বেহুলা দেবপুরীতে পৌঁছান এবং নৃত্যগীতে মহাদেব ও অন্যান্য দেবতাকে তুষ্ট করে স্বামীর পুনর্জীবন লাভ করেন। মনসার কোপে অতীতে নিহত সওদাগরের অন্য ছয়পুত্রের জীবন ও সম্পদ-সম্ভারসহ সপ্তডিঙ্গা উদ্ধার করে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

২২. ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অনবদ্য সৃষ্টি ভাঁড়ুদত্ত চরিত্র। ঠকামি, ধান্ধাবাজি তার পেশা। নীচকুলের ব্যাধ কালকেতু রাজ্য লাভ করায় তার গাত্রদাহ শুরু হয়, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির আশায় সে কালকেতুর কাছে কপটতার আশ্রয় নেয়। ভাড়ু নিজেকে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে পরিচয় দেয়। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেজে পসারীদের দ্রব্যসামগ্রী থেকে তোলাস্বরূপ উৎকৃষ্টটা বেছে নিয়ে পয়সা দেয় না। হাটুরিয়াদের অভিযোগে কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে অপমান করে। প্রতিশোধ হিসেবে সে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর রাজ্য আক্রমণে প্ররোচিত করে। কলিঙ্গ রাজা কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করে রাজ্য কেড়ে নেয়। দেবী চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু রাজ্য ফিরে পায়। পরে ভাড়ুর শাস্তিস্বরূপ মাথা মুড়ে, ঘোল ঢেলে তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়। কবি ভাড়ুদত্তকে আপাদমস্তক মিথ্যেবাদী, ঠক, চতুর, লোভী, স্বার্থপর, আত্মমর্যাদাহীন চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেন। কবি তাঁর বিস্ময়কর জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ভাড়ুদত্ত চরিত্রে। ভাড়ুদত্ত কেবল মুকুন্দরামেরই নয়, বরং সমগ্র মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠ খল চরিত্র।

©Nazmus Sadat
CamScanner

২৩. অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাব্যগুণ বিচার করুন।

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য অন্নদামঙ্গল। এটি দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারে ভবানন্দ মজুমদারের জীবন নিয়ে রচিত কাব্য। অন্নদামঙ্গল কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড 'অন্নদামঙ্গল'; দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' ও তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ'। এ কাব্যের মূল চরিত্রগুলো হলো- ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মানসিংহ, ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী। ভারতচন্দ্রের প্রখর কবিত্ব এ কাব্যের বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গি, তির্যক ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এতে ভারতচন্দ্র তৎসম, তদ্ভব, দেশি-বিদেশি শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি চলিত ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোও ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দ ব্যবহারে এ কাব্য হয়েছে নৃত্যমুখর। তিনি কেবল শেষাক্ষরে মিল করেন নি, অনেক সময় শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরেও মিল দিয়েছেন। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ব্যবহার করে ছন্দকে বৈচিত্র্যময় করে তুলে ধরেছেন। তবে কাহিনিতে সে অর্থে কোন নতুনত্ব নেই। চরিত্রগুলো ইতিহাস থেকে নেয়া হলেও ঈশ্বরী পাটনী ছাড়া অন্য কোন চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠে নি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতি-

- ✓ *আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।*
- ✓ *নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।*
- ✓ *মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন*
- ✓ *বড়র পিরীতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।*

২৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। দেবী অন্নদা তাঁর শ্বশুরবাড়ির সাথে বিরোধে জড়িয়ে স্বামী-সংসার ত্যাগ করে খেয়াঘাটে এসে উপস্থিত হয়। ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে কড়ি ছাড়া খেয়া পারাপারে অপরাগতা প্রকাশ করে। অনেক অনুরোধের পর খেয়ার মাঝি দেবী অন্নদাকে নৌকায় পার করতে রাজি হয়। নৌকায় দেবী যে সেউতিতে পা রেখেছিলেন তা স্বর্ণে পরিণত হয়। এতে ঈশ্বরী পাটনীর মনে হতে থাকে তিনি কোন সাধারণ নারী নন। তীরে নেমে দেবী মাঝিকে বললেন, 'কী বর চাও তুমি, মাঝি? যা চাও তাই পাবে।' ঈশ্বরী পাটনী রাজ্য, বাড়ি ভর্তি সোনারূপা, মুক্তা, পান্না দেবীর কাছে না চেয়ে নিবেদন করলো একটি ছোটো প্রার্থনা। বললো, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' দেবী অন্নদা সাথে সাথে মাঝির এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এ প্রার্থনার মধ্যে বাঙালির নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে সন্তানের কল্যাণ কামনার চিরন্তন মানসিকতা মূখ্য হয়ে উঠে।

CamScanner

২৫. 'ভারতচন্দ্র রায় মূলত নাগরিক কবি' উক্তিটির যথার্থতা লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নগরজীবনের বিচিত্র তন্তুজালের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে নগরজীবনের বিভিন্ন দিক ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তার হয়েছে। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় ও দরবারি সমাজের চাহিদা তাকে মিটাতে হয়েছে। দরবারি জৌলুস, নগরসমাজের অনাচার বিলাস ও বিভ্রমের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে তিনি আচ্ছন্ন হতে দেননি। এজন্য মধ্যযুগের দেবনির্ভর কাব্যচেতনা ও নগরকেন্দ্রিক সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য ভারতচন্দ্র তার কাব্যে নাগরিকতা আমদানি করেছেন মাত্র। মূলত নাগরিক সমাজের শূন্যগর্ভতাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করেছেন ভারতচন্দ্র। তাঁর নাগরিকতা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, এজন্য আধুনিক অর্থে ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি নন। তবে এ-কথা সত্য, বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্রই নাগরিকতার বীজ বপন করেন।

২৬. যাবনী মিশাল ভাষা কী?

উত্তর : যবন শব্দের অর্থ বহিরাগত। আরবি-ফারসি ভারতবর্ষে বহিরাগত ভাষা। যাবনী মিশাল বলতে আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষাকে বুঝায়। মুসলিম কবিদের পুঁথি সাহিত্য, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলসহ মধ্যযুগের কবিদের অনেক কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তুর্কি বিজয়ের পর ফারসি রাজভাষা হিসেবে গৃহীত হলে রাজকার্যে সুবিধা লাভের জন্য হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ওই ভাষা শিখেছে। ফলে বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করে। স্থানীয় মানুষ ছাড়া ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির লোকেরাও এ ভাষা শিখত। সুকুমার সেন একে হিন্দু-মুসলমানের 'কাজের ভাষা' বা 'ব্যবহারিক বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতচন্দ্র রায় একে 'যাবনী মিশাল' ভাষা বলেছেন। সরস ও প্রসাদগুণসম্পন্ন না হলেও এ ভাষা সবাই বুঝত। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অন্নদামঙ্গলে বলেন-

'না রবে প্রসাদগুণ না রবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥'

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র তার রচনায় আরবি-ফারসি ভাষার উত্তরাধিকারী মুসলমানদের বুঝাতে 'যবন' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

২৭. বারমাস্যা বা বারমাসি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বারমাস্যা মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের বার মাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনাই বাংলা সাহিত্যে 'বারমাস্যা' নামে

পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের নায়িকা তার নায়ককে দোষারোপ করে (বা না করে) দীর্ঘ বারো মাসের অর্থনৈতিক দৈন্য বা মানসিক বিরহের যে বর্ণনা প্রদান করা হয় তাকে বারমাস্যা বলে। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে বারমাসির বর্ণনা রয়েছে। নায়ক বা নায়িকার অর্থনৈতিক বা প্রেম-বিরহ-বেদনা একেক মাসে একেক রূপে প্রকটিত। কোন কোন কাব্যে বারমাস্যার স্থলে চৌতিশার মধ্য দিয়ে এ বিরহ বর্ণিত হয়।

২৮. চৌতিশা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক প্রকার খণ্ড কবিতার নাম চৌতিশা। বাংলা ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের (ক-হ) প্রত্যেকটি এক বা একাধিক চরণের আদ্যবর্ণরূপে ব্যবহার করে বিভিন্ন মাস বা ঋতুতে নায়ক বা নায়িকার বিরহের বর্ণনার উদ্দেশ্যে যে পদ রচনা করা হয় তাকে চৌতিশা বলে। চৌতিশা অর্থ বিলাপ। নায়ক-নায়িকার বিরহের বর্ণনা বারোমাসিতে বর্ণিত হয়, কোন কোন কাব্যে তা চৌতিশায় বর্ণিত হয়। যেমন- 'লায়লী-মজনু' কাব্যে বারোমাসির পরিবর্তে চৌতিশার মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার বিরহ ও কষ্টের বর্ণনা করা হয়েছে।

২৯. বাইশা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তার জন্য বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করে যে পদসংকলন করা হয়েছিল তা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশা নামে প্রচলিত।

বৈষ্ণব পদাবলি

১. বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মৌলিক পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলির সমসাময়িক কবি। কিন্তু উভয়ের পদের ভাব, ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, রীতি ও পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভায় বসে রাধার রূপ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস নিভৃত পল্লিতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে সহজ ও সরলভাবে রাধার বিরহ বেদনার মূর্তি অঙ্কন করেছেন। চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাবের গভীরতা বেশি। বিদ্যাপতির পদে ভাষার চাতুর্য, ছন্দ বিন্যাস অধিক। বিদ্যাপতি উচ্ছ্বসিত ও স্পন্দিত মহাসমুদ্রের উপরিভাগের মত উর্মিচঞ্চল, চণ্ডীদাস সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় গভীরতায় স্তব্ধ। বিদ্যাপতির কাব্য যেন দেহ, আর চণ্ডীদাসের কাব্য যেন প্রাণ। একে অপরকে অবলম্বন করে আছে। একে অপরের পরিপূরকও বলা যায়। বিদ্যাপতির রাধা যেখানে শেষ, চণ্ডীদাসের রাধার সেখান থেকে শুরু। বিদ্যাপতি সৌন্দর্যপিয়াসী শিল্পীর মুগ্ধ

দৃষ্টিতে লীলাময়ী রাধাকে দেখেছেন, চণ্ডীদাস সাধকের গভীরতা ও তন্ময়তা নিয়ে যোগমগ্না রাধাকে এঁকেছেন। অন্যদিকে দুজনের তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি।'

২. বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪১তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা হলো বৈষ্ণব পদাবলি। এ পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকদের কাছে সাধন সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলির মূল উপজীব্য প্রেম এবং তার আশ্রয় রাধা ও কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মাহাত্ম্যসূচক পদের সমষ্টি বৈষ্ণব পদাবলি। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ক্রমবিকাশের ধারাকে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, কলহন্তরিতা, মাথুর, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেছেন। কীর্তনগানের আসরে এই সমস্ত পর্যায়ের কোন একটিকে গ্রহণ করে পালা হিসাবে গাওয়া হয়। বৈষ্ণব পদাবলি মূলত লেখা হয়েছিল- কীর্তনগানের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে জনমানসে ছড়িয়ে দিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হলেও পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেও চৈতন্যভক্তগণ অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। এগুলোকে 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' পদ বলা হয়। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও একপ্রকার বৈষ্ণব পদাবলি। বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমের দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

"এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাঙলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপারের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নতুন।"

৩. ব্রজবুলি কী ? *[৩৬তম বিসিএস]*

উত্তর : উত্তর বিহারের তিরহুত জেলা ও দক্ষিণ নেপালের জনকপুর মিলে প্রাচীন এক রাজ্যের নাম 'বিদেহ'। তার রাজধানী ছিল 'মিথিলা'। সে রাজ্যের সভাকবি ছিলেন বিদ্যাপতি। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভাবন করেন। মৈথিলী ও সংস্কৃত ভাষার একটা মেলবন্ধনে তিনি কবিতা লিখতেন। সে ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ, সনাথ-ব্রজমণ্ডলের লীলা বিবৃত হত বলে সে ভাষার নাম দেয়া হল ব্রজবুলি। বাংলা ব্রজবুলি এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা বা উপভাষা। এ ভাষা কখনো মুখের ভাষা ছিল না। সাহিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্র এর ব্যবহারও নেই। বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।

CamScanner

জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ, রায়শেখর প্রমুখ কবিগণের রচিত ব্রজবুলি পদ রয়েছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই শেষবারের মতো এই ভাষায় কাব্যচর্চা করে গিয়েছেন। কাদম্বরী দেবীর অনুরোধে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর লেখাগুলো 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' নামে প্রচার করেন।

৪. বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন। *[৩৫তম]*

উত্তর : বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা। তিনি অবাঙালি কবি হয়েও বাঙালি সমাজে অসামান্য সমাদর লাভ করেছেন। তিনি মিথিলার অর্থাৎ উত্তর বিহারের অধিবাসী অথচ বাঙালিরা প্রথমেই তাঁর পদ সংগ্রহ করে তাঁর কবি কর্মের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন। বিদ্যাপতি সৌন্দর্যপিয়াসী শিল্পীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে লীলাময়ী রাধাকে দেখেছেন। তার পদের ভাব, ভাষা, চিত্ররূপ, অলংকার ও ছন্দ পরবর্তীকালে অনেক কবিকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই বিদ্যাপতি সঙ্গে নিজেদের অন্তরের একটা নিগূঢ় যোগসূত্র কল্পনা করে তাঁর পদাবলির মাধুর্যকে আস্বাদন করেছেন। এটাই তার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' বৈষ্ণব পদাবলি অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এর বিখ্যাত পদ-

'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান! মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট, রক্ত কমল কর...।'

৫. 'চণ্ডীদাস সমস্যা' কী? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস' নামে অন্তত চারজন কবির কাব্য পাওয়া যায়। এরা হলেন বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস। এই চারটি নাম একজনের নাকি পৃথক তা নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নামে পরিচিত। প্রথমে সমস্ত পদই পদাবলির চণ্ডীদাসের রচিত বলে মনে করা হতো। কিন্তু বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করলে এটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর পদাবলির ভাব ও ভাষার এতো বেশি পার্থক্য যে একই কবির রচনা বলে কেউ মেনে নিতে চাননি। তাছাড়া এই কাব্যের ভণিতায় বড়ু চন্দীদাস ও অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নামের প্রয়োগ সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভনে।' পদের মাধ্যমে দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে আরেকজন চণ্ডীদাস পাওয়া যায়। তাছাড়া মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাস নামে আরেকজন চণ্ডীদাসের পক্ষে তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ১. চণ্ডীদাস (পদাবলির) ২. বড়ু চণ্ডীদাস ৩. দ্বিজ চণ্ডীদাস ও ৪. দীন চণ্ডীদাস-এই চার জন ভিন্ন ভিন্ন চণ্ডীদাস রয়েছে।

CamScanner

৬. বৈষ্ণব পদাবলির তিনজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বিখ্যাত চারজন বৈষ্ণব পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। *[৩২তম]*
অথবা, দু'জন বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিন। *[৩০তম, ২৫তম বিসিএস]*

উত্তর : চতুর্দশ শতকের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও ষোড়শ শতকের গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসকে বৈষ্ণব পদাবলি বা পদাবলি সাহিত্যের চতুষ্টয় বলা হয়।

বিদ্যাপতি ঠাকুর বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা, প্রথম অবাঙালি কবি। তাঁরা বংশ পরম্পরায় মিথিলার উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। মিথিলার রাজা কীর্তি সিংহ তাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি মিথিলার কোকিল, অভিনব জয়দেব নামেও খ্যাত। রাজা শিবসিংহ তাকে 'কবি কণ্ঠহার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পদাবলির চণ্ডীদাস একজন বাঙালি কবি। তিনি চৈতন্য-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলি রচয়িতা হিসেবে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। চৈতন্যের জন্মের আগে থেকেই চণ্ডীদাসের নামোল্লেখিত বহু গীতিপদ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। চৈতন্য নিজে তার পদ আস্বাদন করতেন।

স্বভাব কবি গোবিন্দদাস বৈষ্ণব পদকর্তা। তিনি প্রথম জীবনে শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে বৈষ্ণবগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের কাছ থেকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি বিদ্যাপতির মতো ব্রজবুলি ভাষায় অলঙ্কার সমৃদ্ধ পদ রচনা করায় তাকে 'বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য' বলা হয়। তার রচিত পদাবলি ধর্মীয় তত্ত্ব ও কাব্যিক রসসিদ্ধির সুসামঞ্জস্য সমাহারে পরিপূর্ণ।

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ শাখার একজন বৈষ্ণব। তিনি বৈষ্ণবপদাবলির প্রায় সমস্ত পর্যায়েরই পদ রচনা করেছেন। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দবিষয়ক বেশ কিছু পদ তার নামে পাওয়া যায়। তার রোমান্টিক কবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদরচনার মধ্যে দিয়ে। শব্দ ব্যবহার ও ভাষাভঙ্গি একই রকম বলে তাকে চণ্ডীদাসের অনুসারী বলা হয়।

৭. বৈষ্ণব পদাবলি কী? এগুলো কোন শতাব্দীর রচনা? *[২৯তম বিসিএস]*
অথবা, পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়।

উত্তর : লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'গীতগোবিন্দ' পদাবলি ধারার সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। পদ বলতে আগে দুই ছত্রের গান বা গানের দুই ছত্র বোঝাতো। পরবর্তী সময়ে পদ বা পদাবলি বলতে বৈষ্ণব কবিতাকে বুঝায়। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণির ধর্মীয় সঙ্গীতই বৈষ্ণব পদাবলি। এ পদাবলির প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে রাধা-কৃষ্ণের বর্ণনায় মানবিক আবেদন ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের সূচনা হয় চতুর্দশ শতকে, বিকাশ ঘটে ষোড়শ শতকে এবং

©Nazmus Sadat
CamScanner

আঠার শতক পর্যন্ত রচিত হয়। শুধু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারীরাই বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন নি, অনেক মুসলমান লেখকও বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন। এ পদাবলির প্রথম সংকলক বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলন করেন। এতে প্রায় পনের হাজার কবিতা ছিল।

৮. বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাস লিখুন।

উত্তর : শ্রী চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে ভাব বিপ্লবকে কেন্দ্র করে মূলত পদাবলির জন্ম। তবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের শুরু এবং তা থেমেছে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি'তে। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাসকে মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে-

প্রথম স্তর চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলি। এ স্তরের পদাবলি মূলত প্রেমের কবিতা। এগুলি মধ্যযুগের গীতকবিতা। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

দ্বিতীয় স্তরে আছে চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলি। এ স্তরের পদাবলিতে চৈতন্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন। সে কবিতা হল সজীব, সরল। এ সময়ের কবি রামানন্দ বসু, নরহরি, বাসু ঘোষ।

তৃতীয় স্তর চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি। এ কবিতা প্রেমভক্তির কবিতা। এ স্তরের কবি জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস।

বৈষ্ণব পদাবলির মূল বিষয় রাধাকৃষ্ণরের প্রেম। তার সঙ্গে মিলল গৌরাঙ্গ চরিত ও মহিমা। মধুর রসের সঙ্গে বাৎসল্যরস ও সখ্যরসও যোগ হল। ভাব ও ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়।

৯. বৈষ্ণব পদাবলির আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বৈষ্ণব আন্দোলনের উত্থান-পতনের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যও সম্পৃক্ত। বিষয় ভিত্তিতে বৈষ্ণবপদগুলি চার ভাগে বিভক্ত: গৌরলীলা, ভজন, রাধাকৃষ্ণলীলা ও রাগাত্মিকা। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভগবানের মাধুর্যের সংবাদ। ভগবানের প্রেম হৃদয়ে লাভ করতে পারলেই মানুষ যথার্থ আনন্দিত হতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মার এবং রাধাকে জীবাত্মার প্রতীকে বৈষ্ণবেরা এ প্রেম ব্যক্ত করেছেন। বৈষ্ণবদের মতে প্রভুর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে ভক্তি দিয়ে। প্রেম সহযোগে ভক্তির সাথে ভজনা করে কৃষ্ণের চরণে তন্ময় আত্মসমর্পণ করতে পারলেই জীব মায়ামুক্ত হতে পারে। শ্রদ্ধাভক্তি সাধনায় চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হলে উদয় হয় প্রেমের। প্রথমেই এ কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণতা পায় না। স্তর অতিক্রম করে করেই প্রেম পূর্ণতা পায়। রাধা-কৃষ্ণের লীলার মধ্যে প্রেম বা ভক্তির এরূপ ধারাবাহিক পূর্ণতাই প্রস্ফুটিত।

©Nazmus Sadat
CamScanner

১০. গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : গীতিকবিতা বলতে গান ও কবিতার সংমিশ্রণ বুঝায়। আধুনিক দৃষ্টিতে কবির ব্যক্তিগত অনভূতি যখন সংগীতমুখর ছন্দে ও সুললিত শব্দে বাণীবদ্ধ হয়, তখন তা গীতিকবিতা হয়। বৈষ্ণব পদাবলির কবিরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রতীকে ভক্ত-ভগবানের প্রেমরূপী পদ রচনা করেন। কবিদের বৈষ্ণব তত্ত্বের অনুশাসন মেনে চলতে হয় বলে স্বাধীন কল্পনার অবকাশ নেই। আধুনিক গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধর্মমূলক কবিতা গীতিকবিতা না হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু ধর্মের আবেদনকে পশ্চাতে ফেলে কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা আকুলতা স্পষ্ট হলে তাকে গীতিকবিতাই বলা হয়। তবে গীতিকবিতার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য থাকে; বৈষ্ণব কবিতা রচিত হয়েছিল মূলত কীর্তনের জন্য। বৈষ্ণব পদাবলি ভাবের দিক থেকে গীতিকবিতা ঠিকই, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে একে গীতিকবিতা বলা সমীচীন নয়। তবে কিছু ত্রুটি বাদ দিলে সার্বিক বিচারে বৈষ্ণব পদাবলিকে সীমিত অর্থে গীতিকবিতা বলা যায়।

১১. বৈষ্ণব পদাবলির মানবিক আবেদন লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর : বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধা ও কৃষ্ণকে ভক্ত ও ভগবান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পদাবলিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের মাধ্যমে বৈষ্ণব কবিরা চিরন্তন মানব-মানবীর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বিরহমিলনসহ হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র চিত্রকে তুলে ধরেছেন। কবিরা বাস্তব জগতের প্রেমিক-প্রেমিকাদের অভিজ্ঞতা থেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমমূর্তি এঁকেছেন। তাদের নর-নারী মনে করলেও তাদের প্রেমের মহিমা কোন অংশে হ্রাস পায় না। পদাবলির কাব্যরূপ বিচার করলে দেখা যায়- এ কাব্যে মানব মহিমাই উজ্জ্বল। বৈষ্ণব পদকর্তারা যা-ই বলুন না কেন, তারা তো মর্ত্যেরই মানুষ। তারা যে প্রেমছবি এঁকেছেন তা স্বর্গে বসে বা স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা থেকে আঁকেন নি। তাদের যা যা ধারণা সবই মর্ত্যেরই প্রতিকৃতি। তবে একথা ঠিক যে তাদের কলমের আঁচড়ে মানব প্রেম রূপ থেকে অপরূপে পৌঁছেছে। আর এও ঠিক যে পদাবলি ধর্মাশ্রিত রচনা হলেও বৈষ্ণব পদাবলির চিরন্তন মানবিক আবেদন অনস্বীকার্য।

১২. বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পগুণ/সাহিত্যগুণ/কাব্যগুণ নির্ণয় করুন।

উত্তর : বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান উপজীব্য প্রেম। ধর্ম সংগীত হিসেবে বিবেচনা করলেও এর মধ্যে অপূর্ব শিল্পরূপ ও সাহিত্যগুণ রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলির একটি প্রধান গুণ গীতিময়তা। গীতিপ্রবণতার সাথে রোমান্টিকতার অপূর্ব সমন্বয় পদাবলির কাব্যমূল্য অধিকতর বৃদ্ধি করেছে। পদাবলিতে ব্যবহৃত মৈথিলী ও বাংলা শব্দের মিশ্রণে ভাষার ধ্বনি ঝঙ্কার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যমুনা পুলীন, কদম্বতল, তমালের ঘনছায়া, আবৃতকুঞ্জ কানন, নানা রকম লুকোচুরি

©Nazmus Sadat
CamScanner

ইত্যাদির মাধ্যমে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। পদাবলির ভাষা কোথাও কোথাও আধুনিক গীতিকবিতার ভাষাকেও অতিক্রম করেছে। পদাবলিতে সাধারণত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর মাত্রার সংমিশ্রণ এবং ছড়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যকে অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, চিত্রকল্পে পদাবলি শুধু মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক কাব্য আসরেও অতুলনীয়। আধুনিক কাব্য গানে পদাবলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

১৩. পদাবলি সাহিত্যের চতুষ্টয় বলা হয় কাদেরকে?

উত্তর : চতুর্দশ শতকের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস (বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম বাঙালি কবি) ও ষোড়শ শতকের গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাসকে পদাবলি সাহিত্যের চতুষ্টয় বলা হয়। পদাবলি সাহিত্যে এদের স্বতন্ত্র অবস্থান বিদ্যমান। তাদের প্রেমভক্তির লিরিক কবিতায় মহিমা দিয়েছে। তাদের পদের ভাষা ব্যবহারেও রয়েছে বৈচিত্র্য। অঞ্চলভেদে এরা প্রত্যেকেই পদাবলির নিজস্ব ঘরানার ভাষা ব্যবহার করেন। ফলে তাদের পদগুলি প্রায় সাড়ে চারশত বছর আগে রচিত হলেও ভাষা ব্যবহারে একবারেই আধুনিক কালের পরিচয় বহন করে। চণ্ডীদাসের পদ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। যেমন-

'পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বান্ধিব ঘর। পিরীতি পরশি পিরীতি প্রিয়সী অন্য সকলি পর।'

১৪. বিদ্যাপতি কিভাবে বাংলার কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন?

উত্তর : বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা এবং প্রথম অবাঙালি কবি বিদ্যাপতি। বর্তমান উত্তর বিহারের তিরহুত জেলা ও দক্ষিণ নেপালের জনকপুর মিলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য 'বিদেহ'। বিদেহ রাজ্যের রাজধানী মিথিলার পঞ্চদশ শতকের কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর। তাঁরা বংশ পরম্পরায় মিথিলার উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। তৎকালে মিথিলা ছিল শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র। বাংলার ছেলেরা বিদ্যার্জনের জন্য মিথিলা যেত। আর বুক ভরে নিয়ে আসত বিদ্যাপতির কবিতা। এভাবে তিনি বাংলায় এক পঙক্তি না লিখেও বাংলার কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর কবিখ্যাতি মূলত 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক পদ (পদাবলি)-এর জন্য। তবে তিনি মৈথিলী, অবহটঠ ও সংস্কৃত ভাষায়ও পদ রচনা করেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। তার বিখ্যাত পঙক্তি-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥

CamScanner

১৫. আধুনিক কবিদের মধ্যে কোন কবি পদাবলি রচনা করেছেন?

উত্তর : আধুনিক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদাবলি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও প্রথম যৌবনে 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষায় কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতাগুলিই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত পদ-

'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'।

এছাড়া বৈষ্ণব পদাবলির ভাব ভাষা মাধুর্যের চরম উৎকর্ষের প্রভাব দেখা যায় 'সোনার তরী' কাব্যের বহু কবিতায়। পদাবলি সাহিত্যের প্রেম সৌন্দর্যের শাশ্বত রহস্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন এই কাব্যে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্য কবিতার কথা, তাঁদের চিন্তাভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথের মাথায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারে বারে। বর্ষার বিচিত্র ঋতু প্রকৃতির সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার যে গভীর সম্পর্ক তা তিনি স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতার মধ্যে ধরা পড়ে কবির বৈষ্ণবীয় মনস্তত্ত্ব-

বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলি।
সুর করে বার বার পড়ি বর্ষা-অভিসার
অন্ধকার যমুনার তীর

জীবনী সাহিত্য

১. শ্রীচৈতন্য দেব কে? বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্বের কারণ ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম]*
অথবা, বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। *[৩৫তম]*
অথবা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যদেব কেন স্মরণীয়? *[২৯তম]*

উত্তর : ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক শ্রী চৈতন্যদেব। তিনি ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের দত্তরাইল গ্রাম। তার প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর, নিম গাছের নিচে জন্ম বলে ডাকনাম ছিল 'নিমাই'। তবে গায়ের রং গৌরবর্ণ ছিল বলে সবাই 'গৌরাঙ্গ' বা সংক্ষেপে গোরা বলে ডাকত। ১৫৩৩ সালে পুরীতে (বর্তমান ওড়িশা) মারা যান।

শ্রী চৈতন্যদেব বাংলা সাহিত্যে একটি পঙক্তি না লিখেও তিনি একটি যুগের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আবির্ভাবের ফলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, তা বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে প্রভাবিত করে। চৈতন্য সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের দু'টি উপধারা বিদ্যমান- পদাবলি সাহিত্য বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ এবং চৈতন্যজীবনী সাহিত্য। পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায় মঙ্গলকাব্যে, অনুবাদ সাহিত্যে, শাক্ত পদাবলি ও লোকসাহিত্যে।

CamScanner

চৈতন্য প্রভাবে পদাবলি সাহিত্যে এক সূক্ষ্মতর পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাক-চৈতন্যযুগে মানব-মানবীর পার্থিব প্রেমই ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলির মূল ভিত্তি। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী পার্থিব মানব-মানবীর প্রেম পরিণত হয় অপার্থিক রাধাকৃষ্ণ লীলায়। চৈতন্য দেবের চরিত্রকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনীসাহিত্য গড়ে ওঠে। প্রাক-চৈতন্য যুগে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর চরিত্রগত সংকীর্ণতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা চৈতন্যোত্তর পর্বে অনেকটাই হ্রাস পেয়ে এক স্নিগ্ধ দৈব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকসংগীতেও চৈতন্যদেবের জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট। মৈমনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তুতে চৈতন্যদেবের সমন্বয়বাদ ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

২. জীবনী সাহিত্য বলতে কি বুঝেন? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : কোন ক্ষণজন্মা মহৎ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য নির্মিত হয়, তাকে জীবনী সাহিত্য বলে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনী সাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্য ধারার সূচনা হয়। বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রী চৈতন্যদেব এবং তাঁর কয়েকজন ভাব শিষ্যের জীবনকাহিনি নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে 'কড়চা' বলা হয়। কড়চা শব্দের অর্থ ডায়েরি বা দিনলিপি। চৈতন্যদেবের জীবনী প্রথম রচিত হয় সংস্কৃত ভাষায়। এটি রচনা করেন মুরারি গুপ্ত, যার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলে অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনী বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। কাব্যটিতে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক চৈতন্যদেবের জীবনকে ভক্তি মিশ্রিত করে চিত্রিত করা হয়েছে বলে এটি ভাগবত হিসেবে বিবেচ্য।

৩. ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : শ্রীচৈতন্য দেব একজন বাঙালি হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে তিনি এদেশে হিন্দু-সমাজে যে নব চেতনার সঞ্চার করেছিলেন তার প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিচিত্রমুখী বিকাশ ছাড়াও সাহিত্যের অপরাপর শাখায় যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলে হিন্দু সমাজে ভাঙন ধরে। ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিম্নবিত্ত হিন্দুরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। চৈতন্যদেব সে ভাঙন রোধ করার জন্য প্রেমধর্মের প্রচার করেন এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে বৈষ্ণব ধর্মের ছায়াতলে একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্ম, প্রেমকথা বাঙালির জীবন চেতনায় অভূতপূর্ব আনন্দ ও জাগরণ এনে দিল। ফলে বাঙালি হিন্দুদের আচারসর্বস্ব দেবদেবী নির্ভর সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

CamScanner

নাথ সাহিত্য ও মর্সিয়া সাহিত্য

১. নাথ সাহিত্য কাকে বলে? এ সাহিত্যের প্রধান কবি কে? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে নাথ সাহিত্য। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে শৈব ধর্মের মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক ধর্মমতের নাম হচ্ছে নাথ ধর্ম। নাথ ধর্মের সাধনতত্ত্ব ও প্রাসঙ্গিক গল্প কাহিনি অবলম্বনে রচিত সাহিত্যই নাথ সাহিত্য। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের নানা লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনি মিলে নাথ সাহিত্য গড়ে ওঠে। এতে সিদ্ধাচার্যদের জীবনের অলৌকিক কাহিনি থাকলেও পরবর্তীতে এ সাহিত্য সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে মানবিক আবেদনের ফলে সকল সম্প্রদায়ের কাছেই সমাদৃত হয়। দশম থেকে একাদশ শতক নাথ আচার্যদের আবির্ভাবকাল মনে করা হয়। এ সময়েই নাথসাহিত্যের বিকাশ ঘটে। নাথসাহিত্যের উপজীব্য মূলত দেহের উপর আত্মার জয় ঘোষণা। সাহিত্য হিসেবে এর মূল্যমান তেমন না থাকলেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাথসাহিত্য এদেশের পাঠক-শ্রোতাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে বেশ প্রভাবিত করেছিল।

নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তার রচিত কাব্য 'গোরক্ষ বিজয়'।

২. 'গোরক্ষ বিজয়'-এর আদি কবির নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। নাথধর্মের কাহিনি অবলম্বনে শেখ ফয়জুল্লাহর রচিত উল্লেখ্যযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'গোরক্ষ বিজয়'। এতে নাথগুরুর মাহাত্ম্য ও নাথ ধর্মমতের মহত্ত্ব প্রকাশ বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য গোরক্ষ একজন রাখাল ছিলেন। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করেন।

৩. মর্সিয়া সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : 'মর্সিয়া' শব্দটি আরবী। অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবী সাহিত্যে মর্সিয়ার উদ্ভব নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরবর্তীতে কারবালার ঘটনাকে উপজীব্য করে লেখা সাহিত্য মর্সিয়া নামে আখ্যায়িত হয়। আঠারো শতকে মর্সিয়া বাংলা সাহিত্যের এক সমাদৃত শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেখ ফয়জুল্লাকে বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি মনে করা হয়। তার রচিত 'জয়নবের চৌতিশা' মর্সিয়া ধারার প্রথম কাব্য। মর্সিয়া সাহিত্য ইসলামি ভাবধারাসমৃদ্ধ হলেও সমকালীন কয়েকজন হিন্দু কবিও মুসলিম ঐতিহ্যভিত্তিক মর্সিয়া সাহিত্য রচনা করেছেন। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলো প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসেবেও গড়ে উঠে। মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি কারবালার বিষাদময় কাহিনি ভিত্তি করে হলেও তার মধ্যে আরো শোক ও বীরত্বের কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

CamScanner

৪. 'মানিক রাজার গান' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের নিকট থেকে সর্বপ্রথম গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নাথ ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত আখ্যানকাব্য ও ছড়া পাঁচালি ছাড়াও বিশুদ্ধ তত্ত্ব দর্শন সংক্রান্ত ছড়া পদও পাওয়া গেছে। যাতে কাহিনি নেই, আছে সাধন ভজনের গুঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ পদ।

অনুবাদ সাহিত্য

১. চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ সম্পর্কে লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। বাল্যসঙ্গী জয়ানন্দের সাথে চন্দ্রাবতীর প্রণয় ছিল। জয়ানন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় শোকে পাথর হয়ে যান চন্দ্রাবতী। প্রেমের স্মৃতি ভুলতে তিনি আজীবন কুমারী থেকে শিবপুজো করার সিদ্ধান্ত নেন। পিতা বংশীদাসও এই কথা মেনে নিয়ে মেয়েকে আদেশ দেন-

"শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।"

পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী 'রামায়ণ' রচনা শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রচলিত রামকাহিনী নয়। এ এক অন্য রামায়ণ, যেখানে সীতাই প্রধান, রাম এক ব্যক্তিত্বহীন পার্শ্বচরিত্রমাত্র। রাম নয়, সীতার বয়ানে বলা হয়েছে রামায়ণের গল্প। একে অনেকেই রামায়ণ না বলে 'সীতায়ন' বলেছেন। চন্দ্রাবতীর অনেক পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রচলিত রামকথার একটি বিপ্রতীপ দৃষ্টিকোণ বুনেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'।

"প্রান্তস্বর ব্রাত্য ভাবনা" গ্রন্থের 'কবি চন্দ্রাবতী: অবহেলায়, উপেক্ষায়' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক হিমেল বরকত বলছেন, *'মধুসূদনের সাড়াজাগানো এই বিদ্রোহী প্রকাশের প্রায় আড়াইশ বছর আগেই চন্দ্রাবতী ভেঙে দিয়েছেন রামায়ণের রাম-কেন্দ্রিকতার স্তম্ভ। সীতাকে কেন্দ্রে বসিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন রামায়ণের নারীবাদী পাঠ।'*

চন্দ্রাবতী ধর্মগ্রন্থ লেখেননি, এ যেন সাধারণ এক নারীর আনন্দ-বেদনার গল্প। তাই ময়মনসিংহের মেয়েরা এই রামায়ণ বিবাহবাসরে গায়, পুজাতে নয়।

২. 'ইউসুফ-জোলেখা' ও 'লাইলী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যানসমূহ কোন দেশের? *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা' মিশরীয় উপাখ্যান। গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সভাকবি শাহ মুহম্মদ সগীর এ কাব্য রচনা করেন। ফারসি কবি মোল্লা জামীর কাব্য অনুসরণে শাহ

মুহম্মদ সগীর এ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের বিষয়বস্তু ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি। তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখার সাথে আজিজ মিশরীর বিয়ে হয়। কিন্তু জোলেখা ছিল আজিজ মিশরীর ক্রীতদাস ইউসুফের প্রেমে আসক্ত। সে নানাভাবে আকৃষ্ট করেও ইউসুফকে বশীভূত করতে পারে নি। পরে এক সময় ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন এবং জোলেখার সাথে তার মিলন হয়।

পারস্যের কবি আবদুর রহমান জামী ইরানের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রচনা করেন অমর গ্রন্থ 'লায়লা ওয়া মাজনুন'। জামীর এ কাব্য অনুসরণে দৌলত উজির বাহরাম খান বাংলায় 'লাইলী মজনু' কাব্য রচনা করেন। আমির পুত্র কয়েস (মজনু) ও বণিক কন্যা লাইলী একই পাঠশালায় পড়ত। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। লোকনিন্দার ভয়ে বাবা মা লাইলীকে পাঠশালায় পাঠানো বন্ধ করে দেয়। লাইলীর বাবা জোর করে তাকে ইবনে সালামের পুত্রের সাথে বিয়ে দেয়। কিন্তু লাইলী স্বামীকে গ্রহণ করে না। একবার লাইলী সপরিবারে শ্যামদেশে ভ্রমণে যাওয়ার সময় নজদের জঙ্গলের পাশে মজনুকে দেখে এবং এটাই তাদের শেষ দেখা। কোন এক হেমন্তে মারা যায় লাইলী। মজনু তা জানার পর লাইলীর কবরের পাশে পড়ে থাকে এবং এভাবেই তার মৃত্যু হয়।

৩. 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কাব্যের মূল রচয়িতাদের নাম কী? কোন ভাষায় লেখা? *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : রামায়ণ সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাকাব্য। ঋষি বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা। এটি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত হয়। ৭ খণ্ডে বিভক্ত এবং চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত হয়েছে এ মহাকাব্য। শ্লোকগুলো ৩২ অক্ষরযুক্ত 'অনুষ্টুপ' ছন্দে রচিত। এ কাব্যের মূল উপজীব্য হল বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনি। পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করে মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা করেন। তিনিই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য মহাভারত। এটি ১৮ খণ্ডে বিভক্ত ৮৫০০০ শ্লোকে রচিত। মহাভারতের মূল উপজীব্য হল- কৌরব ও পাণ্ডবের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তিনি বেদের ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস। ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রামের পরাগল খান। পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম 'পরাগলী মহাভারত'।

CamScanner

৪. আলাওলের 'পদ্মাবতী' কোন ভাষার, কোন কবির এবং কোন গ্রন্থের অনুবাদ? *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : পদ্মাবতী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় প্রণয়কাব্য। কবি আলাওল ১৬৫১ সালে আরাকান প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর্বসেন ও রাণী চম্পাবতীর কন্যা পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর পরমপ্রিয় তোতা পাখি হীরামন। হীরামন পাখির কল্যাণে চিতোরের রাজা রত্নসেনের সাথে পদ্মাবতীর বিয়ে হয়। চিতোরের রাজসভার পণ্ডিত রাঘবসেন নির্বাসন দণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে দিল্লীর শাসক আলাউদ্দিন খিলজিকে পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা করে তাকে রত্নসেনের রাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে। আলাউদ্দিন খিলজি প্রতারণার মাধ্যমে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। তবে প্রহরীর কৌশলে রত্নসেন মুক্তি পান। এরপর রাজা দেবপালের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে রত্নসেন আহত দেবপাল নিহত হয়। এ সংকটকালে আলাউদ্দিন খিলজি চিতোর আক্রমণ করেন। এর মধ্যে রত্নসেন মারা যান। রত্নসেনের দুই স্ত্রী নাগমতী ও পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। আলাউদ্দিন চিতোর দখল করে দেখতে পান জ্বলন্ত চিতা।

৫. প্রথম কোন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করেন? *[১১তম বিসিএস]*
অথবা, চন্দ্রাবতীর পরিচয় লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। তিনি ১৫৫০ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার মাইজকাপন ইউনিয়নের পাতোয়ারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম সুলোচনা। পিতা মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কবিত্ব শক্তি লাভ করেছিলেন চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী নিজের জীবনের করুণ পরিণতির জন্য নিজেই লোককাব্যের নায়িকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর জীবনের করুণ কাহিনি একটি গাথা থেকে জানা যায়- একই গ্রামের ব্রাহ্মণ জয়ানন্দ ছিল তার সহপাঠী। শৈশব থেকে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিয়ে ঠিক হয়। এমন সময়ে জয়ানন্দ এক মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। কিছুদিন পর অনুতপ্ত হয়ে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসে; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুন্ধা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। চন্দ্রাবতীও আর বিয়ে করেন নি। পিতার আদেশে 'রামায়ণ' রচনায় হাত দেন। কিন্তু তা সমাপ্ত করার পূর্বেই তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়। চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণ মূল রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। বরং নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। এই রামায়ণে সীতার প্রতি অবিচার এবং তার মর্মবেদনা অত্যন্ত দরদের

©Nazmus Sadat
CamScanner

সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর স্বহস্তে লিখিত রামায়ণের পাণ্ডুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। তার অন্যান্য রচনা- মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা। ১৬০০ সালে কিশোরগঞ্জেই তিনি মারা যান।

৬. 'মধুমালতী' কাব্যের অনুবাদক কে? এটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : হিন্দি কবি মনঝনের মধুমালত বা সাধনের মৈনাসত কাব্যের অনুসরণে মুহম্মদ কবির 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন। রাজপুত্র মনোহর ও রাজকন্যা মধুমালতীর রূপকথাসুলভ রোম্যান্টিক প্রেম এতে বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যে ভাবানুবাদের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাতে মূল উৎস-কাব্যের ধর্মীয় ভাব বর্জন করে নিছক মানবীয় প্রেমোপাখ্যানে রূপ দেওয়া হয়েছে। মূল কাব্য অধ্যাত্ম রসাত্মক হলেও অনুবাদে তা আদি রসাত্মক কাব্যে পরিণত হয়েছে। কাব্যে বাস্তব অবাস্তব উভয় শ্রেণির কাহিনি স্থান পেয়েছে। কাব্যটি তৎকালে এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, পরবর্তী আরও ছয়জন কবি একই নামে কাব্য রচনা করেন। তবে সৈয়দ হামজা ব্যতীত অন্য কারও কাব্য শিল্পসফল হয়নি; আবার সৈয়দ হামজার কাব্যও কবিরের কাব্যের মতো সার্থক নয় বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৭. বাল্মীকির রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা। এটি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত হয়। চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত এ মহাকাব্য ৭ খণ্ডে বিভক্ত। শ্লোকগুলো ৩২ অক্ষরযুক্ত 'অনুষ্টুপ' ছন্দে রচিত। বাল্মীকির নাম ছিল দস্যু রত্নাকর। দস্যুবৃত্তি করে সে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন এক ঋষির সাথে সাক্ষাতের পর সে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে ধ্যানে মগ্ন হয়। দীর্ঘদিন একভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকলে তাঁর চারপাশে উইপোকা বাসা বাঁধে। এ থেকে তাঁর নাম হয় 'বাল্মীকি'। সংস্কৃতে উইপোকাকে বলে বল্মীক। 'বাল্মীকি' মানে উইপোকাজাত। পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করে মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা করেন। তিনিই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। তাঁর রচিত রামায়ণের অন্যনাম 'শ্রীরাম পাঞ্চালী'। রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক 'চন্দ্রাবতী' যিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।

৮. মধ্যযুগের কোন কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়।

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ সাহিত্য। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি ধারা গড়ে ওঠে যা 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে পরিচিত।

CamScanner

মধ্যযুগের কোন অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কবিরা মূল কাহিনি ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজের মনের কথা বসিয়ে দিয়েছেন। এ অনুবাদ সাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল- একই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন অনেক কবি। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হয়েছে মূলত-

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
সংস্কৃত থেকে অনবাদ		
রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ (বাল্মীকি)
মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত (বেদব্যাস)
হিন্দি থেকে অনুবাদ		
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর	মধুমালৎ (মনঝন)
মৃগাবতী	মুহম্মদ মকীম	মৃগাবত (কুতবন)
আরবি থেকে অনুবাদ		
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ইলমুস-সায়াৎ
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	কাসাসুল আম্বিয়া
ফারসি থেকে অনুবাদ		
ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (কবি জামী)
লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামী)

৯. মহাভারতের অনুবাদ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য মহাভারত। ষোল শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রামের পরাগল খান। পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম 'পরাগলী মহাভারত'। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের (প্রকৃত নাম নসরত খান) পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করেন। যার নাম 'ছুটিখানী মহাভারত'। তবে এটিকে পৃথক গ্রন্থ না বলে পরাগলী মহাভারতের পরিশিষ্ট বলা যায়। সতের শতকের কবি কাশীরাম দাস মহাভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অনুবাদক। তার রচিত মহাভারতের দুটি পঙক্তি-

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস ভনে শোনে পুন্যবান।'

১০. মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' বলা হয় কেন?

উত্তর : মালাধর বসু গৌড়ের কোন এক সুলতানের (অনুমান করা হয় রুকনুদ্দিন বারবক শাহ) উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করেন। তার অনূদিত কাব্যগ্রন্থটির নাম- 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। আনুমানিক ১৪৭৩ সালে

CamScanner

রচনা শুরু করেন এবং ১৪৮০ সালে শেষ করেন। ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধ অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। এ কাব্য তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব- শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা, দ্বিতীয় পর্বে- কংস বধ থেকে দ্বারকা স্থাপন লীলা, তৃতীয় পর্বে- শ্রীকৃষ্ণের অসুর বধ, বিবাহ, বানাসুর দমন। এই কাব্যের অপর নাম ছিল গোবিন্দমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করে তিনি গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন। কবির নিজের লেখায় পাওয়া যায়-

'গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।'

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

১. **রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক? *[৩৭তম বিসিএস]***
অথবা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন। *[৩৫তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বর্তমান মিয়ানমার তথা বার্মার আরাকান রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে 'রোসাঙ্গ' বা 'রোসাং' নামে উল্লেখ করা হয়। খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে আরাকান ও চট্টগ্রামে একই সময়ে ইসলামের প্রসার ঘটে। সে কারণেই মূলত এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরির সূত্রে রোসাঙ্গে বসবাসরত বাঙালিদের একটি পৃথক সমাজ গড়ে উঠে। যোগ্যতার বিচারে মুসলমানরা এ রাজ্যে অমাত্য, সমরসচিব, কাজী প্রভৃতি উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করে। সমসাময়িককালে বঙ্গ-ভূভাগে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সুফী মতালম্বী। তখন থেকেই আরাকান রাজসভায় বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। আরাকান রাজসভায় যে সকল কবি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মহাকবি আলাওল, আবদুল করীম খোন্দকার প্রমুখ। তাঁরা আরবি-ফারসি কিংবা হিন্দী থেকে উপকরণ গ্রহণ করলেও মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

©Nazmus Sadat
CamScanner

২. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন এমন দুই জন লেখকের নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : আরকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবিগণ- দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খোন্দকার, শমশের আলী প্রমুখ।

৩. আলাওলকে 'পন্ডিত কবি' বলা হয় কেন? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : আলাওল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তার কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাব্য প্রেম সম্পর্কে আলাওলের মন্তব্য বিবেচনা করলেই তার পাণ্ডিত্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। রাগতালনামা ও গীতিপদসমূহ তার প্রথম দিকের রচনা। তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী'। নাগরিক শিক্ষা, বৈদগ্ধ ও অভিপ্রায় তার কাব্যের ভাব-ভাষা-রুচিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। দরবার-সংস্কৃতির সব লক্ষণই তার রচনায় প্রতিফলিত। কাব্যিক আবেগের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার সংমিশ্রণ থাকায় আলাওলকে 'পণ্ডিত কবি' বলা হয়।

৪. রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কী ধরনের সাহিত্য রচিত হয়? সে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : আরাকান মায়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশে অবস্থিত। বাংলায় মোগল-পাঠান সংঘর্ষের ফলে অনেক অভিজাত মুসলমান আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উচ্চপদস্থ রাজপদে নিযুক্ত হন। এদের মাধ্যমে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। আরাকান রাজসভায় চর্চিত বাংলা কাব্য সাহিত্যের দুটি বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি ধর্ম বিষয়ক, অন্যটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। আরাকান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষী কবিগণ মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যের বিপরীতে মানবীয় প্রণয়কাহিনি রচনা করে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন।

আরাকান রাজা শ্রী সুধর্মার আমলে তার সমর সচিব আশরাফ খানের তত্ত্বাবধানে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। কাছাকাছি সময়ে কবি মরদন রচনা করেন 'নসীরানামা'। প্রধানমন্ত্রীর কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। এছাড়া সমর সচিব সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে আলাওল 'সপ্তপয়কর', নবরাজ মজলিসের আদেশে 'সিকান্দারনামা', মন্ত্রী সৈয়দ মুসার আদেশে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেন। কোরেশী মাগন ঠাকুর নিজে 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের রচয়িতা। এছাড়াও আরাকান রাজসভার সভাসদের আনুকূল্যে কবি আবদুল করীম খোন্দকার 'দুল্লা মজলিস' কাব্য রচনা করেন।

CamScanner

৫. আলাওল রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[২৫তম বিসিএস]*
অথবা, আলাওলের সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি আলাওল। আরাকান রাজদরবারের প্রভাবশালী অমাত্য কোরেশী মাগন ঠাকুরের উৎসাহে তিনি কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার সাহিত্য কর্ম দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ১. অনুবাদ সাহিত্য ২. মৌলিক সাহিত্য

ধরন	গ্রন্থ	উৎস	পৃষ্ঠপোষক
অনুবাদ সাহিত্য	পদ্মাবতী	হিন্দি পদুমাবত	কোরেশী মাগন ঠাকুর
	তোহফা	ফারসী তুহ্ফ-ই নসাঈহ	শ্রীমন্ত সোলেমান
	সপ্তপয়কর	ফারসী হপ্তপয়কর	সৈয়দ মুহম্মদ খান
	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল	ফারসী সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল	মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুসা
	সিকান্দারনামা	সিকান্দারনামা	নবরাজ মজলিস
মৌলিক	রত্তনকলিকা আনন্দবর্মা	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানীর পরিশিষ্ট	শ্রীমন্ত সোলেমান
	রাগতালনামা	সঙ্গীত বিষয়ক কাব্য	
	পদাবলি		

৬. দৌলত কাজী কোন কাব্যের জন্য বিখ্যাত? *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। তিনি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের জন্য বিখ্যাত। আরাকান রাজ শ্রী সুধর্মার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আশরাফ খাঁর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির তৃতীয় অংশ রচনাকালে দৌলত কাজীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর কবি আলাওল এর বাকী অংশ রচনা (১৬৫৯) করেন।

দৌলত কাজী লৌকিক ধারার প্রথম কবি। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' রচনার মাধ্যমে তিনিই মানুষকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এর আগে দেবদেবীই সাহিত্যে প্রধান ছিল।

৭. 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? কাব্যটি কোন ভাষা থেকে অনূদিত? *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : 'তোহফা' আলাওলের নীতিকাব্য। এটি আলাওলের পঞ্চম গ্রন্থ। বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভী রচিত ফারসী গ্রন্থ 'তুহ্ফ-ই নসাঈহ' এর ভাবানুবাদ। ১৬৬৪ সালে আরাকান রাজদরবারের প্রধান অমাত্য শ্রীমন্ত সোলেমানের অনুরোধে এটি অনুবাদ করেন। 'তোহফা' মানে উপহার। এতে রয়েছে হিতোপদেশ-

CamScanner

তত্ত্বোপদেশ। সংখ্যা-সংকেত থেকে অনুমিত হয় আলাওল ২৭৮ বছর পর এটি বাংলায় ভাবানুবাদ করেন। এতে রয়েছে হাম্‌দ, নাত, ঈমান, গোর সওয়াল, বিদ্যাশিক্ষা। 'তোহফা'র সপ্তম অধ্যায়ে 'জাকাতের ফজিলত' সম্পর্কে বলা হয়েছে-

'জাকাত না দেয় যে বা না করে নামায
না পাইব রত্ন টুঙ্গী বেহেস্তের মাঝ ॥
খয়রাত করিব যে পবিত্র নিজ ধনে
পরিতে জাকাত ধন না লৈব সুজনে ॥'

৮. দৌলত কাজীকে লৌকিক ধারার প্রথম কবি বলা হয় কেন?

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যখন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে মুখরিত হয়েছিল তখন আরাকানের রাজসভার কবি দৌলত কাজী আরাকান রাজ শ্রী সুধর্মার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আশরাফ খাঁর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য, ধর্মীয় শাস্ত্রকথাই বেশি গুরুত্ব পেত। মানুষের কাহিনি অবলম্বনে কাব্যরচনার কোন প্রয়াসই তখন পরিলক্ষিত হয়নি। মধ্যযুগের ধর্ম সংস্কারমুক্ত লৌকিক কাব্য রচনার প্রথম প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিরাই। আর এই ধারার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে আরাকানে অবস্থানরত কবিদের মাধ্যমে। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দৌলত কাজী। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনার মাধ্যমে তিনিই প্রথম মানুষকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এ জন্যই তাকে লৌকিক ধারার প্রথম কবি বলা হয়।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

১. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*
অথবা, মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লিপিবদ্ধ করুন। *[৪০তম, ৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি রূপায়িত হওয়ায় সাহিত্যে বাস্তববোধের সূত্রপাত ঘটেছে। মানব চেতনার মর্মস্পন্দন, মুক্তিবিলাস, স্বচ্ছন্দগতি ও মর্মলীলা আছে বলেই এগুলো একান্তভাবে মানবকাব্য নয়, রোমান্টিক কাব্য।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেম। প্রেমের উৎস নায়ক-নায়িকার অসামান্য রূপ ও গুণ। ভারতের ও পারস্যের সুফি কবিগণ লৌকিক প্রেমকাব্যকে আধ্যাত্মিকতার জগতে নিয়ে গেছেন। বাঙালি কবিগণ অনুবাদকালে তাদেরই অধ্যাত্ম প্রেমকাব্যকে যথাসম্ভব লৌকিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

CamScanner

এ কাব্যে নর-নারীর অঙ্গরূপ ও অঙ্গসজ্জার বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনি বারমাসীর ঋতু বর্ণনায় প্রাকৃতিক রূপচিত্র আছে। তাছাড়াও রয়েছে জীবন ও জগৎ থেকে উপমা, রূপক, প্রতীকের ব্যবহার। সৌন্দর্যপিপাসু কবিমানসের পরিচয় কাব্যদেহে ছড়িয়ে আছে।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের নায়ক-নায়িকারা সাধারণত যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বচালনা, অস্ত্র চালনাসহ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকে। অধিকাংশ নায়ক সামন্তপতি। স্বপ্নে বা লোকমুখে দয়িতের কথা শুনে তার সন্ধানে অভিযাত্রা করেন।

প্রত্যেক কাব্যেই কিছু অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অবাস্তব ঘটনা বা বিষয় আছে। লৌকিক জ্ঞানে তার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না, তবে এ অলৌকিকতা মানবিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

২. রোমাঞ্চধারার একজন মুসলিম কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩৬তম]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য 'ইউসুফ-জুলেখা'। গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ-এর সভাকবি শাহ মুহম্মদ সগীর এ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং ছোট ছোট ঘটনায় বিভক্ত। ইউসুফ জুলেখার কাহিনি পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত আছে। এ ঘটনা অবলম্বনে ইরানের কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসী ও মোল্লা আবদুর রহমান জামী 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন। মোল্লা জামীর কাব্য অনুসরনে শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের বিষয়বস্তু ইউসুফ ও জুলেখার প্রণয়কাহিনি। তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখার সাথে আজিজ মিশরীর বিয়ে হয়। কিন্তু জুলেখা ছিল আজিজ মিশরীর ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি আসক্ত। সে নানাভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেও ইউসুফকে বশীভূত করতে পারে নি। পরে এক সময় ইউসুফ মিশরের অধিপতি হন এবং জুলেখার সাথে তার মিলন হয়। শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও মধ্যযুগের অনেক কবি এই নামে কাব্য রচনা করেছেন।

৩. 'লায়লী মজনু' কাব্যের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যের নাম কী? *[১০তম বিসিএস]*
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে 'লাইলী মজনু' কাব্যের সার্থকতা লিখুন।

উত্তর : পারস্যের কবি আবদুর রহমান মোল্লা জামীর কাব্য 'লায়লা ওয়া মাজনুন'। জামীর এ কাব্য অনুসরণে ১৫৬০-৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দৌলত উজির বাহরাম খান বাংলায় 'লাইলী মজনু' কাব্য রচনা করেন। আমির পুত্র কয়েস (মজনু) ও বণিক কন্যা লাইলী একই পাঠশালায় পড়ত। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের প্রেমের কথা সবাই জেনে গেলে লোকনিন্দার ভয়ে বাবা মা লাইলীকে পাঠশালায় পাঠানো বন্ধ করে দেয়। বিরহে কাতর কয়েস ভিখারীর ছদ্মবেশে

লাইলীকে দেখতে যায়। লাইলীর বাবা বুঝতে পেরে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। একপর্যায়ে কয়েস মজনু (পাগল) হয়ে গৃহত্যাগ করে। এদিকে লাইলীর বাবা তাকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দিলে লাইলী স্বামীকে গ্রহণ করে না। একবার লাইলী শ্যামদেশে ভ্রমণকালে নজদের জঙ্গলের পাশে মজনুকে দেখে এবং এটাই তাদের শেষ দেখা। বিরহে কাতর লাইলী কোন এক হেমন্তে মারা যায়। মজনু তা জানার পর লাইলীর কবরের পাশে পড়ে থাকে এবং এভাবেই তার মৃত্যু হয়। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কেন্দ্রীয় বিষয় মানবপ্রেম। সেই বিবেচনায় 'লাইলী মজনু' সার্থক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

৪. রচয়িতার নামসহ পাঁচটি রোমাঞ্চমূলক প্রণয়োপাখ্যানের নাম লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

রচয়িতার নামসহ মধ্যযুগের তিনটি রোমান্টিক কাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেন তাই 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামে পরিচিত।

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হলো-

কাব্য	কবি	সময় কাল
ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহাম্মদ সগীর	পনের শতক
লাইলি মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	ষোড়শ শতক
মধুমালতী	মুহাম্মদ কবির	ষোড়শ শতক
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	ষোড়শ শতক
সতীময়না- লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	সতের শতক
পদ্মাবতী	আলাওল	সতের শতক
চন্দ্রাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর	সতের শতক
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	সতের শতক

৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কে? *[২৫তম বিসিএস]*

অথবা, 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা কে ছিলেন? *[১০তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি আনুমানিক ১৪ থেকে ১৫ শতকের কবি। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআন ও ফারসি কাব্য থেকে এর উপজীব্য নিয়ে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন। কাব্যে ধর্মীয় পটভূমি

CamScanner

থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান। সে যুগে দেশি ভাষার রসনির্ভর ধর্মকাহিনি রচনা করার মধ্যে কবি সাহসের পরিচয় দেন। ইউসুফ-জুলেখার কাহিনি কবি ফেরদৌসী ও জামির অনুসরণে কল্পিত হলেও তাতে বাঙালি-জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় প্রণয়োপাখ্যানটি বোধগম্য করা এবং বাস্তবতা বর্জিত পুঁথিসাহিত্য থেকে পাঠককে প্রকৃত সাহিত্য রসে ফিরিয়ে আনা। শাহ মোহাম্মদ সগীর রসপ্রধান সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে যে যুগের উন্মোচন করেছিলেন পরবর্তীতে তা অনেকেই অনুকরণ করেন।

৬. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম কী? *[১০তম বিসিএস]*
আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগের কবি আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী'। আরাকান রাজসভার প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করেন। এ কাব্যের দুটি প্লটের একটিতে আছে পদ্মাবতী-রত্নসেন-নাগমতীর প্রেমের রোমান্স; অপরটিতে রত্নসেন-আলাউদ্দিন-পদ্মাবতীর ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি যাতে মুখ্য হয়েছে যুদ্ধের উত্তেজনা। সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর্বসেন ও রাণী চম্পাবতীর কন্যা পদ্মাবতী। 'পদ্মাবতী জন্ম বর্ণন খণ্ড' অংশে বলা হয়েছে-

"চন্দনের বৃক্ষ তনু পৃষ্ঠে নাগ বেণী।
শেষে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্র গুণি॥
কামধনু জিনিল ঈষৎ ভুরুভঙ্গে।
কটাক্ষে হরএ প্রাণ নয়ান কুরুঙ্গে॥"

পদ্মাবতীর তোতা পাখি হীরামনের কল্যাণে চিতোরের রাজা রত্নসেনের সাথে পদ্মাবতীর বিয়ে হয়। চিতোরের রাজসভার পণ্ডিত রাঘবসেন দিল্লীর শাসক আলাউদ্দিন খিলজিকে পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা করে তাকে রত্নসেনের রাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে। আলাউদ্দিন খিলজি প্রতারণার মাধ্যমে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। তবে প্রহরীর কৌশলে রত্নসেন মুক্তি পান। আলাউদ্দিন খিলজি আবার চিতোর আক্রমণ করলে দেখেন রত্নসেন মারা গিয়েছে। রত্নসেনের দুই স্ত্রী নাগমতী ও পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। আলাউদ্দিন চিতোর গিয়ে দেখতে পান জ্বলন্ত চিতা।

আলাওলের এ কাব্যে দেখা যায়, নায়ক-নায়িকা সমাজের ওপরতলার মানুষ। নায়িকার অন্বেষণে নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান, নর-নারীর রোমান্টিক প্রেম এবং সেই প্রেম নিয়ে নায়কের সঙ্গে খলনায়কের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। আলাওল দেখালেন প্রেম ও মৈত্রীর মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের অবসান।

CamScanner

৭. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। যে কাব্যে দেব-দেবীর প্রাধান্য নেই, অলৌকিকতার ভারে ভারাক্রান্ত নয়, বরং মানব-মানবীর চিন্তাজগৎ ও প্রণয় কাহিনি নিয়ে সৃষ্ট কাব্যই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। কাব্যগুলোর বিষয়বস্তু মৌলিক নয়। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে কবিগণ রোমান্স কাব্য রচনা করেন। তাঁরা রূপক হিসেবে মানবপ্রেম কাহিনির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে এতে কাব্যে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগে যখন দেব-দেবী নির্ভর কাব্য রচিত হচ্ছিল সে সময় মুসলমান কবিগণ একের পর এক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন। বাংলার মুসলমান কবিরা ভারত ও পারস্যের সুফি কবিদের কাব্যের অনুবাদ করে এ ধারাটি গড়ে তুলেছেন। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের মাধ্যমে এ ধারার সূচনা হয় এবং আঠার শতক পর্যন্ত এ ধারার রচনা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে এ ধারার প্রভাব থাকলেও তা ঔজ্জ্বল্য পায় নি।

৮. 'পদ্মাবতী' কাব্যের প্রেম ও ভাব সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা সুফিতত্ত্ব। এ ধারা সৃষ্টির প্রেরণা এসেছিল বহিরাগত সুফি সাধকদের কাছ থেকে। আলাওল ছিলেন 'সুফি' সম্প্রদায়ভুক্ত। সুফি দর্শনের মূলকথা হল ঈশ্বরের প্রেমে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। মানুষের মধ্যে সেই অপার্থিব প্রেম জেগে উঠলে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য যে বিরহবোধ জেগে ওঠে সেই বিরহের অগ্নিতে আত্মনাশ হলেই ঈশ্বরের সঙ্গে তার পুনর্মিলন এবং সেই মিলনেই মুক্তি। আলাওল সুফি মতবাদ থেকে অর্জন করেছিলেন এক উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যার প্রভাব পড়েছে এই কাব্যের পরিণতির ক্ষেত্রে। তার কাব্যে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মৃত্যু এবং জীবন ও জগতের এই নশ্বরতার কথা থাকলেও তত্ত্বরস অপেক্ষা জীবনরসই একাব্যের মূলকথা। যে পরিবেশে কবি এ কাব্য অনুবাদ করেছেন, সেখানে তত্ত্বরস অপেক্ষা রোমান্সই বেশি উপযোগী। এই প্রণয়কথাই যে কবির লেখনীকে সরস করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে কবির আত্মবিবরণে-

" রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে।
প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ।" (আত্মপরিচয়)

আলাওল তার কাব্যে পদ্মাবতীকে আশা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে নিজের মনের মানসী করে গড়ে তুলেছেন। নারীর মনের একান্ত গোপন কথা বলার ক্ষুদ্র একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায় পদ্মাবতী চরিত্রে।

©Nazmus Sadat CamScanner

৯. 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' কাব্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' রচনা শুরু করেন। কাব্যটির ১ম ও ২য় খণ্ড রচনার পর তার জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর কবি আলাওল ৩য় খণ্ড রচনা করেন। লোরক রাজার সতী স্ত্রী ময়নাবতী। একদিন রাজা পরিষদ বর্গকে নিয়ে অরণ্যবিহারে গেলে যোগীর মাধ্যমে গোহারীর রাজকন্যা চন্দ্রানীর সন্ধান পান। লোরক রাজা গোহারী দেশে গিয়ে সন্ন্যাসীবেশে চন্দ্রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোহারীর রাজা মোহর কন্যা চন্দ্রানীসহ লোরকরাজাকে রাজ্যের সিংহাসনে বসান। লোরকরাজা তার প্রথম স্ত্রীর কথা ভুলে গিয়ে চন্দ্রানীকে নিয়ে সুখে বসবাস করেন।

আলাওল রচিত অংশে দেখা যায় স্বামী বিরহে ময়নাবতী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। এমন সময় এক বণিক ময়নার কাছে উপহার সামগ্রীসহ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রত্যাখ্যান করে। ময়নার অনুরোধে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিসলা নামের এক পাখিকে লোরকরাজার কাছে পাঠান। পাখীর মুখে ময়নাবতীর বিরহের কাহিনি শোনার পর লোরকরাজা অনুতপ্ত হন। পুত্র প্রচন্ডতপনকে রাজ্যভার অর্পণ করে সিংহাসনে বসিয়ে লোরকরাজা চন্দ্রানীসহ দেশে ফিরে এলে ময়নাবতীর সঙ্গে লোরকের পুনর্মিলন হয়। লোরক রাজার মৃত্যু হলে দুই রাণী সহমরণে চিতায় আরোহনের মধ্য দিয়ে সতীময়না লোর-চন্দ্রাণী কাব্যের সমাপ্তি ঘটে।

শায়ের ও কবিওয়ালা

১. কবিগান বলতে কী বুঝায়? চারটি বাক্যে উত্তর দিন। *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : কবিগান বলতে বুঝায় একাধিক দলের গানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা। একদল সুরে সুরে প্রশ্ন করবে তাদের বলা হয় 'চাপান'। অন্যদল সুরে সুরেই উত্তর দিবে, তাদের বলা হয় 'উতোর'। প্রত্যেক দলের নেতৃত্বে থাকেন একজন 'কবিয়াল বা সরকার'। কবিয়ালের কয়েকজন সহকারী থাকে যারা নেতার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে। সমাজ জীবনের উৎসব-আনন্দের প্রয়োজনে কবিগানের আসর বসতো। গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু।

- ✓ সজনীকান্ত দাশ তাঁর 'বাংলার কবিগান' বইতে লিখেছিলেন- 'বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন সাংগীতিক ধারার মিলনে কবিগানের জন্ম। এই ধারাগুলির নাম বহু বিচিত্র- তরজা, পাঁচালি, খেউড় আখড়াই, দাড়াঁ কবিগান, বসা কবিগান, ঢপকীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কাগীতি ইত্যাদি।'
- ✓ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে- 'এ গানের উৎপত্তিস্থল নদীয়া জেলার শান্তিপুরে।'

১৮৫৪ সালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম কবিগান সংগ্রহ করতে শুরু করেন এবং 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই কবিগানের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। একটি কবিগান-

'ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভালো কই/ঢাকার ভালো পাতাক্ষীর,
বাঁকুড়ার ভালো দই।'

২. মধ্যযুগের কোন কাব্য প্রথমে এক কবি শুরু করেন এবং পরে আর এক কবি শেষ করেন? কবি দুজনের নাম কী? *[১৭তম বিসিএস]*
অথবা, 'আমীর হামজা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগের দোভাষী পুথি সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় কাব্য 'আমীর হামজা' (১৭৯৫)। ফকির গরীবুল্লাহ 'আমীর হামজা' কাব্য রচনার মাধ্যমে পুথি সাহিত্য ধারার সূত্রপাত করেন। ফকির গরিবুল্লাহ কাব্যটি রচনা শুরু করলেও এটি শেষ করেন সৈয়দ হামজা। উল্লেখ্য পুঁথিটি ছিল ৩৪৪ পৃষ্ঠার। এর মধ্যে গরীবুল্লাহ ১২৮ পৃষ্ঠা রচনা করেন। বাকীটা সৈয়দ হামজা সমাপ্ত করেন। কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাসুল (স.)-এর পিতৃব্য আমীর হামজা। তার সঙ্গে ইরানের অধিপতি নওশেরোয়ানের বিরোধ ও যুদ্ধ এ কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্যবীর্যের পাশাপাশি প্রেমের বর্ণনা আছে। লৌকিক, অলৌকিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক বহু ঘটনা এবং প্রধান-অপ্রধান নানা চরিত্রের সমাবেশে কাহিনি পল্লবিত হয়ে আমীর হামজা মহাকাব্যতুল্য বিশালতা লাভ করেছে। ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ মুসলিমদের বীরত্বের কাহিনি শুনে এক প্রকার মানসিক সান্ত্বনা লাভ করত।

৩. দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের কয়েকজন রচয়িতার নাম লিখুন। *[১৭তম বিসিএস]*
অথবা, দোভাষী পুথি সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষপে লিখুন।

উত্তর : পুথি (বা পুঁথি) শব্দের উৎপত্তি 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে। এ অর্থে পুথি শব্দদ্বারা যে কোনো গ্রন্থকে বোঝালেও পুথি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিশেষ অর্থ বহন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়ে রচিত, বিশেষ ধরনের সাহিত্যই পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত। মধ্যযুগের শায়েরগণ বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে এক ধরনের কাব্য রচনা করতেন যা 'দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। এ সাহিত্য কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে ছাপা হতো বলে 'বটতলার পুঁথি' বলা হয়। রেভারেন্ড জে. লং-এ শ্রেণির রচনাকে 'মুসলমানি বাংলা সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন। প্রথমে এগুলিকে দোভাষী পুথি এবং পরবর্তীকালে 'মিশ্র ভাষারীতির কাব্য' বলে অভিহিত করা হয়। ফকির গরীবুল্লাহ 'আমীর হামজা'

CamScanner

কাব্য রচনার মাধ্যমে এ ধারার সূত্রপাত করেন। এছাড়া সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আব্দুর রহিম, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ মুনশী, তাজউদ্দিন, সাদ আলী, রেজাউল্লাহ প্রমুখ দোভাষী পুঁথি রচনা করেন। দোভাষী পুথিকারদের সাধারণভাবে 'শায়ের' বলা হয়।

৪. ফকির গরীবুল্লাহ রচিত দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন।/১৩তম/
অথবা, ফকির গরীবুল্লাহ কে? তার কয়েকটি কাব্যের নাম লিখুন।

উত্তর : 'দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্য'র প্রাচীনতম, শ্রেষ্ঠতম ও সার্থক কবি ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি 'আমীর হামজা' কাব্য রচনার মাধ্যমে এ ধারার সূত্রপাত করেন। কিন্তু 'আমীর হামজা' কাব্যটি তিনি জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারেন নি। কাব্যটি শেষ করেন সৈয়দ হামজা। ফকির গরীবুল্লাহর অনুসারী হিসেবে এ ধারায় সৈয়দ হামজার আবির্ভাব। ফকির গরীবুল্লাহর অন্যান্য রচনা- সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুঁথি ও ইউসুফ জোলেখা।

৫. কবিওয়ালাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত একদল কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা কবিগান রচনা করতেন। তাদের কবিওয়ালা বা কবিয়াল বলা হতো। এদের অনেকেই মুখে মুখে গান রচনা করতেন। গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু। কবিগানের আসরে একজন প্রধান গায়ক এবং কয়েকজন সহকারী থাকত। কবির লড়াই সে কালের মনোরঞ্জনের বিষয় ছিল। বিয়ে, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ধনী ব্যক্তিদের গৃহে কবিগানের আসর বসানো হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বিখ্যাত কবিয়ালরা ছিলেন- হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ভবানী বেনে, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রমুখ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কবিয়ালরা হলেন বলহরি দে, শম্ভুনাথ মণ্ডল, তারকচন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র শীল, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বিনয়কৃষ্ণ অধিকারী ও স্বরূপেন্দু সরকার। চারণকবি মুকুন্দ দাসও ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন কবিয়াল।

৬. শায়েরদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : শায়ের আরবি শব্দ অর্থ কবি। শায়েরগণ বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে এক ধরনের কাব্য রচনা করতেন যা 'দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। শায়েরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- আঠার শতকের ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা। উনিশ শতকের মোহাম্মদ দানেশ, মালে মুহম্মদ, আব্দুর রহিম, আয়েজুদ্দিন, জনাব আলী, মনিরুদ্দিন, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ মুনশী, আরিফ, তাজউদ্দিন, আব্দুল ওহাব, সাদ আলী, রেজাউল্লাহ প্রমুখ।

CamScanner

৭. কোন পটভূমিতে কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটেছিল?

উত্তর : আঠার শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে কবিগানের রচয়িতা 'কবিওয়ালা বা সরকার' এবং মুসলমান সমাজে দোভাষী পুঁথি রচয়িতা 'শায়ের'-এর আবির্ভাব ঘটে। ১৭৬০ সালে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে মধুসূদন দত্তের কাব্য সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির জগতে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। বাংলা সাহিত্যের এই বন্ধ্যাত্বের সময়ে কবিওয়ালা ও শায়েরদের উদ্ভব ঘটে। হিন্দু সমাজেই কবিগানের প্রসার ঘটেছিল এবং তা বেশি সমাদৃত ছিল। অন্যদিকে মুসলমান সমাজে শায়েরদের উদ্ভব ঘটে। তারা মুসলমানদের বীরত্ব, প্রেম ও অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আরবি, হিন্দি, উর্দু ও বাংলা মিশ্রিত ভাষায় একধরনের কাব্য রচনা করতেন। শিল্প নিপুণতার দিক থেকে এগুলোর সাহিত্যমান উঁচু না হলেও এগুলো বাঙালি জনসাধারণকে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে।

৮. জঙ্গনামা কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : ফারসি 'জঙ্গ' শব্দের অর্থ যুদ্ধ, আর 'জঙ্গনামা' শব্দের অর্থ যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ বা রচনা। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যভিত্তিক যুদ্ধবিষয়ক কাব্যকে জঙ্গনামা বলা হয়। হযরত মুহম্মাদ (স.) ও তাঁর স্বজনদের যুদ্ধই এ শ্রেণির কাব্যের মূল বিষয়। আরবি-ফারসি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও 'জঙ্গনামা' বলতে বিশেষভাবে কারবালার যুদ্ধ ও তার বিষাদময় ঘটনাবলি সংক্রান্ত রচনাকেই বোঝায়। জঙ্গনামা শ্রেণির কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য কাব্য ও কবি হলেন- শেখ ফয়জুল্লাহ (জয়নবের চৌতিশা), দৌলত উজির বাহরাম খান (জঙ্গনামা), মুহম্মদ খান (মকতুল হোসেন), শেরবাজ (কাশিমের লড়াই), হেয়াত মামুদ (জঙ্গনামা), ফকির গরিবুল্লাহ (জঙ্গনামা ও সোনাভান) ইত্যাদি। এসব কাব্য বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সংস্কৃতিকে একটা স্বতন্ত্র পরিচয় দান করেছে।

৯. বাংলা টপ্পা গানের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : টপ্পা গান কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয় সে অঞ্চলের উট চালকদের থেকে। তারা উট নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্য করতে যেতো এবং উটের পিঠে বসে এক ধরনের গান করতো। এই গানকে সংগীতের আসরে প্রথম যিনি নিয়ে আসেন গোলাম নবী ওরফে শোরী মিয়া নামে এক সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি গানগুলোকে সাঙ্গিতিক আদর্শে সাজিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সেজন্য তাকে টপ্পা গানের জনক বলা হয়। পাঞ্জাব অঞ্চলের মূল গানের সাথে মিল

CamScanner

থাকলেও বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) এর উদ্ভাবক বলে পরিচিত। শোরী মিয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু (১৭৪১-১৮৩৯) বাংলা টপ্পা রচনা করেন। নিধুবাবুর অনেক আগেও কালী মীর্জা নামে একজন বাংলা টপ্পার শুরু করেছিলেন। কিন্তু বাংলা টপ্পা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল রামনিধি গুপ্ত তথা নিধুবাবুর সূত্রে।

১০. এন্টনি ফিরিঙ্গির পরিচয় দিন।

উত্তর : এন্টনি ফিরিঙ্গি একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। তিনি ১৭৭০ সালে (আনুমানিক) কলকাতার শ্যামনগরে জন্ম গ্রহণ করেন (সূত্র : বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান)। তাঁর প্রকৃত নাম হেন্সম্যান এন্টনি। ইউরোপীয় (পর্তুগিজ) ছিলেন বলেই ফিরিঙ্গি আখ্যা পান। প্রথম দিকে তাঁর গান বেঁধে দিতেন গোরক্ষনাথ। পরে নিজেই গান রচনা করে গাইতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান-

'আমি ভজন সাধন জানিনে মা/নিজে ত ফিরিঙ্গি
যদি দয়া করে কৃপা কর/হে শিব মাতঙ্গী।'

জন্মসূত্রে খ্রিস্টান হলেও আচারে-পোষাকে বাঙালি হিন্দুর মত জীবনযাপন করতেন। সৌদামিনি নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবাকে সতীদাহের চিতা থেকে উদ্ধার করে বিয়ে করেন। কলকাতা বউবাজার অঞ্চলে অবস্থিত 'ফিরিঙ্গী কালী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। যা 'ফিরিঙ্গী কালীবাড়ি' নামে পরিচিত। তিনি ১৮৩৬ সালে মারা যান।

১১. 'বটতলার সাহিত্য' বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বাংলার মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের আদি স্থান বটতলা। বর্তমানে এটি কলকাতার একটি থানার নাম। শোভাবাজার-চিৎপুর এলাকার একটি বিশাল বটগাছকে কেন্দ্র করে এই নামের উৎপত্তি হয়। উনিশ শতকে বাংলার মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প এখানেই শুরু হয়েছিল। এই বটগাছের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে পুথি, পাঁচালি, পঞ্জিকা, পুরাণ, লোককাহিনি প্রভৃতি প্রকাশিত হতো। এখান থেকে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হতো তা হীনার্থে 'বটতলার সাহিত্য' নামে খ্যাত ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অধিকাংশ পুস্তক ও প্রচারপত্র এই বটতলা থেকেই প্রকাশিত হতো। বিষয়বস্তুর সমসাময়িকতার জন্য বটতলার বইগুলো শহরের মধ্যবিত্ত ও গ্রামের শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষজনের কাছেও জনপ্রিয় ছিল। ১৮৫০-এর দশক থেকে বটতলা তার ঐতিহ্য হারাতে থাকে। উল্লেখ্য ঢাকার বাংলাবাজারকেও একই অর্থে 'পূর্ববঙ্গের বটতলা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

লোকসাহিত্য

১. চন্দ্রকুমার দে এবং দীনেশচন্দ্র সেনের নাম কেন লোকসাহিত্য প্রেমীর হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে? *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলো বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। এ হাওর অঞ্চল মৈমনসিংহ গীতিকার নায়ক-নায়িকাদের বিচরণ ক্ষেত্র। বর্তমান নেত্রকোনা জেলার আইথর গ্রামের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলো সংগ্রহ করেন। তার সংগৃহীত পালাগানগুলো স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩), ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬) নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এ পালাগানগুলোর ভাষা সহজ সরল সাধারণ মানুষের ভাষা কিন্তু মর্মস্পর্শী। এ ভাষায় রঙরস আছে, কারুকাজ আছে কিন্তু কৃত্রিমতা নেই। এতে তৎসম শব্দের ব্যবহার খুবই কম। এগুলোর মধ্যে অতি সাধারণ মানুষের চিন্তা- চেতনা, জীবনবোধ, আবেগ অনুভূতির পরিচয় পাওয়া। আর শ্রোতাদের জন্য এগুলো সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন।

২. লোকসাহিত্য বলতে কী বুঝেন? এর প্রধান শাখা কী কী? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : যে কোন সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। একটি মৌখিক ধারা, অপরটি লেখ্য ধারা। আবহমানকাল থেকে জনসাধারণের মুখেমুখে যে সাহিত্যের সৃষ্টি তাকে লোকসাহিত্য বলে। এ সাহিত্য পল্লি বাংলার তথা গ্রামীণ সমাজের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। লোকমুখে এর উদ্ভব এবং মুখে মুখেই এর বিস্তার। যুগ যুগ ধরে পল্লি বাংলার মানুষ তাকে লালন করে আসছে। লোকসাহিত্য একক কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। বাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লোকসাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোককবি, যাদের সাধারণত 'বয়াতি' বলা হয়। লৌকিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রেম-ভালোবাসা এসবই লোক সাহিত্যের মূল বিষয়। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ লোক সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ আধার।

৩. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কী? এর অন্তত দুটি পালার নাম বলুন। *[২০তম]*

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন। এ পালাগানগুলো বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও

CamScanner

হবিগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলো সংগ্রহ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এই গীতিকাগুলো সম্পাদনা করে প্রকাশ (১৯২৩) করেন। 'দস্যু কেনারামের পালা' ব্যতীত বাকী সবগুলোর মূখ্য বিষয় নরনারীর লৌকিক প্রেম। প্রকৃতপক্ষে বিয়োগাত্মক প্রেমকাহিনি গীতিকাগুলোর উপজীব্য। এতে নারীচরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে এবং নায়িকার নামানুসারে গীতিকাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা রয়েছে-

পালা	রচয়িতা	পালা	রচয়িতা
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি	দেওয়ান ভাবনা	নাম জানা যায় নি
মহুয়া	দ্বিজ কানাই	রূপবতী	নাম জানা যায় নি
মলুয়া	চন্দ্রাবতী	কাজলরেখা	নাম জানা যায় নি
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র	নয়ানচাঁদ ঘোষ	কঙ্ক ও লীলা	দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ান চাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বানিয়া
কমলা	দ্বিজ ঈশান		
দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী		

৪. মনসুর বয়াতী কে? তাঁর কাব্যের নাম কী? *[১৭তম বিসিএস]*
অথবা, গীতিকা হিসেবে 'দেওয়ানা মদিনা'র সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : মনসুর বয়াতি একজন বাঙালি গীতিকবি। তিনি ময়মনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটির রচয়িতা। এটি কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের গীতিকা। এতে গীতিধর্মের চেয়ে কাহিনিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই গীতিকায় কৃষক কন্যা মদিনার জীবন-বেদনা রূপায়িত হয়েছে। কাহিনিতে ফুটে উঠেছে সতী নারীর একনিষ্ঠতা। ভাগ্যবিড়ম্বিত দুলাল মদিনাকে ভালবেসে ঘর বেঁধেছিল। কিন্তু পরে পিতৃপ্রদত্ত অংশের অধিকার পেয়ে মদিনাকে ছেড়ে চলে যায়। দুলাল নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসলে ততদিনে মদিনা প্রাণত্যাগ করে। দুলালের ব্যর্থ হাহাকারের মধ্য দিয়ে এ কাহিনির পরিসমাপ্তি। 'দেওয়ানা মদিনা'তে সহজ-সরল গার্হস্থ্য জীবনের ছবি আছে। কাহিনির শক্ত গাঁথুনির অভাব, চরিত্র সৃষ্টির পারঙ্গমতার অভাবে বিরহ তেমন জমে ওঠে নি। বাংলা গীতিকার বৈশিষ্ট্য অনুসারে 'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকাতে কাহিনির প্রাধান্য, আখ্যানের শৈথিল্য, ঢিলেঢালা চরিত্র চিত্রণ, সংগীত অপেক্ষা কাহিনির প্রাধান্য, অসংযত প্লট, প্রেম-মিলন-বিরহ, কাহিনি বর্ণনায় কবির ব্যক্তি অনুভূতির প্রাধান্য এবং সমাজ বাস্তব চালচিত্র নির্মাণে দেওয়ানা মদিনা বাংলা গীতিকারই বৈশিষ্ট্যানুগ। ফলে এটি গীতিকা হিসেবে সার্থক।

CamScanner

৫. লোকসাহিত্য ও মরমীসাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য। আবহমান কাল থেকে জনসাধারণের মুখেমুখে যে সাহিত্যের সৃষ্টি তাকে লোকসাহিত্য বলে। লোকমুখে এর উদ্ভব এবং মুখে মুখেই এর বিস্তার। যুগ যুগ ধরে পল্লি বাংলার মানুষ তাকে লালন করে আসছে। বাংলার অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী লোকসাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এদের একটি বড় অংশ লোক-কবি, যাদের সাধারণত 'বয়াতি' বলা হয়। এ সাহিত্যে ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লোক ঐতিহ্যের অনবদ্য ফসল মরমী সঙ্গীত বা মরমীবাদের গান। মারেফতি বা ফকিরালী গানের পোশাকী নাম মরমী সাহিত্য। প্রাচীন লোকসাহিত্য বা লোকঐতিহ্যের একাংশের রূপান্তর মরমী সাহিত্য। মরমী সঙ্গীত হচ্ছে সূফীবাদের বহিঃপ্রকাশ। যা মূলত তাওহীদ (স্রষ্টার একত্ববাদ) রিসালতের (পয়গাম্বরের কাহিনি) উপর ভিত্তি করে রচিত। মানুষের জীবন-জীবিকা, আচার-আচরণ ও সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত এককালের লোকসাহিত্য ঈশ্বর প্রেম, সৃষ্টি তত্ব, জীবে প্রেম ইত্যাদির মূল্যবোধে সৃষ্টি হয়েছে মরমী সাহিত্যের।

৬. গীতিকা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সঙ্গীতাকারে বর্ণিত কাহিনিকে এককথায় গীতিকা বলে। বাংলা সাহিত্যে একশ্রেণির কাহিনিমূলক লোকগীতি 'গীতিকা' নামে পরিচিত। যাকে ইংরেজিতে ব্যালাড (ballad) বলা হয়। গীতিকা সাহিত্যে সাধারণত কোন দৈব দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনির বর্ণনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কাহিনি সত্য ঘটনার সাথে জনশ্রুতি মিশ্রিত হয়ে গড়ে ওঠে। গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত। কিন্তু গানের সুরের চেয়ে কাহিনিই প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত-

ক. নাথ গীতিকা : নাথ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব ও অলৌকিক মহিমাকীর্তন এ গীতিকার মূল উপজীব্য। নাথ গীতিকার মধ্যে রয়েছে ময়নামতির গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, গোপীচন্দ্রের পাঁচালি ইত্যাদি।

খ. মৈমনসিংহ গীতিকা : গীতিকার মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকাই শ্রেষ্ঠ। এর কাহিনিগুলো প্রেমমূলক। নারী চরিত্রই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র, সতীত্ব বিশেষত ত্যাগের মহিমাই উজ্জ্বল। গীতিকাগুলোর মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা, কঙ্কাবতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ।

গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ময়মনসিংহের কিছু অংশ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কাফন চোরা, চৌধুরীর লড়াই, কাঞ্চন মালা, আয়না বিবি।

CamScanner

৭. গীতিকার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : গীতিকার বৈশিষ্ট্যঃ

- ✓ গীতিকা সংগীতে লেখা কাহিনি।
- ✓ গীতিকার আখ্যান পরিকল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টি শিথিল ও ঢিলেঢালা।
- ✓ গীতিকার কাহিনি প্রেম, মিলন, বিরহকেন্দ্রিক। ব্যর্থ প্রেমই গীতিকার প্রধান উপজীব্য।
- ✓ গীতিকায় বক্তার ব্যক্তি অনুভূতি প্রাধান্য পায় ।
- ✓ গীতিকায় কাহিনি বিস্তৃত ও শাখা কাহিনি বিদ্যমান। এতে বন্দনা অংশ থাকে।
- ✓ গীতিকায় নাটকীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

৮. মৈমনসিংহ গীতিকার সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকার সাহিত্য মূল্য অসীম। গীতিকাগুলি প্রধানত নায়িকা প্রধান। মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ গীতিকায়ই প্রণয়মূলক। এতে গ্রামীণ প্রেমের কাহিনি অপূর্ব রোমান্টিকতায় বর্ণিত। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলোর মাঝে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির অপূর্ব সম্মিলন পাওয়া যায়। যা চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালী চেতনার পরিচয় বহন করে। বাংলার গ্রামীণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের আখর গ্রন্থ মৈমনসিংহ গীতিকা। ১৯২৩ সালে মৈমনসিংহ গীতিকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বিদ্যত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মৈমনসিংহ গীতিকা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হলে বিদেশের সাহিত্যিকগণ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে বলেছেন-

'গীতিকাগুলোর সাহিত্যিক মূল্য বিদেশী সাহিত্য রসিকেরা কি দিয়াছেন, তাহা জানিলে বোধ হয় আমরা আমাদের ঘরের জিনিসকে একটু বেশি আদর করিব।'

৯. মহুয়া পালার শিল্পরূপ বিচার করুন।

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকার পালা মহুয়া। হুমরা বেদে ব্রাহ্মণের কন্যা মহুয়াকে চুরি করে এবং নাচ-গান শিখিয়ে বেদের দলের মক্ষী করে গড়ে তোলে। জমিদার নদের চাঁদের সাথে মহুয়ার প্রেম হয়। মহুয়ার পাণিপ্রার্থী সুজনের ছুরিকাঘাতে চাঁদের মৃত্যু হয়, ফলে মহুয়াও বিষলক্ষের ছুরিতে আত্মঘাতী হয়। দু'জনকে জোড় কবরে ঘুমিয়ে রাখার মধ্যে কাহিনি শেষ হয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র মহুয়াকে ঘিরেই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এছাড়া প্রধান-অপ্রধান চরিত্রগুলো যার যার স্থানে সুচিহ্নিত। এ পালার কাহিনিতে যেমন নাটকীয়তা রয়েছে, তেমনি গঠনগত দিক থেকেও নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। যেমন কোথাও দেখা যায় সংলাপের মাধ্যমে কাহিনি এগিয়ে গেছে। সরল ভাষা

©Nazmus Sadat
CamScanner

ব্যবহারের পাশাপাশি ভাষায় উপমা, উৎপ্রেক্ষাসহ নানা অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে সমাজচিত্রও উঠে এসেছে। মহুয়া একটি ফুলের নাম। যার নিজের বিষে নিজেই মরে যায়। তাই পালাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে। যথাযথ চরিত্রায়ণ, সংলাপ ও শ্রেণি অনুযায়ী চরিত্রের মুখে ভাষা ব্যবহার কাহিনিতে অন্বয় রক্ষা সবমিলিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে আজও সমান জনপ্রিয়।

১০. মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলোতে নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য ও সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। পল্লি নারীর সহজ সরল শাশ্বত অকৃত্রিম রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। চরিত্রগুলো হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ গীতিকার নারীরা কখনো ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করেছে, কখনো বা অভিভাবকের অভিমতের বিরুদ্ধে পতি মনোনয়নের জন্যে গৃহ ত্যাগ করেছে। এটাই নারীর শক্তি, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধের জয়গান। এ গীতিকা থেকে আমরা মালঞ্চমালা, কঙ্খনমালা, কাঞ্চনমালা এবং পুষ্পমালার কথা পাই প্রেমের রাজ্যে এরা সহোদরা। স্বামীর প্রতি মলুয়ার অকৃত্রিম ভালোবাসা, লীলার লীলাবসান, সোনাই-এর নির্বাক ও নির্ভীক মৃত্যু, কাজল রেখার চরিত্রের সহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি, চন্দ্রার তপোনিরত শান্তি- এসবের মধ্য দিয়ে নারীর স্বকীয় সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১. মনসুর বয়াতির 'হারামনি' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান সংগ্রাহক লোকবিজ্ঞানী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদ থেকে ছয় হাজারের মতো লোকগান সংগ্রহ করেন। তার প্রথম সংগ্রহ ছিল নিজ গ্রামের প্রেমদাস বৈরাগীর কাছ থেকে লালনের একটি গান। লালনের গান সংগ্রহে অনুপ্রেরণার পাশাপাশি তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন বাংলার লোকগাথা, লোকসংগীত, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির প্রতি। তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে ছড়া, গান, ধাঁ ধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। তার সংগৃহীত লোকসাহিত্যের উপাদানগুলো 'হারামনি' (দশ খণ্ড) গ্রন্থে সংকলন করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত লুপ্তপ্রায় লোকগীতি প্রকাশের জন্য একটি বিভাগ রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের নামকরণ করেন 'হারামনি'। মনসুরউদ্দিন 'হারামনি' নামটি এখান থেকেই গ্রহণ করেন। শুধু নাম নয়, 'হারামনি'র প্রথম খণ্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

CamScanner

১২. রূপকথা বলতে কী বুঝায়? রূপকথার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : লোকসাহিত্যের একটি শাখা লোককাহিনি। লোককাহিনির যে শাখায় দীর্ঘতর কাহিনিতে অপুত্রক রাজার দৈববলে পুত্রলাভ, ভাগ্যান্বেষণে রাজপুত্রের দেশান্তর অভিযান, পরে সাফল্য লাভ, পরিণামে অন্য রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্যলাভ- এসব কাহিনি থাকে তাকে রূপকথা বলে। এতে একজন নায়ক/নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্র, একজন খলনায়ক, নায়কের সাহায্যকারী (কোটলিপুত্র বা বন্ধু) চরিত্র থাকে। কখনো আবার যাদুদব্য বা প্রাণী, দেবতা বা স্বর্গীয় চরিত্রও থাকে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রূপকথার কাহিনি অগ্রসর হয়। অনেক বাধা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক জয়লাভ করে। কোনো কোনো রূপকথায় পরীদের কাহিনি থাকে। পরী হলো মানুষের কল্পিত সুন্দরী রমণী যারা আকাশলোকে বিহার করে। তারা কোনো যুবককে ভালোবেসে তাদের জগতে নিয়ে যায়। অথবা মাটির মানুষের সাথে তারা মাটির পৃথিবীতেই ঘর বাঁধতে পারে। রূপকথা কাহিনি সাধারণত মিলনাত্মক হয়।

১৩. বাংলাদেশের লোকসাহিত্য চর্চা বা গবেষণা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : লোকসাহিত্য পল্লি বাংলার অমূল্য সম্পদ। বিশ শতকের গোড়ায় লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের পাশাপাশি সেগুলি বিশ্লেষণে প্রথম এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর বাংলার লোকসাহিত্যচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, জসীমউদ্দীন প্রমুখ সংগ্রাহক লোকসাহিত্যের অনেক দুর্লভ রত্ন সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত ফোকলোরবিদ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। লোকসাহিত্যচর্চায় পুথিসংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নামও স্মরণীয়। পাশ্চাত্য রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত বিদ্যায়তনিক ফোকলোরচর্চা ও গবেষণার পুরোধা হলেন মযহারুল ইসলাম ও আশরাফ সিদ্দিকী। এদের পর ফোকলোরচর্চায় বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় এগিয়ে আসেন আবদুল হাফিজ, ওয়াকিল আহমদ ও শামসুজ্জামান খান। বাংলা লোকসাহিত্য নিয়ে বিদেশে গবেষণামূলক কাজ করেছেন জহুরুল হক ও সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। বাংলাদেশে গত অর্ধ শতকে যে পরিমাণ লোকসাংস্কৃতিক সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে তার অধিকাংশই লোকসাহিত্য। এগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান কৃতিত্ব নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রাহকদের।

CamScanner

আধুনিক যুগ

১. মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য কী? *[২৯তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য লিখুন?

উত্তর : প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ব্যক্তি প্রধান। মধ্যযুগে এসে ধর্মটা মুখ্য হয় এবং মানুষ বা ব্যক্তি গৌণ হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের সাহিত্য দেবদেবীর স্তুতিনির্ভর। এটি ছিল একমুখী অনুবাদ ও অনুকরণমূলক সাহিত্য। আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হয় এবং মানবতাই হলো একমাত্র কাম্য। এ যুগের সাহিত্য অনেক বেশি জীবনমুখী ও মানবিকতাসম্পন্ন। জীবনের দুঃখ দুর্দশা, হতাশা-শূন্যতা, সুখ-স্বপ্ন এতে বর্ণিত হয়। সমাজের নিচুস্তরের লোকজনও এতে নায়ক হতে পারে। যেখানে পূর্বের সাহিত্য সমাজের কেন্দ্রে বসবাসকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি-ই শুধু নায়ক হত। পদ্যের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় মৌলিক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ আধুনিক সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। সাহিত্যে এসেছে নতুন মাত্রা, সৃষ্টি হয়েছে গদ্য কবিতা। এছাড়া প্রকৃতিবোধ, শিল্পচেতনা এবং মননশীলতায়ও এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

২. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে জড়িত। আধুনিক যুগের শুরু হয় ১৮০০ সাল থেকে। তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাপাখানার প্রচলন, বাঙালি তরুণদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ, ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, তদুপরি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার চর্চায় বাঙালি জীবন হয়ে ওঠে গতিশীল। এই গতিই আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের পূর্বে গদ্যরীতির প্রচলন ছিলনা। গদ্যের লিখিত রূপ চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষ্ণব কড়চা ও বিদেশি খ্রিস্টান কর্তৃক লিখিত ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। ১৫৫৫ সালে আসাম রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়। বাংলা গদ্যের বিকাশে 'শ্রীরামপুর মিশন' ও 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

CamScanner

৩. বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তর : ১৮০১ সাল থেকে আধুনিক যুগ ধরা হলেও এই যুগের বিশেষ লক্ষণ আগে থেকেই কিছুটা প্রকাশ হতে দেখা যায়। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত সাহিত্যে মধ্যযুগীয় আলৌকিকতা পরিহার করে অনেকাংশে বাস্তবধর্মীতা দেখা যায়। সাহিত্যকে জীবনমুখী করার এই ইঙ্গিতময় মুহূর্তে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু।

যুগচিন্তার বিবেচনায় আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- মানবিকতা, ব্যক্তি সচেতনতা, সমাজবোধ, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, আত্মচেতনা, আত্মপ্রসার, মৌলিকত্ব, মুক্তবুদ্ধি প্রভৃতি। এর সাথে আরও ছিল- রোমান্টিকতা, যান্ত্রিকতা, প্রগতিশীল চিন্তা ও নগরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থাপনা। আর সাহিত্য কালিক বাস্তবতা প্রভাবিত বলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক কালের সাহিত্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকটিত। এছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে গঠনরীতির দিক থেকে মূলগত যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো-

- ✓ *গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব*
- ✓ *সাময়িকপত্রের আবির্ভাব*
- ✓ *নাট্য সাহিত্যের জন্ম*
- ✓ *প্রবন্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি*

৪. ডিরোজিও কেন বিখ্যাত?

উত্তর : উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের এক অবিস্মরণীয় নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি একজন ইউরেশীয় কবি, যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ও শিক্ষক। মাত্র সতেরো বছর বয়সে কলকাতা হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতেন এবং তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণার মতোই গতানুগতিকতার বাইরে। শিক্ষাদানকে তিনি ক্লাসরুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ক্লাসের বাইরেও ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তুর পরিসীমা ছিল বিস্তৃত- সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। তাঁর শিষ্যদেরকে সমসাময়িক কলকাতা সমাজে ইয়ং বেঙ্গল, ডিরোজীয়ান, নব্যবঙ্গ, ইয়ং ক্যালকাটা বলা হতো। আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় এ তরুণদলকে 'রেডিক্যাল বা বামপন্থী' বলা যায়। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করে, যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার শিক্ষা দেন। তার পুনরাবৃত্ত উপদেশ ছিল- 'সত্যের জন্য বাঁচা, সত্যের জন্য মরা'। 'ইয়ং বেঙ্গল গঠন' তাকে ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৫. ইয়ংবেঙ্গল সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ডিরোজিওর শিষ্যদের সমসাময়িক কলকাতা সমাজে ডিরোজীয়ান, ইয়ংবেঙ্গল, ইয়ং ক্যালকাটা বলা হতো। তারা ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। অনর্গল ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর শিষ্যরা মাংস ভক্ষণ, মদ পানসহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। আবার তারাই সমাজে সবচেয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে। আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় এ তরুণদলকে 'রেডিক্যাল বা বামপন্থী' বলা যায়। তারা ১৮২৮-৪৩ সালের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণসহ বেশ কিছু সাময়িকী প্রকাশ করে। সমাজ সংস্কার বিষয়ে প্রথাগত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যাওয়ায় ইয়ংবেঙ্গলদের তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। যত দ্রুত তাদের আবির্ভাব হয়েছিল, তত দ্রুতই তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইয়ংবেঙ্গল সামাজিক গল্প গুজবের বিষয়ে পরিণত হয়। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ।

৬. আধুনিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে নানা সমালোচক মতপ্রকাশ করেছেন। ১৮০১ সাল থেকে আধুনিক যুগ পুরোপুরি শুরু হয়। বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আধুনিক যুগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১. উন্মেষ পর্ব (১৮০১-১৮৬০ খ্রী.)

২. বিকাশ পর্ব (১৮৬১ - বর্তমান)

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা করেন উইলিয়াম কেরী ও তার সহযোগী সংস্কৃত পন্ডিতগণ। তাঁদের গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে প্রারম্ভিক স্তরটি নির্মিত হয়। এর পর একে একে আগমন ঘটে রামোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো সব চিন্তাশীল ও সৃষ্টিশীল বাঙালি সাহিত্যিকদের। এ যুগে নানা দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধি হয়েছিল। এই যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান শাখা গুলি যেমন- প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি। আধুনিক যুগেই বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হয়ে উঠেছে সুবিখ্যাত ও সমাদৃত।

CamScanner

বাংলা গদ্যের উন্মেষ ও বিকাশ

১. বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কতখানি? [৪৪তম]

উত্তর : ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেও উপজাত হিসেবে বাংলা গদ্যের বিকাশে এই কলেজের অবদান অপরিসীম। এ কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতদের মাধ্যমেই মূলত বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়। এর পূর্বে বাংলা গদ্যের যে সামান্য কিছু নমুনা পাওয়া যায়, তা কেবল ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রশ্নোত্তর আকারে লেখা বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধকদের ধর্মীয় পুস্তিকা বা কড়চা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফোর্ট উইলয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালুর পর বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট মোকাবেলায় উইলিয়াম কেরি নিজে ও অন্যান্য পণ্ডিতদের দিয়ে বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমেই বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশনা শুরু হয়। কলেজের বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

২. কোন উদ্দেশ্যে কোন বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়? কলেজটির নাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন? *[২৮তম বিসিএস]*
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল। *[২৭তম]*

উত্তর : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতার লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে লক্ষ্য করলেন; বিলেত থেকে আসা সিভিলিয়ান কর্মচারীরা এদেশের ভাষা না জানায় শাসনকার্যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ান ও কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাচ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালের ২৪ নভেম্বর কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ। কলেজটি এই দুর্গে অবস্থিত বলে এর নামকরণ করা হয় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিবেচনায় নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কলেজের বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বিভাগে ছিলেন একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন সহকারী শিক্ষক। ১৮০৫ সালের মধ্যে কলেজে মোট ১২টি অনুষদ খোলা হয়। লর্ড ডালহৌসির সময় ১৮৫৪ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

CamScanner

৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কত সালে বাংলা বিভাগ খোলা হয়? [২৪তম]

উত্তর : ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়। বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন পাদ্রি উইলিয়াম কেরি, অন্যতম পন্ডিত ছিলেন রামরাম বসু। এছাড়াও বাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন- তারিণীচরণ মিত্র ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতদের মাধ্যমেই মূলত বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চার সূচনা হয়।

৪. বাংলা গদ্যের সূচনা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ১৫৫৫ সালে আসামরাজ চুকোম্‌ফা স্বর্গদেবকে লেখা কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ-এর একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চিঠির ভাষা নিম্নরূপ- *'লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'* এরপর গদ্যের তেমন বিকাশ লক্ষ করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্তুগিজ পাদ্রিগণ বাংলা গদ্যের ব্যাপক প্রচলন শুরু করেন। ড. সুকুমার সেন বাংলা গদ্যরীতির চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। সে স্তরগুলির পরিধি-

- ❖ প্রথম স্তর ঃ সূচনা- ষোড়শ শতাব্দী থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত।
- ❖ দ্বিতীয় স্তর ঃ উন্মেষ- ১৮০০ (শ্রীরামপুর মিশন) থেকে ১৮৪৭ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের) পূর্ব পর্যন্ত।
- ❖ তৃতীয় স্তর ঃ অভ্যুদয়- ১৮৪৭ (বিদ্যাসাগর) থেকে ১৮৬৫ (বঙ্কিমচন্দ্রের) পূর্ব পর্যন্ত।
- ❖ চতুর্থ ঃ পরিণতি- ১৮৬৫ (বঙ্কিমচন্দ্র) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

৫. বাংলা গদ্যের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ সৃষ্টিতে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় এবং উইলিয়াম কেরির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয়। এ মিশন বাংলায় বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক রচনা করে খ্রিষ্টান ধর্মের মহত্ত্ব প্রচার করে। শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা বাইবেল, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাপার অক্ষরে প্রচার করা হয়। তাছাড়া 'সমাচার দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক ও 'দিগদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা একান্ত নিজস্ব উদ্দেশ্যে এ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর সাথে সাথে এ মিশন আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিকাশে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে। মিশনারীরা নিজেদের অজান্তেই বাংলা সহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বাংলা সাহিত্যের

CamScanner

মধ্যযুগের পুথি ও পয়ারের বন্ধন থেকে ছাপার অক্ষর ও গদ্যে মুক্তির জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মিশন ও মিশনারীরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে।

৬. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিতদের নাম লিখুন।

উত্তর : ভারতের ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে কলকাতার লালবাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮০১ সালের ২৪শে নভেম্বর কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদক উইলিয়াম কেরী। কেরী তাঁর অধীস্ত দুজন পণ্ডিত–মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি এবং ছয় জন সহকারী পণ্ডিত–শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু-এর সহযোগিতায় বাংলা গদ্যে কলেজের পাঠ্যপোযোগী গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৮ সালের জুন মাসে এ কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ছিল মোট ১৫ জন।

৭. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলা গদ্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩টি বাংলা গদ্য পুস্তক লিখেছিলেন।

লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
উইলিয়াম কেরী	কথোপকথন	১৮০১
	ইতিহাসমালা	১৮১২
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
	লিপিমালা	১৮০২
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	১৮০২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	হিতোপদেশ	১৮০৮
	রাজাবলি	১৮০৮
	প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮৩৩
তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

©Nazmus Sadat
CamScanner

৮. বাংলা গদ্যের বিকাশে পত্রিকা ও সাময়িকপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ণ করুন।

উত্তর : বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি, গদ্যের স্বচ্ছতা, লেখক পাঠক সমাজের সম্প্রসারণ ইত্যাদি পত্রিকা ও সাময়িক পত্রের প্রত্যক্ষ ফল। পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য নানা মাত্রায় বিকশিত হয়েছে-

✓ প্রথম পর্বে- দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত প্রভৃতি পত্রিকায় ভূগোল, ইতিহাস, ধর্মীয় বিতর্ক- এ ধরনের বিষয় আলোচিত হত।

✓ দ্বিতীয় পর্বে- ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় কবি ও কাব্যের মূল্যায়ন, আধুনিক শিক্ষা বিষয়ে মন্তব্য করা হত। এ পত্রিকাটির প্রভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব ঘটেছে।

✓ তৃতীয় পর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকায় সংসারে স্ত্রীলোকের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হত।

✓ চতুর্থ পর্বে- গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন। বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আসর গড়ে ওঠে।

✓ পঞ্চম পর্বে- 'সাধনা' পত্রিকার লেখক রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকাটি একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা।

পরবর্তীতে কল্লোল পত্রিকার মধ্য দিয়ে আধুনিক কবি-সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্র বিরোধিতা করেন। 'শিখা', 'ধূমকেতু', 'প্রগতি সাহিত্য পত্র' সাহিত্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকা সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক সাড়া ফেলে ।

৯. বাংলা গদ্যের বিকাশে উইলিয়াম কেরীর অবদান লিখুন।

উত্তর : ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হলে উইলিয়াম কেরীর ওপর বাংলা বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বাংলা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে তিনি নিজে এবং তার অধীন পণ্ডিতদের বাংলা গদ্য লেখায় অনুপ্রাণিত করে তোলেন। তিনি দুটি বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন- কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২)। গ্রন্থ দুটির মাধ্যমেই তিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে সুপ্ত অবস্থা হতে জাগ্রত করেন এবং বাংলাকে শিক্ষিত ও ভদ্রজনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করেন। তিনি নানা ভাষায় অভিজ্ঞ হলেও বাংলা ভাষার আসক্তি তাঁর মাতৃভাষার মতই। তার অনুরোধে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা ও তারিণীচরণ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইংরেজি, ফারসি ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বাংলা গদ্য রচনা শুরু করা এবং বাংলা গদ্য রচনায় নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য উইলিয়াম কেরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

১০. উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : উনিশ শতককে বাঙালির নবজাগরণের যুগ হিসাবে মনে করা হয়। এ যুগেই বাংলা ভাষায় শক্তিশালী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি বিশেষত্ব হচ্ছে-

- ✓ শক্তিশালী গদ্য-সাহিত্যের সূচনা ও তার অসাধারণ বিকাশ;
- ✓ উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের গদ্য-সাহিত্যে সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রভাব;
- ✓ বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সংযোগ;
- ✓ জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি;
- ✓ কাব্য-সাহিত্যের অসামান্য উন্নতি;
- ✓ সর্বদেশীয়, সর্বকালীয় ও সর্বজাতীয় সার্বভৌম সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ এবং
- ✓ জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হওয়া এবং সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানদন্ড এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

১১. কেরী সাহেবের মুন্সি কাকে এবং কেন বলা হয়?

উত্তর : 'মুন্সি' ফারসি শব্দ। শাব্দিক অর্থ শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত, করণিক। মুন্সি হচ্ছে বাঙালি মুসলমানদের প্রাচীন একটি উপাধি। মোগল সম্রাটদের আমলে এই উপাধির প্রচলন শুরু হয়। মোগল আমলে বাদশাহদের রাজদরবারে বাদশার সাচিবিক কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে মুন্সি বলা হতো। তাকে মুন্সি বা মুন্সিজী নামে ডাকা হতো। তিনি বাদশাহের দাপ্তরিক যাবতীয় কাজ বা হিসাব লিপিবদ্ধ করতেন। ইংরেজ আমলে নেটিভ ভাষা শিক্ষক, বিভিন্ন বিষয় বিশেষত প্রশাসনিক নীতি, ধর্মীয় গ্রন্থ, বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষকদের জন্য মুন্সি ব্যবহৃত হয়। সেকালে মুন্সি ছিল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদ। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী এ দেশে আসলে রামরাম বসুকে বাংলা মুন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেন। এজন্য রামরাম বসুকে কেরী সাহেবের মুন্সি বলা হয়।

বাংলা উপন্যাস

১. বাংলা সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের তিনজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন-

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার রচিত বিখ্যাত উপন্যাস- পল্লী সমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত ইত্যাদি।

CamScanner

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার রচিত বিখ্যাত উপন্যাস- দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তার রচিত বিখ্যাত উপন্যাস- ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা ইত্যাদি।

২. উপন্যাস রচনার প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে হ্যানা ক্যাথেরিনের অবদান লিখুন।

উত্তর : হ্যানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্স একজন খ্রিষ্টান বিদেশিনী। জন্মগ্রহণ করেছেন কলকাতায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস রচনায় প্রাথমিক চেষ্টা করেছিলেন। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) তাঁর উপন্যাস রচনার প্রাথমিক চেষ্টা। এটি The Last day of the week অবলম্বনে রচিত। খ্রিষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় ফুলমণির সুখ এবং যথার্থ খ্রিষ্ট ধর্মাচরণ না করায় করুণার দুঃখভোগ, পরে মেম সাহেবের ঈশ্বর প্রেরিত সুপরামর্শে করুণার সুমতি ও সুখের মুখদর্শন এ গ্রন্থের মূল কাহিনি। ম্যালেন্সের বাংলা ভাষায় দক্ষতা ছিল অসাধারাণ। তবে এতে আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য, কাহিনিপট নিরস হওয়ায় পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয় নি। তাই সবমিলে এটি সার্থক উপন্যাস হতে পারে নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৩. বাংলা উপন্যাসের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : বাংলা উপন্যাসের জন্ম উনিশ শতকের পরে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে নকশা জাতীয় রচনাগুলো প্রথম গল্পাকারে লেখা গদ্য। এগুলোতে উপন্যাসের সামান্য লক্ষণ পাওয়া যায়। হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে যে নকশা রচনা করেন তা সমধিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি হয়। অতঃপর মীর মশাররফ হোসেন উপন্যাসে কিছুটা গতির সঞ্চার করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে একেবারেই নিম্নবিত্ত মানুষ, তাদের জীবন সংগ্রামের চিত্রের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের নানা তত্ত্ব (রিয়েলিজম, ফ্রয়েডিজম, লিবিডো প্রভৃতি) বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসিক উপন্যাসগুলো বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

বাংলা কাব্য

১. মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস]*

উত্তর : মহাকাব্য হলো একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক বা আখ্যানমূলক কবিতা। মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু, সুর, শৈলী উন্নত এবং মর্যাদাপূর্ণ। মহাকাব্য বীরত্বপূর্ণ কাজ এবং ঐতিহাসিক (বা মহাজাগতিক) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে। মহাকাব্য সাধারণত এমন একজন নায়কের দুঃসাহসিক কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যার অতিমানবীয় বা ঐশ্বরিক গুণাবলী রয়েছে। যার ভাগ্য প্রায়শই একটি উপজাতি, জাতি বা কখনও সমগ্র মানব জাতির ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- ✓ মহাকাব্যে সর্গবিভাগ থাকবে যার সংখ্যা হবে অষ্টাধিক। সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে। তবে সর্গান্তে ছন্দের পরিবর্তন ঘটতেও পারে।
- ✓ মহাকাব্যের উপজীব্য হবে পুরাণ, ইতিহাস এবং কোন সত্য ঘটনা। মূল কাহিনীর পাশে শাখা কাহিনী থাকতে পারে এবং কাহিনীতে থাকবে নাটকীয়তা।
- ✓ এটি আনুষ্ঠানিক, সমুন্নত এবং মর্যাদাপূর্ণ শৈলীতে লেখা। সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারীর সাথে তৃতীয় ব্যক্তির বর্ণনা থাকবে।
- ✓ মহাকাব্যের ভাষা হবে প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী এবং অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারসমৃদ্ধ।
- ✓ একটি সভ্যতা বা সংস্কৃতির ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রতিফলিত করে।
- ✓ একজন কেন্দ্রীয় নায়ক থাকে যিনি অবিশ্বাস্যভাবে সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। নায়কের বিরুদ্ধে প্রায় অসম্ভব প্রতিকূলতা তৈরি করার জন্য অতিপ্রাকৃত বা অন্য জাগতিক বাধা থাকবে। নায়কের জয়ের মধ্যদিয়ে মহাকাব্যের সমাপ্ত ঘটবে।

২. বাংলা ভাষায় যারা আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান। এই পাঁচজন কবির নাম লিখুন। *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকের পাঁচজন প্রধান কবিকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। তারা রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। তারা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডব বলে পরিচিত কবিরা হলেন-

- ✓ অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)
- ✓ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)
- ✓ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)
- ✓ বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)
- ✓ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)।

CamScanner

৩. মহাকাব্য কী? বাংলা মহাকাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : পাশ্চাত্য আদর্শানুসারে মহাকাব্য হচ্ছে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি। মহৎ জীবন কাহিনি অবলম্বন করে গুরুগম্ভীর ভাবকল্পনা ও ঐশ্বর্যময় শব্দব্যবহারে লেখা বৃহদাকার কাব্যকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ কবিতা। বাংলায় প্রথম মহাকাব্য রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি অনন্যসাধারণ মৌলিকতায় পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের সংযোগ সাধন করেন। রামায়ণের অংশ বিশেষ অবলম্বনে মেঘনাদবধ মহাকাব্য রচনা করলেও এতে চিন্তার যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনি ভাষা, ছন্দ, শব্দ অলঙ্করণেও নতুনত্ব এসেছে। পৌরাণিক কাহিনিকে নবচেতনা ও গভীর ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করে তুলেছেন। মধুসূদন দত্তকে অনুসরণ করে মহাকাব্য রচনা করেন- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৃত্রসংহার' (১ম ও ২য় খণ্ড), নবীনচন্দ্র সেন রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস যা ত্রয়ী কাব্য হিসেবে পরিচিত। হামেদ আলী 'কাশেম বধ', আনন্দচন্দ্র মিত্র 'হেলেনা কাব্য', যোগীন্দ্রনাথ বসু 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী', কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান', ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'স্পেন বিজয়' রচনা করেন। এরা সবাই মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করলেও ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, ট্র্যাজেডি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধুসূদনের মত দক্ষতার পরিচয় দিতে না পারায় মহাকাব্য রচনায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারেন নি।

৪. আধুনিককালে মহাকাব্য রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না কেন?

উত্তর : আধুনিককালে মহাকাব্য তেমন একটা লেখা হয় না। এর কারণ হতে পারে এতবড় কাব্য লিখার সময় লেখকের নেই, পাঠকদেরও তা পড়ার সময় নেই। স্বাভাবিকভাবে যে ধরনের সাহিত্যের পাঠক বেশি হবে সাহিত্যের সে ধারা সমৃদ্ধ হবে। দিন দিন মানুষের ব্যস্ততা বাড়ার সাথে সাথে পাঠাভ্যাসও পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে সাহিত্যের ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে। এককালের মহাকাব্যের স্থান দখল করেছে উপন্যাস। কালের আবর্তে সময়ের প্রয়োজনে সাহিত্য ধারায় যোগ হল গল্প, ছোট গল্প। এছাড়া উত্তরাধুনিককালে জীবনবোধে বা সাহিত্যে সর্বত্রই ব্যক্তির প্রাধান্য। সকলেই সমান আর ব্যক্তি মানুষ স্বস্থানে সকলেই গুরুত্বপূর্ণ। রাজা রাজরার বীরত্ব অনুগত প্রজা মুগ্ধ হয়ে পড়বে বা শুনবে এমনটি এখন আর হয় না। এসব কারণেই মহাকাব্য রচনায়ও কেউ আর আগ্রহ দেখান না।

৫. গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : যে শ্রেণির কবিতায় কবির হৃদয়ের অনুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও আনন্দ-বেদনা প্রাণের অন্তস্তল থেকে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাকে গীতিকবিতা বলে। গীতিকবিতা তন্ময় কবিতার অন্তর্গত।

©Nazmus Sadat

CamScanner

এতে সাধারণত কোন কাহিনি থাকে না। বিশ্ব প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যলীলা কবির মনে যে আবেগের সৃষ্টি করে সেই অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবি যখন সংগীতমুখর ছন্দে রূপায়িত করেন তখনই জন্ম হয় গীতিকবিতার। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যার উদ্দেশ্য, সে কাব্যই গীতিকাব্য। গীতিকবিতা কখনও তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয় না। এ কবিতা পাঠে কবির অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। গীতিকবিতায় কবি আত্মমুখর থাকে। গীতিকবিতায় আছে ভাবের বৈচিত্র্য। সে ভাববস্তু সংক্ষিপ্ত বা কিছুটা বিস্তৃত উভয়ই হতে পারে।

৬. গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য :-

- ✓ কবির ব্যক্তিগত বাসনা, আনন্দ, বেদনা গীতিকবিতায় স্থান লাভ করে।
- ✓ আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের স্বল্পতা, সংগীত মাধুর্য ও গতি স্বাচ্ছন্দ গীতিকবিতার শর্ত।
- ✓ কবির ব্যক্তিহৃদয়ের একান্ত অনুভূতি আবেগ কম্পিত সুরে গীতিকবিতায় ঝঙ্কৃত হয়।
- ✓ গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তি পরিচয়টি বড় হয়ে ওঠে।
- ✓ এ কবিতা প্রচারমূলক নয়, এতে কোন উদ্দেশ্য থাকে না, কবির বিচিত্র ভাবনা বিধৃত হয়।

৭. আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভব ও বিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাতে। অনেক ছোট ছোট জিনিস তার কবিতার বিষয় হিসেবে ধরা দিয়েছে। তবে তার হাতে গীতিকবিতা সফল রূপ পায় নি। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা দুটোতে গীতিকবিতার লক্ষণ ফুটে উঠে। তারপর বাংলা কবিতার আকাশে ভোরের পাখি নামে খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তিনিই আধুনিক গীতিকবিতার জনক এবং সচেতন গীতিকবি। তাঁর 'সংগীত শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিণী', 'সারদামঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি সার্থক গীতিকাব্য। তারপর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ণকুমারী দেবী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, কামিনী রায় প্রমুখ বাংলা গীতিকবিতায় অবদান রাখেন। তবে গীতিকবিতা পূর্ণতা পায় রবীন্দ্রনাথের হাতে। তার প্রভাত সংগীত, 'সন্ধ্যাসংগীত', 'কড়ি ও কোমল', 'ছবি ও গান', 'মানসী', 'খেয়া', 'সোনার তরী , 'বলাকা', 'নৈবেদ্য এসব কাব্য বাংলা গীতিকবিতাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

CamScanner

৮. বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তর কাব্যধারার পরিচয় দিন।
অথবা, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যধারা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ত্রিশোত্তর কাব্যধারা বা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারা বলতে পঞ্চপাণ্ডবের কবিতাকে বুঝায়। এদের কবিতার আধুনিকতাকে কোন একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এ কবিতাগুলো একাধারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, সংশয়ের, ক্লান্তির ও হতাশার। আবার এর মধ্যে জীবনের আনন্দ, বিস্ময়ের জাগরণ, অর্ন্তমুখিনতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা- এ সবকিছুই খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক কবিতা কালের দিক থেকে বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রোত্তর। কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এ সময়টি রবীন্দ্র-উত্তর কাল বলে বিবেচিত হয়। এ সময়ের কবিমানস তথাকথিত মূল্যবোধ যেমন ধর্ম, প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ ইত্যাদিতে সংশয়ে এবং অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ আক্রান্ত। আর কবিতা হয়েছে প্রেমের শরীরী রূপ প্রধান- রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী এবং নতুন সৃষ্টির অনুসন্ধানী। শৈল্পিক প্রকরণেও এতে অভিনবত্ব রয়েছে। আরও আছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের ভাবনার উদ্ধৃতি সহযোগে অতীত ঐতিহ্যের সাথে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন। প্রাচীন উপমার অভিনব প্রয়োগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি। গদ্য ছন্দের ব্যবহার, মধ্য মিলের সৃষ্টি। বিরোধাভাস বক্রোক্তির আধিক্য, ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য।

৯. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ধারা সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক পালাবদল হয়। কবি সানাউল হকের 'কাল সমকাল' ৭১-এর পরবর্তী কাব্য। এ কাব্যে স্বাধীনতার ইচ্ছা, অন্যায়ভাবে হত্যা ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা উঠে এসেছে। সৈয়দ আলী আহসানের 'আমার প্রতিদিনের স্বপ্ন' কাব্য আমাদের উপরকার বীভৎস পীড়নের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। শামসুর রাহমানের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে দেশের মানুষের জীবন সংগ্রাম ও বাঁচবার প্রবল আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি আল মাহমুদের 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' কাব্যগ্রন্থে স্বাধীনতা-উত্তর জীবনের বিধ্বস্ততা ফুটে উঠেছে। রফিক আজাদের 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে' কাব্য ভরে আছে স্বাধীনতা পরবর্তী স্বদেশ, স্বকাল ও যুগ সংগ্রাম। কবি আসাদ চৌধুরীর কাব্যে হাজার বছরের দৈন্য, বঞ্চনা, পীড়া তথা দেশ কালের প্রতি গভীর টান পরিলক্ষিত। নির্মলেন্দু গুণের না বিপ্লবী না প্রেমিক, 'ও বন্ধু আমার', মহাদেব সাহার 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', 'চাই বিষ অমরতা' প্রভৃতি কাব্যে স্বাধীনতার পরবর্তী অবক্ষয়সহ সমসাময়িক বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে।

CamScanner

বাংলা কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার

১. সনেট কি? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর : সনেট ইতালিয়ান শব্দ। একটিমাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত ১৪ টি পংক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সনেট নামে অভিহিত করা হয়। সনেটের দুইটি অংশ থাকে। প্রথম অংশে ৮টি ও দ্বিতীয় অংশে ৬টি পংক্তি থাকে। সনেট মূলত তিন প্রকার- পেত্রার্কীয় সনেট, শেক্সপীয়রীয় সনেট, ফরাসি সনেট। এদের মূল পার্থক্য অন্ত্যমিলে।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগড়দাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনরায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। প্রথম জীবনে তিনি ভার্জিল, দান্তে ও মিল্টনের মত কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এ জন্য তিনি সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ১৮৬২ সালে ইংল্যাণ্ডে যান। ১৮৬৩ সাল থেকে ফ্রান্সে বসবাস শুরু করেন। সাতিহ্য চর্চার দ্বিতীয় পর্বে তিনি বাংলায় সাহিত্য রচনা শুরু করেন। তার রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট কাব্য। ইতালীয় কবি পেত্রাকের অনুসরণের এ কাব্য রচিত। যার মাধ্যমে মধুসূদন দত্তের প্রবল দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। ২৯ জুন ১৮৭৩ সালে কলকাতা আলীপুর হাসপাতালে মারা যান।

২. বাংলা কবিতার ছন্দ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : কবি তাঁর কবিতার ধ্বনিগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করে তাতে এক বিশেষ ধ্বনিসুষমা দান করেন। ধ্বনির সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই বলা হয় ছন্দ। বাংলা কবিতায় সাধারণত তিন প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❖ স্বরবৃত্ত ছন্দ : স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরধ্বনির সংখ্যার উপর নির্ভর করে পর্বের মাত্রা সংখ্যা। স্বরবৃত্ত ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর উভয়ই ১ মাত্রা বহন করে। এ ছন্দে রচিত কবিতা আবৃত্তি করার সময় দ্রুত পড়তে হয়। এ ছন্দ ছড়ায় বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই একে *ছড়ার ছন্দও বলা হয়*। এ ছন্দে মাত্রা সংখ্যা ৪+৪+৪+২।

❖ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ : মাত্রাবৃত্তের সাথে স্বরবৃত্তের অনেকটা মিল থাকলেও এই ছন্দে বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রা বহন করে। এই ছন্দে মুক্তস্বর একমাত্রা হলেও বদ্ধস্বর দু'মাত্রা হিসেবেই গণ্য হয়। কোন অবস্থাতেই বদ্ধাক্ষর একমাত্রা বহন করতে পারেনা। এ ছন্দে মাত্রা সংখ্যা ৬+৬+৬+২।

CamScanner

❖ অক্ষরবৃত্ত : অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের শুরুতে বা মধ্যে বদ্ধাক্ষর হবে একমাত্রা। শব্দের শেষে বদ্ধাক্ষর হবে দুই মাত্রা। এ ছন্দের মূল পর্ব হবে ৮ বা ১০ মাত্রার।

৩. অমিত্রাক্ষর ছন্দ কী? এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা কাব্যের একটি বিশেষ ছন্দরূপ যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য:

- ✓ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবের প্রবহমানতা; অর্থাৎ, এই ছন্দে ভাব চরণ-অনুসারী নয়, কবিকে একটি চরণে একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করতেই হবে- তা নয়, বরং ভাব এক চরণ থেকে আরেক চরণে প্রবহমান এবং চরণের মাঝেও বাক্য শেষ হতে পারে।
- ✓ বিরামচিহ্নের স্বাধীনতা বা যেখানে যেই বিরামচিহ্ন প্রয়োজন, তা ব্যবহার করা এই ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য।
- ✓ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্যমিল থাকে না, বা চরণের শেষে কোন মিত্রাক্ষর বা মিল থাকে না।
- ✓ মিল না থাকলেও এই ছন্দে প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ১৪) এবং পর্বেও মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট (সাধারণত ৮+৬)।

৪. চতুর্দশপদী কবিতা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : চতুর্দশপদী হল এক ধরনের কবিতা যা প্রথম উদ্ভব হয় মধ্যযুগে ইতালিতে। এর বৈশিষ্ট্য হল যে এই কবিতাগুলো ১৪টি চরণে সংগঠিত এবং প্রতিটি চরণে সাধারণভাবে মোট ১৪টি করে অক্ষর থাকবে। এর প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে। বাংলা চতুর্দশপদীর সার্থক স্রষ্টা কবি মধুসূদন দত্ত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালেই ইতালির কবি পেত্রার্কের সনেট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম বাংলা চতুর্দশপদী রচনা করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কবির চতুর্দশপদী কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলিতে কবি চিত্তের ব্যকুলতা, স্বদেশ প্রেম ও আবেগ ধ্বনিত হয়েছে। ইংরেজিতে চতুর্দশপদী কবিতাকে সনেট বলা হয়।

CamScanner

৫. অলংকার কাকে বলে? অলংকার কয়টি ও কী কী?

উত্তর : অলঙ্কার সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত অলম অর্থ ভূষণ বা সাজসজ্জা। যা দ্বারা অলম বা ভূষণ করা হয় তাই অলঙ্কার। সাহিত্যে যে গুণের দ্বারা কোন লেখার প্রকাশক্ষমতা, শ্রুতিমাধুর্য ও অর্থগৌরব বৃদ্ধি পায় তাকে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার যেমন মানব শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনি সাহিত্যেও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত দুই প্রকার-

শব্দালঙ্কার : শব্দের ধ্বনিরূপকে অবলম্বন করে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। এক্ষেত্রে ধ্বনি বা শব্দ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। শব্দালঙ্কারের প্রকারভেদের মধ্যে রয়েছে- অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, পুনরুক্তবদাভাস।

অর্থালঙ্কার : বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের অর্থরূপের মাধ্যমে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কার পাঁচ প্রকার- সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীমূলক।

৬. রুবাই সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রুবাই আরবি শব্দ, এর বহুবচন রুবাইয়্যাৎ। আরবি বা ফারসি ভাষায় রচিত চতুষ্পদী কবিতাকে রুবাই বলে। প্রতিটি রুবাই সাধারণত স্বয়ংসম্পূর্ণ। চার ছত্রেই পূর্ণ কবিতা। আবার একগুচ্ছ রুবাই মিলে একটি রুবাইয়াৎ হয়। প্রতিটি রুবাইতে একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে প্রকাশ করা হয়। কখনও দ্রোহ, কখনও প্রেম, কখনও আনন্দ বা বিষাদ। রুবাই উচ্চমার্গের দার্শনিক রচনা। এর মাধ্যমে মূলত স্রষ্টার স্তুতি বা জীবনের গভীর দর্শনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। পারস্যের কবি উমর খৈয়াম ও কবি হাফিজের হাতে কবিতার এই বিশেষ ধরনটি চরম উৎকর্ষ লাভ করে। রুবাই-এর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে একই অন্তমিল রাখা হয়। কিন্তু তৃতীয় লাইনটি মুক্ত অর্থাৎ কোন অন্তমিল থাকে না। যেমন- 'ককখক'।

৭. রস কাকে বলে? বাংলা সাহিত্যে রস কয়টি ও কী কী?

উত্তর : কোন বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করে অথবা নাটক, অভিনয় দেখে দর্শক শ্রোতার মনে যে অনুভূতি জাগ্রত হয় তাকে রস বলে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, শাস্ত্রমতে কাব্যরস হলো অমৃত। বাংলা সাহিত্যে নাট্যশাস্ত্রের বিচারে রস ৮ প্রকার। এগুলো হলো- শৃঙ্গাররস, বীররস, রৌদ্ররস, বীভৎসরস, হাস্যরস, অদ্ভুতরস, করুণরস, ভয়ানকরস। অনেক বিদ্বজন আরো একটি নাট্যরসের কথা বলে থাকেন। সেটি হল শান্তরস। তাহলে কাব্যশাস্ত্রে বা অভিনয়ের রস ৯ প্রকার। কেউ কেউ এর সাথে বাৎসল্য রস নামক একটি অতিরিক্ত রসের কথা বলে থাকেন। এই অতিরিক্ত প্রকরণ যুক্ত করলে রসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি।

©Nazmus Sadat
CamScanner

বাংলা নাটক

১. বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকারের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের তিনজন নাট্যকার ও তাঁদের একটি করে নাটকের নাম লিখুন। *[২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকার হলেন-

মুনীর চৌধুরী। তার বিখ্যাত নাটক- কবর, পলাশী ব্যারাক, দণ্ডকারণ্য।

সেলিম আল দীন। তার বিখ্যাত নাটক- মুনতাসির ফ্যান্টাসী, কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ আল মামুন। তার বিখ্যাত নাটক- সুবচন নির্বাসনে, এখন দুঃসময়, এখনও ক্রীতদাস ইত্যাদি।

২. বিয়োগান্ত নাটক কাকে বলে? বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য কি? *[৩০তম]*

উত্তর : সাধারণত মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ হয়, তাকে বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি বলে। মানবজীবনের করুণ কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয় এ ধরনের নাটক। বিয়োগান্ত নাটক শ্রোতাদের মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ প্রহসন বা আনন্দের সৃষ্টি করে। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক বিয়োগান্ত নাটক।

বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য:

- ✓ বিয়োগান্ত নাটক হলো জীবনের কোন ঘটনার অনুকরণ।
- ✓ এ নাটকে জীবনের কোন গুরুতর ঘটনা থাকবে।
- ✓ এর ঘটনা হবে পরিপূর্ণ এবং এর একটি পরিমিতি থাকবে।
- ✓ এর ভাষায় আনন্দদায়ক উপাদান থাকবে। যেমন- ছন্দোবদ্ধ রচনা, গীত ইত্যাদি।
- ✓ এ নাটকের প্রকাশরীতি হবে নাটকীয়, বর্ণনামূলক নয়।
- ✓ নাটকে এমন ঘটনাকে রূপায়িত করা হয় যাতে অনুকম্পা ও ভয় দর্শকচিত্তে জাগ্রত হবে।
- ✓ অনেকে দ্বন্দ্বকে এ নাটকের প্রাণ মনে করেন। তবে এ দ্বন্দ্ব ভালোর সঙ্গে ভালোর, সত্যের সঙ্গে সত্যের হয়ে থাকে।

৩. পথ নাটক কাকে বলে? নাট্যকারের নামসহ দুটি পথ নাটকের নাম লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : যে কোন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে যে নাটক অভিনীত হয় তাকে পথনাটক বলে। পথনাটক কাহিনি, ফর্ম, সংলাপ, উপস্থাপনার রীতি কৌশলসহ সবকিছুতেই স্বাতন্ত্র্য। এ নাটক সাধারণত রাস্তার মোড়ে, শিক্ষা

CamScanner

প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায়, রেল স্টেশনের কাছে, বাসস্ট্যান্ডে অথবা যে স্থানে কোন না কোন কারণে লোকসমাগম হয় সেখানে প্রর্দশিত হয়। পথনাটকের জন্য কোন মঞ্চ প্রয়োজন হয় না। দর্শকরা সাধারণত দাঁড়িয়ে এ নাটক উপভোগ করেন। পথনাটকের মূখ্য উদ্দেশ্য বিনোদন নয়; জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ এবং কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন এর প্রধান লক্ষ্য। পথনাটক সহজভাবে প্রদর্শিত হয়। এতে কুশীলবরা মেক আপ পরিহার করেন। সেলিম আল দীনের 'বাসন', এসএম সোলায়মানের 'ক্ষ্যাপা পাগলার পাঁচালী', মান্নান হীরার 'ফেরারী নিশান', আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'সেনাপতি' এগুলো পথনাটক।

৪. অ্যাবসার্ড নাটক কী? বাংলাদেশে যে সব নাট্যকার অ্যাবসার্ড নাটক লিখেছেন তাঁদের নামোল্লেখ করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : উপমহাদেশের অ্যাবসার্ড নাটকের পুরোধা সাঈদ আহমদ 'অ্যাবসার্ড' এর বাংলা হিসেবে 'অধিবাস্তব' বলেছেন। যে নাটকে সুপরিকল্পিত মানবিক চরিত্র নেই; কার্যকারণ শৃঙ্খলার পরম্পরায় কোনো অনিবার্য পরিণাম নেই, নাটকীয় সংলাপগুলিও প্রায় অর্থহীন, সেই আকস্মিক সূচনা ও পরিণামহীন উপসংহার বিশিষ্ট নাটককেই বলা হয় অ্যাবসার্ড নাটক বা উদ্ভট নাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জীবনের শূন্যতা, একাকিত্ব, আত্মবিচ্ছিন্নতা, অন্তহীন ক্লান্তি, অর্থহীন ভবিষ্যৎ ইত্যাদি উপস্থাপনে একদল নাট্যকার সচেতনভাবে এ নাটক নির্মাণ করেন। অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষ্য দর্শক বা পাঠকের মনের গভীরতম স্তরে গিয়ে আঘাত হানা, তার চিত্তে যে আতঙ্ক, নৈরাশ্য, শূন্যতাবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লালসা-উদ্বেগ লুকিয়ে আছে তা তুলে আনা। চারপাশের সহিষ্ণুতার মুখোমুখি দাড় করিয়ে, চূড়ান্ত বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'তরঙ্গভঙ্গ', সাঈদ আহমেদের 'তৃষ্ণায়' এ শ্রেণির নাটক। অ্যাবসার্ড নাটকের উৎসভূমি প্যারিস।

৫. বাংলা প্রহসনের বিষয়াঙ্গিক আলোচনা করুন।

উত্তর : হাস্যরস ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আবরণে সমাজের যেকোন প্রকার অনৈতিকতা, অনাচার এবং প্রাত্যহিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধনার্থে রচিত নাটককে প্রহসন বা Farce বলে। প্রহসনের দৈর্ঘ্য সাধারণত এক থেকে দুই অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রহসন নাটকের মতই তবে নাটকের চেয়ে ছোট। এতে নাটকের মত বিষয়বস্তুর জটিলতা, গভীর জীবনবোধ, চরিত্রের সমগ্রতা থাকে না। প্রহসনে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা বিন্যাসের দিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রহসনে সমগ্র সমাজ জীবন আসে না। বরং সমাজের খণ্ড অংশের বিশেষ কোন অসংগতি তুলে ধরা হয়। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের ভণ্ডামি, জাত্যাভিমান, ফাকা বিদ্যাহংকার, ধনের অহংকার, লাম্পট্য, ছলচাতুরী, মদ্যপান, অসতীর বিড়ম্বনা, বহুবিবাহের কুফল

ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তখন প্রহসন রচনা করা হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' এসব প্রহসন বাংলা প্রহসন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে।

৬. বাংলা নাটকের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী চরিত্র ও সংলাপ নির্ভর সাহিত্যকে বলা হয় নাটক। ১৭৯৫ সালে রুশ দেশীয় হেরাসিম লেবেদফ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে দুটি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলা নাটকে বাঙালি জীবন ও সমাজ উঠে আসতে থাকে। উন্মেষ পর্বে তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন বেশ কিছু নাটক লিখেছেন। বাংলা নাটকের বিকাশ ঘটে মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের হাতে। মধুসূদন বেলগাছিয়া থিয়েটারের সাথে যুক্ত হন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' রচনা করেন, তবে কৃষ্ণকুমারী' তার শ্রেষ্ঠ ও সার্থক ট্র্যাজেডি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নীলকরদের অত্যাচারের বাস্তব চিত্র। এরপর গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাতে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক এসকল ক্ষেত্রে বাংলা নাটক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের হাতে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, ট্র্যাজেডি, সামাজিক, রূপক, সাংকেতিক, ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য সমৃদ্ধ বাংলা নাটক উজ্জ্বল সাহিত্যধারা হিসেবে বিকশিত হতে থাকে।

৭. বাংলা নাটকে গেরাসিম লেবেদফের অবদান মূল্যায়ন করুন?
অথবা, বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফ একজন রুশ পর্যটক ও বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও তার ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের দুটি ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' (সংবদল্য নামে) ও 'লাভ ইজ দ্যা বেস্ট ডক্টর' বাংলায় অনুবাদ করেন। নাটক দুটি মঞ্চস্থ করার জন্য 'প্লে হাউজ' ভাড়া নিতে যান কিন্তু থিয়েটার কর্তৃপক্ষ (ইংরেজ) ভাড়া দিতে অসম্মতি জানান। ব্রিটিশ শাসিত কোলকাতায় কোম্পানির থিয়েটার ছিল, কিন্তু তার সাথে বাঙালি সমাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেখানে নাটক ছিল ইংরেজি, দর্শক, অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাই ছিল ইংরেজ। সেই পরিস্থিতিতে লেবেদফ বাংলা নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৭৯৫ সালে কলকাতার ২৫নং ডোমতলায় জগন্নাথ গাঙ্গুলীর বাড়ি ভাড়া নেন। তার নক্সা এবং পরিকল্পনায় বাড়িটি থিয়েটার হলে রূপান্তরিত হয়। যার নাম দেয়া হলো 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার'। এ নাট্যমঞ্চেই অনূদিত নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। দুটি প্রদর্শনীতেই দর্শক যেন উপচে পড়েছিল।

CamScanner

৮. 'গণনাট্য সংঘ' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা গণনাট্য আন্দোলন। চল্লিশের দশকের শুরুতে এক টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্ভব। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত করা হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্দেশ্য নাট্যের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও শোষণের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। এ কারণেই গণনাট্য আন্দোলন 'Art for arts sake' বা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই নীতি দ্বারা পরিচালিত নয়; 'Art for humans sake' বা 'জীবনের জন্য শিল্প' এই নীতিতেই পুরোপুরি বিশ্বাসী। ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গম (বর্তমানে বিশ্বরূপা) রঙ্গমঞ্চে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটকাভিনয়ের মধ্যেই এই আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠা। যার প্রযোজনায় ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এই পর্ব থেকেই গণনাট্য আন্দোলন বিশেষভাবে কল্লোলিত হয়ে উঠতে থাকে।

৯. বিজন ভট্টাচার্যের 'নবনাট্য আন্দোলন' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে নবনাট্য আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিলো বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনে স্মরণীয় নাম বিজন ভট্টাচার্য। তার 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমে এ আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথম দিকে নবনাট্য আন্দোলন গণনাট্য আন্দোলন নামেই খ্যাত ছিল। 'নবনাট্য আন্দোলন' শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল। যখন বাংলা নাট্যমঞ্চের পরিবেশের গতানুগতিকতা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো– সেই মুমূর্ষু নাট্যাঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিলো এই আন্দোলন। ড. মন্দিরা রায় লিখেছেন-

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আমাদের নাট্য আন্দোলনের মরা গাঙে জোয়ার এনেছিলো। চল্লিশের দশকের এই নাট্য আন্দোলন আমাদের নাট্য-প্রেক্ষাপটে এনেছে সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সেই সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ ও আধুনিকতা।'

১০. রূপক ও সাংকেতিক নাটক কী?

উত্তর : রূপক ও সাংকেতিক নাটক বলতে বোঝায় এক বিশেষ ধরনের রচনা যাতে কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতি উপায় বা উপলক্ষ মাত্র এবং লক্ষ্য হচ্ছে কোন ভাব বা তত্ত্ব। আপাত কাহিনির সমান্তরালে অন্তর্নিহিত ভাবার্থটিকে ব্যক্ত করা হয় এখানে। সহজ কথায় যে নাটকে ভাব প্রকাশে রূপক বা সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তাকে রূপক বা সাংকেতিক নাটক বলে। ড. সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন-

'প্রত্যেক রূপক নাটকের মধ্যেই একটা কথা বলবার থাকে'।

CamScanner

নাটকে ব্যবহৃত এই রূপক বা সংকেত দর্শকের কল্পনায় এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে। কোন মানব সত্য বা অনুভূত সত্যকে একটি অর্থ সমন্বিত মহিমা দান করাই রূপক ও সাংকেতিক নাটকের কাজ। ভাব যে সংকেতের সাহায্যে অব্যর্থভাবে অনন্যচিত্তে সংক্রমিত করা যায় তার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি রূপক/সাংকেতিক নাটকগুলো।

১১. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কাব্যনাট্য রচনা নিয়ে লিখুন।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা নাটকে কাব্যনাট্য রচনার একটি প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', গণনায়ক প্রভৃতি কাব্যনাটক সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় সৃষ্টি। সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যনাট্যের আঙ্গিক। 'কিত্তনখোলা'য় ব্যবহৃত লোকজ ও কাব্যিক উপাদানগুলো নাটকটিকে করে তুলেছে কাব্যনাট্যগুণ সম্পন্ন। এস.এম. সোলায়মানের 'এই দেশে এই বেশে', মমতাজ উদ্দীনের 'রাজা অনুস্বারের পালা' ইত্যাদি নাটকেও কাব্যনাট্যের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর বর্তমান। 'এই দেশে এই বেশে' নাটকে উত্তর বাংলার গম্ভীরা গানের সংলাপ নির্ভরতা এবং রাজা অনুস্বারের পালা'য় ময়মনসিংহ গীতিকার রূপকল্প ব্যবহার কাব্যনাট্যাঙ্গনে স্মরণীয় সাফল্যের পরিচয়বাহী।

১২. আবদুল্লাহ আল মামুনের 'কোকিলারা' নাটকের বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক কোকিলারা (১৯৯০)। এ নাটকে নারীর ত্রিমাত্রিক রূপ ধরা পড়েছে শিল্পীত রূপে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সামগ্রিক অবস্থান মূল্যায়িত হয়েছে এক চরিত্রের এই নাটকে। কোকিলা তিন সত্তায় উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ এক নারী। সে পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছে তার ক্ষোভ- 'ততদিনে আমার বোঝা সারা, এই দুনিয়া আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষ গো লিগা।' মূলত তার কথা হচ্ছে এখানে মেয়েদের বাঁচার কোনো পথ খোলা নেই। এ দুনিয়াটা পুরুষের ফুর্তির জায়গা। তাই কোকিলা ঠিক করে সে আর বাঁচবে না, কেননা বাঁচলে আরও পুরুষ তাকে ভোগ করবে। তারচেয়ে মরে গিয়ে পরপারে খোদার কাছে বিচার চাওয়াই ভালো। তার গর্ভে যে পুরুষের সন্তান সে বিদেশ চলে গেছে। কোকিলা এখন অসহায়। সে বিদেশ চেনে না, সেখানে যাওয়ার পথও তার জানা নেই। সে তার সন্তানকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়। কেয়ামতের দিন আল্লাকে জিজ্ঞেস করবে, কেন তাকে নারী করে পাঠিয়েছে। মূলত অসহায় শক্তিহীন দুর্বল নারীর তীব্র আর্তনাদ ও প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে 'কোকিলারা' নাটক।

CamScanner

প্রবন্ধ সাহিত্য

১. প্রবন্ধ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : প্রবন্ধ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। সাধারণত কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাকে প্রবন্ধ বলে। এর মাধ্যমে কোন বিশেষ বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি বা বিষয় অন্তর্গত বক্তব্যকে চিন্তা এবং যুক্তির পরস্পর মিলনে উপস্থাপন করে। প্রবন্ধ সাধারণত গদ্যে লেখা হয় এবং দৈর্ঘ্যের দিক থেকে নাতিদীর্ঘ হয়। প্রবন্ধ প্রধানত দুই প্রকার।

✓ তন্ময় প্রবন্ধ : বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যেসকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় তাকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' 'বিজ্ঞান রহস্য', কাজী মোতাহার হোসেনের 'সংস্কৃতির কথা', মুনির চৌধুরীর 'বাংলা গদ্য রীতি' এ জাতীয় রচনা।

✓ মন্ময় প্রবন্ধ : যে প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি, মতামত ইত্যাদি প্রাধান্য পায় তাকে মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এ জাতীয় প্রবন্ধ।

বাংলা গল্প ও ছোটগল্প

১. 'পিঁজরাপোল', 'জেগে আছি' এবং 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থ তিনটির লেখকদের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : শওকত ওসমানের গল্পগ্রন্থ 'পিঁজরাপোল'। এ গ্রন্থে মূলত গ্রামজীবন আশ্রয়ী নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ইতিকথাই অঙ্কিত হয়েছে। ঘটনা, উপকরণ ও চরিত্র নির্বাচনে লেখক গ্রামীণ অভিজ্ঞতা নির্ভর। একই সাথে এতে ধনিক-শ্রেণির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত-শ্রেণি মানুষের প্রতিবাদের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি'। এ গ্রন্থের গল্পগুলোতে সমাজের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রাম-জীবনের পটভূমিকায় তিনি যেমন সংগ্রামী মানুষের পরিচয় তুলে ধরেছেন, তেমনি শহুরে পটভূমিতেও নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির সংগ্রামী মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। এ গ্রন্থে মোট আটটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলো নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবচিত্র নিয়ে লেখা। গ্রাম বাংলার কৃষকের শোষিত জীবন সংগ্রাম ও হতাশা গল্পগুলোতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

CamScanner

২. ছোটগল্প বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ ও জনপ্রিয় শাখা ছোটগল্প। ছোটগল্পের বিশেষ ধর্ম বিন্দুর মাঝে সিন্ধু দর্শন। এর দৈর্ঘ্য ছোট হয়, বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত হয়। সাধারণত ছোট গল্পে একটা বা দুইটা প্রধান চরিত্র থাকে। ছোটগল্পে জীবনের খুব ছোট একটা অংশ হঠাৎ করে শুরু হয় এবং হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এর রেশ থাকে বহুক্ষণ। বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর *'বর্ষাযাপন'* কবিতায় বলেছেন-

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্ত সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

বাংলা সার্থক ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার বহন করেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। এঁরা ক্লাসিক্যাল ছোটগল্পকার। কল্লোল গোষ্ঠীর হাতে গল্পে রোমান্টিক রীতির প্রবর্তন হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বাস্তবধর্মিতা প্রত্যক্ষ হয়।

৩. বনফুলের 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পের মূল বক্তব্য তুলে ধরুন।

উত্তর : বনফুলের 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পের কাহিনি শুরু হয় আসানসোল স্টেশনে। স্টেশনে অপেক্ষারত দুজন বাঙালি যাত্রী। একজনের হাতে একটি বাংলা উপন্যাস দেখে অন্যজন বইটি নিয়ে পড়তে শুরু করে। চমৎকার বই, রুদ্ধশ্বাসে পড়তে পড়তে ঘণ্টা দুই কেটে গেল। মালিক ভদ্রলোক পাঠককে বলে যে, তার ট্রেনের আর দেরি নেই। কিন্তু পাঠক পড়ায় মগ্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখে যে বইটির শেষের দিকে কিছু পাতা নেই। পাঠক বই-এর মালিকের উপর কিছুটা রাগত হয়ে বলে যে, বইয়ের শেষ পাতা নেই- তা পাঠকে জানায় নি কেন? এর দশ বছর পর পাঠক তার ভাগ্নিকে শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দিতে যায়। সে বাড়িতে পাঠকের দশ বছর আগের প্রিয় সেই বইটি দেখতে পায়। বইটা কয়েক পাতা পড়তেই কেমন খটকা লাগে। উল্টে পাল্টে নিশ্চিত হয়- সে বইটিই। কিন্তু দশ বছর আগে আসানসোল স্টেশনে পড়া বইটা তার কাছে এখন রাবিশ মনে হয়। আসলে সময়কে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। দশ বছরের ব্যবধানে নিভৃতে পাঠক মনের যে মৃত্যু হয়েছে ব্যক্তি পাঠক তা জানে না। এভাবে মূলত ব্যক্তি নয়, একজন পাঠকের মৃত্যু হয়েছে।

CamScanner

৪. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পের স্বরূপ সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছে। এ সময়ের অধিকাংশ ছোটগাল্পিক যুদ্ধোত্তর হতাশা অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন, উৎসাহী হলেন যন্ত্রণাদগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট জীবনের শিল্পমূর্তি সৃজনে। এ সময়ের গল্পকাররা বয়সে নবীন হলেও সমাজ, মানুষ, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে গল্প রচনায় তাঁরা প্রবীণ। স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনার প্রতি রয়েছে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যুদ্ধোত্তর সংকট, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক অভ্যুত্থান এবং শাসকশ্রেণির প্রতারণার বাস্তবতা তাঁদের গল্পের জীবন্ত বিষয়। সত্তরে রোমান্টিক ধারার গল্প লেখকরাও সামাজিক অসাম্য অস্থিরতা চিত্রিত করেছেন তাঁদের গল্পে। এই দশকে গল্প লেখকদের গল্প পাঠে দেখা যায়, তারা যে যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তার সবকিছু ছোটগল্পে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রাম ও শহর উভয়বিধ পটভূমি উঠে এসেছে ছোটগল্পের জমিনে।

কবি-সাহিত্যিকদের বর্ণনা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

১. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের উপজীব্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : অদ্বৈত মল্লবর্মণ নদী ও নদী তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায় নিয়ে রচনা করেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাস। তিতাস নদীর তীরবর্তী গোকর্ণঘাটের মালোপাড়া এ উপন্যাসের পটভূমি। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র কোন মানুষ নয় একটি নদী, নাম 'তিতাস'। এতে মৎসজীবীদের দুঃখ-দুর্দশা, রীতি নীতি, ধর্ম-সংস্কার, উৎসব সর্বোপরি তাদের জীবন যাপনের অনবদ্য কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। মাছ ধরার মতো আদিম উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল জেলেগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক শক্তির পাশাপাশি বাইরের সমাজের নানা অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গেও নিরন্তর লড়াই করতে হয়। মহাজন-আড়তদার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতা পর্যন্ত সবার শোষণচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়।

তিতাসের জলের দখলিস্বত্ব মালোদের। কিন্তু বিপুল জলরাশি শুকিয়ে তিতাসে চর জাগে। মালোদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পরে। ঋণ শোধ করতে না পারায় কোম্পানির প্রতিনিধি তাদের সর্বস্ব নিয়ে যায়-

> *'সব ছাঁকিয়া তুলিয়াও তেমন কিছুই আদায় হইল না দেখিয়া শেষে তারা ঘরের থালা-ঘটি-বাটি, সুতার হাঁড়ি, জালের পুঁটলি বাহির করিয়া নিয়া ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া চলিয়া গেল।'*

©Nazmus Sadat
CamScanner

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালো সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপন্যাসটিতে মালো তথা ধীবর সমাজের নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রামের কাহিনি করে তুলেছেন অবিনশ্বর ও অসাধারণ। এ উপন্যাসের মাধ্যমে নদীমাতৃক দেশের সাহিত্যের নদী সম্পর্কিত উপন্যাস ধারা পেয়েছে পূর্ণতা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১. 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। *[৩৭তম]*

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পে দেশের তিনটি ক্রান্তিকালীন মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া যায়। যথাক্রমে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়, স্বাধীনতাযুদ্ধের চলমান প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতা-উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জলছবি। এ গল্পের চরিত্র লালমিয়া। সে ঘুমের মধ্যে খোয়াব (স্বপ্ন) দ্যাখে। আসলে সে খোয়াব দ্যাখে না খোয়াব বানায় তার ঠিক নেই। তার স্বপ্নগুলি জাল (মিথ্যা), না সে স্বপ্নের জালে ক্রমাগত জড়িয়ে যায়, এই নিয়ে গল্প। লালমিয়া নাজির আলির লন্ড্রির ইস্ত্রি করার মজুর। খোয়াব দেখা বা খোয়াব তৈরি করা লালমিয়ার স্বভাব। বন্ধু ইমামুদ্দিন তার খোয়াব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করত। আবার ইমামুদ্দিনের মা তার মতো করে স্বপ্ন তৈরি করে নেয়। সে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ইমামুদ্দিনকে বীর মুক্তিযোদ্ধা করে তোলে। রাজাকার নাজির আলি বাংলাদেশের জন্মের পর ঢাকা থেকে পালিয়েছিল। তারপর সব ঠিকঠাক করে ফিরে এসে সে ক্ষমতাধর হয়। লালমিয়া মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। সে ইমামুদ্দিনের এতিম বাচ্চা বুলেট আর তার মায়ের জন্য আহার জোগাড় করেছিল। লালমিয়া যাদের খোয়াবে দ্যাখে, তাদের পায়ের পাতা পিছনে। তারা সম্মুখে এগোতে গেলে পিছনে চলে যায়। লালমিয়ার উল্টা পায়ের জীনের স্বপ্ন পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। গল্পে আসলে উল্টো পা দ্বারা বাঙালির পশ্চাদপদতাকে বোঝানো হয়েছে। অল্প কয়েকটি চরিত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ের স্বপ্নভঙ্গ আর স্বপ্নকথার বয়ান করেছেন নির্মোহ ও সামগ্রিক ফ্রেমে।

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশি কথাসাহিত্যিক। একজন স্বল্পপ্রজ লেখক। দু'টি মাত্র উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬) বাংলা সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় আসন নির্মাণ করে দিয়েছে। 'চিলেকাঠার সেপাই' উপন্যাসে তিনি উপজীব্য করেছেন এ দেশের রাজনীতির পাকিস্তান পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ঊনসত্তরের গণআন্দোলনকে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের

CamScanner

ঘটনা, স্থান কাল, চরিত্র চিত্রায়ন করেছেন পূর্ব বগুড়ার কাৎলাহার বিল এবং বিল পাড়ের মৎস্যজীবী আর শ্রমজীবী, ভূমিহীন কৃষকদের জীবনাখ্যানকে কেন্দ্র করে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ইতিহাসমোথিত সময়, মানুষ আর সমাজকে উপজীব্য করেছেন তাঁর উপন্যাসে। রাজনীতি আমাদের জীবনের একটি প্রধান নিয়ামক হলেও রাজনীতির সঙ্গে লেখকরা সবসময়ই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসই প্রথম এতটা সার্থক শিল্পসম্মতভাবে প্রধান দুটি আন্দোলনকে তার দুই উপন্যাসে ধারণ করেছেন। একই সাথে সেই অঞ্চলের মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-যন্ত্রণা, আন্দোলন সংগ্রামের কথা নৈপূণ্যের সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি জানতেন ঔপন্যাসিকের এটিই মূল কাজ।

৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনার উপজীব্য লিখুন।

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যের ভিত্তি গভীর জীবনবোধ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধে তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনাচরণ অন্বেষণ করেছেন। সমাজ-সংস্কৃতিতে বাঙালির অবস্থান, ইতিহাসে বাঙালির স্থান, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, শ্রমজীবী মানুষের কর্মতৎপরতা ইত্যাদিকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সাহিত্যে সংযোজন করেছেন। গুরু-গম্ভীর বিষয়কে তিনি সহজ করে উপস্থাপন করেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে তিনি তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর 'চিলে কোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' দুটো উপন্যাসই মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে লেখা। ছোটগল্পগুলোও খুব ঘন সন্নিবদ্ধ সমাজচিত্র ও মানবিক সম্পর্ক নিয়ে প্রচ্ছন্ন অথচ জোরালো বক্তব্যে ঠাসা। তার চেতনা ও সৃষ্টিতে রয়েছে আধুনিক সমাজচিন্তা ও জীবনজিজ্ঞাসা। রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সব আলোচনাই তার কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর লেখা প্রতিশোধ, অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোঁয়ারি, মিলির হাতে স্টেনগান, অপঘাত, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল, রেইনকোট প্রভৃতি গল্পে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে।

৪. 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসের উপজীব্য কাৎলাহার বিলের দু'ধারের চাষী-মাঝিদের জীবনচরিত। তমিজ, তমিজের বাপ, ফকিরের নাতনী কুলসুম, চাষীর মেয়ে ফুলজান, বৈকুণ্ঠ-পূর্ব বাংলার এমন সব প্রান্তিক চরিত্রের সমাহার রয়েছে উপন্যাসে। এদের জীবনের ঘটনাসমূহের বর্ণনাতেই সামনে হাজির হয় গ্রামীণ প্রান্তজনের চিরকালীন ক্ষুধা, কান্নার গল্প। উপন্যাসের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পরে ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রচণ্ডভাবে আসে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ।

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বাধীন পাকিস্তান জন্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানপন্থীদের মতামত বোঝা যায়-

'হিন্দু মুসলমান চাষার রক্ত চুষে শেষ করে ফেলল।... হিন্দু জমিদার ফুটানি মারে মুসলমান প্রজার রক্ত চুষে। পাকিস্তান না হলে মুসলমানের জানমাল-ইজ্জত সব বিপন্ন।'

পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর দরিদ্র মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ, দেশভাগের নিমিত্তে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা কোনকিছুই এড়িয়ে যাননি ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

খোয়াব অর্থ স্বপ্ন। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাচঁতে পারে না। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের কুশীলবরা সবাই স্বপ্ন দেখে। শরাফত মণ্ডল স্বপ্ন দেখে আরো বেশি ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ার, মণ্ডলের ছেলে আব্দুল কাদির স্বপ্ন দেখে স্বাধীন পাকিস্তানের। তমিজ স্বপ্ন দেখে এক টুকরো ধানী জমির। খোয়াব বা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় চেরাগ আলী ব্যবহার করে ছেঁড়াখোঁড়া একটি বই। আর এই ছেঁড়াখোঁড়া বইটি যেন বাঙালি জাতির 'খোয়াবনামা'। একটা জাতির প্রায় বারশ বছরের বিশ্বাস, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বিবরণ, বৈচিত্রপূর্ণ শ্লোক চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে এতে।

৫. আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের 'চিলে কোঠার সেপাই'র বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস 'চিলে কোঠার সেপাই' (১৯৮৬)। এর প্রেক্ষাপট মূলত ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। আন্দোলন পরবর্তী সময়ে শ্রমজীবি মানুষ কিভাবে প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছে এবং বামপন্থীদের দোদুল্যমানতা ইত্যাদি বর্ণনার এক চমৎকার আখ্যান 'চিলেকোঠার সেপাই'। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ওসমান। কিন্তু উপন্যাসের মূল ঘটনাবলীর সাথে তার সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। ওসমান চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যবিত্তরা উপরে উঠতে চায়, নিচে নামতে চায় না। ফলে আন্দোলন সংগ্রামে তাদের কাছে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ আশা করা যায় না। বিপরীতে দেখিয়েছেন প্রান্তের মানুষ হাড্ডিখিজির আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। লেখক বুঝাতে চেয়েছেন হাড্ডি খিজিরদের মত নিম্নবিত্তদের দ্বারাই বিপ্লব সংগঠিত হয়। কারণ তাদের আর হারাবার কিছু নাই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে অপূর্ব ভাষা ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ধারায় তাই স্থান পেয়েছে বাংলার সংগ্রামী জনতার স্লোগান-

'শহীদের রক্ত- বৃথা যেতে দেবো না, আইয়ুব
শাহী জুলুম শাহী, ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক।'

CamScanner

বিষয়বস্তুর নিরিখে 'চিলেকোঠার সেপাই' ৬৯-এর রাজনৈতিক দলিল কিন্তু ভাষা ব্যবহারের উপন্যাসটি আঞ্চলিক ও চলিত গদ্য রীতির নমুনাবিশেষ। যেমন বগুড়া অঞ্চলের ভাষা-

'... জরিমানা কও, দণ্ড কও, ট্যাকসো কও-ইগল্যান কি? ভাইজান?'

'চিলেকোঠার সেপাই'কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায়; কারণ এর মাধ্যমে লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস বললেও ভুল হবে না। লেখক ইতিহাস থেকে এর উপজীব্য গ্রহণ করেছেন।

৬. 'সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধগ্রন্থ 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু'। সংস্কৃতির সেতু ভাঙা থাকলে ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্র কোন পথে এগোবে, তার গন্তব্য কতটা ইতিবাচক হবে, তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে, উত্তরপ্রজন্মকে তার দেওয়ার মতো কী থাকবে, তার বৈশ্বিক যাত্রা কতটুকু গতিশীল হবে-এ জিজ্ঞাসাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে আসে। সংস্কৃতি, শিল্প সম্পর্কে একেবারে মৌলিক ধারণা এবং তার পরিব্যপ্তি জানতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এ রচনা অনন্য। খুব সহজ করে বাংলা সংস্কৃতিকে জানতে, জানাতে এবং তার উল্টোপথে চলার নানান অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের একেবারে গভীর থেকে মানুষকে দেখার ও তার সংস্কৃতিকে জানার বিষয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে দক্ষ একজন মানুষ সেটি তার প্রতিটি প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির ভাঙা সেতু বলতে লেখক হয়ত বুঝাতে চেয়েছেন বাঙালির জীবনযাত্রায় সংস্কৃতি সম্যক চর্চারূপে না হয়ে প্রদর্শন ও নিদর্শনের চিহ্ন রূপে লক্ষিত হয় বলে তা লোকান্তরের যোগসূত্রের ভগ্নদশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পের মূলবক্তব্য লিখুন।

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' এর সর্বশেষ গল্প 'রেইনকোট' (১৯৯৫)। গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ে রচিত হয়েছে। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণের ফলে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে এবং তাদের মধ্য থেকে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করে। নুরুল হুদা এই গল্পের কথক। তার জবানিতে গল্পের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র। গেরিলা আক্রমণের পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেয়ে নুরুল হুদা যে রেইনকোটটি পরে কলেজে যায় সেটি তার শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মন্টুর। মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম- তারই প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে।

CamScanner

৮. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের স্বরূপ নির্ণয় করুন।

উত্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি মাত্র পাঁচটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন- অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোঁয়ারি, দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল। তার গল্পে উঠে এসেছে মানুষের যাপিত জীবনবোধের যাতনাময় ও বহুমাত্রিক চিত্রায়ন। মানুষের মতো বিভিন্ন রাস্তাঘাট, পুরান ঢাকার বাড়ি, সড়ক, অলিগলি এমনকি রাস্তায় সাইনবোর্ড পর্যন্তও তার গল্পে প্রাণ পায়। সমাজের বাস্তব চরিত্রগুলোকেই তিনি উপস্থাপন করেছেন তার গল্পে। গল্পের চরিত্রগুলোকে কাহিনির ঠিক ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে উপযুক্ত ভাষায় কথা বলানো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের প্রধান শক্তি। তার গল্পভাষা বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ মন্তব্যটি হলো-

> *'ভাষার প্রাণবন্ততার জন্য যেমন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন আছে, তেমনি slang শব্দের প্রয়োজন আছে। উচ্চভাব প্রকাশের গদ্যে slang সুষ্ঠু প্রকাশ দিতে পারে।' [সুবোধ ঘোষ, ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো, দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৯, কলকাতা]*

তার গল্পে রয়েছে সংগ্রামী গ্রামীণ মানুষের পালাবদলময় জীবন, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিরন্তর সংগ্রামী চরিত্রের আনাগোনা। তিনি গল্পে মানুষের হতাশা, বঞ্চনা, অবহেলা, ভণ্ডামিপনা, অবক্ষয়জনিত জীবন, নোংরামি-ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ জীবনের পথ থেকে উত্তরণের জন্য নানা কৌশল বা নোংরামি-মানবসমাজের মুখোশধারীদের স্বরূপ নির্মোহ ভঙ্গিতে পাঠকের সম্মুখে উন্মোচন করেছেন।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

১. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিন। ***[৪৩তম বিসিএস]***

উত্তর : আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২) একজন গীতিকার, লেখক, সাংবাদিক। বাংলা ভাষার দাবিতে প্রাণ দেওয়া শহিদদের স্মৃতির স্মরণে তিনি লিখেছিলেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। শুধু এ গানটির জন্যই একজন গীতিকার হিসাবে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

তার সাংবাদিকতার কর্মজীবন প্রধানত ইনসাফ থেকে শুরু করে আজাদ, সংবাদ, ইত্তেফাক ও পূর্বদেশের মতো দৈনিক পত্রিকা ঘিরে আবর্তিত। এরই মধ্যে একাধিক সাপ্তাহিক, কচিৎ মাসিক পত্রিকায় কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের মুখপাত্র 'জয়বাংলা'য় কাজ করেন। ১৯৭৪ সালে অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে চলে যান। এরপর সেখানেই স্থায়ী হন। সেখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখতেন।

CamScanner

সাংবাদিকতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, কিশোর উপন্যাসও লিখেছেন। 'ডানপিঠে শওকত', 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', 'নাম না জানা ভোরে', 'নীল যমুনা', 'শেষ রজনীর চাঁদ' ও 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'র মতো ৩৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' নামের একটি ফিল্মও প্রযোজনা করেন। সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৯ সালে তিনি স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি একুশে পদক, ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পদক, সংহতি আজীবন সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আবু ইসহাক

১. 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের বিয়ষবস্তু আলোচনা করুন ।

উত্তর : আবু ইসহাকের বিখ্যাত উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৪৮)। উপন্যাসের পটভূমি পঞ্চাশের মন্বন্তর, ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ, নবগঠিত পাকিস্তান নিয়ে বাংলার মানুষের আশাভঙ্গ, গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, মোড়ল শ্রেণির মানুষের ষড়যন্ত্র, সর্বোপরি গ্রামীণ নারীর জীবন সংগ্রাম ও প্রতিবাদী চেতনা। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বহু দরিদ্র মানুষ প্রাণ হারায়। স্বামী পরিত্যক্ত জয়গুন শহরের লঙ্গরখানায় আশ্রয় নেয়। একসময় জয়গুন তার ছেলে-মেয়ে ও ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্রদের সাথে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। অপয়া বলে পরিচিত পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বি ভিটেতে সূর্যদীঘল বাড়ী তৈরি করে। যেখানে রাতে ঘরে কথিত ভূতের ঢিল পড়ে। সেই বাড়িতে থেকে তারা জীবনযুদ্ধে প্রাণপন লড়াই করে। উপন্যাসের শেষ দিকে জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী এক রাতে দেখে ফেলে রাতে ভূত হয়ে বাড়িতে ঢিল ছোড়া মোড়ল গদু পরধানের কারসাঁজি। সেই রাতের আঁধারেই গদু পরধান তাকে হত্যা করে এবং দিনের আলোতে প্রচার করে এ হত্যাকাণ্ড ভূতেরই কাজ। তখন এ বাড়িতে থাকার সাহস জয়গুন হারিয়ে ফেলে, পাড়ি জমায় অজানার পথে। জয়গুন, হাসু, মায়মুনা, শফি, ডা. রমেশ চক্রবর্তী প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, মোড়ল মোল্লাদের দৌড়াত্ম্য ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

১. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'। এতে ৩৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। মাতৃবেদনার স্মৃতি দিয়ে শুরু করেছিলেন কাব্য যাত্রা, শেষ অধ্যায়ে এসে নিজেকে উত্তীর্ণ করেছেন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার কাব্যকথক রূপে। এতে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে কবি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের

©Nazmus Sadat
CamScanner

আলোকে ব্যক্ত করেছেন। কবিতায় উল্লিখিত পিতৃপুরুষের ঋজু ভাব বা পলিমাটির সৌরভ কিংবা রক্তজবার মতো ক্ষতের দাগ আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এক একটি প্রতীক। সংগ্রামশীল মানুষের সমষ্টিগত চেতনাকে নানা বর্ণের ছবি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন সহজিয়া ভঙ্গিতে। ফলে কাব্যটি দেশ প্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত বহন করে। তার সহজিয়া সুর শব্দ ব্যবহার বা উপমা নির্মাণে তৎসম শব্দের সাবলীল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কবিতা মানুষের জন্য, জীবনের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য- এ সত্যকে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদ

১. আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' গ্রন্থের ব্যঙ্গরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ গল্পের সংকলন 'আয়না' (১৯৩৫)। এতে সাতটি গল্প রয়েছে- হুযুর কেবলা, গো দেওতা কা দেশ, নায়েবে নবী, লীডারে কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সংঘ ও ধর্মরাজ্য। 'বিদ্রোহী সংঘ' গল্পে কেবল রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রয়েছে, বাকি গল্পগুলোতে ধর্মীয় ব্যঙ্গ উঠে এসেছে। মসজিদ, মন্দিরে, বক্তৃতার মঞ্চে মানুষ নামের মুখোশ পরা বন মানুষদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন তার 'আয়না' গ্রন্থে। আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ শুধু ব্যঙ্গ নয়, কিছুটা রঙ্গও। তার ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন তা হয় ব্যঙ্গ, কিন্তু যখন কামড়ায় তখন সাপের মতো। তিনি ব্যঙ্গকে ভদ্র চেহারা দিতে কিছুটা কৌতুক মিশিয়েছেন। তাঁর আঁকা প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের নিজস্ব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। লেখক উপলব্ধি করেছিলেন একটি আয়নার প্রয়োজন, যে আয়নায় দেশের সবাই নিজ নিজ মুখ দেখতে পাবে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন-

> *'এমনি আয়নায় শুধু মানুষের বাইরের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। কিন্তু আমার বন্ধু শিল্পী আবুল মনসুর যে আয়না তৈরি করেছেন, তাতে মানুষের অন্তরের রূপ ধরা পড়েছে।'*

২. 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : আবুল মনসুর আহমদ রচিত গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বইটি রচনা করেছেন। ব্যক্তি জীবনে রাজনীতির যেসব অঙ্গনে বিচরণ করেছেন কিংবা যেসব ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছেন সেসব ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে বইটিতে। বইটির নাম রাজনীতির পঞ্চাশ বছর হলেও এটি ষাট কিংবা তারও বেশি সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের দলীল। এ বইয়ের বর্ণনা এত বৃহৎ পরিসরের ও তথ্যবহুল যে, শুধু এর ঘটনাসমূহ যদি পরপর বলা হয়, তাহলেও একটা মাঝারি আকারের বই হয়ে যেতে পারে। এই

বইয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন অখন্ড ভারতের রাজনীতি, সে সময়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলি। বর্ণিত হয়েছে ভারত খন্ডিত পাকিস্তানের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলি, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হবার সূচনালগ্ন। এরপর আছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত বর্ণনা। কৌতূহলী পাঠক, ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে বহুদিন ধরেই এ বই একটি মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-আকর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আবুল হাসান

১. 'পৃথক পালঙ্কে'র লেখক কে? তিনি কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন? *[৩৪তম]*

উত্তর : 'পৃথক পালঙ্ক' (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থের লেখক আবুল হাসান। তিনি বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি ও সাংবাদিক। ১৯৪৭ সালে ৪ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার বর্ণি (মাতুলালয়) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরের ঝনঝনিয়া গ্রাম। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল হোসেন মিয়া। ১৯৭০ সালে এশীয় কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আল মাহমুদ

১. 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কার রচনা? তাঁর রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ 'পাখির কাছে ফুলের কাছে'। বইটি তার শিশুতোষ ছড়া তথা কিশোর কবিতাগ্রন্থ। তার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ- লোক লোকান্তর (প্রথম কাব্য), সোনালী কাবিন, কালের কলস, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো প্রভৃতি।

২. কবি আল মাহমুদের কবি মানসের পরিচয় দিন।

উত্তর : আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ এক অনন্য জগৎ তৈরি করেন। সেই জগৎ স্নিগ্ধ-শ্যামল, প্রশান্ত গ্রামীণ জীবন নিয়ে গঠিত। বাংলা কবিতার শহরমুখী প্রবণতার মধ্যেই তিনি ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদী নির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে কবিতায় অবলম্বন করেছেন। নারী ও প্রেমের বিষয়টি তার কবিতায় ব্যাপকভাবে এসেছে। আধুনিক কবিতায় স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ তার অনন্য কীর্তি। তিনি কবিতায় যে মৌলিকত্ব, ক্ষমতা ও শক্তির সাথে বাংলাদেশকে ধারণ করেছেন, তা অনন্য। আল মাহমুদের কল্যাণে বাংলা ভাষা কলকাতা থেকে ধার করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পূর্ববঙ্গীয় চেহারা ধারণ করেছে। বাংলা কবিতার

রাজধানীকে কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করার কৃতিত্ব এককভাবে যদি আল মাহমুদকে দেয়া হয়, তাতে ভুল হবে না। হুমায়ূন আহমেদ যদি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের রাজা হয়ে থাকেন, তবে আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে কবিতার জগতে একচ্ছত্র সম্রাট।

৩. 'সোনালী কাবিন' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : আল মাহমুদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সোনালী কাবিন'। মানুষ ও মানবতা এ কাব্যের প্রধান বিষয়। প্রেম-ভালবাসার বন্ধন যেমন আছে, তেমনি আছে বিপ্লব-বিদ্রোহের ধারালো সুর। পুরো কাব্যগ্রন্থে গ্রামীণ আবহে উঠে এসেছে বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রমের কথা। বাদ যায়নি যৌন প্রসঙ্গও। এসবের মধ্যেই তিনি ইতিহাসকে নিয়ে এসেছেন অবলীলায়, তাকে প্রবেশ করিয়েছেন অনুভূতির মাঝে, তার সৌন্দর্যময় শব্দচয়নে। মৃত্যু চিন্তার অনুভূতিগুলো ফুটে উঠেছে বিদগ্ধ শব্দ চয়নে। বাংলাদেশের মাটির গহীন থেকে উঠে আসা গ্রাম্য গন্ধ লেগে আছে এ কবিতাগুলোতে। শহর এবং নাগরিক যুগপৎ অনুপ্রবেশ এ কাব্যের মহিমাকে সমুজ্জ্বল করেছে। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা বাঙালির ঐতিহ্য দানা বেঁধে স্লোগান তুলেছে সোনালী কাবিনে। 'সোনালী কাবিন' এর পর আল মাহমুদ যদি আর কোন কবিতা নাও লিখতেন তবুও তিনি বাংলা কাব্যাকাশে চির ভাস্মর হয়ে থাকতেন।

৪. 'নোলক' কবিতায় কবি হৃদয়ের কী আকুতি ফুটে উঠেছে?

উত্তর : আল মাহমুদের বিখ্যাত কবিতা 'নোলক'। কবিতাটি 'লোক লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। নোলক আবহমান বাঙালি মায়েদের নাকের অলংকার। নোলক মায়েরা আগলে রাখে যতোটা না অলংকার হিসেবে তার চেয়ে বেশি সংস্কৃতির গৌরব হিসেবে।

কবি 'নোলক' কবিতাটি লিখেছেন তাঁর দেশপ্রেম থেকেই। 'মা' বলতে এখানে তিনি দেশকেই বুঝিয়েছেন। আর তাঁর 'নোলক' হলো মায়ের সধবার অহঙ্কার। সম্মানের তথা স্বাধীন সংস্কৃতি লালনের অধিকার। 'নোলক' হলো দেশের স্বাধীনতা সংহত করার, উন্নতির সোপানের উপমা। যার জন্য এদেশের মানুষ বার বার রক্ত ঝরিয়েছে। সেই অর্জিত সম্মান বা চেতনা যখন ভুলুণ্ঠিত হতে দেখেছেন তখনই কবির হৃদয় ডুকরে উঠেছে।

কবি এখানে আক্ষরিক অর্থে নোলক খোঁজেননি, খুঁজেছেন এর ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্যকে। কবি উপমার আশ্রয় নিয়ে যখনই যাদের কাছেই হারানো ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন, তারাই নিজেদের সমৃদ্ধিকেই কবির সামনে মেলে ধরেছেন, যা দেখে কবি

CamScanner

মন আহত হয়েছে, তাই ক্ষোভে, দুঃখে হারানো 'নোলক' খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ঘরে না ফেরার অঙ্গীকার করেছেন-

'এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।'

মায়ের হারানো নোলক খুঁজতে গিয়ে কবি যে প্রাকৃতিক সম্পদ দেখিয়েছেন এখন তার সবকিছুই হুমকির মুখে। এই প্রকৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে কবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন।

আলাউদ্দীন আল আজাদ

১. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : আলাউদ্দিন আল আজাদ এর প্রথম উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০)। জাহেদ নামে একজন শিল্পীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। জাহেদের আঁকা চিত্র 'মাদার আর্থ' করাচিতে এক আর্ন্তজাতিক একজিবিশনে প্রথম পুরস্কার পায়। এই ছবিটা আঁকার পেছনের গল্পই উপন্যাসের মূল কাহিনি। ছবি আঁকার সূত্রে চিত্রশিল্পী জামিলের বাসায় জাহেদের যাতায়াত। একসময় জামিলের ছোটবোন 'ছবি'র সঙ্গে জাহেদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জামিলের স্ত্রী মীরার মধ্যস্থতায় ছবি ও জাহেদের বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই জাহেদ ছবির শরীরে সন্তান জন্মদানের চিহ্ন আবিষ্কার করে। পরে জানতে পারে জামিলের এক পরিচিতজনের দ্বারা ছবি ধর্ষিত হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে সন্তানটি নষ্ট করে ফেলা হয়। জাহেদের সাথে বিবাহিত জীবনে ছবি আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়। জাহেদ কি তাকে গ্রহণ করবে? এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে জাহেদ সহশিল্পী মতলুবের কথা মনে পড়ে- সন্তান মারা যাবার পর মতলুব উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিল। জাহেদ স্বাভবিকভাবেই ছবি ও তার সন্তানকে গ্রহণ করে সংসার ধর্ম পালন করে। উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ফ্রয়েডিয় যৌনতত্ত্ব, দর্শন, আত্মদ্বন্দ্ব, মূল্যবোধ প্রভৃতি গল্পের আড়ালে ফুটে উঠেছে।

২. গল্পকার হিসেবে আলাউদ্দীন আল আজাদের পরিচয় লিখুন?

উত্তর : বাংলাদেশের ছোটগল্প যাদের মনন, মেধা ও শ্রমসাধনায় উন্নত হয়েছে আলাউদ্দীন আল আজাদ তাঁদের অন্যতম। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত আলাউদ্দীন আল আজাদ ছিলেন সমাজমনস্ক শ্রেণিসচতেন প্রগতিশীল কথাশিল্পী। কিন্তু ষাটের দশক থেকে সমাজবাস্তবতা ও শ্রেণিচেতনার পরিবর্তে মানুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষা, লিবিডো তাড়না এবং কালিক নির্বেদই হয়ে ওঠে তাঁর মানসদৃষ্টির মৌলসূত্র। তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে দেশ কাল শ্রেণিসচেতন মানসতার

সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। 'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১), 'মৃগনাভি' (১৯৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রেণিচেতনায় সজাগ থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন মানবতার অপরাজেয় গৌরবগাঁথা। দ্বিতীয় পর্বে মনোবিকলন ও মনোগহনের শিল্পরূপ হিসেবে তার 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৮), 'উজান তরঙ্গ' (১৯৫৯), যখন সৈকত (১৯৬৭), জীবন জমিন (১৯৮৮) প্রভৃতি। তিনি গল্পের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা ব্যবহারে সচেতন শিল্পদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। ছোটগাল্পিক সংহতি নাটকীয়তা এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আহমদ ছফা

১. 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' কী? এর লেখক কে? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের সুবিধাবাদী আচরণের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে আহমদ ছফা 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (১৯৭২) বইটি প্রকাশ করেন। দেশবিভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ- দীর্ঘ সময়ে বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে আত্মবিক্রির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন, কীভাবে পুরস্কার, পদক-পদবির জন্য মরিয়া ছিলেন, তা তথ্য উপাত্তসহ উপস্থাপন করেছেন। ছফার ভাষায়-

'আগে বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি ছিলেন, বিশ্বাসের কারণে নয়- প্রয়োজনে। এখন অধিকাংশ বাঙালি হয়েছেন সেও ঠেলায় পড়ে।'

দেশস্বাধীন হওয়ার আগে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা, গল্প-উপন্যাসে পাকিস্তান প্রশস্তি, স্বৈরশাসকের জীবনী অনুবাদ- এসব বিষয়কে ছফা দেখেছেন লেখকদের মেরুদণ্ডহীনতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগমুহূর্তে লেখক সমাজের নিষ্ক্রিয়তা, যুদ্ধের সময় দ্বিধান্বিত ভূমিকা, ভারতে পালিয়ে বেড়ানো, ভোগবিলাসে মত্ত থাকার প্রসঙ্গ আহমদ ছফা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামো আমূল পরিবর্তন হবে না।'

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' এর ২৫ বছর পূর্তিতে 'সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' (১৯৯৭) শিরোনামে গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২. 'ওঙ্কার' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : আহমদ ছফা'র 'ওঙ্কার' উপন্যাসটি ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে লেখা। এ উপন্যাসের নায়কের বাবা ব্রিটিশ আমলের একজন তালুকদার। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ায় তালুকদারদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। দালাল শ্রেণির নব্য ধনীদের প্রতিনিধি আবু নসর মোক্তার কৌশলে তালুকদারের জমিজমা নিয়ে নেয়

CamScanner

এবং তার বোবা মেয়েকে তালুকদারের ছেলের সাথে বিয়ে দেয়। সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষমতাবলে আবু নসর জামাইকে চাকুরী এবং শহরে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। নায়ক, বউ আর ছোটবোনকে নিয়ে শহরে থাকে। দেশের আন্দোলন সংগ্রাম বোবা বউকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। রাজপথে মিছিল হলে নায়ক দরজা জানালা বন্ধ করে পালিয়ে থাকতে চায়, কিন্তু তার বউ দরজা খুলে মিছিলে যোগ দিতে চায়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় গণঅভ্যুত্থানে আসাদের মৃত্যুর পর জনতার মিছিলটি বাড়ির সামনে এসে পড়লে তখন মিছিলের সাথে বোবা মেয়ে বলে ওঠে 'বাঙলা'। বলার সাথে সাথে তার গলা থেকে গলগল করে রক্ত বেড়িয়ে আসে। তখন তার স্বামী ভাবে কোন রক্ত বেশি লাল আসাদের না তার বউয়ের? এখানেই শেষ হয় উপন্যাস। ছোট পরিসরে, অল্প কথায় বাঙ্গালীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আন্দোলনমূখর দিনগুলো ব্যক্ত করে আহমদ ছফা উপন্যাসটিকে বিশালতা দান করেছেন।

৩. আহমদ ছফার 'অলাতচক্র' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : মহান মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আহমদ ছফার উপন্যাস 'অলাতচক্র'। উপন্যাসের নায়ক দানিয়েলের জবানিতে লেখা অনেকটাই আত্মজীবনী ধাঁচের উপন্যাস। দানিয়েল লেখালেখি করতেন, একসময় রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয় দানিয়েল। সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েও না পেরে কলকাতায় উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করে। উপন্যাসে যুদ্ধপরিস্থিতির বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনায় উঠে এসেছে- কলকাতায় আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের কষ্ট, তাদের প্রতি কলকাতার মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী নেতাদের কলকাতায় ফুর্তির চিত্র। মুজিবনগর সরকারের এক মন্ত্রী ধরা পড়ে নিষিদ্ধ পল্লিতে, কেউ বা আরামে দিন কাটায় থিয়েটার রোডে। বিপরীতে ট্রেনিং ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধারা পার করছিল কঠিন সময়। এছাড়া একটি খণ্ডচিত্রে রয়েছে বাংলাদেশের কথিত বুদ্ধিজীবিরা তখন কী করে বেড়িয়েছেন। উপন্যাস জুড়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ঘিরে এক মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। যেন রণক্ষেত্রের বাহিরে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া আরেকটা মুক্তিযুদ্ধের চিত্র।

আহমদ শরীফ

১. প্রাবন্ধিক হিসেবে আহমদ শরীফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : আহমদ শরীফ ছিলেন শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গবেষক। তার লেখনীতে মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের যৌগিক সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছে। তার রচিত প্রবন্ধসমূহে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, বিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিত্যাগ

CamScanner

করেছিলেন। পঞ্চাশ দশক হতে নব্বই দশকের শেষাবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন ও ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আন্তরিকভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে আমৃত্যু লিখেছেন। সেই সঙ্গে সংস্কারমুক্ত একটি বৈষম্যহীন সামাজিক রাষ্ট্রের চিন্তাই তার লেখায় উঠে এসেছে বারবার। সমাজ পরিবর্তনকারীদের কাছে আজো তার লেখার জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়।

আহসান হাবীব

১. আহসান হাবীবের কবিমানসের স্বরূপ সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : বাংলা কবিতায় আধুনিক মননশৈলী নির্মাণে আহসান হাবীবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কবিতায় জীবন দর্শনের শিল্পরীতি, চৈতন্য জুড়ে তীব্র দহন, অস্তিত্বের সংকট, মধ্যবিত্ত জীবনের আকাংখার স্বরূপ নির্মাণে নিজস্ব বলয় তৈরি করেছেন। তিনি নির্মাণ করেছেন স্বদেশলগ্নতা, জীবন ঘনিষ্ঠতা, মানবিকবেদনাবোধ থেকে উৎসারিত আত্মজৈবনিক কাব্য শৈলী। তিরিশের কাব্যে আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্র-নজরুল যুগের কাব্যকলার সংমিশ্রণে দেশ ও জীবনবোধের ঘনিষ্টতায় নতুন আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সূচনাক্রমে উদ্ভাসিত হয়েছে আহসান হাবীবের রচনাকর্ম। তার প্রেমের কবিতা সমকালীন অন্যান্য কবিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য। কবি হিসেবে তিনি আধুনিক কবিতায় যোগ করেছেন নতুন মাত্রা। আহসান হাবীব উত্তরাধুনিকতার পথেরও পথিক। উভয় বাংলার কাব্য পটভূমিতে আহসান হাবীবের কাব্য চিন্তা ও রচনাকর্ম পথিকৃৎ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। হুমায়ুন আজাদ বলেছেন-

> *'আহসান হাবীবের কবিতাই আমাদের আধুনিকতা চর্চার প্রকৃত সোপান তৈরি করেছেন। তিরিশের কবিরা কবিতায় যে রবীন্দ্রত্তোর ধারা প্রবাহিত করেছেন আহসান হাবীব তাতেই অবগাহন করেছেন।'*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১. 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' কে? কেন বলা হয়? *[৩১তম, ১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির স্বল্পতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে একটি স্বতন্ত্র যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর এ সময়টাকে 'অবক্ষয় যুগ' বা 'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে অভিহিত করা হয়। অথবা মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় আর আধুনিক যুগের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই দুইজনের মধ্যবর্তী (১৭৬০-১৮৬০) সময়কে বলা হয় অবক্ষয় যুগ বা যুগসন্ধিক্ষণ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সময়ের কবি

বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। তাঁর রচনায় মধ্যযুগের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, আবার আধুনিক যুগেরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় পুরাতনকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা আছে বলে তাঁকে প্রাচীনকালের শেষ কবিও বলা হয়। যুগ সন্ধিক্ষণের ফসল হিন্দু কবিওয়ালাদের কবিগান আর মুসলমান শায়েরদের দোভাষী পুঁথি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি' বলা হয়।

২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' বলা হয় কেন?

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতা আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়। সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতাগুলোর জন্য তার সর্বাধিক খ্যাতি। দেশ ও সমাজের প্রতি তার অনুরাগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তিনি বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য যে আন্দোলন করেছেন তা আজ স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি একদিকে মধ্যযুগের দেবমাহাত্ম্য ব্যঞ্জক বিষয় থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে 'পাঁঠা', 'আনারস', 'তপসে মাছ' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেন; অন্যদিকে তৎকালীন কবিওয়ালাদের জিম্মা থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে তিনি নাগরিক বৈদগ্ধ ও মার্জিত রুচির আলোয় নিয়ে আসেন। তিনি সবসময় ইংরেজি প্রভাব বর্জিত খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করতেন। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে 'খাঁটি বাঙালি কবি' বলে অবহিত করেছেন।

৩. ঈশ্বচরচন্দ্র গুপ্তের কবি প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা এই মধ্যবর্তী সময়টাতে ঈশ্বরগুপ্তের কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। সামাজিক ও ব্যঙ্গকবিতাগুলোর জন্য তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সমাজসংক্রান্ত কবিতার বিষয়বস্তুও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমাজ সচেতনতা তাঁর কাব্যেই প্রথমবারের মত ফুটে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি। চারদিকের জীবন তার দৃষ্টিতে কৌতুকের উপাদেয় উপকরণ হিসেবে ধরা পড়েছিল। নৈতিকতা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনেও ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন। ব্যঙ্গের সুনিপুণ শব্দগ্রন্থিতে ও অনুপ্রাসের আন্দোলনে পাশ্চাত্য সাহেবিয়ানা অনুকরণের নৃত্যগীতের একটি কৌতুকপূর্ণ চিত্র বাণীবদ্ধ করেছেন এভাবে-

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল ॥

সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত কবিতাগুলোর মাধ্যমেই তার নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি সমসাময়িক কবিওয়ালাদের প্রভাবে কবিতা রচনা করেছেন, আবার ইংরেজি কবিতার আদর্শ

©Nazmus Sadat
CamScanner

অনুসরণে বাংলায় খণ্ড কবিতাও রচনা করেছেন। কালগত দিক থেকে আধুনিক যুগের সীমানায় প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তবে তার মধ্যে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য থাকলেও তিনি মধ্যযুগীয় কিছু বৈশিষ্ট্য কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

৪. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে 'স্ববিরোধী কবি' বলা হয় কেন?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেন। ইংরেজি শিক্ষাসভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালির সমাজ ও জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল ঈশ্বরগুপ্ত তাকে কবিতার উপজীব্য করেছেন। যেখানেই সামাজিক অনাচার, চারিত্রিক দৈন্য ও আদর্শহীনতা দেখেছেন তা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। ইংরেজদের আচার আচরণকে এ দেশের জন্য অকল্যাণকর মনে করে ইংরেজিয়ানা প্রীতির ব্যঙ্গ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার 'ইংরেজি নববর্ষ' কবিতায়-

'গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বস গিয়া বিবিদের ঘেঁসে ॥
রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম ॥'

শেষের দিকে তিনি তার এ অবস্থান থেকে সরে আসেন। কাব্যে ইংরেজদের শাসনের প্রশংসা করেছেন। তখন তার রচনায় শুধু ইংরেজি শব্দই নয়, পাশ্চাত্য ভাবধারাও স্বাচ্ছন্দে প্রবেশ করেছে। মোটকথা তার শেষের দিকে এসে কাব্যসত্তায় দ্বৈততা লক্ষিত হয়। এ জন্যই তাকে স্ববিরোধী কবি বলা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন। *[৪০তম]*

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম অনূদিত সাহিত্য হওয়ায় অনেকেই তাঁকে মৌলিক সাহিত্যিকের মুকুট দিতে নারাজ। কিন্তু বিদ্যাসাগর অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে-

- ✓ প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৩) *[বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিকগ্রন্থ ও শোকগাঁথা। বন্ধুর বালিকা কন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুশোকে রচনা করেন]*
- ✓ ব্যাকরণ কৌমুদী। (১৮৫৩)
- ✓ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)।
- ✓ বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)।
- ✓ শব্দ মঞ্জুরি (১৮৬৪)
- ✓ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭১)।
- ✓ নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮)
- ✓ জীবন-চরিত (১৮৯১, মরণোত্তর প্রকাশিত)

CamScanner

তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন *[৩৬তম বিসিএস]*

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী মুক্তির জন্য নারীশিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি সামাজিক সংস্কার আন্দোলনেও হাত দিয়েছিলেন। তার সংস্কারগুলো হলো-

বিধবা বিবাহ : তার প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি নিজের পুত্র নারায়ণের সঙ্গে ভবসুন্দরী নামক এক বিধবার বিবাহ দেন।

বাল্যবিবাহ : বাল্যবিবাহ নির্মূল করার জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম করে সফল হন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকার একটি আইন পাস করে মেয়েদের বিবাহের বয়স কমপক্ষে ১০ বছর ধার্য করে।

বহুবিবাহ : সে সময় হিন্দুসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। এ প্রথা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করায় তা বাস্তবায়িত হয় নি।

এছাড়া বিদ্যাসাগর সেযুগের কৌলিন্যপ্রথা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ও কুষ্ঠরোগীকে হত্যা প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম 'ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'। তবে তিনি 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' নামে স্বাক্ষর করতেন।

- ✓ ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৬ মে ল কমিটির কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান তাতেই প্রথম তাঁর নামের সাথে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়।
- ✓ সংস্কৃত কলেজে বার বছর পাঁচ মাস অধ্যয়ন শেষে অপর একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৪১ সালের ১০ ডিসেম্বরে প্রাপ্ত দেবনগরী হরফে লিখিত এই সংস্কৃত প্রশংসাপত্রে কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত করেন।
- ✓ এছাড়া বদান্যতার জন্য জনগণ তাঁকে 'দয়ার সাগর' আখ্যা দিয়েছিল।

CamScanner

৪. বাংলা গদ্যের জনক কে? *[৩৩তম বিসিএস]*
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। *[২৯তম]*
বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কাকে? বাংলা গদ্যে তিনি কী সংযোজন করেন? *[১৫তম বিসিএস]*

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম সার্থক বাংলা গদ্যকার। তাঁর আগে রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা বাংলা লিখেছেন। কিন্তু তারা বাংলা গদ্য ভাষার আড়ষ্টতা দূর করে প্রাঞ্জলতা দিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর প্রথম বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণ করে এতে প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আনেন। বাংলা বর্ণমালা, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এগুলোর অবস্থানে যে বিশৃঙ্খলা ছিল বিদ্যাসাগর তা দূর করে এতে শৃঙ্খলা আনেন। বাংলা বানানেও কিছুটা শৃঙ্খলা আনেন। তার আগে যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। তিনি ইংরেজির অনুসরণে দাঁড়ি-কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, ড্যাশ, হাইফেন এগুলোর ব্যবহার করেন। বাক্যে ক্রিয়া, কর্ম, কর্তা কোথায় কিভাবে বসবে তিনি যেভাবে লিখেছেন, সবাই তা অনুসরণ করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য ভাষাকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ দেন। ফলে তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে শৈলীসম্পন্ন। এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> *"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কর্মকুশলতা দান করিয়াছিলেন।"*

আর এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে 'বাংলা গদ্যের জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৫. বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান নির্দেশ করুন। *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, নারীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান লিখুন।

উত্তর : বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ও এলিয়ট বেথুন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। এটিই ভারতের প্রথম ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৫৭ সালে হ্যালিডে বাংলায় ছোটলাট হয়ে আসলে তার সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে নিজস্ব এলাকায় একের পর এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ১৮৬৪ সালে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮টি। এসব বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক খরচ ছিল ৮৪৫ টাকা এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩৪৮ জন। ধারাবাহিক তদবিরের ফলে সরকার স্কুলগুলোর কিছু

আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়। এরপর কলকাতায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত) এবং নিজের মায়ের স্মৃতি উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটির জন্য বিদ্যাসাগর অধিক সুপরিচিত? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার জড়তা, আড়ষ্টতা দূর করে এতে প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনি বাংলা গদ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আনেন। ফলে গদ্য হয়ে ওঠে শৈলীসম্পন্ন। একইসাথে গদ্য ভাষায় যতি চিহ্নাদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করে গদ্যভাষাকে সাহিত্যরস সৃষ্টির উপযোগী করে তোলেন।

বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও কুলীনদের বহু বিবাহ বন্ধসহ নানাবিধ সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করেন। তার রচিত সাহিত্যে সমাজ সংস্কারের মনোবৃত্তি সহজেই লক্ষণীয়।

তাই বলা যায়, সাহিত্যকর্ম ও সমাজকর্ম উভয়ের জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুপরিচিত।

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কী এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়। *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কার লেখা? *[২৫তম বিসিএস]*

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। এটি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটি হিন্দি বৈতাল পচ্চিসীর অনুবাদ। এ গ্রন্থ থেকে সে যুগের বাঙালি সমাজ সর্বপ্রথম গল্পরসের আস্বাদ লাভ করে। গ্রন্থটি অনুবাদ হলেও এতে বিদ্যাসাগর অনেক কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। শুধু কাহিনি বিন্যাস নয়, ভাষা বিন্যাসেও তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এ গ্রন্থেই প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস' ইংরেজি কোন বইয়ের অনুবাদ? *[২৫তম বিসিএস]*
শেক্সপীয়র রচিত কোন নাটকটি বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেন এবং অনূদিত গ্রন্থটির বাংলা নাম কী? *[১৩তম বিসিএস]*
অথবা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদগ্রন্থ 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। এটি ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটক Comdey of Errors এর অনুবাদ।

CamScanner

তার অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (হিন্দি বৈতাল পচ্চিসীর অনুবাদ), 'শকুন্তলা' (কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের উপাখ্যান ভাগের অনুবাদ), 'সীতার বনবাস' (বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অবলম্বনে রচিত), 'নীতিবোধ' (রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার্সের মরাল ক্লাস বুক অবলম্বনে রচিত) এবং 'বাঙলার ইতিহাস' (মার্শম্যানের History of Bengal গ্রন্থের অনুবাদ)।

৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থটির নাম লিখুন। *[১৮তম]*
অথবা, বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের কলমযুদ্ধের বর্ণনা দিন।

উত্তর : উনবিংশ শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তী সময়ে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলনের কারণে সমাজে বিধবার সংখ্যা মারাত্মক আকারে বেড়ে যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজে তখন বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিদ্যার্সাগর সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে রচনা করেন- 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)।' বইটি প্রকাশের সাথে সাথে শোরগোল পড়ে যায়। বহু কপি বিক্রি হয়। বিপক্ষে অবস্থানকারীরাও বই লিখে। বিরোধীদের প্রতিবাদের তিনি কলমযুদ্ধ শুরু করেন। রচনা করেন বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি গ্রন্থ-

- অতি অল্প হইল (১৮৭৩)। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লেখা।
- আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)। এটিও 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লেখা।
- ব্রজবিলাস (১৮৮৫)। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লিখেছেন। এতে তিনি তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দিয়েছিলেন সেগুলি খণ্ডন করেছেন।
- রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য' ছদ্মনামে লিখেছেন। এতে তিনি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে সংস্কৃত কলেজের তিন জন অধ্যাপক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রশান্তচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং মধুসূদন স্মৃতিরত্নের যুক্তি খণ্ডন করেন।

এভাবে বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া ছাড়াও বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে আইন প্রণয়নের জন্যে তিনি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেন।

১০. বাংলা গদ্য বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা গদ্য বিকশিত হয়ে উঠে। বাংলা গদ্যে তিনি গতি সঞ্চার করেন। পদবন্ধে ভাগ করে, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, অব্যয়-এর যথাযথ অবস্থান বিশুদ্ধভাবে নির্ধারণ এবং শব্দবিন্যাস করে তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন। বাংলা গদ্যের মধ্যে ধ্বনি ঝংকার ও

সুরবিন্যাস তাঁরই অবদান। তার পরিকল্পিত সাধু ভাষাই এদেশে শতাব্দীকাল ধরে বাঙালির লেখনীর ভাষা ছিল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ–

- ✓ ইংরেজি সাহিত্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে ১২টি বিরাম চিহ্নের প্রচলন করেন।
- ✓ তৎসম শব্দ থেকে অধিক সংখ্যক শব্দ চয়ন করে বাংলা সাহিত্যে প্রমিত সাধু ভাষা রীতির প্রচলন করেন।
- ✓ বাংলা গদ্যে ছন্দবোধ আবিষ্কার করে গদ্যকে নতুন আঙ্গিকে রূপ দেন। বিষয় অনুসারে শব্দ ব্যবহার ছন্দের পরিমিত ব্যবহার করেন।
- ✓ বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করতে তিনি প্রবাদ-প্রবচনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে ভাষার অন্তরশক্তি বৃদ্ধি করেছেন।

সর্বোপরি বাংলা গদ্য সাহিত্যে সুশৃঙ্খল উপস্থাপন ও চমৎকার ভাষা শৈলীর মাধ্যমে সাহিত্য রচনা করে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১১. বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন অন্যতম। বিদ্যাসাগর সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে রচনা করেন- 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)।' বইটি প্রকাশের সাথে সাথে শোরগোল পড়ে যায়। বিধবা বিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠে। সবার মুখে মুখে বিধবা বিবাহের কথা, চলতে থাকে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। ১৮৫৫ সালের অক্টোবরে ৯৮৬ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের নিকট পাঠান। কিছুদিন পর বিধবা বিবাহ আইন পাশের বিপক্ষে সরকারের কাছে আরেকটি আবেদন পড়ে। এভাবে পক্ষে বিপক্ষে হাজার হাজার আবেদন পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমুলিয়ার ১২, সুকিয়া স্ট্রিটের (বর্তমান ঠিকানা ৪৮এ, কৈলাশ বসু স্ট্রিট) বাড়িতে প্রথম বিধবা বিবাহ হয় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সাথে কালীমতী দেবীর। এ বিয়ের যাবতীয় খরচ বহন করেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭০ সালে পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবসুন্দরী দেবী নামে এক বিধবার সাথে বিয়ে দিয়ে নিজে এ আইনের বাস্তবায়ন করেন।

১২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কোন উপাধি লাভ করেন।

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার পাণ্ডিত্যের জন্য অনেক উপাধি লাভ করেন। এরমধ্যে রয়েছে-

CamScanner

- ✓ ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৬ মে ল কমিটির কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান তাতেই প্রথম তাঁর নামের সাথে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়।
- ✓ এছাড়া সংস্কৃত কলেজে বার বছর পাঁচ মাস অধ্যয়ন শেষে অপর একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৪১ সালের ১০ ডিসেম্বরে প্রাপ্ত দেবনগরী হরফে লিখিত এই সংস্কৃত প্রশংসাপত্রে কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত করেন।
- ✓ বদান্যতার জন্য জনগণ তাঁকে 'দয়ার সাগর' আখ্যা দেয়।

১৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে শিক্ষাসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল-

ক) সংস্কৃত কলেজ সংস্কার :

১. বর্ণ-বৈষম্য দূরীকরণ : পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানরাই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারত। তিনি এই প্রথা বাতিল করে সকল বর্ণের হিন্দু ছাত্রদের জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

২. অধ্যাপকদের হাজিরা: এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা চালু করেন। পূর্বে এ বিষয়ে কোন নিয়মকানুন ছিল না।

৩. ছুটির নিয়ম : পূর্বে সংস্কৃত কলেজে হিন্দু তিথি ও শুভদিন অনুসারে ছুটি দেওয়া হতো। তিনি এই প্রথা বাতিল করে রবিবার ছুটির নিয়ম চালু করেন।

৪. পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন : তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। মিলের তর্কশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্র চর্চার ব্যবস্থা করেন।

খ) শিক্ষার প্রসার : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার জনশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রসারে নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করেন।

১. গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন : শিক্ষার প্রসারে লর্ড হার্ডিঞ্জের সহায়তায় গ্রাম-বাংলায় বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে ৩৩ টি স্থায়ী হয়।

২. মডেল স্কুল স্থাপন : বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন যার কয়েকটি নিজ ব্যয়ে চালাতেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' (বিদ্যাসাগর কলেজ)।

৩. নারী শিক্ষার প্রসার : নারীমুক্তির জন্য নারীশিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। তাই ১৮৪৯ সালে কলকাতায় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহযোগিতায় 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (বেথুন স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া গ্রাম-বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেন ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়।

CamScanner

৪. পাঠ্যপুস্তক রচনা : তিনি শিশু ও জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এদের মধ্যে বর্ণ পরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, নীতিবোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪. বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' গ্রন্থের উপজীব্য কী?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' একটি আবেগপূর্ণ রচনা। বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের ছোট্ট মেয়ে প্রভাবতী। বিদ্যাসাগর তাকে খুব আদর করতেন। এই মেয়েটি কঠিন অসুখে অবেলায় মারা গেলে বিদ্যাসাগর মানসিকভাবে প্রচন্ড কষ্ট পান। প্রভাবতীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৩)। এতে তাঁর অন্তরের বিলাপ ফুটে উঠেছে। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিকগ্রন্থের পাশাপাশি প্রথম শোকগাঁথা। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য শোকগাঁথা।

১৫. বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক অবলম্বনে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' নামে একটি আখ্যান বা উপন্যাসোপম কাহিনি লিখেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত শিকারে এসে হরিণ শিকার করতে গিয়ে আশ্রমের বালিকাকর্তৃক বাধা পান। আশ্রমের বালিকারা জানায় দুষ্মন্ত যে হরিণ শিকারে উদ্যত তা আশ্রমমৃগ। দুষ্মন্ত হরিণ শিকার না করায় বালিকারা খুশি হয়ে রাজাকে আশ্রমে নিমন্ত্রণ জানায়। রাজা শকুন্তলার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে। শকুন্তলাকে নিজের আংটি দিয়ে বলে আসে যে শীঘ্র তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত রাজ কার্যের ব্যস্ততায় শকুন্তলাকে ভুলে যায়। শকুন্তলার গর্ভে পুত্র সন্তান ভরত জন্ম নেয়। ভরতকে নিয়ে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদে গিয়ে তাদের বিয়ের কথা বললেও দুষ্মন্ত তা মনে করতে পারে না। পরে দৈববাণীতে রাজা দুষ্মন্ত সব অবগত হয়ে শকুন্তলা ও পুত্র ভরতকে গ্রহণ করে। বৃদ্ধ বয়সে রাজা দুষ্মন্ত তার পুত্র ভরতকে উত্তরাধিকারী করে। শকুন্তলা'য় কাহিনি নির্মাণ ও ভাষা ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এ গ্রন্থে লেখকের সৃজনশীলতা, আধুনিক মনোভাব ও পরিমিতবোধ প্রকটিত। এর পূর্বে গদ্যে রচিত এত চমৎকার কাহিনি বা আখ্যান পাওয়া যায় না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনালগ্নে শকুন্তলা এক অনবদ্য সৃষ্টি।

CamScanner

কাজী আবদুল ওদুদ

১. প্রাবন্ধিক হিসেবে আবদুল ওদুদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।[৩১তম]

উত্তর : বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে কাজী আবদুল ওদুদ একজন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী প্রবন্ধকার। তিনি যখন প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন, তখন বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন কেবল শুরু হয়েছে। তখনকার সময়ে তাঁর মত উন্নত ও আধুনিক চিন্তাধারার মুসলমান লেখক কম ছিল। যেহেতু মুসলমান ঐতিহ্যের মধ্যেই তাঁর জন্ম, এজন্য বাঙালি মুসলমান সমাজের সংকট ও সম্ভাবনা, গোড়ামী ও ধর্মান্ধতা এবং অশিক্ষা ও অনুদারতা তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই তৎকালীন সময়ে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিতর্কিত প্রবন্ধকার। তার রচনার বড় আকর্ষণ মৌলিকতা। গতানুগতিক চিন্তাধারার অনুসরণ তিনি করেননি- সব বিষয়েই নুতন করে ভেবেছেন। ফলে তাঁর রচনা চিন্তাকে নাড়া দেয়, ভেঙে দেয় অনেক পূর্বধারণা, পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে নতুন জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশের এ যুগের চিন্তাশীলদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কাজী আবদুল ওদুদের স্থান প্রথম সারিতে। রচনার বৈচিত্র্যে ও গভীরতার দিক দিয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

২. 'নদীবক্ষে' কার রচনা? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মুসলিম পুনর্জাগরনের অন্যতম অগ্রপথিক কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম উপন্যাস 'নদীবক্ষে' (১৯১৯)। এটি যতটুকু উপন্যাস তারচেয়ে বেশি সমাজচিত্র। এতে উত্তাল পদ্মার বক্ষে মাঝিদের সংগ্রামমুখর জীবন ও সাধারণ মুসলমান কৃষকদের জীবনের দুঃখ-বেদনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা গ্রামীণ কৃষি জীবনের ছবি ফুটে ওঠেছে। আবার গ্রামীণ সমাজের কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব ও মিলনের কথা- চারটি কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে। এই কৃষক পরিবারের প্রধানরা হলেন জমির শেখ, ইরফান মণ্ডল, দুখু এবং লালু। এ উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মুসলিমরা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। কেউ কোনো ধর্মীয় রেওয়াজ না মানলে তার ধর্ম গেল বলে চিৎকার করে না। ধর্মীয় রেওয়াজ না মানলেও এরা অসৎ কিংবা কপট নয়। লেখক মূলত বাংলাদেশের শাশ্বত ধর্মবোধকেই তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের উচ্চ প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

'এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, মাধুর্য ও সহজিয়া সুর পাঠককে মুগ্ধ করে।'

৩. কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙলার জাগরণ' প্রবন্ধের মূলভাব লিখুন।

উত্তর : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রবাদ পুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ। তার রচিত প্রবন্ধ 'বাঙলার জাগরণ'। এ প্রবন্ধে তিনি জাতির উন্নতির নিয়ামক

©Nazmus Sadat
CamScanner

জীবনদর্শন, জীবন অভীপ্সা মুক্তচিন্তা প্রকাশ করেছেন। এদেশের অতীত সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞার প্রেক্ষিতে প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি শালীন প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর সভ্যতা-ভাবনার আভাস দিয়েছেন-

'আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে, বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্যও যে নয় সে দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যারা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কিন্তু উদ্দেশ্য-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হয়েছে তার স্বরূপ কী; এসব চিন্তা করলে হয়ত আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হবে না।'

কাজী আবদুল ওদুদ উদার মানবিক স্থিতিশীল সমৃদ্ধিশালী সমাজের কামনা করেছেন। সমাজে ধর্মীয় অপ্রীতি-বিবাদ-বিসংবাদের বিষবাষ্প সঞ্চারিত হলে সমাজের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বাংলার রেনেসাঁসের কর্তাব্যক্তিদের ধর্মীয় আন্দোলনের তিনি সংক্ষিপ্ত একটি ভাবরেখা প্রতিপন্ন করেছেন।

৪. 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রবন্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : আব্দুল ওদুদের প্রবন্ধ গ্রন্থ 'শাশ্বত বঙ্গ' (১৯৫১)। একটি কবিতাসহ ৭৫টি প্রবন্ধ নিয়ে সঙ্কলিত হয় এ গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলো ৬টি ভাগে বিভক্ত। যথা- হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অন্বেষণ, মুসলিমদের আত্মঅন্বেষণ, রবীন্দ্র-ভাবনা, নজরুল-মূল্যায়ন, সাহিত্য-ভাবনা, অন্যান্য মনীষা মূল্যায়ন। প্রবন্ধগুলোতে লেখক বৃহৎ বাংলা ও ভারতের মানুষের মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন এবং শিক্ষিত সমাজের অনবধানতায় জাতির কতটুকু বিড়ম্বনা ঘটতে পারে, সে আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন।

১৯২৬ সালে যে সকল চিন্তা ও বক্তব্য নিয়ে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল বইটি তার একটি মূল্যবান দলিল। এ গ্রন্থে লেখক আলোচনা করেছেন বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, কবি-লেখক ও তাদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, সমাজ ও সাহিত্য, বাংলার জাগরণের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতবর্ষের মনীষীদের দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে। 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থের বক্তব্যে লক্ষ করা যায়, ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ কাল ধরে শাস্ত্রীয় মননের একটা ধারা প্রবাহিত। আধুনিককালেও এ অঞ্চলের মানুষ যুক্তিভীত এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও ভাববাদী চিন্তাভাবনায় অভ্যস্ত। এ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রের আনুগত্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। প্রবন্ধগুলো মানুষের জীবনের অপরূপতা, ব্যাপকতা, জটিলতা ইত্যাদি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রাণবন্ত।

কাজী ইমদাদুল হক

১. 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : কাজী ইমদাদুল হকের একটি অসমাপ্ত উপন্যাস 'আব্দুল্লাহ'। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আব্দুল্লাহ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার মুসলিম সমাজে যেসব সমস্যা, কুসংস্কার দেখা যায় উপন্যাসটি তার দুঃসাহসী প্রতিবাদ। এ সময় সমাজে প্রচলিত আশরাফ আতরাফ ভেদ, ভণ্ডপীর ভক্তি, সুদ সমস্যা, হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি বিরূপ ধারণা, বংশ গরিমার নামে ব্যয়বহুল অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য কুসংস্কার তিনি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। শুধু সমস্যা তুলেই ধরেননি সাথে সাথে যুক্তিসঙ্গত সমাধানও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে নারীর সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের বাস্তবতায় নির্মিত চরিত্র মা হালিমা ও রাবেয়ার অন্তরের ঔদার্যে পাঠক মুগ্ধ হয়। বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাস পড়ে মন্তব্যে লিখেছেন-

> *'আমি খুশি হয়েছি বিশেষ কারণে এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল।'*

উপন্যাসটি অসমাপ্ত রেখে লেখক মৃত্যুবরণ করলে কাজী আনোয়ারুল কাদির রেখে যাওয়া খসড়া অবলম্বনে শেষ করেন। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে চিত্রিত চিত্রের মূল্য এখনও উজ্জ্বল।

কাজী নজরুল ইসলাম

১. কাজী নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন', 'যুগবাণী' ও 'চক্রবাক' কী জাতীয় গ্রন্থ? *[৪৪তম বিসিএস]*

উত্তর : কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ- 'রিক্তের বেদন', প্রবন্ধ গ্রন্থ- 'যুগবাণী' ও কাব্যগ্রন্থ- 'চক্রবাক'।

'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) গ্রন্থে মোট ৮টি গল্প আছে। যথা- রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের নেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামী-হারা, দুরন্ত পথিক।

'যুগবাণী' (১৯২২) নজরুলের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ। 'নবযুগ' পত্রিকায় সাত মাসে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও অন্য নিবন্ধগুলো থেকে বাছাই করে ২১টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয় 'যুগবাণী' সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৭ সালে।

'চক্রবাক' (১৯২৯) প্রেমপ্রধান কাব্যগ্রন্থ। এতে নজরুলের রোমান্টিক সত্তার প্রকাশ ঘটে। চট্টগ্রাম অবস্থানকালে লেখা অধিকাংশ কবিতা এতে স্থান পায়। গ্রন্থটি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (ঢাকা কলেজ) অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে উৎসর্গ করেন।

CamScanner

২. 'অগ্নিবীণা' কাব্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ উল্লেখ করুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২)। এ কাব্যে কবি বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন। অন্যায়-অনাচার বিনাশ করে শান্তি আনয়নের জন্য ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্য থেকে পরশুরামের কঠোর কুঠার ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন-

'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।'

আবার বাঙালি মুসলমানদের উজ্জীবিত করতে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুসারে দেশের কল্যাণে ইমাম হাসান-হোসেনের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। 'মহররম' কবিতায় বলেছেন-

'হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের।'

এছাড়া কবি বাংলার দেশজ উপকরণ হিসেবে বাঙালির প্রেমের ঐতিহ্য বাঁশিকে ব্যবহার করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় বলেছেন-

'মম বাঁশরীর তানে পাশরি।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।'

এ গ্রন্থে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে। গ্রন্থটি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়।

৩. একুশ শতকের বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য যুগের দাবি মিটিয়েছে এবং একালেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। নজরুল তাঁর কাব্যগানে প্রচার করেছেন সাম্যের বাণী। সবসময় মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্মীয় সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ভৌগোলিক অচলায়তন ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। তিনি উচ্চারণ করেছেন,

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয়টি নেই। নজরুল বিশ শতকে যে সাম্প্রদায়িকতাকে মানবতার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে বলে বারবার সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন একুশ শতকে এসে এ সাম্প্রদায়িকতাই ভয়ানক খেলায় মেতে উঠেছে। সেখানে নজরুল সাহিত্য দিনে দিনে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

©Nazmus Sadat CamScanner

নজরুল যে শুধু জাগতিক সংগ্রাম করেছেন তাই নয়। মানুষকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর লেখনীর জুড়ি নেই। তাঁর অনেক কবিতা-গান, প্রবন্ধের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাবোধ লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই নাট্যকার আরিফুল হক বলেছিলেন-

'বাঙালি মুসলমানদের বেসিক নীড পাঁচটি নয় ছয়টি হওয়া উচিত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত হওয়া উচিত নজরুল চর্চা।'

৪. কাজী নজরুল ইসলামকে কেন 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে অভিহিত করা হয়? *[৪৩তম বিসিএস]*

অথবা, নজরুলের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার। তাঁর কবিতা ও গানে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা হাতে তাঁর প্রবেশ, ধূমকেতুর মতো তাঁর প্রকাশ। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতা নয়, নজরুলের সমস্ত সৃষ্টিই বিদ্রোহের বাণীরূপ। তাঁর বিদ্রোহ কেবল পুরোনোকে ভাঙার জন্য নয়, নতুনের সৃষ্টিই তাঁর মূল লক্ষ্য। দেশ বরেণ্য নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু বলেন-

"নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্যকথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাবো, তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখনও তাঁর গান গাইবো।"

সাহিত্যিক বিদ্রোহের নিদর্শনরূপেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নজরুলের হাতে হয়ে গেল মুক্তবন্ধ তথা 'নৃত্যপাগল ছন্দ'। ছন্দে যেমন অলংকারে উপমায়-উৎপ্রেক্ষায়ও নজরুল তেমনই বিদ্রোহী 'মুক্ত জীবনানন্দ'। 'ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার'- এর সঙ্গে সমান মর্যাদায় ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কারকে বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত রূপে হাজির করা কিংবা একই সঙ্গে 'বাসুকির ফণা' ও 'স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা' জাপটে ও সাপটে ধরার মতো সাহিত্যিক বিদ্রোহের কথা আধুনিক কালের নজরুলের কবিতায়ই দেখা যায়।

CamScanner

৫. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন। *[৪১তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। এ কবিতায় কবি পৌরাণিক অনুষঙ্গ ও তথা বিভিন্ন ধরনের মিথের ব্যবহার করেছেন এবং এগুলোকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

ভারতীয় মিথ: ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের অবহেলিত ও শোষিত সমাজের তারুণ্য ও পৌরুষের প্রতীক হিসেবে ভারতীয় পৌরাণিক মিথিক চরিত্র- শিব (নটরাজ), অর্জুন, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বিষ্ণু, পরশুরাম, ভৃগু, অভিমন্যু প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। যেমন-

১। *'মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস !'*
২। *'আমি হোমশিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি, আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।'*
৩। *'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার।'*
৪। *'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান- বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন।'*

বাংলার দেশজ মিথ: বাংলার দেশজ মিথ তথা লোকপুরাণকে দেশের মৃত্তিকামূল থেকে আহরণ করে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি লিখছেন, 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।' এই শ্যাম বা কৃষ্ণ বাংলার দেশজ মিথ।

ইউরোপীয় মিথ: ইউরোপীয় মিথের বহুল প্রয়োগ না থাকলেও দু'একটির ব্যবহার তাঁর কবিতায় লক্ষ্যণীয়। যেমন- *'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি'*।

ইসলামী মিথ: অবরুদ্ধ সমাজের মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত কবিচৈতন্য বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে যখন কাব্যরূপ দান করেছে, তখন ইসলামী ঐতিহ্য অনুষঙ্গও অভিব্যক্ত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় লিখেছেন-

১। *'আমি ইস্রাফিলের শৃঙ্গার মহা-হুঙ্কার।'*
২। *'ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি।'*

নজরুলের কবিচৈতন্য মিথ-ঐতিহ্যের এই বহুমাত্রিক অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে তাৎপর্যময় এবং অভূতপূর্ব শিল্প এষণায় গৌরবমণ্ডিত।

৬. **কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।** *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে কবি হিসেবে সুপরিচিত হলেও কথাসাহিত্যেও অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা তিনটি-

- ✓ বাঁধনহারা
- ✓ মৃত্যুক্ষুধা
- ✓ কুহেলিকা।

©Nazmus Sadat CamScanner

'বাঁধন-হারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। এতে ১৮টি পত্র রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম করাচীতে অবস্থানকালে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস রচনা শুরু করেন। উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদা ওরফে নুরুর চরিত্রে যে উপন্যাসিক নজরুল ইসলামের ছায়া আছে তা সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি নজরুল বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে ছিলেন। এ কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের দরিদ্র্য হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও দুঃখ ভরা জীবন নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। নজরুলের উপন্যাস চিন্তার সর্বশেষ প্রকাশ 'কুহেলিকা'। এর মূল চরিত্র জাহাঙ্গীর। উপন্যাসের মূল বিষয় সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। সাথে সমকালীন নানা সমাজচিত্র এবং অর্থনৈতিক চিত্রও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে।

৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূলবক্তব্য কী? *[৩৭তম]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩)। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কাজী নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার শুনানি চলাকালে ৭ জানুয়ারি ১৯২৩, আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন সেটিই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। এতে ব্রিটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, ঘৃণা, দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের উচ্চারণ। দেশপ্রেমিক মুক্তিপাগল প্রাণের আর্তি এর ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। এ জবানবন্দী কবির একার নয়, বন্দী নির্যাতিত বাঙালির। এ প্রবন্ধে তিনি নিজেকে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

> *'শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট।'*

কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। রাজার বিচারে রাজদ্রোহী হিসেবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে কবি নির্ভয়। সত্যের জন্য বিদ্রোহ করাকে তিনি কর্তব্যজ্ঞান করেছেন।

৮. কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন। *[৩৬তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসেবে সুপরিচিত হলেও উপন্যাস ধারায় তাঁর পদচারণা ছিল। তার রচিত উপন্যাসের সংখ্যা তিনটি- বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা। বাঁধন-হারা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। এতে ১৮টি পত্র রয়েছে। উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদা ওরফে নুরু। 'মৃত্যুক্ষধা' উপন্যাসটি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের দরিদ্র হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও দুঃখ ভরা

জীবন নিয়ে লেখা। 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা। এর মূল চরিত্র জাহাঙ্গীর।

নজরুলের উপন্যাসের অধিকাংশ বাক্য ছোট ছোট। প্রথম লাইন থেকে নজরুলের উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় এবং পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। তার উপন্যাসে সমাজ সচেতনতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, নরনারীর প্রেমের প্রতি দরদি মনোভাব পাঠককে মুগ্ধ করে। নজরুলের উপন্যাস সমাজের, দেশের, মাটির ও মানুষের কাছাকাছি ছিল। কাহিনির বৈচিত্র্য, ভাষা ও রচনাশৈলীতে নজরুলের উপন্যাসগুলো অসাধারণ। নিঃসন্দেহে নজরুল সমাজ-সচেতন, ইতিহাস-সচেতন, দেশপ্রেমিক, দরদি ও কুশলী ঔপন্যাসিক।

৯. নজরুল কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : সামাজিক স্তরবিন্যাসে নানামাত্রিক ক্ষমতা, মর্যাদা ও শক্তির বিপ্রতীপ প্রান্তে যাদের অবস্থান তারাই নিম্নবর্গ। নজরুল সাহিত্যে নিম্নবর্গ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাই তীব্রভাবে উচ্চারিত হয়েছে। নিম্নবর্গের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার থেকে নজরুল লিখেছেন কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস। নজরুল নিজেকে নিম্নবর্গের মানুষের দলভুক্ত করেছেন- তাত্ত্বিকভাবে নয়, আত্মিকভাবেই। 'বিদ্রোহী' কবিতায় উৎপীড়িত বা প্রান্তজনের জন্যই কবি বিদ্রোহ করেছেন। বিষের বাঁশী-সাম্যবাদী-সর্বহারা কাব্যে প্রান্তজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ কারণেই কাব্যের নাম রাখেন তিনি 'সাম্যবাদী' কিংবা 'সর্বহারা'। কবিতার নাম রাখেন 'কুলি-মজুর', 'রাজা-প্রজা', 'নারী', 'বারাঙ্গনা', 'মানুষ', 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ছাত্রদলের গান', 'ধীবরদের গান', 'জাতের বজ্জাতি', 'চরকার গান' ইত্যাদি। এসব নাম নির্বাচনের অন্তঃপ্রেরণা যে নজরুলের প্রান্তজনপ্রীতি তা স্পষ্টই বোঝা যায়। নজরুলের কথাসাহিত্যেও পাওয়া যাবে প্রান্তজনের নানামাত্রিক ছবি। কথাসাহিত্যে নজরুল সেসব চরিত্রকেই মহিমান্বিত করে তুলেছেন কোনো-না-কোনো সূত্রে দলিত-পীড়িত-নির্যাতিত। চরিত্রগুলোর শরীরে স্পষ্ট ফুটে ওঠে দারিদ্র্যের ছাপ, সংস্কারের দগদগে দাগ, ঔপনিবেশিক শোষণের চিহ্ন।

১০. নজরুলের জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ) বুধবার প্রত্যুষে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার (তখনকার রানিগঞ্জ থানা) পুরনো শেরগড় পরগনার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন। চার পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হয় বলে তার নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'।

১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১২ ভাদ্র) সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে ৭৭ বছর বয়সে ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিকেল সাড়ে চারটায় শোক মিছিল সহকারে কফিনে মোড়ানো কবির মরদেহ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্মরণাতীত কালের এক বিশাল জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবিকে সমাহিত করা হয়।

১১. কাজী নজরুল ইসলামের কোন কোন গ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। *[২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : সাহিত্য সমালোচক শিশির কর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে নজরুলের পাঁচটি নিষিদ্ধ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো-

- যুগবাণী। নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৭ সালে।
- বিষের বাঁশি। নিষিদ্ধ হয় ২২ অক্টোবর ১৯২৪।
- ভাঙার গান। নিষিদ্ধ হয় ১১ নভেম্বর ১৯২৪।
- প্রলয় শিখা। নিষিদ্ধ হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০।
- চন্দ্রবিন্দু। নিষিদ্ধ হয় ১৪ অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫।

এ গ্রন্থগুলো ছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থের উপর সরকারের আক্রোশ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয় নি। এগুলো হল- অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফনিমনসা, সর্বহারা, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল, কুহেলিকা। উল্লেখ্য যে, গ্রন্থ হিসেবে অগ্নিবীণা কাব্যটি কখনো নিষিদ্ধ করা হয় নি। এ কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়।

১২. কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পের বই এর নাম কি? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ 'শিউলিমালা'। গ্রন্থটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট ৪টি গল্প আছে। যথা- পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি, শিউলিমালা। 'পদ্মগোখরা' গল্প অবলম্বনে খান আতাউর রহমান ১৯৭১ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন 'সুখ দুঃখ'।

১৩. কাব্য আমপারা কে লিখেছেন? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : পবিত্র কুরআন শরীফের ত্রিশতম পারার নাম 'আমপারা'। এই পারার অনুবাদ কবি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যে কাব্যে করেছেন। তার অনূদিত সেই অমর কীর্তি 'কাব্য আমপারা' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সালে (২৩ নভেম্বর ১৯৩৩ সালে)। এ গ্রন্থে সর্বমোট আটত্রিশটি সূরার অনুবাদ স্থান

CamScanner

পেয়েছে। মূলভাবকে অক্ষত রেখে নির্ভুল অবয়বে সুষম অর্থবহ অনুবাদে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। গ্রন্থের শেষে 'শানে নুযুল' অংশে সূরাসমূহের পরিচয় প্রদানপূর্বক যে টীকা উল্লেখ করেছেন তাতে আরবী ভাষায় বিস্তর জ্ঞান, হাদিস বিষয়ে বুৎপত্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪. কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। [২১তম বিসিএস]

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থ-

অগ্নিবীণা (১৯২২) প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে- প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমণী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, রণভেরী, শাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মহররম। গ্রন্থটি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়।

বিষের বাঁশি (১৯২৪)। বৃটিশ সরকার ১৯২৪ সালেই কাব্যটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় এদেশের নারী অধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক মিসেস এম. রহমানকে (মোসাম্মদ মাসুদা খাতুন)।

দোলনচাঁপা (১৯২৩)। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এক বছরের সশ্রম দিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। এ সময় তিনি দোলনচাঁপা কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করেন। জেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ওয়ার্ডারদের সাহায্যে তাঁর সব কবিতাই বাইরে নিয়ে আসেন। এ কবিতাগুলো দিয়ে 'দোলনচাঁপা' কাব্য প্রকাশ করেন।

১৫. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের মূলবক্তব্য লিখুন। [২০তম]

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালে তিনি মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে ছিলেন। এ কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের দরিদ্র হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি। এই মানুষদের একদিকে মৃত্যু, আর এক দিকে ক্ষুধা। সেখান থেকে উপন্যাসের নামকরণ 'মৃত্যুক্ষুধা'। উপন্যাস শুরু হয় গজালের মা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। যৌবনে মৃত তিন ছেলের বিধবা স্ত্রী (বড় বউ, মেঝো বউ, সেজো বউ) আর তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ছোট ছেলে প্যাঁকালে সবার ভরণ-পোষণের চেষ্টা করে। অভাব অনটনের মধ্যে প্যাঁকালে খ্রিষ্টান কুর্শিকে প্রচণ্ড ভালবাসে। ভালবাসার জন্য ধর্মান্তরিতও হয়। অভাবের তাড়নায় মেঝ বউ খ্রিষ্টান হয়ে বরিশালে থাকতে চাইলেও সন্তানদের টানে তাকে বস্তিতে ফিরে আসতে হয়। অন্যদিকে প্যাঁকালেকে খাঁন বাহাদুর সাহেব কুড়ি টাকা বেতনের চাকুরী দিলে সে কুর্শিকে নিয়ে মুসলমান হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এভাবেই উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়। কাহিনি, চরিত্রচিত্রণ, সমাজ সচেতনতা, রোমান্টিকতা সার্বিক বিচারে 'মৃত্যুক্ষুধা' নজরুলের সার্থক উপন্যাস।

©Nazmus Sadat
CamScanner

১৬. 'কুহেলিকা' গ্রন্থটির আঙ্গিক কী? রচয়িতা কে? *[১৫তম বিসিএস]*

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের সর্বশেষ উপন্যাস 'কুহেলিকা'। কুহেলিকা শব্দের অর্থ কুয়াশা। উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো এরূপ। এর মূল চরিত্র জাহাঙ্গীর। সকলে তাকে 'উলঝলুল' বলে ডাকে। জাহাঙ্গীর কুমিল্লার এক সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদারের একমাত্র সন্তান। তারা কখনো কুমিল্লায় যায় নি, কলকাতায়ই ছিল। একদিন জানতে পারে সে পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান। তার মা ছিল কলকাতার বাঈজি, জমিদার পিতার রক্ষিতা। এটা জানার পর সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। নারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অবিশ্বাস জন্মে। এর মধ্যে বন্ধু হারুণের বোন ভূণীর সঙ্গে বিয়ে হলেও সংসার করা হয় না। একসময় সে পুরোপুরি বিপ্লবী হয়ে পড়ে। জয়তী ও চম্পার সাথে পরিচয় হয়। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে স্বদেশকুমার ছদ্মনামে দ্বীপান্তরী হয়। এর আগে তার সম্পদের এক-চতুর্থাংশ ভূণী আর বাকী অংশ চম্পার হাতে রেখে যায়।
'কুহেলিকা' উপন্যাসকে 'বিপ্লবী উপন্যাস' বলা যায়। এর বড় অংশ জুড়ে স্বদেশী বিপ্লবের ছাপ রয়েছে। এছাড়াও নারীর মন বিশ্লেষণ, জমিদারদের দাপট, হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে হীনমন্যতা ও সর্বোপরি সমকালীন স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপর এতে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৭. নজরুল কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় এক নতুন স্বাদ এবং উত্তেজনা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাময়িকতা। সাময়িক ঘটনা, জীবন অথবা কোনো সাময়িক আবেগকে অবলম্বন করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। সাময়িক জীবন নিয়ে এতো কবিতা কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউ লিখতে পারেননি। প্রেমের কবিতা যখন লিখেন তখনও সাময়িকতা তাঁর কাব্যে বিদ্যমান। নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় বিভিন্ন দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ছাড়াও বাংলা কবিতা বিকাশের যে নতুন পথ আছে, নজরুল ইসলাম তা প্রমাণ করলেন। কুলি-মজুর থেকে শুরু করে সবার কথা তাঁর কাব্যে বলেছেন। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকেছেন। আর এ সচেতনতার কারণে তাঁর কবিতা বহুমাত্রিক হয়েছে। নজরুল মানুষের জয়গান গেয়েছেন, সবার ওপরে মানুষকে স্থান দিয়েছেন। এখানেই কাজী নজরুল ইসলামের সার্থকতা।

১৮. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অগ্নিবীণা' (১৯২২)। এতে রয়েছে ১২টি কবিতা। এ কাব্যে নজরুল মুসলিম ঐতিহ্য থেকে ইমাম হাসান-হোসেন, ভারতীয় পুরাণ-ঐতিহ্য থেকে পরশুরামের কঠোর কুঠার ব্যবহার করেছেন।

CamScanner

তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে জাগাতে হিন্দু ঐতিহ্যের নমুনায় লিখলেন- 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমনী', 'প্রলয়োল্লাস'। মুসলিম ঐতিহ্য তুলে ধরতে লিখলেন- কোরবানী, মহররম, খেয়াপারের তরণী, কামাল পাশা, বিদ্রোহী, ধূমকেতু কবিতা। জরাজীর্ণ নড়বড়ে সমাজরীতি ভেঙে নতুন সমাজ, দেশ জাতি সৃষ্টির জন্য তিনি ভাঙনের কাজে আহ্বান জানিয়েছেন। পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি শিকল ছেড়ার মন্ত্র শিখিয়েছেন। সুন্দর দেশ-সমাজ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এ বিদ্রোহ চলবেই বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির বিদ্রোহের মূল সুর তীব্রভাবে বেজে উঠেছে। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য'- এ চরণটিতে বিদ্রোহ ও প্রেম একসাথে বেজে উঠেছে। এ চরণটি যেন সমগ্র নজরুল সাহিত্যের অনুবিশ্ব।

১৯. কাজী নজরুল ইসলামের 'দোলনচাঁপা' কাব্যের ভাবধারা লিখুন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩)। রাজদ্রোহের অভিযোগে কবি এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এ সময় প্রেসিডেন্সি জেলে বসে দোলনচাঁপা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো রচনা করেন। প্রথম বিয়ের ব্যর্থতা ও প্রমীলার সাথে প্রণয় বিষয়ক অনিশ্চয়তায় কবি হৃদয় বিচলিত। দোলনের সাথে কবির মান-অভিমান, অনুরাগ-বিরাগ, দ্বন্দ্ব-সংশয়সহ বিচিত্র ভাবভাবনা এ কাব্যের উপজীব্য। 'দোলনচাঁপা' কাব্যে মোট ২২টি কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলোকে নিম্নোক্ত ভাবধারার অন্তর্গত করা যায়-

- ✓ প্রেমকে মহিমান্বিত করে দেখে প্রেমের বেদনায় গর্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে- ব্যথা গরব, সমর্পণ, সাধের ভিখারিনী কবিতায়।
- ✓ প্রেমের সাথে বিজড়িত বেদনার দিক- বেলাশেষে, উপেক্ষিত, পুবের চাতক, অনাদৃতা কবিতায়।
- ✓ প্রেমের সাথে বিজড়িত আনন্দের দিক- আশান্বিতা, শেষ প্রার্থনা, চপল সাথী কবিতায়।
- ✓ নিসর্গমূলক- ঐ নীল গগনের নয়ন পাতায়, মাতাল হাওয়া, সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়, নীলপরী, বরষা কবিতায়।
- ✓ নারী সম্পর্কে দ্বিবিধ ধারণা- দোদুল দোল, পূজারিণী, অভিশাপ কবিতায়।

বলা যায় বিবিধ-প্রিয়ার রূপ 'দোলনচাপা' নজরুলের প্রেমকাব্য হিসেবে নন্দিত। এ কাব্যের 'পূজারিণী' কবিতাটি বহুল পঠিত ও নন্দিত।

২০. কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি গল্পগ্রন্থের নাম লিখুন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ- ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শউলিমালা।

'ব্যথার দান' (১৯২২) গ্রন্থে মোট ৬টি গল্প আছে। যথা- ব্যথার দান, হেনা, বাদল-বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা, রাজ-বন্দীর চিঠি।

CamScanner

'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) গ্রন্থে মোট ৮টি গল্প আছে। যথা- রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের নেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামী-হারা, দুরন্ত পথিক।

'শিউলিমালা' (১৯৩১) গ্রন্থে মোট ৪টি গল্প আছে। যথা- পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি, শিউলিমালা। 'পদ্মগোখরা' গল্প অবলম্বনে খান আতাউর রহমান ১৯৭১ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন 'সুখ দুঃখ'।

২১. কথাসাহিত্যে নজরুলের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুল ইসলামের স্থান এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। কথাসাহিত্যে তার আত্মজৈবনিক প্রভাব লক্ষণীয়। 'ব্যথার দান', 'ঘুমের ঘোরে', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি গল্প এবং বাঁধনহারা উপন্যাসটিও সৈনিকজীবন নিয়ে রচিত। সাথে সাথে নজরুল সমাজ-বাস্তবতার ছবি নিয়েও গল্প লিখছেন। যেমন- 'স্বামীহারা', 'রাক্ষুসী', 'জিনের বাদশা', 'পদ্মা-গোখরো' প্রভৃতি। নজরুলের গল্প-উপন্যাসে আত্মজীবনীমূলক উপাদানের প্রাচুর্য রয়েছে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশ নজরুলের বাঁধনহারা-তেই প্রথম। কথাসাহিত্যে পত্রের ব্যবহারও নজরুলের বিশেষত্ব। ব্যথার দান, রিক্তের বেদনে রয়েছে পত্র ও ডায়েরীর ব্যবহার। 'রাজবন্দীর চিঠি'র পুরো গল্পটাই একটা পত্র, বাঁধনহারা উপন্যাসটি একটি পত্রোপন্যাস। নজরুলের প্রথম পর্বের লেখায় আরবি, ফারসি শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও শেষ দিকে আঞ্চলিক ভাষাকে কথাসাহিত্যের ভাষা করে ফেললেন সহজেই। মাত্র উনিশটি গল্প এবং তিনটি উপন্যাসে তিনি এমন মেধার সাক্ষর রেখেছেন যা পূর্বসূরি কথাসাহিত্যিকদের রচনাতে দেখা যায় নি।

২২. কাজী নজরুলের সাহিত্যে সমাজ ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : নজরুল সব সময়ই সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন। পুরনো সমাজকে ভেঙে নতুন একটি সমাজ গড়ার জন্য লিখছেন। নজরুল চেয়েছেন সমাজের সকল মানুষ সচেতন হয়ে উঠুক, প্রতিবাদী হয়ে উঠুক। নিজের অধিকার নিজেই আদায় করে নিতে শিখুক। অসাম্প্রদায়িক ও সমতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা তার সব সময়ই ছিলো। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নজরুলের বিরামহীন লড়াই এবং অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ বঞ্চনামুক্ত একটি আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টাও তার রচনায় পাওয়া যায়। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত, উৎপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের কথা বলতে সব সময়ই ছিলেন সোচ্চার। নজরুল ইসলাম লেখনিতে এই সমাজ, জাতি বা মানুষের সমস্যার কথাই বলেছেন। কখনো বলেছেন সরাসরি, কখনো পরোক্ষভাবে। নজরুল তার কবিতার মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষ শুধু নয়, গোটা ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছেন। নজরুল সাহিত্য আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতে অর্থাৎ সবসময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক।

CamScanner

২৩. কাজী নজরুলের সাহিত্যে দেশপ্রেম নিয়ে আলোচনা করুন।

উত্তর : নজরুল সাহিত্যে দেশপ্রেমের স্বরূপ নানাভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং অর্থনৈতিক পরবশতা থেকে দেশ ও জাতির মুক্তি চেয়েছিলেন। এর পথ তরান্বিত করার নির্দেশনাও রয়েছে তাঁর লেখনিতে। কামাল আতাতুর্কের মত সুশৃঙ্খল সংগ্রামের মাধ্যমে নজরুল স্বাধীনতা চেয়েছেন। দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকার জন্য তাদের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চনা যখন ব্যথিত করে চলেছে তখনই নজরুল দেশপ্রেমের কথা ভেবে প্রতিবাদমুখি হয়ে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গান রচনা করে দেশের মানুষকে অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'ব্যাথার দান' গল্পগ্রন্থে দেশপ্রেমের দ্বৈতরূপ দেখতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্পে প্রেম-কাহিনিকে আশ্রয় করে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রতিবাদের ভাষাকে বিদ্রোহী মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ বিদ্রোহের চেতনা জাগ্রত হয় দেশপ্রেম থেকে। কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হাতে তুলে নিয়েছিলেন লেখনি। আর বাক্‌শক্তি স্তব্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লিখেছেন বিদ্রোহের তথা দেশপ্রেমের অমরবাণী। যা মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের সম্মিলিত রূপ।

২৪. 'নজরুল প্রেম ও দ্রোহের কবি' ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম প্রেম ও দ্রোহের কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অনন্য মর্যাদায় সমাসীন। শোষিত, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে তিনি দ্রোহী হয়েছেন, একইসঙ্গে শাশ্বত প্রেমের সুধা পান করে নিজের প্রেমিক মনকে সতত প্রফুল্ল রেখেছেন। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। প্রেমের কবিতায়ও নজরুলের তুলনা নেই। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি প্রেমে পড়েছিলেন বারবার। কবি যাদের প্রেমে পড়েছিলেন, তাদের নিয়ে লিখেছেন গান, কবিতা আর প্রেমপত্র। প্রিয়ার প্রতি নিজের আকুল প্রাণের আর্তি উপস্থাপন করে নজরুল লিখেন-

'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী/দেব খোঁপায় তারার ফুল।'

দ্রোহ ও প্রেমের বিপরীত দু'টি অবস্থানকে সমান্তরাল করা শুধু কঠিনই নয় অনেকক্ষেত্রে তা অসাধ্যও বটে। দ্রোহ-প্রেম, মানবিকতা নজরুলকে করেছে অতুলনীয়। এটি তাকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব। নজরুল নিজের দ্রোহ ও প্রেমের সহাবস্থানকে তুলে ধরে 'বিদ্রোহী' কবিতায় বলেন-

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতূর্য।'

২৫. নজরুল সাহিত্যে সাম্যবাদী চেতনার পরিচয় দিন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী কবি। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'তেই তার সাম্যবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। নজরুলের সাম্যবাদের প্রধান ক্ষেত্র মানুষ। আশরাফ আর আতরাফের কোনো ভেদাভেদ নেই এখানে। সবাই সৃষ্টির সেরা। তিনি বলেছেন-

'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

'নারী' কবিতায় কবি নারী-পুরুষের ভেদাভেদ অস্বীকার করে সাম্যের বাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন-

'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কারো আসল পরিচয় হতে পারে না। আসল পরিচয় হলো, সবাই মানুষ। 'কান্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতায় বলেছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/ কান্ডারি! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।' 'লাঙল' এর প্রথম সংখ্যাতেই নজরুল 'সাম্যের গান' নামের কবিতাটি লিখলেন :

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান।

সাম্যবাদ বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যে মমতায় মানবতা মিশ্রিত সাম্যের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন তা একান্তই অভিনব। এখানেই নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

২৬. 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৬)। এর প্রবন্ধগুলো হচ্ছে- রুদ্রমঙ্গল, আমার পথ, মোহররম, বিষবাণী, ক্ষুধিরামের মা, ধূমকেতুর পথ, মন্দির ও মসজিদ এবং হিন্দু-মুসলমান। এ গ্রন্থের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে রচিত। এতে সত্য আর আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। 'মোহররম' প্রবন্ধে মাতম-অভিনয়কে বাদ দিয়ে নির্যাতনের প্রতিবাদে রক্ত দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। 'বিষবাণী'তে তরুণদের আত্মবোধন এবং দ্রোহের পথে আহ্বান করা হয়েছে। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের প্রধান দুই জাতির পরস্পর অর্থহীন বিদ্বেষ এবং হানাহানিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে নজরুল শোষিত বঞ্চিত-ভীরু পরাধীন ভারতবাসীকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। নারী সমাজকে নজরুল জেগে উঠতে বলেছেন। ক্ষুধিরামের মত দেশপ্রেমিক সন্তান তিনি কামনা করেছেন। ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সংঘাত ভুলে গিয়ে একত্রে দেশমাতাকে শৃঙখলমুক্ত করার আহবান জানিয়েছেন।

২৭. শিশু সাহিত্যে নজরুলের অবদান লিখুন।

উত্তর : শিশু সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিশুদেরকে আত্মস্থ করেন। খুব সহজে মজা করে তিনি তাদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন-

'আমি চির শিশু, চির কিশোর'।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা- 'ঝিঙেফুল', 'খুকী ও কাঠবিড়ালী', 'মা', 'খাদু-দাদু', 'খোকার বুদ্ধি', 'খোকার গল্প বলা', 'চিঠি', 'লিচু চোর', 'ঠ্যাংফুলী ও পিলে-পটকা', 'হোঁদল-কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন', 'প্রভাতী' ইত্যাদি। 'প্রভাতী' কবিতায় প্রভাতের বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকরভাবে, আর উৎসবমুখর ঝর্ণাধারার মতো কবিতাটির গতিও অবারিত।

'ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠরে!
ঐ ডাকে যুঁই শাখে ফুল-খুকী ছোটরে।'

এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'পুতুলের বিয়ে', 'ঘুম জাগানো পাখি', 'ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি' ইত্যাদি এবং কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'শেষ সওগাত', 'ঝড়' ইত্যাদি যা চিরকাল পাঠকের হৃদয় হরণ করবে।

২৮. কাজী নজরুলের 'নৃত্যপাগল ছন্দ' বলতে কোন ছন্দকে বুঝায়?

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় লিখেছেন-

'আমি নৃত্যপাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।'

'নৃত্যপাগল ছন্দ' বলতে কবি মুক্তবন্ধ ছন্দকে বুঝিয়েছেন। ভাবের প্রবাহমানতাকে গুরুত্ব দিয়ে অক্ষরবৃত্ত রীতির অন্যতম একটি ছন্দ প্রকরণ হলো মুক্তক ছন্দ বা মুক্তবন্ধ ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে এই রীতির ছন্দের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন। বাংলায় মূলত অক্ষরবৃত্তে মুক্তকে লেখা বেশি দৃশ্যমান, যদিও মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তেও অনেক লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' মুক্তক অক্ষরবৃত্তে লেখা এবং কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা মুক্তক মাত্রাবৃত্তে লেখা।

কায়কোবাদ

১. কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী? তাঁর লেখা 'অশ্রুমালা' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
অথবা, 'অশ্রুমালা' কাব্যের রচয়িতা কে? *[২৫তম বিসিএস]*

উত্তর : কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কাজেম আল্ কোরেশী। তার কবি জীবনের প্রথম পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাব্য 'অশ্রুমালা' (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়। তার

যাবতীয় খ্যাতি এবং পাঠক সমাজের যত সব বিমুগ্ধ বিস্ময় তা তার 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যকে ঘিরে। তবে মহাকাব্য অপেক্ষা গীতিকবিতা বা খন্ড কবিতা রচনাতেই তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত ও অধিকতর সিদ্ধহস্ত। তার শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য 'অশ্রুমালা'ই এর বড় প্রমাণ। 'অশ্রুমালা'য় বিরহ-তাপিত মনের একান্ত ক্রন্দন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও 'অশ্রুমালা' কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় মুসলমানদের প্রাচীন সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে কবিকে দু:খ প্রকাশ করতে দেখা যায়। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা কবিকে বেদনার্ত করেছে। তাই তিনি অতীতের সমৃদ্ধ যুগকে স্মরণ করেছেন- সিরাজ সমাধি, মোসলেম শ্মশান, শ্মশান সংগীত প্রভৃতি কবিতায়।

২. কায়কোবাদের মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' বাংলা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ মহকাব্য। এর পটভূমি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। ইতিহাস থেকে মহাকাব্যের বিষয় নির্বাচনে কবি স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত। আহমদ শাহ আবদালী ভারতের সমগ্র মুসলমানকে একত্রিত করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের যথেষ্ট প্রাণহানির পর মুসলমান শক্তির জয় হয়। মহাশ্মশান কাব্যের মধ্য দিয়ে কবি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের বীরত্ব ও অতীত গৌরব তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বে উভয়পক্ষের শৌর্য শক্তির নিঃশেষ হবার কাহিনিই এ কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য। 'মহাশ্মশান' কাব্যে মহাকাব্যিক কাহিনি, কাহিনির শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও মহাকাব্য হিসেবে 'মহাশ্মশান' ত্রুটিপূর্ণ। অসংখ্য কাহিনি থাকলেও কাহিনি গ্রন্থন দুর্বল। কাহিনির ধারাবাহিকতা নেই। নায়কোচিত চরিত্র নেই। এছাড়া দীর্ঘ বক্তৃতা, অতিকথন দোষে কাব্যটি দুষ্ট। মহাশ্মশানে বক্তব্য আছে কিন্তু তা শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত হয় নি। তবুও বাংলা মহাকাব্যের জগতে মেঘনাদবধ কাব্যের পরেই 'মহাশ্মশান' এর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। এ কাব্য সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা মন্তব্য করেছেন-

> *'মহাশ্মশান কাব্যখানি হাতে নিলেই সর্বপ্রথম যে বিস্ময় ও কৌতুহল মনে জাগে তা হচ্ছে এই এতো বড় একটি মহাকাব্য লিখবার মত বিরাট মন যে কবির ছিল সে তো সাধারণ নয়।'*

কালীপ্রসন্ন সিংহ

১. 'হুতোম প্যাচার নকশা' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক সমস্যামূলক রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। কালীপ্রসন্ন সিংহ এতে অত্যন্ত বেদনার সাথে ব্যঙ্গাকারে কলকাতার সামাজিক ক্ষতচিহ্নের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে কলকাতার হঠাৎ ধনী

CamScanner

হওয়া নব্যসমাজের চিত্র, হিন্দু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামি ভণ্ডামির কদর্য দিকগুলো তুলে ধরেছেন। একই সাথে উনিশ শতকে বাঙালিদের ইংরেজ তোষণকে নিন্দা করেছেন। সেকালের শহরের নানা প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, যানবাহন ও পল্লির চিত্রময় বর্ণনা দিয়েছেন। এটি উপন্যাস না হলেও উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে (২০ অক্টোবর ১৮৬২) লিখেন-

'ইহাতে আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।'

কালীপ্রসন্ন যাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তারা সবাই সমাজের ক্ষমতাধর মানুষ। ফলে আইনি জটিলতা থেকে বাঁচার জন্য তিনি 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনাম ধারণ করেন। আর 'প্যাঁচা' নামকে বেছে নেওয়ার কারণ হলো প্যাঁচা নিশাচর প্রাণী বলে সকলের গোপন কীর্তি সে জানতে পারে। এতে কলকাতা ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন। লেখক 'হুতোম' ছদ্মনামে লিখতেন বলে এর ভাষা 'হুতোমী বাংলা' বলে পরিচিত পায়।

গিরিশচন্দ্র সেন

১. বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র সেনের অবদান মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান পবিত্র কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ। দীর্ঘদিন ধরে কোরআন শরীফের বাংলা ভাষায় অনুবাদ ছিল না। কুরআনের অনুবাদে ভুল হলে এর ভয়াবহ পরিণাম হবে; তাই কেউ এর অনুবাদে হাত দেয়নি দীর্ঘদিন। এগিয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র সেন। অল্প অল্প করে তিনি অনুবাদ করতেন এবং খণ্ড খণ্ড আকারে তা প্রকাশ করতেন। তিনি দীর্ঘ ছয় বছরে (১৮৮১-৮৬) কোরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ করেন। শুধু অনুবাদই নয়, প্রয়োজন অনুসারে বেশ কিছু টীকাও লিখেছেন। এসব টীকা দেবার জন্য তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রকাশিত বেশ কিছু তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক কাজ এবং বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তৎকালে তার করা অনুবাদ ছিল বাংলা ভাষায় সাড়া ফেলে দেবার মতো কাজ। তিনি শুধুই কোরআনের অনুবাদক ছিলেন না, তিনি বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থ, নবী-রাসূল ও সাহাবাদের জীবনী নিয়েও লিখেছেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১. গোবিন্দচন্দ্র দাসকে 'স্বভাব কবি' কেন বলা হয়?

উত্তর : গোবিন্দচন্দ্র দাস 'স্বভাব কবি'। স্বভাব কবি বলতে সেই কবিকে বোঝায় যিনি একান্তই হৃদয়-নির্ভর প্রেরণায় বিশ্বাসী। যখন যেমন মন চায় লিখে যান। গোবিন্দ দাসকে স্বভাব কবি বলার একটা কারণ হতে পারে- তিনি রচনার শিল্পরীতির

CamScanner

তোয়াক্কা না করে যখন যেমন খুশি লিখেছেন। যুগের চলতি সাহিত্যরীতির সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের কবিমনের গঠন মিল ছিল। ফলে তিনি প্রথার বাইরে যেতে চাননি। পুরনো রীতির মধ্যেই খানিকটা নতুনত্ব যোগান দিতে পেরেছেন তিনি। যা তার কবিতায় স্বভাব কবির চৈতন্য এবং গঠনভঙ্গি এনে দিয়েছে। প্রাচীনকালের বেশিরভাগ কবিতাতেই বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের চেতনা লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দচন্দ্র দাসেও অল্পাধিক ঐ ধারাটিই চর্চিত হয়েছে। সেই অর্থে তিনি আঞ্চলিক রসেরও কবি বটে।

গোলাম মোস্তফা

১. কবি গোলাম মোস্তফার তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : কবি গোলাম মোস্তফার গ্রন্থ- রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), বিশ্বনবী (১৯৪২)।

'রক্তরাগ' (১৯২৪) প্রথম কাব্য গ্রন্থ। এ কাব্যে মোট ২৮টি কবিতা স্থান লাভ করেছে। কবিতাগুলো মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা। যেমন- মরুর মহিমা, ঈদ উৎসব, হযরত মোহাম্মদ ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রেমের কবিতা। যেমন- প্রেমের জয়, পাশের বাড়ীর মেয়ে, প্রথম চিঠি ইত্যাদি। গোলাম মোস্তফার সমগ্র সাহিত্যের মূল ভাবধারা- ইসলামী চেতনা, স্বাজাত্যবোধ, প্রেম ও মানবতা এ বিষয়গুলো মোটামুটি এ কাব্যগ্রন্থেই প্রতিফলিত হয়েছে। বলা যায় এ কাব্যেই গোলাম মোস্তফার অনেকটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'লাইন কবিতার মাধ্যমে গোলাম মোস্তফাকে অভিনন্দন জানান-

'তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।'

'খোশরোজ' (১৯২৯) গ্রন্থে কবির ধর্মীয় চেতনার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম, শবে বরাত, কুরবানী, আল হেলাল, তরুণের অভিযান, তরুণের গান প্রভৃতি কবিতায় কবির এ ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

'বিশ্বনবী' (১৯৪২) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত। এটি কবি গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটা কোন গতানুগতিক জীবনী গ্রন্থ নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনী, রিসালত, কারামত, অন্য সকল মহাপুরুষের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি এ অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এটি সাধারণ পাঠকের জন্য নয়; এটা শিক্ষিত বিদগ্ধ পাঠকের উপযোগী।

CamScanner

জসীমউদ্‌দীন

১. জসীমউদ্‌দীনের একটি কাহিনিকাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস]

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য 'নকশী কাঁথার মাঠ'। রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর প্রেম কাহিনি নিয়ে কাব্যটি রচিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাগরিক জীবনের সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্যে থেকেও পল্লীর জীবন মাধুর্যের ছবি এঁকেছেন কবি এ কাব্যে। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তি এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ। এ কাব্য পড়ে একই সাথে কবিতা ও গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। এতে করে এ কাব্যে একঘেঁয়েমি দেখা দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তা পাঠকের আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১৪ পর্বের কাহিনীকাব্যের প্রতিটি পর্বের শুরুতেই সংযুক্ত করেছেন একটা করে গান। পর্বের সাথে সঙ্গতি রেখেই যুক্ত করা হয়েছে গানগুলো। গানগুলো আঞ্চলিক সুরে রচিত। 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যে পল্লীর প্রকৃতি, এর নানা উপকরণ, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার-সংস্কৃতি ইত্যাদির বর্ণনা ফুটে উঠেছে সহজভাবে। একটি কৃষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার চিত্র অঙ্কণ এবং গ্রামীণ প্রেমের আবেদনটি ফুটিয়ে তুলতে নকশী কাঁথাটি যথার্থ উপযোগী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি এ কাব্যের ভূমিকা লিখেছেন তিনি বলেছেন-

"এই লেখার মধ্য দিয়ে পল্লী জীবন আমার কাছে চমৎকার একটি মাধুর্যময় ছবির মতো দেখা দিয়েছে।"

২. কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের বিষয় ও প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। [২১তম বিসিএস]

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনের কাব্যোপন্যাস 'নক্সীকাঁথার মাঠ'। রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতির প্রেম কাহিনি এর বিষয়বস্তু। নায়ক রূপাই গাঁয়ের ছেলে, কৃষ্ণকায়, কাঁধ পর্যন্ত চুল এবং প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল। রূপাইর সঙ্গে সাজুর ভালবাসার সম্পর্ক এবং তারা বিয়ে করে সংসার শুরু করে। একদিন খবর আসে বনগেঁয়োরা তাদের গাজনা চরের পাকা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বনগেঁয়োদের সাথে লড়াই করে খুনের আসামী হয়ে ফেরারী হয় রূপাই। সাজু রূপাইয়ের সাথে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় থেকে শুরু করে রূপাইয়ের চলে যাওয়ার রাত পর্যন্ত সমস্ত অতীত স্মৃতি সুঁই-সুতা দিয়ে কাঁথার ওপর ফুটিয়ে তুলতে থাকে আর রূপাই আসার অপেক্ষা করে। শেষে একদিন আশা হারিয়ে মাকে বলে আমি মরে গেলে আমার কবরের উপর কাঁথাটি বিছিয়ে দিও। এভাবে একদিন সাজু মারা যায়। বহুদিন পর গাঁয়ের কৃষকেরা গভীর

রাতে বেদনার্ত এক বাঁশীর সুর শুনতে পায়, আর ভোরে দেখে সাজুর কবরের পাশে এক ভিনদেশি লোক মরে পড়ে আছে। 'নক্সী কাঁথার মাঠ'কে বলা হয় আবহমান বাংলার দর্পণ। এতে পল্লিজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদির জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এটি পড়ে পাঠক একই সাথে কবিতা ও গল্প পড়ার স্বাদ পায়। তাই কেউ কেউ একে কাব্যপোন্যাস বলে অভিহিত করেছেন।

৩. 'জসীমউদ্‌দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।' কেন? *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জসীমউদ্‌দীন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও গ্রামে বেড়ে উঠা 'পল্লীকবি' খ্যাত এ কবি গ্রামীণ জীবনের রূপকে কবিতায় তুলে এনেছেন। গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষ, তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা, ছায়া-ঢাকা সবুজ অরণ্য, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, শস্য ভরা ক্ষেত, নদী-নালা, ফুল-পাখি ইত্যাদি তার কাব্যে অসাধারণ বর্ণ-সুষমায় রূপায়িত হয়েছে। তবে তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গী হয়েছে আধুনিক শিল্প-রীতি ও কলা সম্মত উপায়ে। তাই তা পল্লী-জীবন-কেন্দ্রিক হলেও পল্লী-সাহিত্য হয়নি, হয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আধুনিক সাহিত্য। এটাকে পল্লীর সাথে নগর-জীবনের এক সুন্দর সেতুবন্ধন বলে আখ্যায়িত করা চলে। বাংলাদেশের অন্য কোন কবি পল্লীর ভাব ও বিষয় নিয়ে এমন সার্থক কাব্য-কর্ম করতে সক্ষম হননি। ফলে বাংলা কাব্যে তিনি নতুন ধারার প্রবর্তক ও স্বতন্ত্র মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি হিসাবে স্বীকৃত। নিজস্ব কাব্যপ্রতিভায় তিনি এক 'পল্লীধারা' বিপ্লবের সফল স্রষ্টা।

৪. জসীমউদ্‌দীনের তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনের তিনটি কাব্য-

- ✓ রাখালী (১৯২৭) প্রথম কাব্য গ্রন্থ।
- ✓ বালুচর (১৯৩০)
- ✓ ধানক্ষেত (১৯৩৩)

৫. জসীমউদ্‌দীন কোন অর্থে পল্লিকবি? *[২৪তম বিসিএস]*

উত্তর : জসীমউদ্‌দীন রচিত অধিকাংশ সাহিত্যের পটভূমি গ্রাম ও গ্রামীণ জীবন। পল্লি জীবনের নানা অস্ফুট চিত্র তার কবিতায় অতি যত্নের সাথে চিত্রিত হয়েছে। পল্লির সহজ-সরল মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি অতি দরদ দিয়ে কবি তাঁর কবিতায় চিত্রায়ণ করেছেন। বাংলা কবিতায় পল্লি নিয়ে অনেকেই কবিতা লিখেছেন। কিন্তু একমাত্র জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় পল্লির প্রকৃত চিত্র, প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। এ কারণে তাকে 'পল্লিকবি' বলা হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৬. জসীমউদ্‌দীন কী আসলেই 'পল্লিকবি'?

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনকে বাংলা সাহিত্যের 'পল্লিকবি' বলা হয়। তবে জসীমউদ্‌দীনকে 'পল্লিকবি' হিসেবে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মাঝে বন্দি করা মনে হয় কবির সৃষ্টির প্রতি অবমূল্যায়ন। সাহিত্যের পটভূমি পল্লি বা নগর যাই হোক, সে হিসেবে পল্লি সাহিত্য বা নাগরিক সাহিত্য বলা হয় না। কারণ সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাই হোক শিল্পের প্রকাশ শৈলীর ধরন ও ভঙ্গি অনুযায়ী তার চরিত্র নির্ধারণ হয়। বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে জসীমউদ্‌দীনের আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনি ও গল্প-উপন্যাসে রয়েছে আধুনিক নগরসভ্যতার ছাপ। সেজন্যই কবিকে পল্লি কবি না বলে বাঙ্গালির কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যথার্থ এবং সম্মানজনক হবে।

৭. জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনের কাব্যোপন্যাস 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। মুসলমান চাষীর ছেলে সোজন আর হিন্দু নমুর মেয়ে দুলীর প্রেম কাহিনিকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। শিমুলতলীর গ্রামের নমুদের নেতা গদাই মোড়লের কন্যা দুলালী তথা দুলীর সাথে দমির শেখের ছেলে সোজনের প্রেম। একদিন গ্রামে মহরমের উৎসবকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান সংঘাত শুরু হলে সোজনরা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। দুলীর বাবা অন্য ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করে। বিয়ের দিন হঠাৎ সোজন এসে উপস্থিত হয়। বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে দুজন ঘর বাঁধে গড়াই নদীর তীরে। কিছুদিন সুখে ঘর করলেও শেষ রক্ষা হয়না। অপহরণের মামলায় সোজনের জেল হয়। এদিকে দুলীকে এনে দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়া হয় ধনাঢ্য কালাচাঁদের সাথে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজন দুলীর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুলির শ্বশুড়বাড়ির গ্রামে আসে। সোজন বিষের বড়ি খেয়ে গভীর রাতে নদীর ঘাটে বাঁশীর সুর তোলে। দুলী বাঁশীর সুর শুনে পাগল হয়ে ছুটে আসে। একদিকে স্বামীর বিশ্বাসের মূল্য, অন্যদিকে সোজনের ভালোবাসার টান। এই টানাপোড়েনের মূল্য দিতে হয় দুলীকে জীবন দিয়ে।

৮. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার সারমর্ম লিখুন।

উত্তর : জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'কবর'। কবিতাটি তরুণ বয়সে রচনা তাই এতে তার আবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, তবে বাস্তবতা বর্জিত নয়। প্রেম কবিতার প্রধানতম উপাদান। কিন্তু শ্যামল, সবুজ, মায়াঘেরা স্নিগ্ধ পল্লীর রূপায়ণ ও সহায়হীন মানুষের দুঃখ, বেদনার করুণ দিকগুলো কবিতাকে পূর্ণতা দান করেছে। এটি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ড্রামাটিক মনোলগ। এটি একটি শোকগাথা বা এলিজি। বাংলা সাহিত্যে এত মর্মন্তুদ কবিতা আর লেখা হয়নি। কবিতাটি পাঠক ও সুধী মহলে এত বেশি সাড়া ফেলেছিল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটি তাদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় যা সে সময়কার কোন মুসলমান কবির মধ্যে ছিল প্রথম। কবিতাটিকে জন

CamScanner

মিলটনের 'লিসিডাস', শেলীর 'এডোনিস', বা টেনিসনের বিশ্বখ্যাত 'ইন মেমোরিয়াম'-এর সাথে তুলনা করা হয়। একজন অসহায়ের সব হারানোর যন্ত্রণা সবার হৃদয়ে নাড়া দেয়। জীবনসায়হ্নে এসে তার বেদনার্ত স্মৃতিচারণসূত্রে জানা যায় কিভাবে এক এক স্বজন হারিয়ে তিনি আজ রিক্ত হয়েছে। শুধু বেদনাবিধুরতা নয় তার স্মৃতিচারণে সুখস্মৃতিও দোলা দেয়। যাতে পল্লীর সমাজ জীবনও ফুটে উঠে-

'শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু'পয়সা করি দেড়ি,
পুঁতির মালা একছড়া নিতে কখনো হইত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এর মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে।'

জহির রায়হান

১. 'হাজার বছর ধরে' কার লেখা? কী বিষয়ে কোন আঙ্গিকে লেখা? *[২০তম]*
অথবা, জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি? *[১০তম বিসিএস]*

উত্তর : জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪)। পরীর দীঘির পাড়ের ক্ষুদ্র একটি গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারের সংঘাতময় জীবন কাহিনি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারটির কর্তা মকবুল বুড়ো। বৃদ্ধ মকবুলের তৃতীয় স্ত্রী কিশোরী টুনি গ্রাম বাংলার এক উচ্ছল কিশোরীর প্রতীক। টুনি উপন্যাসের আরেক চরিত্র মন্তুকে নিয়ে রাতের আঁধারে মাছ ধরতে যায়, বর্ষায় শাপলা তুলতে যায়। ভালবাসার জোয়ারে ভাসে দুজন কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। একসময় মকবুল মারা যায়। মন্তু যখন তার মনের কথা টুনিকে বলে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

রাতে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার দৃশ্য দিয়ে উপন্যাস শুরু হয় আবার শেষের দিকে তার ছেলে বাপের মতোই পুঁথি পড়তে থাকে। হাজার বছরের পুরানো জোস্না ভরা রাতে একই পুঁথির সুর ভেসে বেড়ায় বাতাসে। এ উপন্যাসে জহির রায়হান বাংলার গ্রামীণ সমাজের নিখুঁত চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কালের আবর্তে প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে পরিবর্তিত হয় অনেক কিছু। শুধু পরিবর্তন আসেনা অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম বাংলার সমাজে।

২. বাংলা কথাসাহিত্যে জহির রায়হানের অবদান তুলে ধরুন।

উত্তর : জহির রায়হানের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো- হাজার বছর ধরে, আর কয়টা দিন, কয়েকটি মৃত্যু, তৃষ্ণা, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী প্রভৃতি। এসব উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হবে এতে নতুন কিছু নেই। এই নতুন কিছু না থাকাটাই অন্যভাবে যেন তার উপন্যাসের সম্পদ হয়ে দাড়িয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে

এত সাধারণ মনে হয়, এত চেনা মনে হয় যে তাদের সাথে মিলেমিশে যেতে মুহূর্ত লাগে না। মনে হয় এটা শুধু মরিয়ম-মাহমুদ-লিলির একান্ত কাহিনি নয়, আমার চারপাশের কাহিনি। একটা সামগ্রিকতার আভাস ফুটে ওঠে তার স্বল্পায়তন উপন্যাসের কলেবরে।

জাহানারা ইমাম

১. জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : জাহানারা ইমাম রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি'। এতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা শহরের অবস্থা ও গেরিলা তৎপরতার বাস্তব চিত্র। তার সন্তান শফি ইমাম রুমী বইয়ের প্রধান চরিত্র। ব্যক্তিগত দিনলিপি বা ডায়েরি আকারে লেখা বইটির ব্যাপ্তি ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। লেখিকা অসাধারণ লেখনির মাধ্যমে পাঠককে নিয়ে গেছেন সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে। প্রতিটি দিনের এমন নিখুঁত বর্ণনা লেখিকা তার বইয়ে দিয়েছেন যেন মনে হয় সব কিছু পাঠকের সামনে ঘটে যাচ্ছে। 'একাত্তরের দিনগুলি' উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত একটি পরিবারের সদস্যদের যাপিত জীবনের দিনলিপিটি। সেই পরিবারের হাসি কান্না স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা যেন একটি জাতির হাসি কান্না স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। জাহানারা ইমাম দিনপঞ্জির আদলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এক মায়ের আবেগ, তাঁর সন্তানের প্রতি ভালবাসার বিপরীতে দেশ ও আত্মমর্যাদায় দৃঢ় মানসিকতার এক উজ্জ্বল দিনলিপি 'একাত্তরের দিনগুলি'।

জীবনানন্দ দাশ

১. বাংলা কবিতার 'পঞ্চপাণ্ডব' কারা? কেন এরূপ বলা হয়? *[৪৩তম]*

উত্তর : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীনচেতা লেখনীর মাধ্যমে কল্লোল যুগের শুরু হয়। এই যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পাঁচ জন প্রথিতযশা লেখক কবি। যারা বাংলা কবিতার ইতিহাসে পঞ্চপান্ডব নামে খ্যাত। তারা হলেন-

- ✓ অমিয় চক্রবর্তী
- ✓ জীবনানন্দ দাশ
- ✓ বুদ্ধদেব বসু
- ✓ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- ✓ বিষ্ণু দে।

বিগত শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রযুগ হিসেবে খ্যাত। বাংলা কবিতায় তখন রবীন্দ্রনাথের বাইরে কিছু হচ্ছিল না। এ পাঁচজন কবি বাংলা সাহিত্যে নতুন

একটি যুগের উন্মেষ ঘটান। তারা রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে তারা সবাই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন।

২. আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন। *[৪০তম বিসিএস]*

উত্তর : জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। নিবিড় প্রকৃতিচেতনা তাঁর কবিতায় গভীর দ্যোতনা লাভ করেছে। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা- পুরাণের জগৎ তার কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। বিশেষত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে যেভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি রূপসী বাংলার কবি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থে প্রায় ৭০টি ফুল-ফল-বৃক্ষ ও লতা-গুল্মের ছবি এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। বর্তমান এবং পরবর্তী প্রজন্ম যেন পলিমাটির এসব আত্মজকে খুব সহজেই চিনতে পারে, সে লক্ষ্য থেকেই এই কাব্য। কবি ধানসিঁড়ি নিয়ে কবিতা লিখে তিনি খ্যাতিম্যান হয়েছেন। সেই ধানসিঁড়িকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছেন। ধানসিঁড়ির রূপে পরিচিতি দিয়েছিলেন বাংলার অসীম রূপ। তাঁর কবিতার চিত্রময়তার সঙ্গে সবাই ঘনিষ্ট বোধ করে। এটি তাঁর জনপ্রিয়তার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ। আবহমান বাংলার যে প্রকৃতির বর্ণনা জীবনানন্দ করেন, বাস্তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যাক আর না যাক সেই সৌন্দর্যকে নিজের ভেবে প্রবলভাবে সবাই আঁকড়ে ধরে। সম্রাট বিম্বিসার কে, বির্দভ নগর কোথায়, তা'না জেনেই মনে মনে নিজের মতো এক চিত্র ও ধ্বনির জগৎ গড়ে নেয়।

৩. 'অবসরের গান' কবিতাটি কার রচনা? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : 'অবসরের গান' কবি জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের কবিতা। এ কবিতায় কবি হেমন্তের অপরূপ চিত্র এঁকেছেন। কবিতাটিতে তিন ভাগ রয়েছে- প্রথমটি ধান পাকার সময়ের উৎসবের আমেজে মজে হাতে হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচবার গান; দ্বিতীয়টি ফলন্ত মাঠের পরে মরণের স্থান না খুঁজে গাওয়া 'প্রেম আর পিপাসার গান'; আর তৃতীয়টি 'অলস মাছির শব্দে' ভরে থাকা সকালে 'গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে' ভেসে আসা চোখের ঘুমের গান।

৪. জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার উপস্থিতি তুলে ধরুন। *[৩১তম]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ মানেই নান্দনিক উপমার বিশাল এক সমাহার। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ ফুটে আসে। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির যে ছবি তিনি

কবিতায় এঁকেছেন, তার তুলনা তিনি নিজেই। আর এই প্রকৃতির সাথে মিশিয়েছেন অনুভব আর বোধ; যা একত্রে কবিতারূপে অনন্য এক শিল্প হয়ে ধরা দিয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বৈশিষ্ট্য 'চিত্ররূপময়' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন, রঙের ব্যবহার, অনুভব সব মিলিয়ে জীবনানন্দ তৈরি করেছেন অপ্রতিম কবিভাষা। তার ব্যবহৃত উপমাগুলো প্রতিষ্ঠিত অন্য কবিদের থেকে ব্যতিক্রম। এছাড়াও নান্দনিকতাঋদ্ধ এসব উপমা জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিশেষভাবে শনাক্ত করতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। যেমন- 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি বলেছেন-

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

৫. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্য কে রচনা করেন? তাঁর কবি মানসের পরিচয় দিন। *[৩০তম, ১০ম বিসিএস]*

উত্তর : কবি জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১৭টি কবিতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ কাব্যটি কবি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কাব্য-বৈশিষ্ট্য, আবেগ-অনুভব, শব্দের বহুমাত্রাবিধ দ্যোতনা বা ভাষার তীর্যকতা, প্রকাশ-শৈলী ইত্যাদি তাঁর কবিতাকে মহিমান্বিত করেছে। যা তাঁর সময়ের বা পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্নতর। আধুনিক কাব্যকলার বিচিত্র ইজম প্রয়োগ ও শব্দ নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রতিভা বিস্ময়কর। কবিতার উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দের নৈপুন্য তুলনাহীন। কবিতাকে তিনি মুক্ত আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করে গদ্যের স্পন্দনযুক্ত করেন, যা পরবর্তী কবিদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কবিতা মানে আধুনিকতা, যুগযন্ত্রণা, আধুনিক জীবন দর্শন ও চেতনার আলোচনা। তিনি ছিলেন একজন কালসচেতন ও ইতিহাসচেতন কবি। তিনি ইতিহাসচেতনা দিয়ে অতীত ও বর্তমানকে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে বেঁধেছেন। তাঁর কবিস্বভাব ছিল অন্তর্মুখী, দৃষ্টিতে ছিল চেতনা থেকে নিশ্চেতনা ও পরাচেতনার শব্দরূপ আবিষ্কারের লক্ষ্য। যে কাল-পরিধিতে বাঙালি কবিতা-পাঠক জীবনানন্দকে আবিষ্কার করেছে, সে সময়ে রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির মর্মমূল অধিকার করে নিয়েছে। এক বিবেচনায় বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথেরই পরিপূরক।

৬. জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। *[২২তম, ২০তম]*

উত্তর : জীবনানন্দ দাশের তিনটি কাব্যগ্রন্থ হলো-

ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)। এ কাব্যগ্রন্থে ১৭টি কবিতা আছে। ভাষা, দেশিয় ও লোকজ উপাদানের বুননে এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো জীবন্ত হয়েছে। কবিতাগুলোতে

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা উঠে এসেছে। একই সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির দৌরাত্ম্য ও কালো থাবার কথা তুলে ধরা হয়েছে। গরীব দেশগুলোকে কীভাবে শোষণ করা হয় তাও কবি ইঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

বনলতা সেন (১৯৪২) কবির জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়নে যেমন বিদিশা, শ্রাবস্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো বা চোখের নীড়ের মতো উপমাগুলো নির্মাণ করেছে নতুন কাব্যমণ্ডল। প্রেম ও প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বর্তমানকে তন্নতন্ন করে খোঁজা- এসব কিছুর সমাহার ঘটেছে এ কাব্যে।

রূপসী বাংলা (১৯৫৭) জীবনানন্দ দাশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। কবির মৃত্যুর পর এর পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। কবি এ কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ নাম নির্বাচন করেছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'। তবে প্রকাশকালে 'রূপসী বাংলা' স্থির করা হয়। কবিভ্রাতা আশোকানন্দ দাশের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কবি মৃত্যুর তিন বছর পর।

৭. জীবনানন্দ দাশকে 'রূপসী বাংলার কবি' কেন বলা হয়?

উত্তর : জীবনানন্দ দাশকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি। বাংলার চিরায়ত রূপকে তিনি কবিতার পংক্তিতে উঠিয়ে এনেছেন। তার লেখনীর মধ্য দিয়ে বাংলার রূপ-সৌন্দর্যকে এত নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন, যার তুলনা তিনি নিজেই। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। বিশেষত রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে যেভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও অনুসূক্ষ্ম সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। তবে প্রকৃতির পাশাপাশি জীবনানন্দের শিল্পজগতে মূর্ত হয়েছে বিপন্ন মানবতার ছবি এবং আধুনিক নগরজীবনের অবক্ষয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও সংশয়বোধ। জীবনানন্দ দাশের বহুমাত্রিক অনন্য প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

৮. জীবনানন্দ দাশকে 'ধূসরতার কবি' বলা হয় কেন?

উত্তর : জীবনানন্দ দাশের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। কিন্তু শুধু এ কারণেই তাঁকে 'ধূসরতার কবি' বলা হয় না। ঝরা পাতা, শিরশিরে হাওয়া, ব্যাবিলন মিশরীয় সভ্যতা-এসবই জীবনানন্দ দাশের কাব্য বৈশিষ্ট্য। বন্ধ্যাযুগের যথাযথ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দের তুলনা হয় না। মৃত্যুচেতনাও প্রায় প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শ্মশান, মরুবালু, আলেয়া ইত্যাদি কবিতার পটভূমি মৃত্যু। এই মৃত্যুচেতনা যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ভুত। একটি কবিতায় তিনি হতাশা ভরে বলেছেন:

'বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্য কাগজের ডাঁইয়ে পড়ে আছে
আমাদের সন্ততিও আমাদের নয়।'

CamScanner

এরকমের হতশা আর বিবর্ণের কথা আছে তার বহু কবিতায়। তাঁর কবিতার চালচিত্রে আছে ধূসর বর্ণ। তাই জীবনানন্দ দাশকে 'ধূসরতার কবি' বলা হয়।

৯. জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : কাব্যে আধুনিক কাব্যকলার বিচিত্র ইজম প্রয়োগ ও কবিতায় উপমা প্রয়োগে কবি জীবনানন্দ দাশের নৈপুণ্য তুলনাহীন। তার প্রথম কাব্যে নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্য ধারার প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী। তার কাব্যবৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

- ✓ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা তার কাব্যে চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে। তার 'রূপসী বাংলা' কাব্যে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে।
- ✓ তিনি ইতিহাস চেতনাসম্পন্ন কবি। ইতিহাসের চেতনা দিয়ে অতীত ও বর্তমানকে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সূত্রে বেঁধেছেন। যেমন: 'বনলতা সেন', 'নির্জন হাত' ও 'হাওয়ার রাত' ইত্যাদি।
- ✓ আধুনিক নগর জীবনের অবক্ষয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও সংশয়বোধ তার কাব্যে উঠে এসেছে। যেমন : '১৯৪৬-৪৭', 'রাত্রি' ইত্যাদি।
- ✓ তিনি বেশ কিছু কাব্যে অবিমিশ্রভাবে প্রেমের কথা বলেছেন। যেমন- 'তোমায় আমি', 'তোমায় আমি দেখেছিলাম' ইত্যাদি।

১০. জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : জীবনানন্দ দাশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা'। কবির মৃত্যুর পর এর পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। কবি এ কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ নাম নির্বাচন করেছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'। তবে প্রকাশকালে 'রূপসী বাংলা' স্থির করা হয়। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবি হলেও গ্রামবাংলার উপাদান উপকরণ তাঁর কাব্যে পেয়েছে স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি তার 'রূপসী বাংলা' কাব্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। নীলাকাশ, কাশবন, হিজল-নারকেলের সবুজ পাতা কবিকে হাতছানি দেয়। প্রকৃতিপ্রেম এক সময় কবিকে অতীতবিধুরতার পথে টেনে নিয়েছে। কবির সমগ্র অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকা বাংলার প্রকৃতি, বাংলার পাখপাখালি, নদ-নদী, গাছ-গাছালি প্রাকৃতিক পরিবেশ- সবই কবির অভিজ্ঞাত। কবি তাই মৃত্যুর পরেও শঙখচিল, রাজহংস, শালিক বা বাংলার কোন পাখি হয়ে রূপসী বাংলায় ফিরে আসতে চান। রূপসী বাংলা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ কাব্যের মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃতিপ্রেম ও দেশপ্রেম উচ্চারিত হয়েছে।

CamScanner

১১. জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : জীবনানন্দ দাশের অধিক পরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন' প্রধানত রোমান্টিক গীতিকাব্য হিসেবে সমাদৃত। এ কাব্যগ্রন্থে মোট ৩০টি কবিতা রয়েছে। এতে কবি গাছপালা, পশুপাখি, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসহ প্রকৃতির নানা উপাদানকে আশ্রয় করে চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন। 'আমাকে তুমি' কবিতায় লিখেছেন-

'ঝাউ হরিতকি শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল, পিয়াল আমলকী দেবদারু-
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ জীবনের ফেনা।'

একই সাথে তিনি মৃত্যু চেতনাও তুলে ধরেছেন-

'মরনের পরপারে বড় অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম নির্জনতার মতো।'

এতে ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়ণে যেমন বিদিশা, শ্রাবন্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো দু'টি চোখ উপমাগুলো হয়ে উঠেছে আধুনিক-অভিনব ও কাব্যময়। প্রেম প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি অবসাদ, ইতিহাস ঐতিহ্য ও বর্তমানকে তন্নতন্ন করে খোঁজা- এ সব কিছুর সমাহার ঘটেছে এ কাব্যে। পাখির নীড়ের মতো চোখ, শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা, অন্ধকারের মতো কালো চুল ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে 'বনলতা সেন' কাব্যকে বিশেষ অনবদ্যতা দান করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।

উত্তর : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার অন্যতম কথাসাহিত্যিক। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের মাটি ও মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তির মহিমা, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের বিজয় ইত্যাদি তার লেখার উপজীব্য। বিশেষ করে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা প্রবলভাবে উঠে এসেছে। মানবচরিত্রের নানা জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য তার উপন্যাসে জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামীণ জীবনের ভাঙনের কথা, নগর জীবনের বিকাশের কথা তার রচনায় নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনায় একদিকে গ্রাম্য নিম্নবিত্ত সমাজের সুখ-দুঃখের কাহিনি, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। জীবনবোধের প্রথম থেকেই রাজনীতির উপস্থিতির কারণে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসত্রয় রাজনৈতিক মহাকাব্যিক অনুষঙ্গে লিখতে সমর্থ হন।

©Nazmus Sadat
CamScanner

২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) রচিত উপন্যাস 'কবি'। এ উপন্যাসের উপজীব্য অন্ত্যজ শ্রেণির একজন কবিয়ালের জীবনগাঁথা। কবিয়ালের নাম নিতাইচরণ। চোর-ডাকাত বংশের ছেলে নিতাইচরণ গ্রামের সবাইকে চমকে দিয়ে কবি হয়ে ওঠে। হিন্দু শ্রেণি ব্যবস্থায় সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ডোম। ডোম সম্প্রদায়ের যুবক নিতাইচরণের কবিরূপে প্রতিষ্ঠা এবং দু'জন নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কাহিনি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত।

'কবি' একটি ভিন্নস্বাদের ও ভিন্ন আঙ্গিকের উপন্যাস। সময়ের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা নিয়ে এ ধরনের উপন্যাস বেশি রচিত হয়নি। বিষয় বৈচিত্র্য আর প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে 'কবি' নিঃসন্দেহে একটি অনন্য অসাধারণ সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসটিতে ব্যক্তির জীবনের প্রত্যাশা-প্রাপ্তির আড়ালে মানবজীবন-বিষয়ক অনেক বার্তা দিয়েছেন লেখক। পরকীয়া এবং অবাধ যৌনাচার যে কারও জন্য সুফল বয়ে আনে না, তা বোঝানোর চেষ্টা আছে উপন্যাসে। উপন্যাসের অভিনবত্ব হচ্ছে সংলাপগুলো কাব্যিক। কবিতার পঙক্তির আধিপত্যের কারণে কখনো কখনো একে কাব্যোপন্যাস বলে মনে হয়। এই উপন্যাসের ক্লাসিক সংলাপ-

'জীবন এতো ছোট কেনে? এ ভুবনে।'

৩. তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের বিষয় ভাবনা আলোচনা করুন।

উত্তর : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি' গল্পটির উপজীব্য বৈষ্ণবদের জীবনাচরণ, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার ও জীবনবোধ। রাঢ় অঞ্চলের বাউল বোষ্টমদের জীবন যাত্রায়, সমাজ সংগঠনে, তাদের বিশ্বাসে ও আচরণে এমন কিছু স্বাতন্ত্র আছে যা বাইরে থেকে সমাজতাত্ত্বিকদের যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি ভেতর থেকে শিল্পী সাহিত্যিকরাও উৎসাহিত হতে পারেন। বৈরাগী বোষ্টমদের গোষ্ঠী জীবন তারাশঙ্করের লেখাতে বিশিষ্ট বিষয় হয়ে ওঠে। ভদ্র সমাজের একটু দূরে, হিন্দুদের ধর্মীয় চৌহদ্দীর মধ্যে থেকেও স্বাতন্ত্রবৃত্তে এই বৈরাগী বোষ্টমরা নিজেদের বেঁধেছে। গল্পে বৈষ্ণব জীবনে মাধুকরী বৃত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিবাহ বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও বৈষ্ণবীয় প্রেমের অনুষঙ্গে লোকায়ত সমাজ গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। অপছন্দ হলে বিবাহিত নারীরা পুরুষকে প্রত্যাখান করার মাধ্যমে নারী স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে। গল্পটিতে বৈরাগ্য জীবনের সরস উচ্ছলতা ও প্রণয় বিষয়ে স্বাধীনতা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।

CamScanner

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১. **'সাজাহান' নাটকের পটভূমি ও উপজীব্য লিখুন।**

উত্তর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'সাজাহান' (১৯০৯)। মোগল সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালের দ্বন্দ্বমুখর ঘটনাবলি এ নাটকের উপজীব্য। শেষ বয়সে সম্রাট সাজাহান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রাজ্য পরিচালনায় অসমর্থ হলে জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন। কিন্তু দারার এ ক্ষমতাপ্রাপ্তি সম্রাটের অন্য তিন পুত্র মেনে নিতে পারে নি। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেবের হাতে ভাইয়েরা বন্দী ও নিহত হয়। সম্রাট আগ্রায় বন্দীদশায় জীবন কাটান। সম্রাটের শেষ জীবন, চার পুত্রের রাজক্ষমতা দখলের হীন চক্রান্ত এবং আওরঙ্গজেবের বিজয়ই 'সাজাহান' নাটকের কাহিনি। নাটকটিতে পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা রক্ষার চেষ্টার মধ্যেই সমস্যার বীজ নাট্যকার সুকৌশলে প্রোথিত করেছেন। মোগল সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের উত্তেজনা নাট্যকার দর্শকচিত্তে সঞ্চার করতে পেরেছেন। কাহিনি বুনন, বিশ্লেষণধর্মী চরিত্র সৃষ্টি, চরিত্রানুগ সংলাপ নির্মাণ, স্থান ও ঘটনার ঐক্য সংস্থাপনে 'সাজাহান' কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরই নয়, বরং বাংলা নাট্যসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নাটক।

দীনবন্ধু মিত্র

১. **'সধবার একাদশী' কি সার্থক প্রহসন? আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]***
'সধবার একাদশী' কার লেখা ও কী ধরনের বই? *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। এতে সে যুগের কলকাতায় উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি চরিত্র ভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মদ্যপান ও তৎসংশ্লিষ্ট নৈতিক অধঃপতন কীভাবে সমাজকে বিধ্বস্ত করে তা দেখানোর জন্যই নাট্যকার নাটক শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে জীবন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র অটল ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান। তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের প্ররোচনায় সে মদে আসক্ত হয় এবং বেশ্যালয়ে গমন শুরু করে। কাঞ্চন নামের এক মেয়েকে রক্ষিতা হিসেবে রাখে। অটলের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ করে নিমচাঁদ এসব কর্মকান্ডে তাকে সাহায্য করে। এক পর্যায়ে কাঞ্চনসহ বন্ধুরা সবাই দূরে চলে গেলে অটল বাস্তবতা বুঝতে পারে। অন্যদিকে নিমচাঁদের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জীবনে ব্যর্থতা, অধঃপতন বোধ ও আত্মগ্লানি প্রহসনটিতে এক গভীর মাত্রা যোগ করেছে। কেনারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণির নৈতিক অবস্থান এবং বিচার ব্যবস্থার হাস্যকর পরিচয় ফুটে উঠেছে। অটল চরিত্রের বিবর্তন, নিমচাঁদ চরিত্রের পরিণতি এবং কেনারাম চরিত্র কেন্দ্রিক বাস্তবতার বিবরণ সব মিলে সার্থক চরিত্রায়ণ ঘটেছে।

CamScanner

২. 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে সামাজিক মূল্য বেশি। মন্তব্যটির পক্ষে কিছু লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ নাটকে চরিত্র চিত্রায়ণে দেখা যায় দুএকটি চরিত্র ছাড়া প্রায় সব চরিত্র ব্যর্থ। সংলাপের কৃত্রিমতায় ও পুঁথিগত ভাবের আড়ষ্টতায় স্বাভাবিক মানুষের মত হয় নি। তবে চাষাদের সরল উক্তি, কৌতুকরস ও কারুণ্য মনকে নাড়া দেয়। আবার উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির ট্র্যাজেডিকে ক্ষুণ্ন করেছে। গঠনগত এসব ত্রুটি সত্ত্বেও এ নাটকের সামাজিক মূল্য যথেষ্ট গুরুত্ববহ। এটি কেবল নীলকরদের সাময়িক উৎপীড়নের কাহিনি নয়। এতে পল্লি জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং সনাতন জীবন-সত্য প্রাণবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রথম আঞ্চলিক ভাষায় কৃষক জীবনের মৃত্তিকাশ্রিত বাস্তবরূপ উদ্ঘাটিত হলো। এই নাটকেই প্রথম প্রতিবাদের জ্বালাময় রূপ দেখা যায়। মোটা দাগে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অত্যাচারিত মানুষের পীড়নের চিত্রের বেশি কিছু এ নাটকে না থাকলেও গ্রাম্য ভূমিকাগুলোর মধ্যে মানব জীবনে অনাবৃত খণ্ডিত রূপটুকুর চকিত যে দর্শন পাওয়া যায় তা-ই সমসাময়িক সামাজিক সমস্যামূলক নাটকগুলো হতে নীল দর্পণকে বিশিষ্ট করেছে।

৩. 'নীলদর্পণ' কে লিখেছেন? তাঁর একটি বিখ্যাত প্রহসনের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। বাংলাদেশের মেহেরপুর অঞ্চলের নীলচাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে এটি রচিত। প্রথম প্রকাশের সময় দীনবন্ধুর নাম ছিল না। এটি তিনি 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিকেনাভি প্রণীতম' ছদ্মনামে রচনা করেন।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। এ প্রহসনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতায় উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে ইয়ংবেঙ্গল সমাজের অধঃপতনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মদ্যপান ও তৎসংশ্লিষ্ট নৈতিক অধঃপতন কিভাবে সমাজকে বিধ্বস্ত করে তা দেখানোর জন্যই নাট্যকার নাটক শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে জীবন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করেছেন।

CamScanner

৪. বাংলা নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান বর্ণনা করুন।

উত্তর : দীনবন্ধু মিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অন্যতম রূপকার। মধুসূদন দত্ত যেমন বাংলা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাত করেছিলেন, তেমনি দীনবন্ধু মিত্র বাস্তবধর্মী সামাজিক নাটক রচনায় খ্যতিলাভ করেন। সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষ তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। দীনবন্ধু মিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'নীলদর্পণ'। নীলদর্পণ নাটকের মূল উপজীব্য বাঙালি কৃষক শ্রেণির প্রতি নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি। এ নাটকের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েই গিরীশচন্দ্র ঘোষ কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার গঠন করেন এবং নীলদর্পণই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত হয়। তারপর একে একে রচনা করেন নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক নাটক ও প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক আধুনিক বিচারে শ্রেষ্ঠ না হলেও বাংলা নাটকের প্রথম যুগের সম্পদ। দীনবন্ধুকে আদর্শ করেই অনেকে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। তাই বলা যায় বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান অনস্বীকার্য। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

'মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর আকালে মৃত্যু হয়, তিনি আর একটু দীর্ঘজীবি হলে বাংলা নাটকের যে কত উন্নতি হত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।'

৫. 'নীলদর্পণ' নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করুন।

উত্তর : শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। উৎকৃষ্ট নীল গাছ কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই জন্ম হত। ফলে ইংরেজ বণিকরা হুগলির কাছাকাছি নীলকুঠি স্থাপন করে। নীলের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় যশোর, নদীয়া ও পাবনা জেলায় নীলচাষ সম্প্রসারিত হয়। এক সময় ইউরোপের বাজারে নীলের দাম পড়ে যাওয়ায় নীলকরগণ নীলচাষীদের মজুরি কম দিতে শুরু করে। ফলে প্রজারা নীল চাষ করতে রাজি হয় না। তখন নীল চাষীদের ওপর নেমে আসে অত্যাচার। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলে। ফলে নীলচাষীরা নিজেদের রক্ষায় সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করে। নীলচাষী ও নীলকরদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষের ঘটনাই দীনবন্ধু মিত্রকে 'নীলদর্পণ' লিখতে প্রণোদিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে কৃত্রিম নীল রং তৈরি করলে এ দেশে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

CamScanner

নবীনচন্দ্র সেন

১. নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্য- রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)। এ তিনটি মূলত একটি বিরাট কাব্যের তিনটি স্বতন্ত্র অংশ। তিনটি অংশ আলাদাভাবে একেকটি কাব্য কিন্তু একত্রে একটি মহাকাব্যের মর্যাদা পায়। এর নায়ক কৃষ্ণ। বৈরতকে কৃষ্ণের আদি, কুরুক্ষেত্রে মধ্য ও প্রভাসে অন্তলীলার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

নির্মলেন্দু গুণ

১. নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয় কেন?

উত্তর : নির্মলেন্দু গুণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কবিতা রচনা শুরু করেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (১৯৭০) দিয়েই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি তরুণদের মন জয় করেন এবং অগ্রজ কবিদের সমীহ আদায় করেন। তার কবিতা এতোটা প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠে যে, তরুণেরা তার কবিতা দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, তিনিই সম্ভবত এখন পর্যন্ত একমাত্র কবি, যার কবিতা পড়ে অনেকে কবি হবার আকাঙ্ক্ষা বোধ করতেন। বাংলাদেশের আর কোনো কবি অনুজ কবিদের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। সত্তর দশকের অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি নির্মলেন্দু গুণের প্রভাবেই কবি হয়েছেন। পরের দশকগুলোতেও এই কবির প্রভাব অল্প-বিস্তার তরুণ কবিসমাজকে প্রভাবিত করে। তাই নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের 'কবিদের কবি' বলা হয়।

নীলিমা ইব্রাহিম

১. নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ড. নীলিমা ইব্রাহিম রচিত গ্রন্থ 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'। বীরাঙ্গনা শব্দের অর্থ বীর নারী। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অগণিত নারী তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে 'বীরাঙ্গনা' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে কেউই বীরাঙ্গনাদের খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগের বিনিময়ে তারা পেয়েছে মানুষের ঘৃণা ও অবহেলা। এমনকি কেউ কেউ উপহাস করে 'বারাঙ্গনা'ও বলেছে। বীরাঙ্গনাদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যা করেছেন, অনেকে চিরদিনের জন্য নিজেকে আড়াল করেছেন, কেউ আবার দেশান্তরিত হয়েছেন। এই মহান বীরাঙ্গনাদের আত্মকথা নিয়ে ড. নীলিমা ইব্রাহিম রচনা করেছেন 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন বীরাঙ্গনাদের দুঃখ এবং যুদ্ধের পরবর্তী সুখ-দুঃখের কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লেখিকা যে

©Nazmus Sadat
CamScanner

বীরাঙ্গনাদের কথা বলেছেন তারা ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক অবস্থা থেকে আসা। কৃষকের মেয়ে থেকে শুরু করে উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদের মেয়েও রয়েছে। যাদের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন- তারা ব্যানার্জি, মেহেরজান, রীনা, শেফালী, ময়না, ফাতেমা ও মীনা।

নূরুল মোমেন

১. 'নেমেসিস' কোন শ্রেণির রচনা? রচয়িতার নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের প্রথম নিরীক্ষামূলক নাটক নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন (পঞ্চাশের) মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত নাটকের কাহিনি চোরাকারবারীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। নেমেসিস নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্কুল মাষ্টার সুরজিত নন্দী। সুরজিত ধনী নৃপেন বোসের কন্যা সুলতাকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। নৃপেন বোস বিয়ের পূর্বশর্ত দেয় তিন মাসের মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা উপার্জন করতে হবে। সুরজিত এ শর্তে রাজি হয়। শর্ত পূরণের জন্য সে নৃপেন বোস ও তার সহযোগী অসীমের সহায়তায় যুদ্ধের বাজারে কালো টাকা উপার্জনের পথ আবিষ্কার করে। কিন্তু বিবেকের দংশনে পীড়িত হয় সুরজিত। বিজয় মুহূর্তে সুরজিতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনি শেষ হয়। নেমেসিস এক চরিত্রের একটি ট্রাজেডি। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যকর্মী সজনীকান্ত দাশের মন্তব্য-

> *"দেড় ঘন্টা ধরে এই এক চরিত্র একাঙ্ক নাটকটি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম একথা একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। সার্থক শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এতোখানি গভীর অনুভূতি বাংলা সাহিত্যে দেখিনি।"*

বাংলা নাট্যসাহিত্যে এর পূর্বে একক চরিত্রের নাটক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ রচনা করেন নি। তবে এ নাটকের অদৃশ্য চরিত্র হিসেবে আছে নৃপেন বোস, তার কন্যা সুলতা, ম্যানেজার অসীম, অমল বাবু, ইয়াকুব প্রমুখ।

২. নূরুল মোমেনের নাটকের স্বরূপ তুলে ধরুন।

উত্তর : নাট্যকার নূরুল মোমেন সমাজ ও জীবনভিত্তিক নাটক রচনা করেছেন। তিনি নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন সমাজজীবনের চারপাশ থেকে। অভিনব উপস্থাপন রীতি, নাটকীয় গতি, সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও মার্জিত হিউমার প্রয়োগ তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি উদ্ভট আধুনিকতার দিকে ছোটেননি। নিজ শিকড়কে উপড়ে ফেলেননি। পরিবেশের গভীরে চলমান জীবন যে বিচিত্র তরঙ্গ জাগায়, তাকে তিনি দেখেছেন দিগন্তের স্পষ্টতায় ও সারল্যে। বিষয়বস্তু, জীবনদৃষ্টি, গঠনশৈলী এবং উপস্থাপনরীতির পরীক্ষায় নূরুল মোমেনের অবদান বাংলা নাটকের ধারায় বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মী হিসেবে চিহ্নিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আত্মউন্মোচন এবং

স্বীকারোক্তিমূলক যে সাহিত্যধারা সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা নাটকে তা সংযোজিত হয়েছে নাট্যকার নূরুল মোমেনের হাতে। তার রচিত বুদ্ধিদীপ্ত নাটকগুলো ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র

১. বাংলা কথ্যরীতিতে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন কে? তাঁর এ গ্রন্থের নাম লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]*

অথবা, 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : বাংলা কথ্যরীতিতে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। গ্রন্থটির নাম 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। এটি প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনা। নব্যশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যকলাপ ও পরিণতি এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। ধনী বাবুরামের অতি আদরের পুত্র মতিলাল আবাল্য কখনও ধর্মীয় ও নীতির শিক্ষা পায় নি। পিতার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে গ্রন্থের সমাপ্তি। উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা। চরিত্রের সংলাপে লেখক যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন তা 'আলালী ভাষা' নামে খ্যাত। গ্রন্থটিতে বাস্তবতার নিরিখে আঁকা সমকালীন নগর ও পল্লির বিভিন্ন বিত্ত ও শ্রেণির চিত্রে লেখকের নিজস্বতা রয়েছে। তবে উপন্যাস হতে গেলে যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যেমন- কাহিনি, চরিত্র, বর্ণনার সুদৃঢ় বন্ধন, মনস্তাত্ত্বিকবোধ এর সবকটি 'আলালের ঘরের দুলাল' এ নেই। তাই এটিকে সার্থক উপন্যাস বলা যায় না। তবে এটি প্রথম গদ্য কাহিনি বটে, যা বাংলা উপন্যাসের ভিত্তি রচনা করেছিল।

২. বাংলা গদ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের সফলতা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সব মিলিয়ে ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সাফল্যের একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে আলালের ঘরের দুলাল। গ্রন্থটি বিশেষ সমাজচিত্র হলেও লেখকের উদার নীতিবোধের কারণে এর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত। কাহিনি বর্ণনায় বিশিষ্ট ভঙ্গি, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য এবং সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার প্রথম প্রয়োগ সব মিলিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন পথের সূচনা করেছিল। বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি বা আচরণে পার্শ্বচরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঠকচাচা চরিত্র চিত্রণে শিল্পীর রসচেতনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। কৌতুকপ্রিয়তা, বাস্তববুদ্ধি এবং কথার বয়ন দক্ষতায় প্যারীচাঁদ অনবদ্য। তার 'যৎকিঞ্চিত', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা'

©Nazmus Sadat
CamScanner

তিনটি কাহিনিই আধ্যাত্মিক। তবে 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' এ লেখাটিতে সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের গভীর রূপ অঙ্কনে না হলেও জীবনের চিত্র অঙ্কনে একান্তভাবে বাঙালি সমাজ বাঙালি ভাষা ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে সাহিত্য রচনায় তিনি কৃতিত্বের অধিকারী।

৩. আলালি ভাষা কী? সংক্ষেপে এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত। অন্যভাবে বলা যায় কথ্যভাষার লেখ্যরূপকেই প্রমিত চলিত লেখ্যরীতি বলে। কলকাতার ভাগীরথী নদীর তীরের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে প্রথম লিখিত ভাষায়রূপ দান করেন প্যারীচাঁদ তার উপন্যাসে। এইজন্য এই ভাষাকে আলালি ভাষা বলা হতো। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীসহ অনেকেই চলিত ভাষায় লিখেছেন। প্রমিত চলিত লেখার ক্ষেত্রে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত সবুজপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী

১. 'বীরবলী গদ্যে'র স্রষ্টা কে? এ গদ্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে আধুনিক গদ্য সাহিত্যে চলিত রীতির প্রর্বতন করেন। যা 'বীরবলী গদ্য' নামে পরিচিত। বাংলা গদ্য রীতির এ ধারা প্রমথ চৌধুরীর আগে শুরু হলেও সর্বায়ব রূপটি তখনও বিকশিত হয়নি। তিনি অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, অকারণ বিশেষণ প্রয়োগ, ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি প্রভৃতি দুর্লক্ষণ থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্ত করে একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রমথ গদ্য সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য/উপাদানগুলো পাওয়া যায়-

✓ বিষয়বৈচিত্র্য : প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধগুলো বিচিত্র বিষয়াবলম্বনে রচিত। বিষয় বিন্যাস এবং বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য তিনি পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তার বিষয়বস্তুর মধ্যে যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি বলার ভঙ্গিতেও আছে নতুনত্বের ইঙ্গিত।

✓ চিন্তানুভূতি : প্রমথ চৌধুরীর চিন্তানুভূতির প্রকাশ ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক। পরিচিত বিষয়বস্তুকে তিনি এমন যুক্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন যা পাঠকের কাছে একদম নতুন।

✓ প্রকাশভঙ্গি : ভাষার বুনন, শব্দ নির্বাচন, অলঙ্কার সৃষ্টি এবং উপস্থাপন কৌশলে তার কৃতিত্ব বিশেষত্বমন্ডিত। ঢিলেঢালা মেজাজে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে চলার বিলাস, কথাকে ঘুরিয়ে শ্লেষের সৃষ্টি, ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য- সব মিলিয়ে এক অনন্য প্রকাশভঙ্গির সৃষ্টি হয়।

CamScanner

২. **প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম কি? *[২৫তম বিসিএস]***

উত্তর : প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক। তিনি 'বীরবল' ছদ্মনামে পরিচিত। কখনো 'নীললোহিত' ছদ্মনামও ব্যবহার করতেন। তাঁর রচিত সাহিত্য বীরবলী সাহিত্য এবং তার স্টাইল 'বীরবলী স্টাইল' নামেও সুপরিচিত।

৩. **প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক বলা হয় কেন?**

উত্তর : বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তিনি বাংলা সাহিত্যে বীরবল (সম্রাট আকবরের সভার 'নবরত্ন'র একজন) নামে সমধিক পরিচিত। 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তিনি বাংলা গদ্যে নবরীতি প্রবর্তন করেন। সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমেই চলিত গদ্যরীতিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বাংলায় কথ্যরীতি তারই হাতে সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের জোর সমর্থন এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় সে রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রবন্ধাবলীতে প্রমাণ করেন চলিতভাষায় লঘুগুরু সকল প্রকার ভাবভাবনার প্রকাশ সম্ভব। তার প্রবন্ধ এবং ভাষাভঙ্গি আর ভাবনার ধারা পরবর্তী একটি গোষ্ঠীর উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাই রবীন্দ্র যুগের লেখক হয়েও বাংলা গদ্যের একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রতিষ্ঠার দাবিদার হিসেবে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ খ্যাত।

৪. **প্রমথ চৌধুরী রচিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।**

উত্তর : প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যের উপাদান হচ্ছে মানবজীবন ও প্রকৃতি। মানব জীবনের সাথে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই তা সাহিত্য নয়। তবে সাহিত্য মানব জীবনের বস্তুগত রূপ নয়, আবার প্রকৃতির হুবহু অনুকরণও নয়। মানবজীবন ও প্রকৃতি থেকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে উপযুক্ত উপাদান নির্বাচন করে শিল্পী মনের রূপ-রস, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলিয়েই সৃষ্টি হয় প্রকৃত সাহিত্য। তাঁর রচনার পরতে পরতে মানবজীবন ও প্রকৃতির উপাদানের নির্যাসের পরিপূর্ণ অবয়বের চিত্র রয়েছে। মূলত সাহিত্যের দুটি দিক রয়েছে- বিষয় ও সৌন্দর্য। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে বিষয় ও সৌন্দর্যকে সমমূল্যে বিচার করেছেন। তিনি উপন্যাস লেখেন নি। বৃহদাকার রচনার প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না, তার মেজাজ ছিল ছোট লেখার অনুকূল। বাংলায় ফারসি ছোটগল্পের আঙ্গিকরীতিকে তিনিই প্রথম পরিচিত করিয়েছিলেন।

৫. **প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের মূলবক্তব্য লিখুন।**

উত্তর : প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিত একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্যে খেলা'। তার মতে, সাহিত্য হচ্ছে এক ধরনের খেলা। এ খেলা আনন্দ লাভের মাধ্যম। যিনি সাহিত্য রচনা করেন তিনি কেবল মনের আনন্দে তা করে থাকেন।

©Nazmus Sadat
CamScanner

আবার যারা তা পাঠ করেন তারাও আনন্দ পান। তাই সাহিত্যের মাধ্যমে লেখক ও পাঠকের আনন্দ একাকার হয়ে যায়। তবে লেখক যখন স্বার্থোদ্ধারের জন্য লেখনী ধারণ করেন তখন সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তারাও স্বতস্ফূর্ত সাহিত্য রচনার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন- উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য, সাহিত্য হিসেবে যেমন মূল্যহীন তেমনি লেখকও মূল্যহীন। মহৎ সাহিত্যিকগণ নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটান তাঁদের সৃষ্টিকর্মে। ফলে তাঁদের লেখা পাঠকের হৃদয় বীণায় ঝংকার তুলে। সুতরাং মহৎ সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যিকের হৃদয়ের নিংড়ানো অনুরাগ নয় বরং পাঠকের আনন্দ উপভোগের মাধ্যম হিসেবেও গণ্য হয়।

ফররুখ আহমদ

১. ফররুখ আহমদের দুটি কাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।
অথবা, ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : কবি ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'। কাব্যটি ১৯৪৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন কবি বেনজীর আহমদ। এতে কবি ফররুখ আহমদ অতীত ঐতিহ্যের কাহিনি শুনিয়ে মুসলমানদের জেগে উঠতে বলেছেন। এই কাব্যের মোট ঊনিশটি কবিতার মধ্যে কবি মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্যের কথা বলেছেন 'সিন্দাবাদ', 'বারদরিয়া', 'দরিয়ার শেষ রাত্রি', 'বন্দরে সন্ধ্যা' ইত্যাদি কবিতায়। সমকালীন দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী করে জড়বাদী সভ্যতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন 'লাশ' ও 'আওলাদ' কবিতায়। তাদের এখনকার জীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে 'পাঞ্জেরী', 'আকাশ-নাবিক', 'স্বর্ণঈগল', 'তুফান', 'এই সব দিনরাত্রি', 'পুরোনো মাজার' কবিতায়। বাঙালি মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করতেই কবি রচনা করেছেন 'সাত সাগরের মাঝি'। কবি বলেছেন মুসলমানদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। আরব্য উপন্যাসের নাবিক সিন্দাবাদকে রূপক আশ্রয়ে সেই নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যে এই মুসলিম জাতিকে বিপদ সংকুল অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে, পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের তিনি এগিয়ে যাবার মন্ত্রণা দিবেন। বাংলা কবিতায় রেনেসাঁর যে সুরটি কাজী নজরুল সৃষ্টি করেছিলেন কবি ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' তারই পরিপূরক।

কবি ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ ১৯৫২ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হয়। এতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং চার খলিফার গৌরবময় জীবনগাঁথা ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে। 'সিরাজাম মুনীরা'র আভিধানিক অর্থ হলো

CamScanner

আলোর পথ বা আলোকিত সূর্য। গ্রন্থটিতে যাদেরকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে তারা পৃথিবীর তৎকালীন ও অনাগত মানুষের জন্য আলোর পথ দেখিয়েছেন। বলা যায় তারা সেই আলোকিত সূর্য যাদের আলোকে সভ্যতা, মানবতা ও মানুষের সঠিক পথে চলার পথ দেখে চলবে পৃথিবীর মানুষ। তৎকালীন সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আর সে পথে প্রধান পথ নির্দেশক হলেন আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সিরাজাম মুনীরা কাব্যের প্রথম কবিতার নাম 'সিরাজাম মুনীরা মোহাম্মদ মুস্তফা'।

২. ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, কাহিনিকাব্য এবং কাব্যনাট্যের নাম লিখুন। *[২০তম বিসিএস]*

উত্তর : কবি ফররুখ আহমদের-

প্রথম কাব্যগ্রন্থ- 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)। এতে ১৯টি কবিতা রয়েছে। বিখ্যাত উর্দু কবি আল্লামা ইকবালকে কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়। অশিক্ষিত, অবহেলিত ও দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করার মানসেই রচিত হয়েছে এ কাব্য।

কাহিনিকাব্য- 'হাতেমতায়ী'। এ গ্রন্থের জন্য ১৯৬৬ সালে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।

কাব্যনাট্য- নৌফেল ও হাতেম। আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত কাহিনী থেকে কবি ফররুখ আহমদ 'নৌফেল ও হাতেম' নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করেছেন। এতে ইয়েমেনের শাহজাদা হাতেমকে মানবতাবাদী চরিত্র ও প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। তাকে আদর্শবাদী 'ন্যায়পরায়ণ', পরোপকারী, সেবাব্রতী, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ও মহৎ মানবতাবাদীরূপে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে নৌফেলকে ঈর্ষাপরায়ণ, অত্যাচারী, অহংকারী বাদশাহর প্রতীকে চিত্রিত করেছেন। বিজয় দেখিয়েছেন মানবতার। মুক্তি দেখিয়েছেন ইনসাফের।

৩. ফররুখ আহমদ রচিত সনেট গ্রন্থের নাম কী? *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : মুসলিম রেঁনেসার কবি ফররুখ আহমদ। ব্যঙ্গকবিতা ও সনেট রচনায় তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর পূর্ণাঙ্গ সনেট গ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা'। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৯৩টি সনেট রয়েছে। এগুলো শেক্সপিয়রীয়-পেত্রার্কীয় রীতিতে ১৮ অক্ষর চরণ মাত্রায় রচিত।

এছাড়াও দিলরুবা, অনুস্বার, সিরাজাম মুনিরা, সাত সাগরের মাঝি, আজাদ করো পাকিস্তান এবং হাতেমতায়ী গ্রন্থে বেশ কিছু সনেট রয়েছে।

৪. কবি ফররুখ আহমদকে ইসলামী রেঁনেসার কবি বলা হয় কেন?

উত্তর : কবি ফররুখ আহমদের কাব্য প্রতিভা মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী আদর্শ অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। ইসলামের নিমজ্জমান সূর্যের পূনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায় তিনি বিপ্লবী দামামা বাজিয়েছেন কাব্যভাষায়। স্বপ্ন দেখেছিলেন পরাজয়ের গ্লানির সাগর পেরিয়ে পৃথিবীর বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে ইসলামী ঐতিহ্য, মানবজীবনের প্রতি অসীম দরদ, অকৃত্রিম সমবেদনা। লেখনী শক্তিকে তিনি ইসলামী আদর্শ প্রকাশ ও প্রচারের হাতিয়ার মনে করতেন। কবিতায় বিদ্রোহী চেতনা ও ইসলামী ঐতিহ্যে উজ্জীবনের প্রেরণা কাজ করেছে। ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন এ জাতির প্রতি কবির বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা, 'দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা, তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?' কবিতার মাধ্যমে অন্যায় অসত্যের প্রতিবাদ করতেন। কবি তার লেখনীর মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। বাংলা সাহিত্যে লুপ্তপ্রায় ইসলামি চেতনাকে দৃঢ়তার সাথে আবার তুলে ধরায় তিনি ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

৫. ফররুখ আহমদের কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলা কাব্যের বিভিন্ন শাখায় ফররুখ আহমদের বিচরণ। গীতি-কবিতা, সনেট, মহাকাব্য, শিশুতোষ-কাব্য, ব্যঙ্গ-কাব্য, নাট্য-কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসেবে খ্যাত হলেও তাঁর কবিতায় সরাসরি ইসলামের কথা উচ্চারিত হয় নি। প্রতীক ও রূপকল্পের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-ভাষায়, অসাধারণ কাব্য-কুশলতায় তিনি ইসলামের ব্যঞ্জনাকে প্রমূর্ত করেছেন। বাংলার বিচিত্র, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি তার কাব্যে যেমন ধরা দিয়েছে, তেমনি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সীমাহীন অতল সমুদ্র, ধূসর বিস্তীর্ণ মরুভূমি, উটের বহর, নীলাকাশে উড়ে বেড়ানো মুক্ত ঈগল পাখি ও মরুচারী দুরন্ত বেদুইন আরব প্রভৃতির বিচিত্র বর্ণনা তাঁর কবিতাকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। তার কবিতায় ভ্রমণকারী অভিযাত্রী সিন্দবাদ, নাবিক আর মাল্লাদের ও জ্বীন পরীদের পাওয়া যায়। কাব্য নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী ফুল, তার রূপ-গন্ধ, সেই সঙ্গে ঘ্রাণ উদ্দীপ্তকারী রন্ধনকর্মে ব্যবহৃত মসলা-এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি নাম। ব্যবহৃত হয়েছে হরেক রকম উজ্জ্বল রঙ্গীন পাথরের নাম। আর এভাবেই তিনি এক অভূতপূর্ব কবিতার জগৎ তৈরি করেছেন যার সাথে আধুনিক বাংলাভাষী পাঠকের পূর্ব পরিচয় ছিলনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১. 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস অবলম্বনে কপালকুণ্ডলার রূপের বর্ণনা দিন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কপালকুণ্ডলা কাপালিকের পালিত কন্যা। কপালকুণ্ডলার রূপ দেবী মূর্তির সাথে তুলনা করা যায়। তার রূপ আর প্রকৃতি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-

'ফিরিয়ামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার-অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না- তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।

পুরোপুরি প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এবং প্রকৃতির অনুষঙ্গে উপমা-রূপকের মাধ্যমে লেখক কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনা করেছেন। সচেতন লেখকের তাই স্পষ্ট মন্তব্য-

'অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।'

কপালকুণ্ডলার রূপ সম্পর্কে মতিবিবির মন্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-

'এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না।'

কপালকুণ্ডলার এই রূপ বর্ণনার মধ্যে তার চারিত্রিক সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলা যেন সমুদ্র এবং অরণ্যের মিলিত রূপ।

২. বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসের নাম লিপিবদ্ধ করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*
অথবা, বঙ্কিমের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস- আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)

আনন্দমঠ (১৮৮২) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এতে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটি সংযোজিত আছে। এ উপন্যাসে মুসলমান সম্পর্কে বক্রোক্তির জবাবে ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'বঙ্কিম দুহিতা' উপন্যাস লিখেন।

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)। দেবী চৌধুরাণী হচ্ছেন রংপুরের পীরগাছার মহুনার জমিদার। রংপুর অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের নেত্রী। ইংরেজ বিরোধী অনেকগুলো সফল অভিযানের পর ১৭৮৩ সালে স্বয়ং ওয়ারেন

হেস্টিংসের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রংপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনকালে এ ঘটনা জানতে পারেন এবং রচনা করেন 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস।

সীতারাম (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। রাজা সীতারাম এর রাজ্য ছিল মাগুরার মোহাম্মাদপুরে। এই রাজ্য ঘিরেই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের প্লট। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে মাগুরায় থাকা অবস্থায় এই উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর খুব একটা ভূমিকা উপন্যাসে নেই।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কেন? *[৩০তম]*

উত্তর : বাংলা উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালাতিক্রমের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের। চরিত্র কুশলতায়, কাহিনি বিন্যাসের চাতুর্যে ও ভাষার ঐশ্বর্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো এক অপরূপ সৃষ্টি। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে খ্যাত। একটি সার্থক উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণ- যেমন সেই সময়ের মানুষের ছবি আঁকা, সাধারণ মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, বাস্তবতাবোধ ইত্যাদি গুণ প্যারীচাঁদ মিত্রসহ অনেকের রচনায় কিছু কিছু ছিল। কিন্তু উপন্যাস লিখতে গেলে সার্বিকভাবে কাহিনি গেঁথে একটা অখণ্ড জিনিষ তৈরি করার যে ক্ষমতা দরকার এবং লেখকের জীবন দৃষ্টি থাকার জন্য সমস্ত ঘটনাই উপন্যাসে যেভাবে জীবনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে, উপন্যাসের সেই মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউই সেই মূহুর্তে সৃষ্টি করতে পারেন নি। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।

৪. 'বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমান্সমূলক'।- বিষয়টি অল্পকথায় বুঝিয়ে দিন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : যে উপন্যাসে কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক উগ্র প্রেমমূলক কাহিনী বিধৃত হয় তাকেই রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'কপালকুণ্ডলা'। এটি শুধু বঙ্কিম রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত। এছাড়াও তার রচিত দুর্গেশনন্দিনী, যুগলাঙ্গরীয়, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি উপন্যাসেও যথেষ্ট রোমান্টিক উপাদান রয়েছে। অনেক উপন্যাসে ইতিহাসের প্রাধান্য থাকলেও

©Nazmus Sadat
CamScanner

সমালোচনগণ এগুলোকে রোমান্সধর্মী উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি যেমন ইতিহাস ও দৈবশক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, অন্যান্য সামাজিক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলোতেও অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিহাসের কথাবস্তুতে কল্পনারস মিশিয়ে তিনি মানব-মনের নিগূঢ়তম সত্যকে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসে কেবল ঘটনার বর্ণচ্ছটাই নেই, মানবজীবনের চিত্তলোকের প্রকাশও আছে। এ কারণেই বলা হয় 'বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই রোমাঞ্চমূলক'।

৫. বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাংলার স্কট' বলা হয় কেন?

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যকে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় প্রবাহিত করেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করার ফলে ব্রিটিশদের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। এই বিষয়টি তাঁর সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্য খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তেন। তার রচিত উপন্যাসগুলোতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

'বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন'

ওয়াল্টার স্কট স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক। পুরো ইউরোপ জুড়ে তার জনপ্রিয়তা ছিল। ওয়াল্টার স্কটের ইংরেজি উপন্যাসের আদলকে আদর্শ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন ওয়াল্টার স্কটের লেখা 'আইভ্যানহো' উপন্যাসের ধরনেই লেখা হয়েছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব এখানে তিনি দুর্গেশনন্দিনীকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। এসব কারণে তাকে 'বাংলার স্কট' বলা হয়।

৬. 'দুর্গেশনন্দিনী' কেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস?

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। এর পটভূমিতে রয়েছে- ষোল শতকের শেষ পর্যায়ে উড়িষ্যার অধিকার নিয়ে মোঘল ও পাঠানদের মধ্যকার সংগ্রামের ঘটনা। সংঘাত এ উপন্যাসের পটভূমি হলেও মূল উপজীব্য প্রেম। ইতিহাসের ছায়া থাকলেও ইতিহাসের চেয়ে এখানে জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার ত্রিভুজ প্রেমই পাঠককে বেশি নাড়া দিয়েছে। এ উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙালি পাঠক উপন্যাসের প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে। প্রেম–সংঘাত–অভিযান-রহস্য সবকিছুর মিশেল ঘটেছে এতে। একটি সার্থক উপন্যাসের জন্য বাস্তবতাবোধ, কাহিনির অখন্ডতা, সমাজচিত্রের নিখুঁত পরিচয়, লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। সেগুলো 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বিদ্যমান ছিল। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী'কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বলা হয়।

CamScanner

'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' বা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এর আগে রচিত হলেও এসব বৈশিষ্ট্য ছিল না বলে সার্থক উপন্যাস বলা যায় না।

৭. 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় সার্থক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। অরণ্যে কাপালিক পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে অপরিচিত। কপালকুণ্ডলার নবকুমারের সাথে বিয়ে এবং সমাজ বন্ধনের সাথে তার দ্বন্দ্বই এর মূল কাহিনি। উপন্যাসে দেখা যায় তীর্থ যাত্রীদের রান্নার জন্য নবকুমার কাঠ আনতে গেলে তাকে রেখেই জোয়ারের টানে নৌকা চলে যায়। এই সুযোগে বনের কাপালিক তাকে ভৈরবীর কাছে বলি দিতে চায়। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সহায়তায় নবকুমার রক্ষা পায় এবং কপালকুণ্ডলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করে। পথিমধ্যে নবকুমারের ধর্মান্তরিত প্রথম স্ত্রী মতি তাদের দেখে এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে ছদ্মবেশে বাড়ি পর্যন্ত যায়। এদিকে কাপালিকও আসে কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে যেতে। একপর্যায়ে নবকুমার সবই বুঝতে পারে। সমাজপ্রথার সাথে বিরোধ ও এসব ঘটনায় দিশেহারা কপালকুণ্ডলা স্রোতময় নদীর তীর থেকে হারিয়ে যায়। তাকে খুঁজতে নবকুমার নদীতে নামে। তাদের কেউ আর ফিরে আসে না। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতায়, গল্প বলার সাবলীলতা, ঘটনা সন্নিবেশ, পরিবেশ রচনা, ভাষা নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে যে কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে তা শিল্পীর শিল্প সচেতনতার পরিচয় বহন করে। সবমিলিয়ে এক রোমান্সধর্মী উপন্যাসের সার্থক প্রকাশ।

৮. রোমান্টিক উপন্যাস হিসেবে 'কপালকুণ্ডলা'র সার্থকতা আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'। শিল্প-সাহিত্যে রোমান্টিকতার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো কল্পনা শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। বস্তুজগতের বাইরে যে অলৌকিক জগত তাকে খুঁজে বের করতে পারে একমাত্র কল্পনা শক্তি। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লেখক কল্পনার নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসে লেখক রোমান্টিকতাকে অবলম্বন করেছেন, তবে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ঘটনাবর্ত রোমান্টিক আমেজে মিশ্রিত। উপন্যাসে সমুদ্র, উপকূলবর্তী অরণ্য, খরস্রোতা নদীর ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়া তটভূমি সবই রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করে। উপন্যাসে অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত আবহ এসেছে রোমান্টিকতার বাহন হিসেবে। উপন্যাসের সমস্ত রোমান্টিকতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অরণ্যচারী ও সমাজবিচ্ছিন্ন নারী কপালকুণ্ডলা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক উক্তি কপালকুণ্ডলার-

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"।

এর কাহিনি, প্রকৃতি, রূপ বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার মিলন, প্রতি নায়িকার আবির্ভাব, কথোপকথনে কাব্যময়তা, সবই রোমান্টিকতার জন্ম দিয়েছে। আর 'কপালকুণ্ডলা' হয়ে উঠেছে সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস।

৯. 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। উপন্যাসের পটভূমি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে শুরু হয়েছে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দুর্গ আনন্দমঠ, ভাওয়াল অঞ্চল, তার বন-বনানী, প্রকৃতি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধের ঘটনা ঘুরে ফিরে এসেছে। বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির পতন ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। এই সংকটকালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশমাতার মুক্তির জন্য সন্তান দলের আবির্ভাব ঘটে। এই সন্তান দলই উপন্যাসের মূল চরিত্র। তাদের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের যুবসমাজকে দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বঙ্কিমচন্দ্র। স্বাধীনতা অর্জনে একদল আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর কার্যাবলির বিবরণও আছে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন দেশমাতার লাঞ্ছিত রূপ তুলে ধরেছেন এবং সত্যানন্দের আহ্বানের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা করেছেন। বন্দেমাতরম গানটি এ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও তাঁর বন্দেমাতরম গানটির অবদান অপরিসীম।

১০. 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের বহুল আলোচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে সমাজ, অর্থনীতি, ব্যক্তি চরিত্রের স্খলন ইত্যাদির সাথে প্রচ্ছন্নভাবে যুক্ত হয়েছে জীবনজিজ্ঞাসা ও আত্মগত ভাবনা। পরিকল্পনার অভিনবত্বে, ভাষার সারল্য অথচ তীক্ষ্ণতায় ও গীতি সৌরভে এ প্রবন্ধগ্রন্থটি সার্থক সিদ্ধি লাভ করেছে। রচনাভঙ্গিতে রঙ্গব্যঙ্গ আছে, কিন্তু তরলতা কিছুটা অন্তর্হিত, পরিবর্তে যুক্ত হয়েছে গীতলতা। কমলাকান্তের দপ্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ঠাঁই পেয়েছে। প্রবন্ধগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে ভাগ করা যায় এভাবে-

- ✓ অর্থনীতি- আমার মন, বড় বাজার, বিড়াল, কমলাকান্তের জবানবন্দী।
- ✓ রাজনীতি- একটি গীত, পলিটিক্স, কাকাতুয়া, কমলাকান্তের জবানবন্দী, বাঙালির মনুষ্যত্ব।
- ✓ সামাজিক পারিবারিক রীতিনীতি- মনুষ্যফল, বসন্তের কোকিল, ফুলের বিবাহ, ঢেঁকি।
- ✓ সাহিত্য সংস্কৃতি- কি লিখিব, মনুষ্যফল, বড় বাজার, পতঙ্গ।

©Nazmus Sadat
CamScanner

১১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা করুন।

উত্তর : 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত। আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যের রচনাদর্শ কী হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ মতামত দিয়েছেন। বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন নিয়ে পণ্ডিতগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল সংস্কৃত মিশ্রিত সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী, অপর দল মুখের ভাষায় সহজবোধ্য রচনার সমর্থক। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মধ্যপন্থা অবলম্বী। তিনি বিষয়ের সাথে ভাষার সমন্বয় সাধনে আগ্রহী। তাঁর মতে সাহিত্য যে পড়বে তার বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। পাঠক গ্রন্থ পাঠ করে কিছু বুঝতে না পারলে সে সাহিত্য ও গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিফল হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার সৌন্দর্য সাধনে যে কোন শব্দের গ্রহণ-বর্জনের পক্ষপাতী। যথার্থ শব্দচয়নই ভাষাকে শিল্পসম্মত করে তোলে। বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ভাষা প্রয়োগই ভাষার বড় গুণ। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন- মূলত প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী উভয় সম্প্রদায়ের নিকট থেকে অকৃপণভাবে শব্দ গ্রহণ করেই বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

১. কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিশেষত্ব নিরূপণ করুন। *[৪৪তম]*

অথবা, আধুনিক গীতিকবিতায় বিহারীলালের অবদান লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। কবি হৃদয়ের বিচিত্র ভাব-ভাবনা আধুনিক গীতিকবিতায় প্রকাশমান। জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্যে লব্ধ কবির অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে গীতিকবিতায়। তাই আধুনিক গীতিকবিতা কবিমানসের বিচিত্র অনুভূতির যথার্থ প্রকাশক। গীতি কবির ভাবরস নিমগ্ন, আত্মচেতনায় আন্তর্লীন হৃদয়ের আনন্দ বেদনার প্রথম প্রকাশ বিহারীলালের কবিতায় রূপলাভ করেছে। কবির অন্তরঙ্গ মনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটিয়ে বিহারীলাল আধুনিক অর্থে বিশুদ্ধ গীতি কবি বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। বিহারীলাল গতানুগতিক কাব্য ধারার মধ্যে এমন এক অভিনব সুর শুনালেন যার মাধ্যমে কবি হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতির সংগে পরিচিত হওয়া সম্ভব হল। তার কাছে কাব্যকলার চেয়ে কবি হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশই বড় হয়ে উঠেছে। তাই তার কাব্যে রূপ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বিদ্যমান।

CamScanner

২. বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? এ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন। *[৩৮তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' কে? কেন তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলা হয়েছে? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। যে কবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত কামনাবাসনা ও আনন্দবেদনা প্রকাশ করে তাকে 'গীতিকবিতা' বলে। বিহারীলাল চক্রবর্তী-ই প্রথম যিনি কবিতায় নিজের মনের কথা বলেছেন। তার আগে কবিতায় এমন ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় নি। তিনি নতুন গীতিকবিতার যুগের শুরু করেছিলেন। তার ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথের হাতে গীতিকবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাকে 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যায়িত করেন। ভোরের পাখি যেমন ভোর বেলায় একাকী জাগে, মনের আনন্দে গান গায়। তেমনি বিহারীলাল চক্রবর্তী ইংরেজি কিংবা পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুসরণ না করে নিভৃতে বসে নিজের ছন্দে, নিজের মনের কথা কবিতায় বলেছেন। তাঁর হাতে যেহেতু গীতিকবিতার শুরু, সেহেতু তাঁর সময়ই ছিল বাংলা গীতিকবিতার ভোর বা সকাল। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,

'উদীয়মান নবীন সূর্যের একটি অস্ফুট আভাস দেওয়াই ভোরের পাখির কাজ। বিহারীলালও ভাস্বর প্রতিভায় দশদিক উদ্ভাসনকারী রবীন্দ্রনাথের আগমনীবার্তা জানাইয়া কাব্যমোদিগনের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরাইয়া গিয়াছেন মাত্র।'

তার দুটি কাব্যগ্রন্থ- স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), সঙ্গীত শতক (১৮৬২)।

৩. বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বিহারীলাল চক্রবর্তীর অন্যতম কাব্য 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০)। এতে তিনি প্রকৃতি ও নারীকে একাকার করে দেখেছেন। তার মতে বঙ্গের প্রকৃতি যেমন সুন্দর, তেমনি নারীও। নারীদের তিনি স্বর্গের ইন্দ্রাণী, কখনো মিস্টিক, কখনো রোমান্টিক হিসেবে দেখেছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' প্রথমে নয় সর্গের কাব্য ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে 'সুরবালা' যোগ করাতে কাব্যটির দশ সর্গ হয়েছে। কাব্যের প্রথম সর্গ 'উপহার'। এ সর্গে কবিচিত্ত অস্তির-অতৃপ্ত। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে কবি যেন নিজেকে মেলাতে পারছেন না। 'নারীবন্দনা' এ সর্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিচিত্র ধরনের নারীর স্নেহ-প্রীতি ও রূপ ঐশ্বর্যে জগতে স্নেহের অমিয়ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। 'সুরবালা' সর্গকে অনেকে স্বতন্ত্র কাব্য জ্ঞান করেছেন। এখানে কবি বলতে চেয়েছেন যে, জগতে সুর, ছন্দ ও আনন্দের প্রতীক হচ্ছে নারী। 'অভাগিনী' সর্গে দেখানো হয়েছে যে, নারী কীভাবে অবহেলায় তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে ফেলে। মূলত 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে কবি বিশেষ যত্নে সহজ সরল দৈনন্দিন শব্দ প্রয়োগে, সরল রমণীয় ছন্দে বাংলার নারীর অপরূপ মাধুর্য তুলে ধরেছেন।

CamScanner

৪. বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯)। কাব্যটি পাঁচ সর্গে রচিত। কাব্যের প্রথম সর্গে কবির মনোজগতে এক কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে, দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কবি মানসভ্রমণ করেন। তৃতীয় সর্গে কবিচিত্তের দ্বন্দ্ব, চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তের আশ্বাস লাভ, পঞ্চম সর্গে হিমালয়ের পুণ্যভূমিতে কবির আনন্দ উপলব্ধির চিত্র পাওয়া যায়। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের নামকরণে কবি প্রাচীন বাঙলা কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। কাব্যের বিষয়ও দেবীমাহাত্ম্য, তবে লোক উপাস্য দেবী নয় কাব্যসরস্বতী। প্রাচীন ও আধুনিক দুই অর্থেই এটি গীতিকাব্য। অন্তরবাসিনী কাব্যদেবীকে অন্তরে বাইরে বিচিত্র কল্পনায় যেরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, সেভাবে কবি সারদামঙ্গলে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। সারদামঙ্গল একান্তভাবে 'সাবজেকটিভ' অর্থাৎ আত্মগত কাব্য। কবি প্রিয়তমার মধ্যে সারদাকে অন্বেষণ করেছেন এবং দীর্ঘ বিরহের পর হিমাদ্রিশিখরে ভাবসম্মিলনের চিত্র অঙ্কন করে কাব্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

বুদ্ধদেব বসু

১. বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) একজন প্রভাবশালী কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস মালখানগর, মুন্সিগঞ্জ।

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে যারা আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ তিনি তাদের একজন। রবীন্দ্র-প্রভাবের বাইরে এসে তখন যারা লেখালেখি করেছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার বিচরণ ছিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর তাকে ***'সব্যসাচী লেখক'*** বলা হয়। ইংরেজি ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনা করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়ও প্রশংসা অর্জন করেন।

সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। ঢাকা থেকে অজিত দত্তের সহযোগিতায় 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকা এবং কলকাতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ত্রৈমাসিক 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৮ সালে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনা করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মার্কিন নীতির সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ মৃত্যুবরণ।

বেগম রোকেয়া

১. নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন। *[৪৪তম বিসিএস]*
অথবা, রোকেয়াকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কেন বলা হয়?

উত্তর : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীরা যুগযুগ ধরে নির্যাতিত, বঞ্চিত, নানারকম কুসংস্কার ও সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে বন্দি ছিল। মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা ও সম্মানে পিছিয়ে ছিল আর মুসলিম নারীদের অবস্থা ছিল আরও করুন। সমাজের এই ক্রান্তিকালে বেগম রোকেয়া তাঁর সাহিত্য সাধনা, সংগ্রাম এবং বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের জাগরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন কাজ করেছেন। নারীকে জাগানোর ভাবনা ভাবতে গিয়ে রোকেয়া প্রথমেই খেয়াল করলেন যে, বাঙালির ভাবনাচিন্তায় বাঙালি নারী প্রায় অনুপস্থিত। তাকে সক্রিয় সত্তা হিসেবেই ভাবা হয় না। অন্তঃপুর, রন্ধনশালা আর কবিতাকল্পনালতায় ছাড়া আর কোথাও সেভাবে তার অবস্থান নেই। নারী যে সমাজের অর্ধেক শক্তি, এই শক্তি অব্যবহৃত থাকার ফলে একটি জাতি যে পিছিয়ে পড়ে, এই কথা বাঙালি পুরুষ সমাজে তখনো কেউ খুব একটা গ্রাহ্য করতেন না। তবে রোকেয়া বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে দুই চাকার গাড়ির মতো এই সমাজের দু'টি চাকা হল নারী ও পুরুষ। তাঁর এসব ভূমিকার জন্যই তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত।

২. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন। *[৪১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ১৯০২ সালে 'পিপাসা' নামক গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে তার আবির্ভাব। তারপর একে একে প্রবন্ধ- মতিচূর (১ম খণ্ড ১৯০৪), মতিচূর (২য় খণ্ড ১৯২২), নকশাধর্মী রচনা- Sultana`s Dream (১৯০৮), নকশাধর্মী গদ্যগ্রন্থ- অবরোধবাসিনী (১৯৩১), এবং উপন্যাস- পদ্মরাগ (১৯২৪) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও নবনূর, মোহাম্মদী পত্রিকায় বহু গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা ও কবিতা প্রকাশিত হয়। 'সওগাত' পত্রিকার সাথে তার নিবিড় সম্পৃক্ততা ছিল।

বেগম রোকেয়ার রচিত সাহিত্য পরিমাণে বিপুল নয় কিন্তু বিবিধ তাৎপর্যে গৌরবময়। তার রচনার অধিকাংশ স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত। সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিবেশ, ধর্মীয় উপলব্ধির উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে তার রচনা পরিপূর্ণ। এছাড়াও বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রগতি ও বিকাশের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহেরও সন্ধান পাওয়া যায়। হাস্যরস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে

©Nazmus Sadat CamScanner

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থান তুলে ধরেছেন। তার রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তার রচনার মাধ্যমে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, নারীদের শিক্ষা আর পছন্দানুযায়ী পেশা নির্বাচনের কথা বলেছেন। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তার অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়।

৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের বিষয়বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। *[৪০তম বিসিএস]*

অথবা, 'অবরোধবাসিনী' কে লিখেছেন? তিনি কী হিসাবে বিখ্যাত? *[২৭তম]*

উত্তর : 'অবরোধবাসিনী' বেগম রোকেয়ার নকশাধর্মী গদ্যগ্রন্থ রচনা। এতে নারীদের অবরোধের বিভিন্ন কাহিনি নকশা আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে ৪৭টি নকশাধর্মী কাহিনি রয়েছে। 'অবরোধবাসিনী'র ঘটনাগুলো বাংলা ও বিহারের অন্তঃপুরবাসিনীদের বেদনার্ত জীবনের করুণ আলেখ্য। পর্দা প্রথার নামে মেয়েরা অন্তঃপুরে থাকতে থাকতে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। তারা ট্রেনের নিচে চাপা খেয়ে মরবে, তবুও অন্য পুরুষের সহযোগিতায় পর্দা যাওয়ার ভয়ে জীবন বাঁচাবে না। পালকির মধ্যে না খেয়ে থাকবে, তবু অন্যে কণ্ঠস্বর শুনবে বলে পানি পর্যন্ত চাইবে না। তৎকালীন পর্দা প্রথার এমনি লোমহর্ষক বেদনাদায়ক কাহিনির সমাহার হচ্ছে 'অবরোধবাসিনী'। ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য হলেও লেখিকার ভাষ্য অনুসারে-

'এর একটি অক্ষরও সত্যের সীমা লঙ্ঘন করে যায় নি।'

লেখিকা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন। সমাজজীবনে কুসংস্কার দূর করে নারীদেরকে অবরোধমুক্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করেছেন।

৪. 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : বেগম রোকেয়ার একটি বিস্ময়কর ও পাঠক নন্দিত গ্রন্থ 'সুলতানাস ড্রিম' বা সুলতানার স্বপ্ন। এ গ্রন্থে বেগম রোকেয়া একটি নারীর স্বপ্ন রাজ্য বা ইউটোপিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন; যেখানে সমাজে নারী ও পুরুষদের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গেছে। নারীরা সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষরা করে ঘরের কাজ। সেই কল্পরাজ্যের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আবিষ্কার করেছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সূর্যের কিরণ দূর থেকে শত্রু শিবিরে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি। আবিষ্কার করেছে মেঘ থেকে পানি সংগ্রহের পদ্ধতি। যার ফলে মানুষকে আর বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকের তাকিয়ে থাকতে হয় না। আবার বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মেয়েরা আবিষ্কার করেছে এমন যন্ত্র, যা মেঘের পানিকে শোষণ করে নিতে পারে। ফলে

দেশটি কাদাবিহীন। ঐ রাজ্যে এরোপ্লেন চলে, কৃষিকার্যে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। বেগম রোকেয়া যখন এই লেখা লেখেন তখন ভারতবর্ষে এরোপ্লেন তো দূরের কথা, মোটর গাড়ি এসে থাকলেও তিনি তা দেখেন নি। বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কেও তার প্রত্যক্ষ কোন ধারণা ছিলনা। মেঘ থেকে পানি ও সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করা যায় এ ধারণাও ছিলনা। বেগম রোকেয়া যে সময়ে এই বইটি লিখেছেন সেই সময়ের বাস্তবতায় একে অত্যন্ত সাহসী সাহিত্যকর্ম।

৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : বেগম রোকেয়া ১৯১৬ সালে কলকাতায় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রথম সংগঠন, যা শিক্ষাহীনতা ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে মেয়েদের মুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৬. 'বেগম রোকেয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখক' কথাটি বুঝিয়ে দিন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বেগম রোকেয়া বাঙালি চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখক। নারীর অধিকার নিয়ে যিনি কথা বলেন তিনি নারীবাদী, সন্দেহ নেই। এই অর্থে রোকেয়া অবশ্যই নারীবাদী। তিনি বাইরের দেশে চালু নারীবাদী ভাবনার ছকচিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার নারীদের সমস্যাকে দেখেননি, বরং এ দেশের নারীসমাজকে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে বিশ্ব নারীবাদী তত্ত্বদর্শনকে ঋদ্ধ করেছেন। চারপাশের নারীসমাজকে তিনি দেখেছেন দরদি হৃদয় ও যুক্তিবাদী মন দিয়ে। আর এভাবেই সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে তৈরি করেছেন নারী মুক্তির প্রশস্ত পথ। এখানেই রোকেয়ার নারীবাদী ভাবনার অনন্যতা। 'মতিচুর' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম তাঁর নারীবাদী অবস্থান প্রকাশিত হয়। 'সুলতানার স্বপ্ন' বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়। তার রচনা দিয়ে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ করতে চেয়েছেন। আর বলেছেন শিক্ষা আর পছন্দানুযায়ী পেশা নির্বাচনের সুযোগ ছাড়া যে নারী মুক্তি আসবে না।

CamScanner

৭. নারী মুক্তি আন্দোলনে বেগম রোকেয়ার গৃহীত পদক্ষেপ লিখুন।

উত্তর : বেগম রোকেয়া নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। নারীসমাজের মুক্তির জন্য তিনি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন-

- ১৯০৯ সালে ১ অক্টোবর পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ সালে পারিপার্শ্বিক কিছু সমস্যার কারণে স্কুল বন্ধ করে কলকাতায় চলে যান। ১৯১১ সালে আট জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি কলকাতায় পুনরায় চালু করেন।

- ১৯১৬ সালে সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন।

- ১৯২৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ। কারণ সে যুগে অভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের ভাষা ছিল উর্দু।

- ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় তিনি 'নারীর অধিকার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশটির নামকরণের তাৎপর্য লিখুন। *[৪১তম বিসিএস]*

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদকে বলা হয় 'বল্লালী-বালাই', সপ্তম থেকে উনত্রিশ পরিচ্ছেদকে বলা হয় 'আম-আঁটির ভেঁপু' এবং ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ পরিচ্ছেদকে বলা হয় 'অক্রূর সংবাদ'। 'বল্লালী-বালাই' অংশের মূল চরিত্র ইন্দির ঠাকরুণ আর দুর্গা। 'বল্লালী' বলতে রাজা বল্লাল সেন। 'বালাই' শব্দের অর্থ আপদ। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার শিকার হয়ে বৃদ্ধকে বিয়ে করে দীর্ঘ বিধবা জীবনে ইন্দির ঠাকরুণ সংসারে 'বালাই' হয়ে উঠেছিলেন।

রাজা বল্লাল সেন বাংলায় কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। এই প্রথাকে ব্যবহার করে তৎকালীন একশ্রেণির মানুষ শুরু করলেন বহুবিবাহ। ফলে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটি মেয়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। বাংলার ইতিহাসের এই অন্ধকার দিকটি ইন্দির ঠাকরুণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে তুলে আনলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বল্লাল সেন এ প্রথার প্রবর্তক বিধায় বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রথম অংশের নাম রাখলেন 'বল্লালী-বালাই'।

CamScanner

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। বিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরে অপু ও তার পরিবারের জীবন যাত্রার কথাই উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। অপু, তার বাবা হরিহর রায়, মা সর্বজয়া, বোন দুর্গা ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় ইন্দির ঠাকুরণ এই নিয়ে তাদের পরিবার। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে তাদের দিন কাটে। একবার বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার জ্বর হয় এবং অনেকদিন জ্বরে ভোগে দুর্গা মারা যায়। হরিহর জীবিকার সন্ধানে কাশীতে যায়। কিছুদিন পর হরিহর মারা গেলে সর্বজয়া অন্যের বাড়ীতে রান্নার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অপুর মন পড়ে থাকে নিশ্চিন্দিপুরে। উপন্যাসের পাতায় পাতায় চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ সমাজের প্রথা-আচার, লোক-ঐতিহ্য এবং স্বাভাবিক সরলতা। আর এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে প্রকৃতির উপহার ও উপহাসের চিত্রাবলী। বিষয়-ভাবনা, চরিত্র, জীবনের সকল ব্যথা ও কথা সহজ স্বচ্ছন্দ গতি এবং শিল্পরীতি 'পথের পাঁচালী'কে উচ্ছল গতির এক অনন্য উপন্যাস করে তুলেছে।

৩. 'আরণ্যক' উপন্যাসের রচয়িতার নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যধর্মী উপন্যাস 'আরণ্যক' (১৯৩৯)। এটি তার বিহারে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। বিহারের ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইসমাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্ট হচ্ছে আরণ্যক-এর পটভূমি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরন ভাগলপুর-এর কাছাকাছি জঙ্গলে একটি জমিদার এস্টেটের ম্যানেজার। জঙ্গলে তার জীবনের ঘটনাপঞ্জি নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি। শুরুতে লোকালয় থেকে দূরে গভীর বনে প্রথমে অস্বস্তি লাগলেও ধীরে ধীরে এই বনের অপূর্ব ও জাদুময় সৌন্দর্য ও আকর্ষণশক্তিতে মুগ্ধ হতে থাকে। আদিবাসী ও স্থানীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়তে থাকে। সত্যচরন তার সৌন্দর্যপূজারী সঙ্গী যুগলপ্রসাদ মিলে বনের এই সবুজ প্রকৃতিকে সাজায় নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ লতা দিয়ে। এক সময় জমিদারের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার হাতে গড়া উদ্যান প্রজাদের মধ্যে টুকরা টুকরা করে বিলিয়ে দিতে হয়। প্রজারা বসতির জন্য এ বাগান পরিষ্কার করে। তাদের কুঠারের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় প্রাচীন মহীরূহ, লতা বাগান ও সাজানো বৃক্ষের সিড়ি। এদিকে তার চাকরীর মেয়াদও শেষ হয়। সময় হয় বিদায় নেওয়ার। কিন্তু এবার তার অস্বস্থি লাগে শহরে যেতে। তার মন ফিরে যেতে চায় না এই আদি ও অকৃত্রিম সৌন্দর্য থেকে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৪. বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পাঠে পাঠকের কল্পনায় ভেসে ওঠে ছায়াঘেরা গ্রাম, স্রোতস্বিনী নদী, সবুজ-সোনালি ফসলের মাঠ, পালতোলা নৌকার মাঝির ভাটিয়ালি গান আর অবারিত শ্যামল প্রকৃতি। এসব নিয়েই জীবনব্যাপী জাগ্রত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ- লেখায়, গানে, কবিতায়, গল্পে, নাটকে, চিত্রে আর বিস্তৃত উপন্যাসে। আবার বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে স্নিগ্ধ প্রকৃতির নিঃসঙ্গ উপাসক। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও জীবন, তার আকাশ বাতাস, রৌদ্র বৃষ্টি, গাছপালা, নদী-মাঠ সবকিছুই তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সাহিত্যে তিনি প্রকৃতির এক স্নিগ্ধ কোমল, সৌন্দর্যময় রূপ উপস্থিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে সূক্ষ্ম তুলিতে এঁকেছিলেন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ দিকটিকে মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য সমারোহেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, গ্রাম বাংলার নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসটিও বিভূতিভূষণের মন কেড়ে নিয়েছিল। তুলনামূলক বিচারে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপকে দেখেছেন খণ্ড খণ্ডভাবে। আর বিভূতিভূষণ প্রকৃতির সমগ্র রূপের এক অভিন্ন সত্তাকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

৫. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অঙ্কিত প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করুন।

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ পটভূমির সার্থক শিল্পী। তার 'পথের পাঁচালী' যেনো প্রকৃতির সন্তান। বাংলার শাশ্বত গ্রাম, গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষ এই উপন্যাসের কথাবস্তু। মানব জীবনের অন্তর্লীন সত্তার সঙ্গে পল্লি প্রকৃতির নিসর্গ জীবন তুলে ধরেছেন এতে। প্রকৃতি নিবিড় ভালোবাসার ছোঁয়া লাগিয়ে, মমতা মাখিয়ে এতোটাই মায়াময়ী রূপ দিয়েছেন যে, প্রকৃতি আর বিভূতিভূষণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভাষা হারা প্রকৃতি যেনো তাঁর যাদু স্পর্শে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে। অন্নদাশঙ্কর রায় তাকে 'প্রকৃতি-পাগল সাহিত্যিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'পথের পাঁচালী' শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয়, এরমধ্যে রয়েছে বিভূতিভূষণের পল্লিপ্রীতি ও নৈসর্গিক চেতনা। মানুষ যে প্রকৃতিরই সন্তান- এই সত্য প্রতিফলিত হয়েছে এতে। প্রকৃতির লতাপাতা, ঘাস, পোকামাকড় সবকিছুই গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে বলেন-

'এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শেখা হয়নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখিনি।'

CamScanner

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১. 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক কে এবং কেন? *[৪৪তম বিসিএস]*

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী আপাতত মেঘনাদকে এ কাব্যের নায়ক মনে হয়। কিন্তু নায়ক অর্থে আমরা সেই চরিত্রকে বুঝি, যিনি সমগ্র কাব্যের ভিত্তি বা মূল প্রতিপাদ্যরূপে যার বর্ণনা থাকে। এ কাব্যে মেঘনাদ সে রকম স্থান দখল করতে পারে নি। মেঘনাদ এ কাব্যের ভিত্তি বা ধারণ স্তম্ভ নয়, কাব্যে প্রবাহিত ঘটনা স্রোতের অল্প ক্ষেত্রই সে অধিকার করে আছে। কাব্যে রাবণকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী হিসেবে পাওয়া যায়। রাবণকে দিয়ে কাব্যের শুরু, তাকে দিয়েই সমাপ্তি। জয়-পরাজয়, কীর্তি ও অকীর্তির ফলভোগী, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি ও বিগ্রহ সে-ই করেছে। এ কাব্যের পরিণাম রাবণেরই পরিণাম। মেঘনাদ এই পরিণামের উপায় মাত্র। মেঘনাদের জীবন যত সুন্দর ও মৃত্যু যতই করুণ হোক- এ কাব্যে সে সব উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য রাবণ চরিত্র। মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি মূলত রাবণের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনি। মেঘনাদ রাবণেরই একটা বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র। ফলে মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদ নয়, রাবণই এ কাব্যের নায়কের যোগ্যতম পুরুষ।

২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন। *[৪১তম]*

উত্তর : সনেট ইতালীয়ান শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ মৃদুধ্বনি। সনেট এক ধরনের গীতিধর্মী কবিতা। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এর জন্মদাতা। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি এর নাম দিয়েছেন চর্তুদশপদী কবিতা। সনেটের যে আঙ্গিক তাতে মধুসূদন অত্যন্ত সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের বড় কৃতিত্ব তিনি সনেটের ধাঁচটি ধরতে পেরেছিলেন। চৌদ্দ চরণের আঁটসাঁট শক্ত-সমর্থ কায়ারূপের মধ্যে, নিটোল মুক্তরূপের মধ্যে গভীরভাবের প্রাণটি তুলে ধরার কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী তথা সনেট মধুসূদন দত্তের অনত্যম সৃষ্টি হলেও কবি প্রতিভার সার্থকতম সৃষ্টি নয়। পেত্রাক, মিল্টন, সেক্সপিয়ারের সনেটে যে বিষয় গরিমা আছে, যে ভাব মহিমা আছে, মধুসূদনের অনেক চতুর্দশপদীতেই তা অনুপস্থিত। শোক-দুঃখের তাপে মধুসূদনের মনটা ঠিক সনেট রচনার অনুকূল ছিল না। তাই অনেক সনেটে শুধু গদ্যাত্মক, কাব্যের ভঙ্গি আছে কিন্তু প্রাণ নেই। আবার অনেক সনেট দাঁড়িয়ে আছে একটু আলঙ্কারিক মারপ্যাঁচের উপর। কাব্যে অলংকার ভালো কিন্তু তার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা অনেক ক্ষেত্রেই শোভন হয় না। তারপরও চতুর্দশপদী কবিতা কবিকে আরেক মাত্রায় উন্নীত করেছে।

CamScanner

৩. আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুদূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন। *[৪০তম বিসিএস]*

অথবা, মধুসূদন দত্তকে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার জনক বলা হয় কেন?

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তক। বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতার রূপ, রস, ছন্দ ও ভাব খুঁজে পাওয়া যায় তার ধারক ও বাহক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সমাজ-সভ্যতা, মানুষের যাপিতজীবন, ধর্ম ও বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মধুসূদন দত্তের যে চেতনা বিশ্বাস উপলব্ধিবোধ তা তিনি আধুনিকতার আদলে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। মধ্যযুগের কাব্যে দেব-দেবীর মাহাত্মসূচক কাহিনির বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে বাংলা কাব্যধারায় মানবতাবোধ সৃষ্টিপূর্বক আধুনিকতা সূচনা করেছেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে পৌরাণিক অনেক নারীকে কুসংস্কার ও ধর্মীয় বেড়াজাল থেকে বের করে তাদের কণ্ঠে আধুনিকতা ও মানবতার কথা উচ্চারণ করিয়েছেন। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে আধুনিকতার রঙে এক বিরহের চিত্রই এঁকেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের পরতে পরতে আধুনিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের বৈচিত্র্যহীন বাংলা কবিতার ছন্দ ও বিষয় মুক্তি ঘটে তার হাতে। আধুনিক বাংলা কবিতায় মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. আহমদ শরীফ বলেছেন-

> *'মধুসূদন ভাবে ভাষায় ছন্দে আঙ্গিকে যা কিছুই আনলেন তা এ দেশে নতুন বটে। তবে তাতে সমকালীনতা বা স্বাদেশিকতা ছিলো না, ছিলো আধুনিকতা। মধুসূদনের আধুনিকতার এ বৈশিষ্ট্যই তাকে আজো কালপ্রবাহে চিরঞ্জীব অমর অক্ষয় অপরাজেয় করে রেখেছে।'*

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় সৃষ্টিশীলতার নব দিগন্তের সূচনা করেছেন। মধুসূদন দত্তের হাত ধরে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার যে সূচনা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা আজও বর্তমান।

৪. **'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের পরিচয় দিন।** *[৩৭তম বিসিএস]*

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রো' (১৮৬১)। এর প্রথম নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। বুড়ো বয়সে ভীমরতিকে ব্যঙ্গ করে লেখা এই প্রহসন। এর মূল চরিত্র বুড়ো জমিদার ভক্তপ্রসাদ বাবু। জমিদার ভক্তপ্রসাদ প্রজাদের লুটে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, কথায় কথায় ধর্মের কথা বলে কিন্তু পাড়ার মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। নারী তার কাছে ভোগ্যপণ্য। এ ব্যাপারে ধর্ম, বর্ণের কোন ভেদাভেদ নেই। হানিফের স্ত্রী ফাতিমা, ভট্টাচার্যের মেয়ে ইচ্ছে, পীতেশ্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চী সবাই সমান। তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন

©Nazmus Sadat CamScanner

মিলে রাতের অন্ধকারে ফাতেমার মাধ্যমে শিবমন্দিরের কাছে নিয়ে আসে। বাচস্পতি, হানিফ আর ফাতেমা মিলে ভক্তপ্রসাদকে শুধু অপদস্থ করেনি, জরিমানাও আদায় করেছে। এ প্রহসনের মাধ্যমে মধুসূদন দত্তের পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজবাস্তবতাবোধ ও কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় কুশলতা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নব্য ও সনাতনপন্থী উভয় সমাজকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলে। ফলে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি।

৫. 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সর্গ সংখ্যা কত এবং কী কী ? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১)। এটি সাহিত্যের মহাকাব্যের আদর্শে রচিত। এর কাহিনি রামায়ণ থেকে সংগৃহীত। এতে ৯টি সর্গ আছে- অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তিনির্ভেদ, প্রেতপুরী ও সংক্রিয়া। এটি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মত বীররসাশ্রিত।

৬. বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনটি অবদানের বর্ণনা দিন। *[৩০তম বিসিএস]*

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন কোন কোন শিল্পাঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন? এগুলোর একটি প্রসঙ্গে লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। প্রথম জীবনে ইংরেজপ্রীতি থাকলেও জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নবজীবন দান করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রবেশ করে মণি-মুক্তা আহরণ করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, ট্রাজেডিসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা রয়েছে। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা আনয়ন করেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য। ১৮৫৯ সালে রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক মৌলিক নাটক। ১৮৬০ সালে রচনা করেন দুটি প্রহসন : 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক পদ্মাবতী। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। তারপর একের পর এক রচনা করেন 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক, 'বীরাঙ্গনা' কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা।

CamScanner

৭. **মধুসূদন দত্তের একটি মহাকাব্যের নাম লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]***
অথবা, মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের নাম কী? *[১০তম বিসিএস]*

উত্তর : মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বাংলা প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১)। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা এটি বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্য। সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কাহিনি অবলম্বনে মধুসূদন দত্ত এ কাব্য রচনা করেন। রাবণের সীতাহরণ, রাম-রাবণের লঙ্কাযুদ্ধ এবং যুদ্ধে রাবণের পরাজয়ের কাহিনি নিয়ে এ মহাকাব্য রচিত হয়েছে। এতে মোট তিন দিন দুই রাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের বিষয়বস্তু বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গ্রহণ করলেও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট থেকে। রাম ও রাবণের চরিত্রকে তিনি উল্টে দিয়েছেন। বাল্মিকীর রামায়ণে রাম সত্যনিষ্ঠ এবং দয়াবান, আর রাবণ পাপীষ্ঠ, অত্যাচারী। কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্যে রামকে ভীরু, প্রতারক এবং রাবণকে সাহসী এবং প্রজাহিতৈষী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মধুসূদন রামচন্দ্রের জয়ের উপর নয়, রাবণের পরাজয়ের উপর আলো ফেলেছেন। কাব্যের শুরুতেই দেবী বন্দনায় কবি বলেছেন-

'গাইব, মা, বীর রসে ভাসি, মহাগীত।'

কবি বীররসের কথা বললেও এতে করুণরসই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মত বীররসাশ্রিত।

৮. **মধুসূদন দত্তের একটি পত্রকাব্য ও একটি নাটকের নাম লিখুন। *[২৭তম]***

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম (একমাত্র) পত্রকাব্য। এটি ইতালিয়ান কবি ওভিডিয়াস-এর The Heroides or Epistle of the Heroines গ্রন্থের আদলে রচিত। ওভিডের কাব্যে ২১টি পত্র থাকলেও মধুসূদন ১১টি পত্রে কাব্য সমাপ্ত করেন। ভারতীয় পুরানের এগারজন নারী স্বামী বা প্রেমিকের উদ্দেশ্যে এই পত্রগুলো লিখেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি। এ নাটকে প্রথম 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রিক পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্প Apple of Discord এর ছায়া অবলম্বনে রচিত। গ্রিক পুরাণের দেবী জুনো, প্যালেস ও ভেনাস এ নাটকে হয়েছেন শচী, মুরজা ও রতি। হেলেন ও প্যারিস হয়েছেন পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল। তিন দেবীর মধ্যে রতিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচন করায় অন্য দুই দেবী ইন্দ্রনীলের উপর রুষ্ট হন এবং ইন্দ্রনীলের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পরে দেবী রতির চেষ্টায় ইন্দ্রনীল উদ্ধার পান এবং বিচ্ছিন্ন স্ত্রী পদ্মাবতীর সাথে তার মিলন ঘটে।

CamScanner

৯. 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের রচয়িতা কে? এ নাটকের গুরুত্ব কী? [১৫তম]
অথবা, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটকের পরিচয় দিন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। এর কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিষাদময় জীবনই নাটকের বিষয়বস্তু। কৃষ্ণকুমারীর রূপেগুণে মোহিত হয়ে জয়পুরের লম্পটপ্রকৃতির রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর রাজা মানসিংহ তার পাণিপ্রার্থী হন। তারা উভয়ই প্রতিজ্ঞা করেন যে কৃষ্ণকুমারীকে না পেলে উদয়পুর আক্রমণ করবে। এদের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করার সামর্থ ভীমসিংহের ছিল না। তাই রাজ্যের স্বার্থে নিজ কন্যাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। কৃষ্ণা সবকিছু জানতে পেরে রাজ্যের কল্যাণের কথা ভেবে বিষপানে আত্মহত্যা করে। রাজা ভীমসিংহের একদিকে কন্যা, অন্যদিকে রাজ্য- এ সংকট নাটকের দ্বন্দ্বকে সৃজনশীল করেছে। এ নাটকের প্রধান দোষ বলা যেতে পারে রাজপুত নরনারীগনের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে লেখক স্বদেশীয় নরনারীগণের চরিত্র চিত্রণ করে ফেলেছেন। এমন দু একটি ত্রুটিকে ছাপিয়ে গেছে এ নাটকের মূল আকর্ষণ। যা নাটকটিকে সার্থক ট্রাজেডির মহিমা দান করেছে।

১০. মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন?

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। কাজী নজরুলকে আমরা যে অর্থে বিদ্রোহী বলি মধুসূদন সে অর্থে বিদ্রোহী নয়। কাজী নজরুল রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবিতা লিখেন। আর মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্য রচনার ধারার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী। মধুসূদন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার ধারা ভেঙ্গে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। তিনি একে একে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বাংলা সনেট, সার্থক মহাকাব্য, সার্থক ট্রাজেডি, সার্থক নাটক রচনা করেন। বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগের পয়ার ত্রিপদী'র বন্ধন থেকে মুক্ত করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও প্রসারতা দান করেই তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

এককথায় প্রাকরণিক ও আদর্শিক অর্থে মধুসূদনই বাংলা কবিতায় প্রথম বিদ্রোহী। কেননা এক নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ দেশি বাংলা (আঞ্চলিক) ভাষায় তিনি যোগ করেছেন অদৃষ্টপূর্ব আলো। বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অবলীলায় কবিতার জন্য কবিতা (অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্প) চর্চা করে গেছেন।

CamScanner

১১. মহাকাব্য হিসেবে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কতটা সফল?

উত্তর : মহাকাব্যের ভাব ভাষা হবে ঐশ্বর্যবান এবং রাজসিক গুণবিশিষ্ট। বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে মহাকাব্য হবে সমৃদ্ধ। মহাকাব্যের থাকবে বিশালতা ও ঔদার্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ সার্থক মহাকাব্য। নয়টি সর্গের কাব্যটির মূল কাহিনি রামায়ণ থেকে গৃহীত। এর প্রত্যেকটি চরিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। এ কাব্যের ভাষায় ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গুরুগম্ভীর শব্দ ব্যবহারে ওজোগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সংযুক্ত বহুল পদ প্রয়োগে মহাকাব্যোচিত দীপ্তির সমাবেশ ঘটেছে। মহাকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ উপমা বৈশিষ্ট্য। পুরো কাব্যটিই উপমার আকর। কাব্যের সর্গে সর্গে বৈচিত্র্য, বীরত্বের পাশে কারুণ্য, মূল কাহিনির পাশে উপকাহিনি। কাব্যোচিত ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার ও রসাদি গুণ ইত্যাদি বিবেচনায় মেঘনাদবধ মহাকাব্য। এ কাব্যে জাতীয় ঐতিহ্যমূলক রাম-রাবণের কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে কবির যন্ত্রণা আশা আদর্শ উঁকি দেয়ায় এটি সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।

১২. মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য এবং প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০)। এটি মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ কাহিনি অবলম্বনে রচিত। দেবদ্রোহী দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ-উপসুন্দ অত্যন্ত ধার্মিক হয়েও স্বর্গের সুন্দরী তিলোত্তমাকে দেখে কীভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরস্পরকে আঘাত করে নিহত হল এবং দেবরাজ্য রাহুমুক্ত হল- পুরাণের সেই গল্পটাকে মধুসূদন একালের উপযোগী করে বলবার চেষ্টা করেছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করা হয়েছে। তিলোত্তমার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এ কাব্য যথার্থই আধুনিক কাব্যের সোপানরূপে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। কাব্যটি পৌরাণিক আখ্যান কাব্য হলেও এতে পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্যের রচনা প্রকরণগত অনেক সাদৃশ্য ও প্রভাব আছে। এর প্রথম কয়েক চরণেই সে যুগের রসিক ও নবীন পাঠক বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা কাব্যে নতুন প্রতিভার উদয় হয়েছে- যা একক মহিমায় আসীন। মধুসূদন প্রতিভার প্রথম প্রয়াস মধুসূদন কীর্তির ভিত্তি হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবিদার।

১৩. বাংলা নাটকে মধুসূদন দত্তের অবদান বর্ণনা করুন।

উত্তর : মধুসূদন দত্ত আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা করেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব মূলত বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে একটি শখের নাট্যশালা ছিল।

CamScanner

সেখানে রাজারা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে বিতরণের জন্য মধুসূদন দত্তকে এর ইংরেজি অনুবাদ করতে বলা হয়। 'রত্নাবলী' নাটকের অনুশীলন দেখে মধুসূদন হতাশ হয়ে বলেছিলেন- এহেন দুর্বল নাটকের জন্য রাজারা বিপুল অর্থব্যয় করছেন। বাংলা নাটকের দৈন্য উপলব্ধি করে তিনি কলম ধরলেন। তার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি লিখেন–

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে/মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

এরপর প্রকাশিত 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক দু'টির মাধ্যমে তিনি প্রথম আধুনিক কমেডি ও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেন। 'পদ্মাবতী'তে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। মৃত্যুশয্যায় বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য দুটি নাটক রচনায় হাত দিয়ে 'মায়াকানন' শেষ করতে পারলেও 'বিষ না ধনুর্গুন' পারেন নি। পাইকপাড়ার রাজার অনুরোধে উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত যুবসমাজের ভ্রষ্টাচার নিয়ে 'একেই কি বলে সভ্যতায়' এবং ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের লাম্পট্য নিয়ে 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করেন। কথ্য রচনাভঙ্গির নিশ্চিত স্বাভাবিক গতি, বিভিন্ন চরিত্রের নির্বাধ প্রকাশ এবং সামাজিক বিকারের কৌতুকাবহ উন্মোচন প্রহসন দু'টিকে উজ্জ্বল করেছে। মাত্র চারটি নাটক ও দুটি প্রহসন রচনার মাধ্যমে মধুসূদন আধুনিক বাংলা নাটককে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তিনিই প্রথম সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আচ্ছন্নতা থেকে বাংলা নাটককে মুক্তি দেন। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে বাংলা নাটকে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এর আগে বাংলা নাটক অভিনয় উপযোগী ছিল না। তিনি রঙ্গমঞ্চকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসেন।

১৪. 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন। এতে দেখানো হয়েছে দেশীয় ও পশ্চিমা দুই সংস্কৃতি ধারণকারী ইয়ং বেঙ্গলদের অনাচার। নববাবু ও তার বন্ধুরা মিলে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' নামে একটি ক্লাব খোলে। আড্ডা এ ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও সেখানে অবাধে মদ্যপান ও বারবণিতাদের সঙ্গ চলে। এরাই আবার সভা-সমিতিতে গিয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিতো আর ভাবতো এই হলো সভ্যতা। যারা এসব করে না তাদের বলত সেকেলে, অসভ্য। প্রহসনটিতে মধুসূদন নিঃস্পৃহভাবে সমাজ ও ব্যক্তিকে সার্থকভাবে চিত্রায়ণ করেছেন। এতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা তৎকালীন সর্বজনবিদিত কোন না কোন নববাবুর আচরণেরই প্রতিকৃতি। প্রহসনটিতে কোন ধারাবাহিক কাহিনি নেই। কতকগুলো চরিত্রের রেখাচিত্র মাত্র। প্রহসনটিতে

নীতিকথা অত্যন্ত গৌণ হয়ে এর বাস্তব রসটিই উচ্ছল হয়ে উঠেছে। যদিও মদপানের কুফল দেখানোই এর উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রহসনে কোথাও সে বিষয়ে কোন বক্তৃতা নেই। সর্বোপরি প্রহসনটি বাংলা প্রহসন এমনকি সামাজিক নাটকেরও উৎসমুখ হিসেবে প্রশংসার দাবীদার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস- জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), চতুষ্কোণ (১৯৪৮)।

'জননী' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। শ্যামা নামে এক গৃহবধূর জননী সত্তার বহুবিধ আত্মপ্রকাশ এই উপন্যাসের উপজীব্য। এখানে লেখক জননী চরিত্রটিকে স্বর্গীয় বা দৈবিক মহিমায় ভাস্বর করেননি। বরং এক জননীর কাহিনী বাস্তবতার আয়নায় তুলে ধরেছেন।

'দিবারাত্রির কাব্য' কাব্যধর্মী উপন্যাস। অবৈধ প্রেমের রোমান্টিক গল্প দিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। এতে মানুষের মনের অবচেতন দিকটি দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত। কেউ এ গল্পে সুখী নয়। নায়ক হেরম্ব ভাববাদী প্রেমের প্রতীক। সংসারে বাস করলেও মন তার সেখানে আবদ্ধ নয়। তার কাছে প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। সে সুপ্রিয়ার প্রেমে ধরা দেয় না কিন্তু সুপ্রিয়া তাকে ভালবাসে। উপন্যাসটি প্রেমভিত্তিক নরনারীর জীবনের জটিল হৃদয় সম্পর্কের চিত্র।

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের রাজকুমার সুদর্শন তরুণ। রিণি, সরসী, মাধবী ও কালী- এই চার নারী তাকে দুর্বার আকর্ষণ করে। কিন্তু রাজকুমার কাউকে ভালোও বাসে না, আবার ভোগ করার কামনাও করে না। সে মেয়েদের সাথে গল্প করে সময় কাটায়, কৌতূহলী চোখে মেয়েদের শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে বোধ হয় নিজেই বুঝতে পারে না, সে নিজে কী চায়।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেন। বিষয়বস্তু ও মনোদৃষ্টির ভিন্নতার কারণে তার উপন্যাসসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে- পুতুল নাচের ইতিকথা এবং পদ্মানদীর মাঝি। দ্বিতীয় ভাগে- চতুষ্কোণ, সরীসৃপ, অহিংসা এবং তৃতীয়ভাগে পড়ে- শহরতলী, চিহ্ন, আরোগ্য ইত্যাদি। যদিও তিনভাগের রচনায় তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে, তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি ও জীবন গ্রহণের পদ্ধতি প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে। উপন্যাস

রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য-সন্ধানী। তাঁর উপন্যাসে যে গভীর সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার স্বরূপ হলো মানুষের প্রতি ভালোবাসা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপন্যাসেই প্রথম সমাজের নীচুতলার মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নরনারীর যৌন সম্পর্ক এতোদিন নিষেধ বা রোমান্সের ঘেরাটোপে ঢাকা ছিলো। তিনি প্রেম ও যৌনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞান নিরাসক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী এবং চৈতন্য প্রবাহের লক্ষণ মুক্ত চরিত্রের তিনিই প্রথম স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় তাঁর শিল্পকর্ম এক স্বতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর।

৩. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।

উত্তর : মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। উপন্যাসটির পটভূমিতে আছে কলকাতার গাওদিয়া গ্রাম ও গ্রামের মানুষ। সুদী মহাজন গোপালের ছেলে শশী কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে আসে। পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে শশী গ্রামে গরীব দুঃখীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। পরান ঘোষের স্ত্রী কুসুম শশীকে পাগলের মতো ভালবাসে। কিন্তু শশী সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। একসময় কুসুম সবকিছুতেই আগ্রহ হারায়। এক পর্যায়ে শশীর মনে হয় সবকিছুর মধ্যে থেকেও সে যেন একা। এবার সে কুসুমের কাছে গেলে কুসুম তাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর কুসুম স্বামীসহ গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। মন ভাঙা শশীও এবার গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে দিতে চায়। বিদেশ গিয়ে বড় ডিগ্রি নিতে চায় কিন্তু গ্রামীণ জীবনের পরিবেশ বৈচিত্র্য আর বাস্তবতার ডালপালা তাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যা ছিড়ে শশী বের হতে পারে না। টিলার উপর উঠে শশী ডাক্তারের সূর্যাস্ত দর্শনের শখের অতৃপ্ততা দিয়ে উপন্যাসের শেষ হয়। শশীর জীবনে কাঙ্খিত সূর্যের উদয় আর হয় না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে 'পুতুল' আসলে কারা?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬)। উপন্যাসে আক্ষরিক অর্থে কোথাও পুতুলনাচের দৃশ্য নেই। তবে মানুষের মাঝেই পুতুল যে নানাভাবে খেলা করে অথবা মানুষই পুতুল হয়ে নাচে তা স্পষ্ট। লেখক এখানে পুতুল বলতে সেসব মানুষকে বুঝিয়েছেন যারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। গোপাল, শশী, কুসুম, বিন্দু, সেন দিদি, যামিনী কবিরাজ, যাদব পণ্ডিত উপন্যাসের সব চরিত্রের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। এরা কেউই নিজের জীবনকে নিজের অভিপ্রায় মত গড়ে তুলতে পারে নি। কখনো সমাজ ও সংস্কারে শৃঙ্খলের সুতোয় বন্দি, কখনো নিয়তির হাতে। ঔপনিবেশিকতা এ উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন হলেও শশীর এই পুতুল সত্তায় তা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানমনস্ক

©Nazmus Sadat
CamScanner

অর্থাৎ কার্যকারণচেতনাচালিত জীবনে বিশ্বাসী। তবুও কেন উপন্যাসের নাম 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। তিনি যখন এই নামে উপন্যাস লিখলেন প্রশ্ন আসতেই পারে এই পুতুলের অদৃশ্য রশি কার হাতে? কিছুটা রহস্যাবৃতই মনে হয়।

৫. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোসমীক্ষণমূলক উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬)। পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের দরিদ্র পল্লিতে বসবাসরত জেলে-মাঝিদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দরিদ্র মাঝি কুবের। কুবের বিবাহিত হলেও নায়িকা মূলত তার শ্যালিকা কপিলা। উপন্যাসের রসহ্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া। সে শ্বাপদসংকুল ময়নাদ্বীপে একটি জমিদারী পত্তন করছিল। মাঝিদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের সেখানে পাঠাত। একসময় কুবেরও ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমায়। এভাবেই চলে অসহায় পদ্মানদীর মাঝির জীবন। চিরকাল তারা এক অজ্ঞতার ধোঁয়াশার ভেতরে কাটিয়ে দেয়। জেলে জীবনের দুর্দশার সমান্তরালে লেখক মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সময় কুবের এবং কপিলাকে নিয়ে যাওয়া আদিম প্রবৃত্তির তাড়নার ইঙ্গিত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণিকে তুলে ধরেছেন হোসেন মিয়া চরিত্রের রূপায়ণে। পদ্মাপাড়ের মাঝিদের জীবনের ঘনিষ্ঠ বর্ণনা এবং চরিত্রের মুখের ভাষা হিসেবে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের জন্য এ উপন্যাসকে অনেকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলেও অভিহিত করেছেন।

মাহমুদুল হক

১. 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাহমুদুল হকের উপন্যাস 'জীবন আমার বোন'। উপন্যাসটা দৃশ্যত একাত্তর সাল নিয়ে। কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধকালীন ঘটনাপঞ্জিতে উপন্যাসের ব্যাপ্তি নয়। ৭ই মার্চের ভাষণের দুইদিন পূর্ব থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত উপন্যাসের ব্যাপ্তি। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ব্যক্তিগত জীবনের যে সংকট, টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, হিসেব-নিকেশ-সেসব উঠে এসেছে খোকা নামের এক যুবকের জীবনের মধ্যে দিয়ে। এ উপন্যাসে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির উত্তেজনা জায়গা করে নিয়েছে। বলা চলে না যে মুক্তিযুদ্ধ এই রচনার মূল বিষয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা সমকালের অন্তর্লীন টানাপোড়েন ও গতি-প্রকৃতি এতে ব্যক্তির অনুভূতির মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। সে হিসেবে এই উপন্যাসটি সমকালের অন্তর্দর্শন বটে। ইতিহাসের কাহিনি নথিকারের মতো না বলেও যে ইতিহাসের দর্শনকে দৃশ্যমান করা যায়, জীবন আমার বোন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মীর মশাররফ হোসেন

১. মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রধান তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ মীর মশাররফ হোসেন। তিনি ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। তার রচিত প্রধান তিনটি গ্রন্থ-

- **রত্নবতী (১৮৬৯)**। এটি মুসলমান সাহিত্যিক রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। গুজরাট নগরের রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের কল্পিত কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। এটি রূপকথার মাধ্যমে শিক্ষামূলক একটি দীর্ঘ গল্প। রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' এ বিতর্ক ও বিতর্কের সমাধানই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।
- **বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫-৯১)**। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা এর মূল উপজীব্য। এর প্রধান চরিত্র এজিদ। তার কামনা বাসনাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের সূচনা এবং শোচনীয় বিপর্যয়ের মাধ্যমে কাহিনির সমাপ্তি।
- **উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০)**। আত্মজীবনীমূলক রচনা। উদাসীন পথিক ছদ্মনামে লিখেছেন। নীলকর কেনির অত্যাচার ও কৃষক ভূস্বামীদের প্রতিরোধের মুখে মি. কেনির শোচনীয় পরাজয় এ গ্রন্থের প্রধান বিষয়।

২. নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেনের পরিচয় লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন। তার রচিত নাটক- 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৯৮), নিয়তি কি অবনতি (১৮৯৮) প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম রচিত প্রথম বাংলা নাটক 'বসন্তকুমারী'। নাটকটি তার লাহিনীপাড়ার নিজ বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। 'জমিদার দর্পণ' নাটক লিখে তিনি তদানীন্তনকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মর্যাদা লাভ করেন। এ নাটকে রচনাশক্তির উৎকৃষ্টতা যেমন দেখা যায়, তেমনি সমাজ-সচেতনতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এতে তিনি প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। 'জমিদার দর্পণ' নাটকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জমিদার কাচারীতে। তাই জমিদারের স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবন-বৃত্তান্ত তাঁর বিশদরূপে জানা ছিল।

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয় মশাররফ হোসেনের প্রহসন 'এর উপায় কি'। ইতঃপূর্বে রচিত মধুসূদনের 'একেই বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুটো প্রহসনের খানিকটা প্রভাব এতে থাকলেও ভাব-বিষয় ও রচনা-শৈলির দিক থেকে এটা স্বতন্ত্র। তার অন্যান্য প্রহসন- ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস কাগজ, এ কী।

CamScanner

৩. 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। *[৪১তম, ৩৫তম]*

উত্তর : 'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মশাররফ হোসেনের ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। কারবালার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং সপরিবারে ইমাম হোসাইন (রা)-এর শাহাদাতের কাহিনিই 'বিষাদ সিন্ধু'র মূল আলোচ্য বিষয়। উপন্যাসে ব্যবহৃত চরিত্রগুলোর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। লেখক মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করেছেন কিন্তু ইতিহাসের অন্ধ অনুকরণ করেননি। ইমাম হাসান হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বপ্রসূত এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। কারবালার প্রধান ঘটনাটি ইমাম হোসেন ও তাঁর পরিজনবর্গের নির্মম হত্যাকাণ্ড। কিন্তু বিষাদ সিন্ধুতে এ ঘটনার আগের ও পরের অনেক কাহিনি সংযোজন করা হয়েছে। লেখক আবেগতাড়িত হয়ে এতে কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। যেগুলো ইতিহাসের আলোকে বিচার করা চলে না। যেমন- এজিদের চোখের সামনে থেকে হোসেনের খণ্ডিত শির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, কারবালার প্রান্তরের গাছ থেকে রক্তক্ষরণ, হোসেনের দাফনের সময় তার পিতামাতার মর্তে আগমন প্রভৃতি। বিষাদসিন্ধুর ঘটনা কারবালার ঐতিহাসিক কাহিনি আশ্রিত হলেও শিল্পীর তুলির আচড়ে তা হয়ে উঠেছে জীবন্ত। মুহম্মদ আব্দুল হাই 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন-

> *"বাংলা সাহিত্যে 'বিষাদ সিন্ধু' অভিনব সৃষ্টি- একাধারে ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস ও গদ্য মহাকাব্য।"*

৪. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা? এটি কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম? *[৩১তম, ১১তম বিসিএস]*

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০)। তিনি উদাসীন পথিক ছদ্মনামে এটি লিখেছেন। নীলকর মি. কেনির অত্যাচার এবং কৃষক ভূস্বামীদের প্রতিরোধের মুখে মি. কেনির শোচনীয় পরাজয় এ গ্রন্থের প্রধান বিষয়। এছাড়াও লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র উঠে এসেছে। মীর মোশাররফ হোসেন নদীয়ার মানুষ। নীলচাষ, নীলকর, নীল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার পরিণাম সবকিছু তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। নীলকর টিআই কেনি ছিলেন তার পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নীল সংগ্রামের সংগঠক ও নেতা সা গোলাম ছিলেন ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। এসব কারণে দোলাচল মনোভাব নিয়েই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এর কাহিনি দুটি ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারায় রয়েছে নীলকর টিআই কেনির সঙ্গে কুষ্টিয়ার আমলার জোড়াগ্রাম সুন্দরপুরের (সদরপুর) মহিলা জমিদার প্যারীসুন্দরীর দ্বন্দ্ব, নীল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কেনির পরিণতি। দ্বিতীয় ধারায় মোশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের সঙ্গে

তার ভ্রাতুষ্পুত্রী-পতি সা গোলামের তিক্ত সম্পর্ক। দুটি ধারার যোগসূত্র মীর মোয়াজ্জম হোসেন। এই উপাখ্যানের কাহিনি ও স্থান-কাল-পাত্র বাস্তবভিত্তিক।

৫. 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ কি? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা উপন্যাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু'। এর উপজীব্য কারবালার বিষাদাত্মক কাহিনি। এ উপন্যাসের নানা উপাদান লেখক পুঁথিসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করেছেন। পুঁথিসাহিত্যের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনি সাধারণ মুসলিম পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। আর রচনাগুণের জন্য সাহিত্যরসিকদের কাছে জনপ্রিয়। অপরদিকে জয়নাবের রূপে বিমোহিত এজিদ এবং এই রূপতৃষ্ণার পরিণামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে কথকতা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রন্থটিকে সর্বজনীন করে তুলেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রথমে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গ্রামে গ্রামে পঠিত হতে থাকে। এই জনপ্রিয়তার সূত্র ধরেই পরবর্তীতে বাংলাদেশের নেত্রকোণা অঞ্চলে প্রচলিত জারিগানের আদলে আত্তীকৃত হয়। 'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন-

> *'এদেশের মুসলিম গণ-মানসে কারবালা কাহিনীর মর্মন্তুদ স্মৃতি দোভাষী পুঁথির মাধ্যমে যে-ধর্মীয় আবেগ নির্মাণ করেছিলো, 'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা প্রধানত সেই সংবেদনশীলতার কাছেই ঋণী।'*

৬. 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ নামের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের নামটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিয়তি নির্ধারিত মানবভাগ্যের বেদনাবহ পরিণতিই এ গ্রন্থের মূলসুর। জয়নবের রূপে মুগ্ধতা, পরিণামে ব্যর্থতা, তা থেকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে একে একে অসংখ্য মানুষের জীবননাশ 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসের কাহিনিকে বেদনাবিদুর করে তুলেছে। উপন্যাসে ছোট-বড় সব চরিত্রেই কম-বেশি বিষাদের কালো ছায়া পড়েছে। শেষ পর্বে ইমাম হোসেনের মর্মান্তিক শাহাদত বরণকে লেখক 'বিষাদ সিন্ধু' বা 'দুঃখের সাগর'-এর সাথে তুলনা করেছেন। উপন্যাসের কাহিনির শুরু বিষাদের ছায়া দিয়ে, আবার সমাপ্ত হয়েছে বিষাদ দিয়ে। তাই সব কিছু মিলিয়ে এ উপন্যাসের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের পরিচয় লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন। তিনি ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার লাহিনীপাড়ার এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন জমিদার। মীর

মশাররফের স্কুল জীবন কাটে প্রথমে কুষ্টিয়ায়, পরে পদমদী এবং শেষে কৃষ্ণনগরে। পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের বাসায় থেকে কলকাতা কালীঘাট স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। সংসার জীবনে টাঙ্গাইলের 'শান্তিকুঞ্জে' বিবি কুলসুমকে নিয়ে বসবাস করতেন। কাঙাল হরিনাথ ছিলেন তার সাহিত্য গুরু। ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দির পদমদীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী' (১৮৬৯)। এটি মুসলিম রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস। গুজরাট নগরের রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের কল্পিত কাহিনি অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। এটি রূপকথার মাধ্যমে শিক্ষামূলক একটি দীর্ঘ গল্প। রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়' এ বিতর্ক ও বিতর্কের সমাধানই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

৮. বাংলা গদ্যে মীর মশাররফ হোসেনের অবদান লিখুন।

উত্তর : বাংলার মুসলমান সমাজে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা করেন মীর মশাররফ হোসেন। তিনি একাধারে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্য চর্চার হাতে খড়ি ছাত্রজীবনেই। 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকার সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ তার সাহিত্যগুরু। তিনি 'গ্রামবার্ত্তা' এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা দু'টিতে নিয়মিত লিখতেন। তৎকালীন কলকাতার বাবুদের ভিড়ে মীর মশাররফ হোসেন প্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্যিক হিসেবে সুধীজনের দৃষ্টি আর্কষণে সক্ষম হন। 'মুসলমানরা গদ্য লিখতে পারে না' বাবুদের এ ধারণা ভুল প্রমাণ করেছেন। তারা বলাবলি শুরু করেন, মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বিশুদ্ধ বাংলা চর্চা করেছেন। তার প্রথম গ্রন্থ 'রত্নাবতী' নামক উপন্যাস। তার নাটক 'জমিদার দর্পণ', আত্মজীবনীমূলক রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। যে গ্রন্থটির কারণে মীর মশাররফ হোসেন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন তার নাম 'বিষাদ সিন্ধু'। কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে লেখা সর্ববৃহৎ রচনা। সাহিত্যে রসগ্রন্থ রচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

৯. 'জমিদার দর্পন' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন?

উত্তর : মীর মশাররফ হোসেনের নাটক 'জমিদার দর্পন' (১৮৭৩)। জমিদারদের লাম্পট্য, প্রজা পীড়ন ও অর্থের প্রভাবে বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ এ নাটকের উপজীব্য। কোশলপুরের ছোট জমিদার মেরাজ আলীকে সকলে আড়ালে হায়ওয়ান (জানোয়ার) আলী বলে ডাকে। মদ আর নারীর প্রতি তার সীমাহীন লোভ। কৃষক আবু মোল্লার সুন্দরী স্ত্রী নুরুন্নেহারের উপর তার কুনজর পরে। সে কৌশলে আবু মোল্লাকে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠায়। হায়ওয়ান আলীর পাশবিকতায় অতিরিক্ত

রক্তক্ষরণে আবু মোল্লার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নুরুন্নেহারের মৃত্যু হয়। হত্যার দায় এড়াতে ব্রিটিশ ডাক্তার, পুলিশ ও বিচারক সবাইকে উৎকোচ দেয়। তারা উল্টো স্বামী আবু মোল্লাকেই খুনী সাব্যস্ত করতে চায়। এভাবে মীর মশাররফ জমিদার ও শাসকশ্রেণির দালালদের ঘৃণ্য চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া গ্রামের মানুষদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 'জমিদার দর্পণ' মীর মশাররফের সমাজ চেতনার এক বিস্ময়কর পরিচয়।

১০. সাংবাদিক মীর মশাররফ হোসেনের অবদান লিখুন?

উত্তর : সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও মীর মশাররফ হোসেন মুসলমান সাহিত্যসেবীদের মধ্যে অগ্রপথিক। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানেই মীর মশাররফের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। ১৮৬৫ সালের মে মাসে 'মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ *সংবাদ প্রভাকর*-এ প্রকাশিত হয়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় মফস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিক হিসাবে প্রথম জীবনে কাজ করে এক সময় 'আজিজন নেহার' ও 'হিতকরী' নামক দুটি পত্রিকা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙালি মুসলমানের সাময়িকপত্র প্রকাশনার আদি পর্বে তাঁর সম্পাদনায় 'আজীজন নেহার' (১৮৭৪) নামের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম স্ত্রী আজিজুন নেহারের নামের সাথে মিল রেখে এর নামকরণ করেন। তারও ১৬ বছর পর তিনি পাক্ষিক 'হিতকরী' (১৮৯০) পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'হিতকরী' পত্রিকা কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত হতো। 'হিতকরী' পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পাঠক-চাহিদার কারণে দ্বিতীয় বর্ষে 'দাশাহিক' বা 'দাশহিক' হিসেবে (অর্থাৎ দশ দিন পর পর) প্রকাশিত হতো।

মুকুন্দদাস

১. মুকুন্দদাসকে চারণ কবি বলা হয় কেন?

উত্তর : ব্যাকরণগতভাবে চারণ শব্দের অর্থ স্তুতি পাঠক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে, দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা জোগাতে যেসব কবি গান গেয়ে ও যাত্রাভিনয় করে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদেরকে 'চারণ কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের 'চারণ কবি' মুকুন্দদাস। তিনি স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু স্বদেশী গান ও নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যে চারণ কবিদের মধ্যে আরো রয়েছেন- আব্দুল গফুর, বিজয় সরকার।

মুনীর চৌধুরী

১. নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পরিচয় দিন। *[৪৪তম বিসিএস]*

উত্তর : মুনীর চৌধুরী এদেশে আধুনিক নাটকের জনক। আধুনিকতার ধ্যান ধারণা তাঁর বিভিন্ন নাটকে যেমন পরিস্ফুটিত, তেমনি আধুনিক বিশ্ব নাটকের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তার মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লেখা 'মানুষ', ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'কবর', পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড রীতিতে পৌরাণিক পুনর্নির্মাণ 'দণ্ডকারণ্য'। পানিপথের যুদ্ধকে প্রেক্ষাপটে রেখে 'রক্তাক্ত প্রান্তর'। তার নাটকের আঙ্গিকে নতুনত্ব আছে। সংলাপ রচনায় তাঁর দক্ষতা অতুলনীয়। অসাধারণ নাটকীয়তাযুক্ত, বেগবান, বুদ্ধিদীপ্ত, বিদ্রূপ ও হাস্যরসাত্মক এ সংলাপ। মুনীর চৌধুরী মৌলিক নাটক রচনার পাশাপাশি বিদেশি নাটকের অনুবাদ করেছেন। পাশ্চাত্য নাট্যকলা সম্পর্কে বাঙালি নাট্যকর্মীদের অবগত করানো এবং বাংলার নাট্যমঞ্চকে সমৃদ্ধকরণের অভিপ্রায়ে তিনি অনুবাদ-রূপান্তরকর্মে মনোযোগী হন। এ পর্যায়ের নাটকে গভীর জীবনবোধ, নিখুঁত শিল্পদৃষ্টি ও আধুনিক নাট্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ট্র্যাজিডির চেয়ে কমেডি নাটকের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশি।

২. মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের বিষয় কি? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মুনীর চৌধুরীর ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক 'কবর'। ১৯৫৩ সালে প্রথম ভাষাদিবস পালন উপলক্ষে জেলের মধ্যে পরিবেশনের জন্য রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে জেলে বসে রচনা করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র জনতা মিছিল বের করে। মিছিলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণে বহুসংখ্যক লোক মারা যায়। শাসকগোষ্ঠী ছিন্নভিন্ন মৃতদেহগুলো রাতারাতি কবর দিতে চায়। কিন্তু লাশগুলো জীবিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমবেত প্রতিবাদ জানায়- আমরা কবরে যাব না, আমরা বাঁচবো। বারুদের গন্ধ থাকায় এ লাশ কবর দেওয়া হবে না বলে জানায় মুর্দা ফকির। এমতাবস্থায় বিপাকে পড়ে দায়িত্বে থাকা মদ্যপ নেতা ও ইন্সপেক্টর। এই হলো কবর নাটকের মূল পরিসর। এতে রয়েছে নেতা, পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ, মুর্দা-ফকির, কবরস্থানের একজন গার্ড ও কয়েকটি ছায়া চরিত্র। নেতা শাসকশ্রেণির নিষ্ঠুরতার প্রতীক। ইন্সপেক্টর হাফিজ চাটুকার চাকুরীজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি। মুর্দা ফকির প্রতিবাদী বাঙালি। ছায়া চরিত্রগুলো তারুণ্যের প্রতিনিধি। কবর নাটকে লেখক রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। লাশগুলো জীবিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তারা মরেও অমর।

CamScanner

৩. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের বিষয় লিখুন। *[২১তম বিসিএস]*

উত্তর : মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২)। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এর বিষয়বস্তু। মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আহমেদ শাহ আবদালী ও জোহরা বেগম। অন্যদিকে মারাঠাদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইব্রাহিম কার্দি। ইব্রাহিম কার্দি জোহরা বেগমের স্বামী। জোহরা বেগম রাতের অন্ধকারে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু ইব্রাহিম কার্দি আদর্শগত কারণে ফিরে আসতে নারাজ। কারণ ইব্রাহিম কার্দির দুঃসময়ে মারাঠারা তাকে চাকরি দিয়ে সেনাপতি বানিয়েছে। এদিকে জোহরা বেগমের পিতা মেহেদী বেগের হত্যাকারী মারাঠারা। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হলে ইব্রাহিম কার্দি বন্দী হয়। জোহরা বেগম স্বামী ইব্রাহিম কার্দির মুক্তির ফরমান নিয়ে কারাগারে গিয়ে দেখে সে মারা গেছে। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের কাহিনি ইতিহাস থেকে গ্রহণ করলেও তা ঐতিহাসিক নাটক নয়। যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ণয় করার পরিবর্তে নাট্যকার দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন ইব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের আদর্শগত দ্বন্দ্ব রূপায়ণে। এ নাটকের বিখ্যাত উক্তি সুজাউদ্দৌলার সংলাপ-

'মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে বিকালে বদলায়।'

৪. মুনীর চৌধুরী কী জন্য বিখ্যাত? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, বাগ্মী এবং বুদ্ধিজীবী। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তিনি গ্রেফতার হন। জেলে বসেই এম.এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। জেলে থাকা অবস্থায়ই রচনা করেন বিখ্যাত নাটক 'কবর'। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রিয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে বাংলা টাইপরাইটারের জন্য কি-বোর্ড উদ্ভাবন করেন, যেটি 'মুনীর অপটিমা' নামে পরিচিত। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একজন। এ সব কিছুর জন্যই মুনীর চৌধুরী বিখ্যাত।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-ভাবনার পরিচয় দিন। *[৩৭তম]*

উত্তর : বাংলাদেশের 'সংস্কৃতি' শব্দটির সঙ্গে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি সংস্কৃতি নিয়েই ভেবেছেন এবং লিখেছেন। তিনি সংস্কৃতির এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন যা আমাদের চৈতন্যে স্থান করে নিয়েছে। সংস্কৃতির সাধনাকে তিনি মনুষ্যত্বের সাধনা বলে মনে করেছেন। তার প্রবন্ধ সংকলনের নাম প্রবন্ধের সূচনা-বাক্য-

'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।'

সংস্কৃতিই এক অর্থে জীবন। সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য অন্তরের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত জীবন দর্শন সৃষ্টি করা। যিনি তা করতে পারেন তিনিই প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান। তার কাছে সংস্কৃতি একান্তই ব্যক্তিতান্ত্রিক। তিনি বলেন-

'নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান কর, সুন্দর করো, বিচিত্র করো এই কালচারের আদেশ।'

তার মতে ব্যক্তিত্বের সাধনা সংস্কৃতি সাধনার মূল ভাবনা। সংস্কৃতিবান মানুষ কোন 'ইজম' বা মতবাদে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। মতবাদে আবদ্ধ থাকা মানে নিজের চিন্তার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা। সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের ভিতরের পশু প্রবৃত্তির অবসান ও তাকে মনুষ্যত্বলোকে উন্নীত করার কথা মোতাহের হোসেন বলেছেন বারবার। তাঁর মতে সংস্কৃতি মানে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা। সংস্কার মুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব।

২. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : 'সংস্কৃতি-কথা' মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মৌলিক চিন্তার বই। সংস্কৃতি-কথায় তিনি চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কিংবা সংস্কৃতির মৌলিক সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানে জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক কর্মকাণ্ডেই সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে বলে মনে করা হয়। কিন্তু মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংজ্ঞা ধরলে বলতে হয়, সামষ্টিকতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নামই সংস্কৃতিবান হওয়া। শিক্ষা, সংস্কৃতি জাতির পরিচায়ক বারবার বলেছেন। সংস্কৃতি-কথা প্রবন্ধের প্রবাদপ্রতিম উক্তি-

'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।

সাম্প্রদায়িকতা জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষায় তার ব্যাপক আগ্রহ উৎসাহ ছিলো। নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে তিনি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন,

'রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, মহাপুরুষ, অর্থাৎ সত্য ও প্রেমপরায়ণ পুরুষ।'

প্রগতিশীল চিন্তা ও সরস কথ্যভাষার জন্য এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধগ্রন্থ সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন-

'মোতাহের হোসেন চৌধুরী এই একখানি বই লিখে অমর হয়ে গেলেন।'

৩. প্রাবন্ধিক হিসেবে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী বাংলাভাষার জনপ্রিয় প্রাবন্ধিক। মুক্তবুদ্ধিচর্চার প্রবক্তা, উদার মানবতাবাদী ও মননশীল প্রবন্ধকার হিসেবে মোতাহের হোসেন

CamScanner

চৌধুরী অর্জন করেন বিশেষ খ্যাতি। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। সাহিত্য সমাজের সভা ও সম্মেলনে তার অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত। লেখক রচিত 'আমাদের দৈন্য', 'আদেশপন্থী ও অনুপ্রেরণাপন্থী' ও 'মুসলমান সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা' প্রবন্ধ তিনটি যথাক্রমে সাহিত্য সমাজের পঞ্চম (১৯৩১), ষষ্ঠ (১৯৩২) ও অষ্টম (১৯৩৪) বার্ষিক সম্মেলনে পাঠ করা হয়। এছাড়াও তার 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্যবিলাস' প্রবন্ধটি সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র পঞ্চম বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মোতাহের হোসেনের প্রবন্ধের গদ্যশৈলীতে প্রমথ চৌধুরী এবং মননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'র প্রভাব লক্ষণীয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

১. 'তাপস কাহিনী', 'মহর্ষি মনসুর' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী? [১৮তম]

উত্তর : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক রচিত জীবনীগ্রন্থ-

তাপস কাহিনী (১৯১৪)। এটি আউলিয়া অর্থাৎ মুসলমান মহর্ষিগণের জীবন কথা। এতে সাতজন প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীর জীবনকাহিনি বর্ণিত রয়েছে। এরা হলেন- হজরত আব্দুল কাদির জিলানী, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, ইমাম জাফর সাদেক, ইব্রাহিম আদহাম বলখী, তপস্বী ফজিল আয়াজ, তপস্বী বশর হাফী এবং দরবেশ আবু হেফ্স।

মহর্ষি মনসুর (১৮৯৬)। এটি ধর্মবীর মনসুর হাল্লাজের অলৌকিক জীবন-কাহিনি। মনসুর হাল্লাজ পারস্যের একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি মুসলিম জগতে চরম বিতর্কিত বক্তব্য 'আনাল হাক্ক' (আমিই পরম সত্য)-এর জন্য পরিচিত।

২. 'জোহরা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : মোজাম্মেল হক একজন ভিন্নধর্মী কবি ও লেখক। তিনি কবি হিসেবে পরিচিত হলেও উপন্যাস-রচনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'জোহরা' তার পাঠকনন্দিত উপন্যাস। এটি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। সে সময়কার মুসলমানদের সমাজচিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। তখন মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের মতামত বা ইচ্ছের কোনো মূল্য ছিল না। পরিবারের পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হতো। এতে নারীর জীবনে দুঃসহ বেদনার যে করুণ পরিণতির জন্ম হতো উপন্যাসে সে চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। জোহরা উপন্যাসে সমাজচিত্রটিও নির্মিত হয়েছে বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার অনুসৃতে। ভারতবর্ষ, অমৃত বাজার, বেঙ্গলী, মুসলমান প্রভৃতি পত্রিকায় উপন্যাসটি ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৪৪তম]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ মোট ১২ বার বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়েছেন। ৩০টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তার বিদেশ ভ্রমণ শুরু হয় ১৮৭৮ সালে প্যারিস হয়ে লন্ডন গমনের মাধ্যমে। সর্বশেষ সিংহল ভ্রমণ (১৯৩৪) করেন। তার রচিত ভ্রমণসাহিত্য হলো-

- য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১)। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ কাহিনির সাথে সাথে ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির কথা এতে এসেছে। উঠে এসেছে দর্শনালোচনা, তত্ত্বকথা, আবার লঘু প্রলেপে গভীর জ্ঞানান্বেষণ।
- জাপান যাত্রী (১৯১৯)। এতে জাপান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার স্বচ্ছ ও স্পষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। জাপানের মানুষের চিরন্তন সারল্য ও সৌন্দর্যবোধ থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের নেতির প্রভাব এমনকি বাণিজ্য বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির প্রভাবের কথা উঠে এসেছে।
- রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১)। রুশ বিপ্লবের একযুগ পরে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, দর্শন এবং পরিকল্পনা সবই ফুটে উঠেছে। একইসাথে ব্রিটিশ শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আফসোস, অপারগতা ফুটে উঠেছে। তাঁর এ লেখনীর মাধ্যমে এদেশে রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছিল।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বলাকা' কাব্যের বিশেষত্ব লিখুন। *[৪৪তম(পেশাগত)*
রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের প্রথম প্রকাশ কোন সালে? *[১০তম বিসিএস]*
অথবা, 'বলাকা' কাব্য অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গতিচেতনা বিষয়ক কাব্য 'বলাকা' (১৯১৬)। প্রাক-বলাকা কাব্যে কবির অনুভূতি ব্যক্ত হতো আবেগের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু বলাকা কাব্যে সেই অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে বোধ ও বুদ্ধি, জ্ঞান ও অনুভবে। বলাকা পর্বে পরিদৃষ্ট হয় জগতে কোনো কিছুই স্থির হয়ে নেই। সব কিছুই বন্ধন থেকে মুক্তির পানে ধাবমান। এমন নিরবচ্ছিন্ন চলাতেই তার আনন্দ। এ প্রবাহের গতি যেদিন রুদ্ধ হয়ে যাবে সেদিনই জড়ত্ব ও মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন-

'আমার বলাকার কবিতাগুলোতেও সেই গতির কথাই বলেছি। গতির ছন্দেই বিশেষ সৌন্দর্য। গতি নিয়েই সৃষ্টি। এই চরাচর সেই সৃষ্টি বা গতির প্রবাহ। কি অপূর্ব ছন্দে এ সৃষ্টির প্রবাহ চলছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।'

কবিগুরু গতির উপাসক। কবি-মনের সেই গতির সুরই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটেছে 'বলাকা' কাব্যে। বলাকার প্রতিটি কবিতায় কবি গতির জয়গান গেয়েছেন।

CamScanner

৩. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কলকাতার জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত ঠাকুর পরিবারের প্রাচীন বাড়ি। আঠারো শতকে দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ) এটি নির্মাণ করেন। বাড়িটি বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বা ঠাকুর পরিবারের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

এ বাড়ির কবি-লেখকদের মধ্যে রয়েছে- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা) ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিক জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত রচয়িতার কৃতিত্বের দাবীদার। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে লেখক, শিল্পী, সুরকার, গীতিকার এবং নাট্যব্যক্তিত্ব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার, সম্পাদক ও চিত্রকর। স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়া মহাদেশে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ লেখক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি.এ পাশ করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তিনি সঙ্গীতশিল্পী, লেখক ও অনুবাদক। উল্লেখ্য ইন্দিরা দেবীর স্বামী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

৪. বাংলাদেশে রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪৩তম]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের খুলনায়। এছাড়াও জমিদারী দেখার জন্য তিনি বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছেন। আনোয়ারুল করিম 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে লিখেছেন-

> *'স্থায়ীভাবে থাকার সময় ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ মোট ৫০ বার বাংলাদেশে এসেছেন।'*

বাংলাদেশে রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো হলো-

✓ **দক্ষিণডিহি:** খুলনার ফুলতলা উপজেলার একটি গ্রাম দক্ষিণডিহি। রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর জন্ম এই গ্রামে। তাছাড়া রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও এই গ্রামের মেয়ে। তাদের বিয়েও হয়েছিল এই গ্রামে।

✓ **শিলাইদহ:** বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার একটি গ্রাম শিলাইদহ। ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম শিলাইদহে আসেন। শিলাইদহ কুটিবাড়িতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। এখানে বসেই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ-

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী রচনা করেন। গীতাঞ্জলী কাব্যের অনুবাদ কাজও শুরু করেন। ১৯০১ সালে শিলাইদহ ছেড়ে শান্তি নিকেতনে উঠেন।

✓ **শাহজাদপুর :** সিরাজগঞ্জ জেলার একটি থানা। ১৮৯০ সালে প্রথম জমিদারী এস্টেট পরিদর্শনে শাহজাদপুরে আসেন।

✓ **পতিসর :** নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার একটি গ্রাম। ঠাকুর জমিদারির কালিগ্রাম পরগণার সদর কাচারি ছিল পতিসরে। ১৮৯১ সালে প্রথম পতিসরে আসেন। ১৯৩৭ সালে শেষবার পতিসর পরিদর্শন করেন।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন *[৪১তম]*
অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি নাটকের নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাট্যকার যে নাটক রচনা করেন তাকে রূপক বা সাংকেতিক নাটক বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক সাংকেতিক নাটক- ডাকঘর, অচলায়তন, রক্তকরবী, কালের যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত নাটক 'ডাকঘর'। ঘরে বন্দি বালক অমলের ক্ষয় অবসন্নতা ও মৃত্যুর ঘটনাই নাটকের আলোচ্যবিষয়। এতে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মুক্তির কথা এসেছে। বিশ্বাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যুক্ত হওয়ার পরম আকাঙ্ক্ষার গূঢ় তত্ত্বই এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

'অচলায়তন' তত্ত্বনাটক। এর মূল বিষয় জড়ধর্মের সঙ্গে প্রাণধর্মের দ্বন্দ্ব। জড়ধর্মের প্রাধান্য যতই প্রবল হোক, প্রাণধর্মের কাছে তার পরাজয় নিশ্চিত- এই তত্ত্বকেই লেখক উপস্থাপন করেছেন। একইসাথে মানুষের তৈরি বিকৃত সংস্কারে আবদ্ধ সমাজের স্বরূপ প্রকাশ করে সেখান থেকে মুক্তির কথা বলেছেন।

'রক্তকরবী' নাটকে রূপায়িত হয়েছে মানুষের লোভ কিভাবে জীবনের সব সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে ধ্বংস করে মানুষকে উৎপাদনের নিছক যন্ত্রে পরিণত করে। যন্ত্রের সঙ্গে কৃষির সংঘাত, পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতে ঘোষিত হয়েছে প্রেম ও প্রাণের জয়।

৬. 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী? *[৩৭তম বিসিএস]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার'। গল্পের নায়ক চাকুরীর কারণে কলকাতা হতে গ্রামে এসেছে। এখানে তার সাথে থাকে বারো তেরো বছরের এতিম বালিকা রতন। দীর্ঘদিন এক সঙ্গে থাকার ফলে দু'জনের মধ্যে আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পোস্টমাস্টার বদলি হয়ে অন্যত্র যাওয়ার সময় পোস্ট মাস্টার ও রতনের মধ্যে যে অভিব্যক্তি ফুটে উটেছে সেটিই গল্পের মূল বক্তব্য। পোস্টমাস্টারের বিদায়বেলার মনোভাব-

©Nazmus Sadat
CamScanner

'একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, ... জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে।'

গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ করেছেন এক অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে-

'ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?'

এটাই গল্পের জীবনদর্শন। পৃথিবীতে কেউ কারো নয়, সময়ের ব্যবধানে এরে অপরকে ছেড়ে চলে যাবে। পোস্টমাস্টার চাকুরীর কারণে গ্রামে এসে নিঃসঙ্গ হয়, জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন নিঃসঙ্গপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ হয়তো গল্পের মাঝে নিজের নিঃসঙ্গ অনুভূতিই ছড়িয়ে দিয়ে চেয়েছেন।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি ছোটগল্প- হৈমন্তী, শাস্তি ও দেনাপাওনা।

'হৈমন্তী' গল্পটি সাধুরীতিতে এবং উত্তম পুরুষের বর্ণনায় লেখা। গল্পকথক তার গল্পের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী। এতে যৌতুক প্রথা প্রাধান্য পেয়েছে। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ সমাজের এমন কিছু দুষ্টক্ষত চিহ্নিত করেন, যার অন্যায় অনুশীলনের নির্মম শিকার হৈমন্তী এবং যুগে যুগে তার মতো নিষ্ফলা নারীরা।

'শাস্তি' গল্পের ছোট বউ চন্দরার স্বামী ছিদামের ভাই দুখিরাম স্ত্রী রাধাকে হত্যা করে। ছিদাম ভাইকে বাঁচানোর জন্য স্ত্রী চন্দরার ওপর দায় চাপায়। স্বামীর দেয় অপবাদে বিস্মিত এবং হতবিহ্বল হয় চন্দরা। এক সময় স্বামী সত্য প্রকাশ করে চন্দরাকে খুনের দায় থেকে বাঁচাতে চাইলেও চন্দরা বাঁচতে চায় নি।

'দেনাপাওনা' গল্পে জমিদার রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকা পণ স্বীকার করেন নিরুপমার বাবা। কিন্তু পণের পুরো টাকা দিতে না পারায় শাশুড়ির নির্যাতনের শিকার হয় নিরুপমা। শেষ সম্বল বাড়ি বিক্রি করে বাবা পণের টাকা দিতে চাইলে নিরুপমা বাধা দেয়। সে বলে টাকা দেয়া হবে লজ্জার কারণ। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে নিরুপমার মৃত্যু হয়।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত তিনটি কাব্যনাট্যের নাম উল্লেখ করুন। *[৩১তম]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতে সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছিলেন। তিনি দেশিয় পটভূমিতে কাব্যনাটক রচনা করেন। তার রচিত তিনটি কাব্যনাট্য- প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী এবং বিসর্জন।

'প্রকৃতির পরিশোধ' নাটকের প্রধান চরিত্র গুহাবাসী সন্ন্যাসী। একদিন সন্ন্যাসী সংসার জীবনে প্রবেশ করে। কিন্তু সাংসার জীবনের নয়নাভিরাম দৃশ্য তাকে আকর্ষণ

করতে পারে নি। অথচ সন্ন্যাসী এক অনাথা বালিকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পিতৃস্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। পরে তিনি সংসারের মায়াজাল থেকে পলায়ন করতে চাইলেও পারেন নি। বালিকাটির মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সংসার-জীবনই সন্ন্যাসীর নিকট একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতির প্রতিশোধ সন্ন্যাসীর জীবনসত্য উপলব্ধি করার বিষয়টিই মুখ্য।

'রাজা ও রানী' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিক্রমদেব ও সুমিত্রা। বিক্রমদেব প্রবলভাবে সুমিত্রাকে কামনা করেছে। রাজার এই কামতাড়িত প্রবল প্রেমের প্রতিহিংসা সমস্ত রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এক সময় ইলার সঙ্গ লাভ করে প্রতিহিংসা পরায়ণ বিক্রমদেব মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠে। উদগ্র কামবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ঋষিতুল্য মানুষে পরিণত হন।

'বিসর্জন' কাব্যনাট্যের কাহিনী রাজর্ষি উপন্যাস থেকে সংগৃহীত। তৎকালীন হিন্দু সমাজে ধর্মের নামে যে পশু হত্যার প্রথা প্রচলিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিতে পারেন নি। রক্তপাত-হিংসা-দ্বেষের পথে যে ধর্মের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এই নাট্যকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ তাই তুলে ধরেছেন। জীবে দয়া ও প্রেমের অমোঘ বাণীই বিসর্জন নাটকের মূল লক্ষ্য।

৯. 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী-ব্যক্তিত্ব' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নারীদের কঠিন জীবনের রূঢ় সত্যকে ছোটগল্পে ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজ বাস্তবতাকে মূর্ত করেছেন। প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'দেনা-পাওনা'য় পণপ্রথার আবর্তে বলি হওয়া নিরুপমার বিবাহিত জীবনের যে দুঃসহ অভিজ্ঞতা তা আজও গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিষ্ঠুর অবয়ব। 'পোস্ট মাস্টার' গল্পে রতনের বিপন্ন সামাজিক অবস্থা তার স্বপ্ন আর আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলে ছিল। 'সুভা' গল্পে মানসিক ভারসাম্যহীন নির্বাক মেয়েটিকে বিয়ে দিতে দরিদ্র পিতার অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বিয়ে যদিওবা হয় সংসার টেকে না। 'শাস্তি' গল্পে দুই নারীর একজন খুন হয় অন্য জন মিথ্যা অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে খুনের আসামি।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের সিংহভাগ নারী চিত্রিত হয় সনাতনী ধারায়। আধুনিক চেতনাসম্পন্ন নারীর সংখ্যা হাতেগোনার মতো। তবে নারীচরিত্রের অধিকাংশই মনস্তত্ত্ব ও দর্শনগত দিক দিয়ে অনন্য এবং বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ নারীত্বের সম্মানকে কখনোই ধুলায় লুণ্ঠিত হতে দেননি। অত্যন্ত সচেতন ও সুনিপুণভাবে সেটা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। নারীকে তিনি সর্বপ্রথমে 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাই তার চেতনায় ধরা পড়েছে 'নারীমুক্তি' মানে 'মানবমুক্তি'।

১০. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? [২৮তম বিসিএস]

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ছোটগল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। তার প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে পদ্মাতীরবর্তী উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের জীবনই প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলিতে ভাব, বিষয় ও রূপকল্পে সম্পূর্ণ নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ পালাবদলের শুরু হয়েছে 'নষ্টনীড়' গল্পরচনার কাল থেকে। সবুজপত্রের পরেও রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন, তবে সে গল্পগুলিতে রবীন্দ্রমানসের প্রতিফলন ততটা নেই, যতটা তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটান বা আধুনিক গল্পকারদের প্রতিস্পর্ধিতার উত্তরদানের তৎপরতা। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *'বর্ষাযাপন'* কবিতায় বলেছেন-

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্ত সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

বাঙালি জীবনের ছোটখাট আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আনন্দ-বেদনার মৃদু স্বপ্ন কল্পনা ও সুকোমল বাস্তব স্পর্শ, অন্তরের সুকুমার কাব্যনির্যাস রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে কখনও কৌতুক স্নিগ্ধ, কখনও অশ্রু-করুণ পরিণতিতে ক্লান্ত অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করেছে। তাঁর গল্পে কয়েকটি চরিত্র ছাড়া সবাই সাধারণ নর-নারী। বেশিরভাগ গল্পে রয়েছে নারীপ্রধান কাহিনী কিংবা নারীর মনোস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। এছাড়া বালক বালিকার চরিত্রগুলো বিশেষ সার্থকতা বহন করে। তিনি গল্পে মানুষকে মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন, শ্রেণি হিসেবে নয়।

১১. রবীন্দ্রনাথ কত সালে কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। [২৭তম বিসিএস]

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'। গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদানকে বলে 'গীতাঞ্জলি'। এ কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৮ সালে পূজার ছুটিতে শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন

©Nazmus Sadat
CamScanner

ও ঠাকুর বাড়িতে অবস্থান করার সময় গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি লিখেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে পাঁচটি ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- ✓ ভগবানকে সহজে না পাবার জন্য হতাশ ভাব ও প্রবল বিরহ বেদনার অনুভূতি,
- ✓ অহংকার ত্যাগ করে দুঃখ বেদনার দাহে হৃদয়কে নির্মল করে ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করা ও তার দয়া প্রার্থনা,
- ✓ প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ রসে ভগবানের আভাস ও ক্ষণস্পর্শের অনুভূতি,
- ✓ দীন দরিদ্রের মধ্যে, হীন অস্পৃশ্যদের মধ্যে পতিত পাবন ভগবানের অবস্থান
- ✓ অসীম সসীমের লীলাতত্ত্বের অনুভূতি।

এ পর্বে কবির হৃদয় বৈষ্ণব ও সুফি রসে সিক্ত। ভাগবত প্রেম যেন শ্রাবণের দুকূল প্লাবিত স্রোতধারায় কবিচিত্তে প্রবাহিত। পাশাপাশি তাঁর মানবতাবাদ ও ঈশ্বরবন্দনা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে। তবে এ কাব্যগ্রন্থের ঈশ্বরবন্দনা কোন বিশেষ ধর্মানুসারে নয়। স্রষ্টার বিশালতায় সৃষ্টির প্রার্থনা নিবেদন মাত্র। ধর্ম আর দর্শনের গভীর সম্মিলন ঘটেছে এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে। এগুলো মূলত গান এবং বেশির ভাগের সুরারোপ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন।

১২. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কোন ধরনের গ্রন্থ? *[২৪তম বিসিএস]*
অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' কাব্য নাকি উপন্যাস?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। অথচ তিনি এর নাম দিয়েছেন শেষের কবিতা। এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ১৬টি কবিতা এবং মোট ৩৯৪টি কাব্যচরণ ব্যবহার করেছেন। এতে ব্যবহৃত কাব্যচরণ একটি কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য যথেষ্ট। এর ভাষা মাধুর্য হৃদয়ে গেঁথে থাকার মতো। একটা শব্দ আরেকটাকে ছুঁয়ে থাকার ব্যাকুলতা এখানে আছে এবং তা প্রথম থেকে একেবারে শেষ অব্দি বিরাজমান। এর গদ্যে রয়েছে কাব্যময়তা। গদ্যেও যে ছন্দময়তার ব্যাকুল-বিন্যাস থাকতে পারে তা রবিঠাকুর তার স্বভাবজাত কবিশক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এ উপন্যাসে। এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাষা, বিষয়বস্তু, ঘটনা পরম্পরায় মধুরতা, অন্বিসন্ধি এবং সংলাপ সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে কাব্যময়তা। তাই একে কাব্যপোন্যাসও বলা হয়। উপন্যাসটির যবনিকাপাত হয়েছে একটি কবিতা দিয়ে-

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।'

১৩. রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যের নাম কি? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ কাব্য 'শেষ লেখা'। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার 'অন্ত্যপর্ব'-এর অন্তর্গত সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এতে সর্বমোট পনেরোটি কবিতা রয়েছে। এ কাব্যের কবিতাগুলোতে বিচিত্র-বর্ণিল জীবনের অন্তিমে পৌঁছে কবির জীবন জিজ্ঞাসা, মৃত্যু চেতনা ছায়াপাত করেছে। কাব্যগ্রন্থটির বেশিরভাগ কবিতাই কবি শয্যাশায়ী অবস্থায় লিখেছেন। সর্বশেষ দুটি কবিতা তার মুখ থেকে শুনে অন্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে। শেষ দুটি কবিতার প্রথমটি 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবি পরে সংশোধন করে দিলেও সর্বশেষ রচনা 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটি সংশোধন করার সুযোগ পাননি। এমন কি এই গ্রন্থের নামকরণও রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেন নি।

১৪. রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি? *[২০তম বিসিএস]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩)। এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকলার জমিদার রামচন্দ্রের বিবাদকে উপজীব্য করে উপন্যাসটি রচিত হয়। এটি ভারতী পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। সৌদামিনী দেবীকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়। পরবর্তীতে এর কাহিনি নিয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন।

১৫. শেষের কবিতার তিনটি পঙ্‌ক্তি লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। উপন্যাস হলেও এতে অনেক কাব্যচরণ রয়েছে। এ উপন্যাসের শেষের তিনটি পঙ্‌ক্তি হলো-

'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।'

১৬. ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম? এই ছদ্মনামে কোন গ্রন্থটি রচিত হয়? *[১৭তম]*

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম 'ভানুসিংহ'। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও প্রথম যৌবনে 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে এগুলো ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতাগুলোই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

©Nazmus Sadat CamScanner

১৭. রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০)। এই গ্রন্থে মোট ১৫৭টি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলো ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ভক্তিমূলক রচনা। গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করা হয় বলে এর নাম 'গীতাঞ্জলি'। এতে গানে গানে স্রষ্টার প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছে। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রার পূর্বে তিনি অর্শ রোগে আক্রান্ত হলে পদ্মা নদীতে নৌকায় বিশ্রাম নিতে শুরু করেন। তখন তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যকে ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে ৫৩টি কবিতা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে গীতিমাল্য, নৈবদ্য, খেয়াসহ আরো নয়টি গ্রন্থ থেকে ৫০টি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সুস্থ হয়ে লন্ডনে পৌঁছে তিনি অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিটি তার ইংরেজ বন্ধু উইলিয়াম রোদেনস্টাইনকে দেন। কিছুদিন পরেই গ্রন্থটি ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক 'Song Offerings' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা লিখেন ইংরেজ কবি W.B. Yeats। ১৬ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ ভূমিকার সাথে রোদেনস্টাইন অংকিত কবির প্রতিকৃতির একটি পেন্সিল স্কেচ সংযোজন করা হয়। এ কাব্যের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ তার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধে বলেন, চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি। তার কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রদের কেবলই কিছু তথ্য প্রদান করা নয়; তথ্য নিয়ে ভাবতে শেখানো। শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ানো। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজস্ব শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন। তার মতে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক হবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। শিক্ষা কখনো পণ্য রূপে বিক্রি হতে পারে না। ছাত্রদের সম্পর্কে তার উপদেশ হলো দারিদ্র্য লজ্জার বিষয় নয় কিন্তু শৌখিনতাকে বর্জন করা ছাত্রদের কর্তব্য। ছাত্রদের দায়িত্ব হল অধ্যাপকদের ভক্তি করবে। মুখস্ত করার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ চৌর্যবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন। 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষার সঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে পরীক্ষা পাসের জন্য শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব রাখেন। এর ফলে জ্ঞান সহজেই তাদের চেতনার অংশ হয়ে উঠবে। অনেক সহজেই তার প্রয়োগ ঘটাতে পারবে।

CamScanner

১৯. রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীমুক্তি ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ফলে নর-নারীর মধ্যে যে চেতনার ব্যবধান ঘটেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ 'করুণা' উপন্যাস। সেইসঙ্গে প্রকৃত শিক্ষা বঞ্চিত নারীর ব্যক্তিত্বের অভাব, বাবার সম্পত্তিতে অনধিকার এবং অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে যে দুস্তর মানসিক ব্যবধান- এ বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। নারী শিক্ষা, তার উত্তরাধিকারের দাবি, বিধবাবিবাহ ও নারীর প্রেমের স্বাধীনতা- এসবকিছুই ব্যক্তি-নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির উপাদান, যা নিয়ে রচিত 'চোখের বালি' উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিধবা নারীর প্রেম ও তার দৈহিক আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে দামিনীকে রক্তমাংসের মানবী করে তুলেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীর মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরেছেন। আবার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ডায়েরি লেখার আঙ্গিকে অন্তঃপুরবাসিনী নারীর আত্ম-আবিষ্কারের গল্প বলেছেন। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন সচেতন নারী প্রেয় থেকে শ্রেয়র পথে যাত্রা করে। তার সৃষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যে নারী যেমন আত্মআবিষ্কার করেছে, তেমনি পুরুষও সেই দর্পণে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠেছে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রা প্রভাবিত করেছে সময়, সমাজ ও ব্যক্তিকে।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় কী কী শিরোনামে বক্তব্য দেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন দুই বার। ১৮৯৮ সালে প্রথম বার আসেন ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে। সম্মেলনটি হয়েছিল ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ। ১৯২৬ সালে দ্বিতীয় বার আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ঢাকাবাসীর আমন্ত্রণে। ১৯২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কার্জন হলে তাকে সংবর্ধনা দেয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জি. এইচ. ল্যাংলি। সংবর্ধনাপত্র পাঠ করেন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. আর সি মজুমদার। সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল- The meaning of Art। ১৩ ফেব্রুয়ারি কার্জন হলে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন। বিষয়বস্তু ছিল- The Rule of the Gaint। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিদায় দিনে জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে হল বার্ষিকী 'বাসন্তিকা'র জন্য একটি গান লিখে দেন। গানটি ছিল-

'এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায়, আমি এই গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।'

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের পরিচয় দিন।

উত্তর : 'ঘরে বাইরে' রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের মূল চরিত্র তিনটি- নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ। নিখিলেশ রাজবংশের যুবক অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারী, বিমলা সাধারণ ঘরের মেয়ে, সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের নেতা। স্বামী নিখিলেশের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও নায়িকা বিমলা বিপ্লবী সন্দীপের দ্বারা তীব্রভাবে আকর্ষিত। একদিকে বাইরে জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনা, অন্যদিকে তিনটি মানুষের জীবনে টানাপোড়েন- এই দুই দ্বন্দ্ব মিলে উপন্যাস। তিনজনের আত্মকথায় তাদের জীবনবোধ আর রাজনৈতিক বোধ প্রকাশ পেয়েছে প্রবলভাবে। তিনটি চরিত্র সেসময়কার বাংলার তিন ধরনের চিন্তা-বিশ্বাসের মানুষ। তাদের চিন্তা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য যেন সেই সময়ের বাংলাকেই প্রকাশ করছে। এছাড়া সব আন্দোলনের মত স্বদেশি আন্দোলনেরও বেশকিছু নেতিবাচক দিক ছিল, সেগুলো স্পষ্টভাবেই দেখা গেছে উপন্যাসে।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গীতিধর্মী উপন্যাসের পরিচয় লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতধর্মী উপন্যাস 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমিত রায়। ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিল। তার বন্ধুর চেয়ে বান্ধবীর সংখ্যাই বেশি ছিল। এদের মধ্যে কেতকীর সাথে প্রেম হয় ও আংটি পরায়। পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে অমিত শিলংয়ে বেড়াতে গেলে উপন্যাসের মূল নায়িকা লাবণ্যর সাথে পরিচয় হয়। অচিরেই বাস্তববাদী লাবণ্য বুঝতে পারে অমিত রোমান্টিক জগতের মানুষ, যার সঙ্গে প্রতিদিনের সংসারের হিসেব নিকেশ চলে না। তবু তাদের বিয়ের ক্ষণ ঠিক হয়। কিন্তু সেখানে কেতকী হাজির হলে ভেংগে যায় তাদের বিবাহ আয়োজন। শেষ পর্যন্ত অমিত-কেতকী সংসার শুরু করে, আর লাবণ্য গ্রহণ করে তার পিতার ছাত্র শোভনলালকে। এভাবে ব্যক্তি চরিত্রের দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসটি গীতিধর্মী মাত্রা পায়। উপন্যাসের কাব্যময় গদ্য ভাষা ছাড়াও এতে রয়েছে ১৬টি দীর্ঘ কবিতা। সব মিলিয়ে গীতির ছন্দ সুর অনুরণিত হয়ে উপন্যাস হয়ে ওঠে গীতিধর্মী।

২৩. 'চোখের বালি' উপন্যাসের উপজীব্য লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩)-র মূল আলোচ্য বিষয় সমাজ ও যুগযুগান্তরগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ। কাহিনিতে দেখা যায় নায়িকা বিনোদিনীর মহেন্দ্রর সাথে বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও মহেন্দ্র রাজি না হওয়ায় অন্যত্র বিয়ে হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই সে বিধবা হয়। পড়াশোনা করা সংস্কৃতিবান মেয়ে বিনোদিনী। ঘটনাচক্রে বিনোদিনী মহেন্দ্রদের

বাড়িতে আসলে তাকে দেখে মহেন্দ্র মুগ্ধ হয় এবং উপলব্ধি করে সমচেতনা সম্পন্ন জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা। উপন্যাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র- আশালতা, রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। এসকল নারী চরিত্র চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে অনন্য বিনোদিনীর স্বকীয়তা তুলে ধরেছেন। বিনোদিনী চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ বিহারী চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত জীবনের সকল কোলাহল এড়িয়ে কাশীর নির্লিপ্ত জীবনে নিক্ষেপ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে তো বটেই পুরো বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় চরিত্র বিনোদিনীও শেষ পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের কাছে হেরে যায়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব ও মানসিক টানাপড়েনই এ উপন্যাসের উপজীব্য।

২৪. গদ্য কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যজীবন ষাট বছরেরও অধিককাল বিস্তৃত। বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকতায়, প্রাচুর্যে এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের তুলনা। ১৯৩২ সালে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সাথে তাঁর কবিতার এক নতুন রূপ উপস্থাপিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থে তিনি পদ্যের নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভেঙে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রশস্ত করেন। ছন্দের বন্ধন মুক্ত করে তিনি গদ্য কবিতা রচনা শুরু করেন। গদ্য কবিতা লেখা হয় গদ্যের মতো করেই। গদ্যটি যখন কবিতার ভাব লাভ করে তখন গদ্যটি আর গদ্য না থেকে কবিতা হয়ে যায়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মন্তব্য এরকম-

> *'সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্যপদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন কিন্তু কৃতকার্য হননি। এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো বিরোধ ঘুচল।'*

গদ্য কবিতা ছন্দেবদ্ধ কবিতা থেকে একদম আলাদা কিছু নয়, শুধু মাত্রাগত ছন্দের মুক্তি। গদ্য কবিতা বলতে যে ধরনের রচনাকে বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তার 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' কাব্যে তা ব্যবহার করেছেন। গদ্যছন্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায় 'শেষ সপ্তক' কাব্যে। ভাব-ভাষা-ছন্দ আঙ্গিক সবই এখানে বিষয়ানুযায়ী সার্থকতা লাভ করেছে। 'শেষ সপ্তক'-এ উৎকর্ষতার চরমে উঠেও 'শ্যামলী'তে এসে নিচে নেমে যায়। গদ্য কবিতা লিখে সফলতা অর্জন করলেও 'শ্যামলী'র পর রবীন্দ্রনাথ আর এ ছন্দে কাব্য লেখেননি।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য 'মানসী' (১২৯৭)। মানসীতে রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার পূর্ণ উদয় হয়েছে। কবির মানস প্রিয়ার প্রতি তার প্রেম নিবেদন ও প্রেমের সংশয় সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদময় বিচিত্র লীলাই 'মানসী'র প্রধান বিষয়বস্তু। 'মানসী'র কবিতাগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করলে প্রেম, প্রকৃতি বিষয়ক, দেশের অবস্থা সম্পর্কে কবির

মনোভাব, বিরুদ্ধ সমালোচনায় কবি মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ক কবিতা পাওয়া যায়। মানসীতে রবীন্দ্রনাথ স্থিত যে- প্রেম অসীম, অনন্তের ধন, আত্মার সম্পদ, দেহের সীমায় তাকে ধরা যায় না। 'ভৈরবী গান' কবিতায় বলেছেন- কর্মকুণ্ঠা, আত্মশক্তিতে অবিশ্বস্ত ও নৈরাশ্যে কোন উদ্দেশ্য সফল হয় না। 'বিদায়', 'সন্ধ্যায়', 'শেষ উপহার' কবিতায় মানসীর সৌন্দর্য বিষয়ক চূড়ান্ত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। কবির মানসী চির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানলোকে বাস করে। মূলত মানসী প্রিয়া নির্বিশেষে রূপ নিয়েছে মানসী কাব্যে। এটাই রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ এক সুর। এ সুরই সুন্দরভাবে 'মানসী' কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে।

২৬. 'মানসী' কাব্যকে রবীন্দ্রনাথের অনুবিশ্ব বলা হয় কেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ যৌবনে লেখা কবিতাগুচ্ছ একত্র করে 'মানসী' নামে প্রকাশিত হয়। মানসী কাব্যের মূল সুর প্রেম ও প্রকৃতি। বিষয়বস্তুর গভীরতায় বুদ্ধদেব বসু 'মানসী' কাব্যকে রবীন্দ্র কাব্য সাধনার অনুবিশ্ব বলে অভিহিত করেন। মানসী রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা পর্বের শেষ কাব্য। এ কাব্যের কবিতা কোন নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে আবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বারের মত মানসী কাব্যের মধ্যকার কবিতার মাত্রা গুনে, কানে শুনে, তাল বোধের দ্বারা কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। এটি বাংলা ছন্দে তার একটি বিশেষ অবদান। মানসীতে কবির চিন্তাশক্তি পরিপুষ্ট হয়েছে। তিনি দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহ সুনিপুণভাবে এবং সমতার সঙ্গে চিত্রায়ন করেছেন। 'মানসী' কাব্যে যে প্রেম ও নারী ভাবনা, নিসর্গচেতনা, দৈশিক ও বিশ্ববোধ উন্মোচিত হয়েছে, মানসীর পূর্বের কাব্যগুলোতে তেমনটি দেখা যায় না। 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত কোথাও কোথাও ভাষার মধ্যে আড়ষ্টতা আছে। কিন্তু মানসীতে এসে তা থেকে অনেকটা পরিমার্জিত রূপ লাভ করে। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষার প্রধান গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য মানসীর মাধ্যমেই জন্মলাভ করে। সার্বিক বিবেচনায় বিশেষজ্ঞগণ 'মানসী'কে রবীন্দ্র কাব্যের অনুবিশ্ব বলা যায়

২৭. 'সোনার তরী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাবনা তুলে ধরুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'সোনার তরী'। এ কাব্যে জগত ও জীবনের প্রতি কবির দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। বর্ষাকালে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় একজন কৃষক ধান নিয়ে দ্বীপের মত একটি জায়গায় বসে আছে। এ ধান নেওয়ার জন্য নৌকা দরকার। এমন সময় এক মাঝি নৌকা নিয়ে আসে। কৃষকের অনুরোধে সে ধান নিতে রাজি হলেও ছোট নৌকায় কৃষকের জায়গা হয় না। ফসল তীরে পৌছলেও পৌছতে পারে না কৃষক নিজে। এই বর্ণনাকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়- মাঝি হল মহাকালের প্রতীক আর বাঁকা

জল সময়ের প্রতীক। মহাকালের চিরন্তন স্রোতে মানুষ অনিবার্য মৃত্যু বা মহাকালে হারিয়ে যাওয়া এড়িয়ে যেতে পারে না। কেবল টিকে থাকে তার সৃষ্ট কর্ম বা সোনার ফসল। একইভাবে কবির সৃষ্টিকর্ম ধরাতে স্থান পেলেও ব্যক্তি কবির স্থান সেখানে হয় না। এ অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনিবার্যভাবে মহাকালের শূন্যতায় বিলীন হওয়ার জন্য।

২৮. রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যটির বিশেষত্ব লিখুন।

উত্তর : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ' গদ্য কবিতার আঙ্গিকে রচিত। এতে তিনি পদ্যের ছন্দের বন্ধন ভাঙলেন। ছন্দের বন্ধন যেন তাঁর কবিতাকে এতদিন সম্ভ্রান্ত ও সুসংস্কৃত রেখেছিল। এবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা নেমে এল সাধারণের জীবন প্রাঙ্গণে। কবি মনে করলেন এ পর্যন্ত যা রচনা করেছেন তাতে আধ্যাত্মলোকের কথা আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা নেই। সুতরাং আজ যা লিখতে হবে তা একান্তভাবেই সাধারণের কথা। কাব্যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন, তাদের জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যবহারিক জিনিস, নিতান্ত ক্ষুদ্র পোকা-মাকড় ইত্যাদিকেও কাব্যে স্বাচ্ছন্দ্যে স্থান দিলেন। এই কাব্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ব্যক্ত করলেন 'কোপাই' নদীর ভাষা বর্ণনার মধ্য দিয়ে-

ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা
ওকে সাধু ভাষা বলে না
জলস্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

'পুনশ্চ' কাব্যে রয়েছে ছোট-বড় পঙক্তি মিশানো ছোট গল্পের আমেজসমৃদ্ধ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্য কবিতা। গদ্যছন্দের আদলে তিনি গল্পধর্মী কবিতা লিখেছেন যা গল্পধাঁচে লেখা সত্ত্বেও গল্প না হয়ে কবিতাই হয়ে উঠেছে।

২৯. বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপকার। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, প্রহসন- সব ধারায় তার বিচরণ। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের সংশয়-দ্বন্দ্বে পড়ে ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট মূল্যবোধ তথা অধ্যাত্মবিশ্বাসের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর নাটকে। নাটকের শৈলী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি সারা জীবনই পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। 'নটীর পূজা' নাটকে প্রথম অভিনয়ের সঙ্গে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটান। বিদেশি নাটকের প্রভাব থাকলেও, তাঁর নাটক তাঁর গানের মতোই স্বকীয়তায় ভাস্বর। তার প্রতিভা বিরল-বহুমুখী, কারণ নাটক রচনায় উচ্চাঙ্গের সাফল্য অর্জনের সমান্তরালে তিনি ছিলেন সার্থক নাট্যনির্দেশক, নাট্যসমালোচক, নাট্য-অধিকর্তা, নাট্য-প্রশিক্ষক, নাট্য-অভিনেতা ও নেপথ্য

©Nazmus Sadat CamScanner

নাট্যকুশলী। নাটকের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সময়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন আস্থার আশ্রয়।

৩০. 'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'রক্তকরবী' একটি সাংকেতিক নাটক। এর কাহিনি গড়ে উঠেছে খনি শ্রমিকদের নিয়ে। যক্ষপুরীর রাজার অর্থলোভের বলি সোনার খনির শ্রমিকেরা। রাজার দৃষ্টিতে শ্রমিকেরা স্বর্ণলাভের যন্ত্র। অন্যদিকে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক নন্দিনী সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রাজাও নন্দিনীকে পেতে চায় শক্তি দিয়ে কর্তৃত্ব আরোপ করে। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য এভাবে লাভ করা যায় না। সমাজ নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষাই 'রক্তকরবী' নাটকের মূল উপজীব্য। এ নাটকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে শ্রেণি চরিত্র, মানবজীবনের বন্ধন ও মুক্তির সংঘাত রাজা ও নন্দিনীর বিপরীতমুখী চরিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। নায়িকা নন্দিনীর প্রতীক্ষা কিশোরের জন্য। আসলে কিশোর বলে কোন চরিত্র নেই, কিশোর হচ্ছে স্বাধীনতা, মুক্তি। এই নাটকে রূপায়িত হয়েছে মানুষের লোভ কিভাবে জীবনের সব সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে তথা নিছক যন্ত্রে পরিণত করে। নাটকের রূপকাশ্রিত সংলাপ ও দার্শনিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার রূপকের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। নাটকের শিল্পসৌন্দর্য, কথার অপূর্ব ভঙ্গিমা, ভাষার সরল সৌন্দর্য 'রক্তকরবী'কে যুগোত্তীর্ণ করছে।

৩১. রূপক নাটক হিসেবে 'ডাকঘর' নাটকের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : রূপক ও সাংকেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অভিনব সৃষ্টি। এ জাতীয় নাটক তাঁর পূর্বে বা পরে রচিত হয় নাই। 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল। অমল অসুস্থতার কারণে ঘরবন্দী। কবিরাজের নির্দেশ মত তাকে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ঘরে থাকতে হয়। কিন্তু তার মন চার দেওয়ালের গণ্ডি পার হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়তে চায়। সে অপেক্ষা করতে থাকে তার নামে রাজার চিঠি আসবে। একদিন রাজকবিরাজ এসে দরজা জানালা খোলার নির্দেশ দেয়। দরজা জানালাগুলি খুলে দেওয়ার সাথে সাথে অমল সুস্থবোধ করে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। অমল এখানে মানবাত্মার প্রতীক। আত্মা চায় মুক্তি। সে অপেক্ষা করতে থাকে রাজা বা অরূপের সাথে মেলার জন্য। এখানে ঘুম বা মৃত্যু তথা মুক্তির প্রতীক। মৃত্যু পূর্ণতায় পৌছানোর সোপান। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটে। নাটকের নামকরণেও রূপকের ব্যবহার রয়েছে। এখানে 'ডাকঘর' হল বিপুল বিচিত্র পৃথিবী তথা বিশ্বপ্রকৃতি। চিঠি যেন সৌন্দর্য্য ও আনন্দ

রূপের প্রতীক। সুতরাং দেখা যায় সমস্ত নাটকেই রূপকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ রুদ্ধ ও বদ্ধ জীবন থেকে আনন্দ-সৌন্দর্য্য- মুক্তির বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। রূপকের স্পর্শে নাটকটি যথার্থই রূপক নাটক হয়ে উঠেছে।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইসব প্রবন্ধে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। তার সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে 'সমাজ' (১৯০৮) সংকলনে। রাজনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ 'কালান্তর' (১৯৩৭)। ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'ইতিহাস' (১৯৫৫) ইত্যাদি গ্রন্থে। 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩) গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ধ্রুপদি ভারতীয় সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন যথাক্রমে 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) ও 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থ দুটিতে। 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) প্রবন্ধমালায় তিনি আলোচনা করেছেন বাংলা লোকসাহিত্যের প্রকৃতি। ভাষাতত্ত্ব চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ রয়েছে 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯), 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) ইত্যাদি গ্রন্থে। ছন্দ ও সংগীত নিয়ে আলোচনা যথাক্রমে 'ছন্দ' (১৯৩৬) ও 'সংগীতচিন্তা' (১৯৬৬) গ্রন্থে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন 'শিক্ষা' (১৯০৮) প্রবন্ধমালায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) নামে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৩৩. 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : কালান্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনে রচিত একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলন। এ গ্রন্থে সর্বমোট ৩২টি প্রবন্ধ রয়েছে। এতে সমাজ-রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষা, হিন্দু-মুসলমান সংকটসহ বিবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, ইংরেজ বনাম ভারতবর্ষ এবং সমকালীন দেশীয় সমস্যাসমূহের মূল উদঘাটন ও এর সমাধানের সুস্পষ্ট পথনির্দেশই রবীন্দ্রনাথের কালান্তরের মূল উদ্দেশ্য। এতে শিক্ষা বিষয়ক অভিমত তাৎপর্যবহ। এসব প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন-

'তার চিন্তার শ্রেণিকরণ দুঃসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।'

একাধিক প্রবন্ধে একই বিষয় আলোচিত হয়েছে। আবার একই প্রবন্ধে একাধিক প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে। বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবন্ধগুলোকে ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়- ১. হিন্দু-মুসলিম সমস্যা; ২. ভারতবাসী ও ইংরেজ; ৩. ইউরোপীয় সভ্যতা; ৪. ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজ; ৫. শিক্ষা: ৬. বিবিধ পর্যায়ের।

CamScanner

৩৪. 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রবন্ধে বিষয় বা বস্তুভাব অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভাব বা বিষয়ের গৌরবই প্রধান হয়ে উঠেছে। এর প্রবন্ধগুলোর মূল বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনার রস সম্ভোগে। আপাতদৃষ্টিতে এ সকল প্রবন্ধে ভাব বা বিষয়ের শৈথিল্য, অসংলগ্নতা অর্থাৎ প্রসঙ্গচ্যুতি মনে হলেও একটি কেন্দ্রীয় ভাব সর্বদাই প্রবন্ধের সৌষ্ঠব গঠনে সহায়ক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দিব্য লেখনী স্পর্শে বিচিত্র প্রবন্ধের রচনাসমূহ কবিমনের আবেগ সংরাগে শুচিত হয়ে এক বিস্ময়কর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এক বিচিত্র রসামৃত দান করে তাকে অধিকতর সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। যে ভাষার প্রবন্ধ সাহিত্যে কেবল ক্ষীণধ্বনি একতারার সুর বাজত, তাতে কবি বীণাযন্ত্রের বিচিত্র সুর সংযোগ করে বিশ্বজগতে পরিবেশনের যোগ্য ক্ষমতা দান করেছেন। রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাতে তার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৩৫. 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের সভ্যতার সংকট সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট'। এ প্রবন্ধে তিনি সভ্যতার সৃষ্ট সংকট সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি, চিন্তা ও অভিমত অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও সত্য ভাষণে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে সভ্যতার জনক হিসেবে ইংরেজদের সম্মানের আসন দিয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে এসে ইংরেজ সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ভেঙে যায়। ইংরেজ সভ্যতা প্রথম থেকেই নিজের স্বার্থকে অন্বেষণ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তারা মানব কল্যাণে ব্যবহার না করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। শক্তি ও সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের যাতাকলে পড়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অভাবে চরম দারিদ্র্য ভোগ করছে। নিজের দেশ, জাতির মুক্তি সাধন করবে বলে যে সভ্যতাকে একদিন প্রাবন্ধিক গ্রহণ করেছিলেন, সে সভ্যতায় মানব মুক্তির উপাদান নেই। তাই প্রাবন্ধিক বিদেশি সভ্যতার আওতামুক্ত এক নতুন সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছেন।

৩৬. বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম শাখা ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সূচনা হয়। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী'। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখা শুরু করার আগে জমিদারি দেখাশোনার জন্য শাহজাদপুর ও শিলাইদহে ছিলেন। ছোটগল্পে সে সব মানুষের সুখ-দুঃখের কথাকেই নিতান্ত সহজ সরল ভাষায়

আপন মনের সৌন্দর্য মিশিয়ে তুলে ধরেছেন। গীতিময়তা তার ছোটগল্পে প্রবলভাবে উপস্থিত। সাধারণ বাস্তবতা ও ব্যক্তি মানুষের অন্তবেদনার এক মনোরম বহিঃপ্রকাশ তার ছোটগল্প। একজন সার্থক শিল্পীর মতো জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের অনুভূতির সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শিল্পিত করেছেন। পল্লি বাংলায় বেড়ে ওঠা অতি সাধারণভাবে জনমানুষের চিত্র আঁকা হয়েছে। তার ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলো আমাদের সদাজাগ্রত চিরচেনা জগতের বাসিন্দা, আমাদের একান্ত আপনজন। গ্রাম্য বিধবা, গৃহবধূ, কুমারী, বাল্যবধূ, তরুণী প্রমুখ চরিত্রের সমাবেশ গল্পগুলো অবিসংবেদীরূপে প্রত্যক্ষধর্মী হয়ে উঠেছে। বাঙালি নারী সমাজের নিপীড়নের নানা চিত্র শিল্পিত রূপে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই স্বমহিমায় ভাস্বর।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

উত্তর : উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরে (১৮৯১-১৯৩৩) প্রায় নব্বইয়ের অধিক গল্প রচনা করেছেন। প্রকাশকাল এবং চরিত্রলক্ষণের দিক থেকে গল্পগুলোকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যাস করা যায়-

ক. উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত গল্প (১৮৯১-১৯০০): এ পর্বে রচিত গল্পের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'পোস্টমাস্টার', 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'কাবুলিওয়ালা', 'অধ্যাপক' ইত্যাদি। এ পর্বের গল্পগুলো পল্লিকেন্দ্রিক এবং এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের হৃদয়রহস্য ও মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ঐকাত্ম্য। পদ্মা-তীরবর্তী পূর্ব বাংলার প্রকৃতি রবীন্দ্রচেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক।

খ. বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী গল্প (১৯০১-১৯১৩): এ পর্বে রচিত ষোলোটি গল্পের মধ্যে রয়েছে- 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'নষ্টনীড়', 'মাল্যদান', 'গুপ্তধন', 'পণরক্ষা' ইত্যাদি। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার মোহন জগৎ ছেড়ে ক্রমশ বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রেখেছেন। শহর-অভিমুখী হয়েছেন এবং মূল শিল্প উপাদান হিসেবে নির্বাচন করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্তজীবন।

গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প (১৯১৪-১৯৩৩): এ পর্বের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথা ও সমষ্টির সংঘর্ষ এবং সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। এ পর্বের প্রধান গল্পগুলো হলো- 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি।

©Nazmus Sadat CamScanner

৩৮.রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে কি গীতিধর্মী বলা যায়?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লিপিকা'র গল্পগুলোকে বলেছেন 'কথিকা'। এমনকি পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায়ও লিপিকার রচনাগুলোকে তাঁর 'প্রথম গদ্যকবিতা লেখার চেষ্টা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনেকটা কবিতার ধাঁচে লেখা হলেও এগুলোর মধ্যে গল্প আছে। আর সমালোচকরা পরবর্তীকালে রচনাগুলোকে গল্প হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে কাব্যধর্মিতা থাকলেও গীতিধর্মিতা নেই। কারণ তার গল্পে বাস্তবের অভাব নেই। দেখা এবং উপলব্ধি যার মধ্যে রয়েছে নিজের অভিজ্ঞতা, তাছাড়া তাঁর গল্পেই বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথমবারের মত ধরা পড়েছে। সেই বাস্তবতা কবির গভীর উপলব্ধির ছোঁয়া লেগে রসে রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং আমাদের মর্মে সাড়া দেয়। সহজ সরল স্বচ্ছ আবেগও আমাদের অন্তরের গহনে প্রবেশ করে। ফলে রবীন্দ্রনাথের গল্প বাস্তবতার কারণে ব্যক্তি থেকে বিশ্বব্যাপী হয়ে মিলিয়ে যায়। তাই বিশেষজ্ঞগণের মতে তাঁর গল্পে গীতিধর্মিতা নেই।

৩৯.রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানবজীবনের বৈচিত্র্য সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেই প্রথম বিভিন্ন বিত্ত, শ্রেণি ও বয়সের নর-নারী, বালকবালিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, বৈচিত্র্যের বিচারেও তাঁর ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রীরা বিস্ময়কর। এদের মধ্যে বাদাওনের নবাবকন্যা হতে হতভাগ্য রাইচরণ, শানিয়াড়ি ও নয়ানজোড়ের বাবুগণ হতে দিনমজুর পরিবারের নর-নারী সকলেই আছে। রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ শ্রেণি বা বৃত্তির মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নি। আপন জ্ঞানের পরিধির মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই লিখে গেছেন। মধ্যবিত্ত স্তরের গল্পই সংখ্যায় বেশি, কারণ ঐ অংশটাই শিল্পীর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে অধিকতর উজ্জ্বল। পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলো সমধিক উজ্জ্বল। সুরবালা, অনিলা, রতন, চন্দরা, মৃন্ময়ী প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে নারীর শক্তি ও বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। পুরুষ চরিত্রগুলোর স্বার্থপরতাই চোখে পড়ে। যেসব মানুষ সভাস্থলে কথা বলতে পারে না, লোক সমাজে যারা উপেক্ষিত, পৃথিবীতে যারা একান্ত অনাবশ্যক বোধ হয়, রবীন্দ্র গল্প সেইসব নারী-পুরুষের সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা ও আত্মবিসর্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪০. 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের অতিপ্রাকৃত উপাদান সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : অতিপ্রাকৃত গল্প বলতে সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত গল্পকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত অতিপ্রাকৃত গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। গল্পের কথক মাশুল আদায়ের কাজে নিযুক্ত হলে সে রহস্যে ঘেরা এক প্রাসাদে আশ্রয় নেয়। আড়াই শ' বছর আগে নির্মাণ করা প্রাসাদটিতে শত শত যুবতীকে নিয়ে প্রমোদ শেষে হত্যা করা হতো। প্রাসাদে দিনের পর দিন সংঘটিত ভোগবিলাসের পৈশাচিক চিত্র রাতের

অন্ধকারে জাগ্রত হয়ে উঠে। সে প্রাসাদের সামনে বসা থাকলে সিড়িতে অনেক নারীর পায়ের শব্দ শোনা যায়, পেছনে ফিরলে কাউকে দেখা যায় না। গাঢ় অন্ধকারে প্রাসাদের মধ্যে অনেক মানুষের জলসা বসে। কিন্তু কোন মানুষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে সারারাত প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নৃত্য গীতের ঝংকার, নারীর পদধ্বনি, হাস্যকলরব শুনতে পাওয়া যায়। যে সেখানে একাধিক রাত যাপন করেছে তারই শরীর মন অল্পে অল্পে সেই প্রাসাদের মোহ গ্রাসে জীর্ণ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে একটা অতি প্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অতীতচারী হয়ে রাজা বাদশাদের ভোগ বিলাস ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করেছেন ও তাদের হাতে বলী হওয়া নারীদের দুঃখ ব্যাথাকে অনুভব করেছেন।

৪১. রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের মূল বক্তব্য লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কাবুলীওয়ালা' (১৮৯২) একটি ছোটগল্প। গল্পের প্রধান দুই চরিত্র রহমত এবং মিনি। রহমত আফগান থেকে আসা এক ফল বিক্রেতা আর মিনি ছোট এক বাঙালি মেয়ে। রহমত আফগানের কাবুল এলাকা থেকে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসে। কাবুলে তার স্ত্রী আর ছোট এক মেয়েকে রেখে আসে। মিনিকে দেখে তার মেয়ের কথা মনে পরে। তাই মিনিকে সে মেয়ের মতোই আদর করে। রহমতের থলের ভেতরে মিনির জন্য থাকত বাদাম, কিসমিস, আকরোট। আর সেই সুবাদে মিনির সঙ্গে নিয়মিত বাক্যালাপ এবং দেখাশোনা হতো। এ সম্পর্কের ছন্দপতন ঘটে যখন রহমত মারামারি করে জেলহাজতে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই রহমত মিনির খোঁজে আসে। ততদিনে মিনি বড় হয়ে গেছে। আর সেদিনই ছিল মিনির বিয়ে। সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বধূ সাজে মিনিকে রহমতের সামনে হাজির করা হয়। রহমত অপলক নেত্রে মিনির দিকে তাকিয়ে থাকে। অপূর্ণতার একটা রেশ টেনে ধরে রেখে এখানেই রবীন্দ্রনাথ গল্পের ইতি টানেন।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের মূলবক্তব্য লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের অনন্য ছোটগল্প 'ছুটি'। গল্পের চরিত্র ফটিক গ্রাম্য এক দূরন্ত বালক। যার জ্বালায় অতিষ্ঠ তার মা। শহর থেকে তার মামা বিশ্বম্ভর বাবু এলে ভাগ্নের এই অবস্থা দেখে তার সুন্দর একটি ভবিষ্যতের জন্য তাকে কলকাতায় নিয়ে যায়। কিন্তু মামী তাকে গ্রহণ করে না। গেঁয়ো ভূত বলে খোটা দেয়। মামাত ভাই-বোনরাও তাকে এড়িয়ে চলে। কেউ তার সাথে মিশে না। মামী বই কিনে দেয় না। বই না থাকায় স্কুলে মার খায়। পড়া না পারায় আবার মার খায়। ইট সুড়কির নাগরিক শহরে মারাত্মক অবহেলায় ফটিক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মামাকে বলে বাড়ি যাবে। মামা সামনের পূজোর ছুটিতে বাড়ি নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ততদিন

তার তর সয় না। গা পোড়া জ্বর নিয়ে কাউকে না বলেই সে বের হয়ে যায় বাড়ির উদ্দেশ্যে। মামা খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। গ্রাম থেকে তার মা আসে। পরে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। মায়ের কোলে মাথা রেখে সে বলে, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক ছোঁয়ায় গ্রাম্য বালকের শহরে অবাঞ্চিত হয়ে চিরজনমের তরে ছুটি নেওয়ার করুণ চিত্র ফুটে ওঠে মানস ক্যানভাসে। লেখক দেখিয়েছেন মানুষের মনের স্বাধীনতাই আসল। মনের মৃত্যু, দৈহিক মৃত্যু ঘটাতে পারে।

৪৩. ভ্রমণ কাহিনি হিসেবে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' কতটা সফল লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। ইউরোপের বিবিধ বিষয়ের অবতারণায় ভ্রমণ কাহিনিটি সমৃদ্ধ। লেখকের অতি বিচক্ষণ বর্ণনায় ভ্রমণ কাহিনির সাথে সাথে ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির কথা এসেছে। উঠে এসেছে দর্শনালোচনা, তত্ত্বকথা, কোথাও লঘু প্রলেপে গভীর জ্ঞানান্বেষণ। ইউরোপের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও বিত্তের মানুষের বিভাজন ও মানসিকতার পার্থক্য। কাহিনিতে রয়েছে অনবদ্য রসবোধ যা পাঠককে কখনো ক্লান্ত করে না। পত্রাকারে লিখিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ভ্রমণ কাহিনি হয়েও তা ভ্রাম্যমাণ ডায়ারি জাতীয় রচনা। সন তারিখ চিহ্নিত ডায়ারির প্রত্যক্ষতা রচনায় গায়ে সেঁটে দেওয়া আছে। পত্রগুলোর মধ্যে একটি পারস্পরিক বিষয়গত ঐক্য লক্ষ করা যায়। ফলে পত্রসমূহতে পরস্পরের পরিপূরক এবং বক্তব্য বিষয়ের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবহমান। ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক ভারতবর্ষের প্রসঙ্গও এনেছেন। বিষয়ানুসারে ভাষার সাবলীলতা, বাহুল্যবর্জন, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সূক্ষ্মতা, সহজ সরল উপস্থাপনা সব মিলিয়ে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' সুলিখিত ভ্রমণ কাহিনির মর্যাদায় অভিষিক্ত।

৪৪. 'ছিন্নপত্রের' চিঠিগুলো রবীন্দ্রনাথ কাদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের অন্যতম শাখা পত্রসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্র সংকলন তিনটি- ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে। এর মধ্যে 'ছিন্নপত্রে' (১৯১২) মোট ১৫৩টি পত্র আছে। এর প্রথম ৮টি পত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এবং ১৪৫টি পত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ১৮৮৭-১৮৯৫ সালের মধ্যে লিখিত চিঠিগুলো (সব চিঠি নয়) ইন্দিরা দেবী দুটি খাতায় স্বহস্তে লিখে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। এই খাতা দুটি অবলম্বনে ছিন্নপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে' প্রকৃতি ও নিঃসর্গের পাশাপাশি বাংলার দুঃস্থ মানুষের জীবনগাঁথাও সমানভাবে উজ্জ্বল। তিনি পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থান শিলাইদহ-পতিসর ও শাহজাদপুরের সাধারণ মানুষের বর্ণিল জীবন চিত্রকলার মতো উপস্থাপন করেছেন। মূলত 'ছিন্নপত্রে'ই বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়।

CamScanner

রশীদ করীম

১. রশীদ করীমের চারটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : রশীদ করিমের উপন্যাস- উত্তম পুরুষ (১৯৬১), আমার যত গ্লানি (১৯৭৩), প্রেম একটি লাল গোলাপ (১৯৭৮), লাঞ্চবক্স (১৯৯৩)।

'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১) উপন্যাসটি দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত। এতে চল্লিশের দশকের কলকাতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একই সাথে কলকাতার হিন্দু-মুসলিম আন্তঃসম্পর্কের চালচিত্র উদঘাটিত হয়েছে।

'আমার যত গ্লানি' উপন্যাসে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যকার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭০ এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নির্বাচন, গণপরিষদের অধিবেশন, ৭ই মার্চের ভাষণ, যুদ্ধের কবলে দেশ ও জাতি- এ বিষয়গুলো মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মননে কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই ধারাবাহিক ছবির নির্যাস এ উপন্যাস।

'প্রেম একটি লাল গোলাপ' (১৯৭৮) উপন্যাসের কাহিনি স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বিকাশমান ঢাকা শহরের এলিট শ্রেণিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নায়ক উমর এবং জেনারেল ম্যানেজার প্রতিনায়ক সুফি এবং উমরের স্ত্রী রানু এ তিনটি চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুর্জোয়ার অবক্ষয়িত দিকটি রশীদ করীম সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'লাঞ্চবক্স' (১৯৯৩) উপন্যাসের পটভূমি একটি ট্রেন। ট্রেনে নায়ক চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসছেন। পথিমধ্যে বেয়ারা নায়কের টেবিলের ওপর একটি লাঞ্চবক্স রেখে যায়। এর সূত্র ধরেই কাহিনী আগায়। এছাড়া উপন্যাসে পঁচাত্তর-পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এসেছে। এসেছে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রটি নিজের সবুজ রংটি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে সে আশংকাও!

২. 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করুন।

উত্তর : রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১) উপন্যাসটি দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসে চল্লিশের দশকের কলকাতার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে একদিকে যেমন শাকের, সলিল, শেখর, সেলিনা, অনিমার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম আন্তঃসম্পর্কের চালচিত্র উদঘাটিত হয়, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমাতঙ্কের মধ্যে কাল কাটানো অর্থনৈতিক মন্দাগ্রস্ত মানুষের অবয়বও স্পষ্ট। দেশভাগ দরজায় কড়া নাড়ছে, রাজনীতিতে মুসলিম লীগ নিজেদের দাবীকে বাঙালি মুসলমান মানসে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছে। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব বড় আকারে দেখা দিচ্ছে। দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিগত বৈষম্য, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের অন্দরমহলের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও দেশ বিভাগের ঠিক আগে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের

©Nazmus Sadat
CamScanner

সামগ্রিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। শাকেরের ছোট বেলায় ঈদের আগের দিনের বর্ণনার মধ্যে আশির দশক আগের কলকতার মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি প্রতিচ্ছবি আছে। কলকাতার আলো বাতাস, পথ ঘাট, মানুষজন এ উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। পুরো উপন্যাসের কাহিনি কলকাতাকে ঘিরেই।

রামমোহন রায়

১. বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন রায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষাকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় শাণিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুলেছেন। তাঁর গদ্য সুগঠিত, গতি তীক্ষ্ণ ও যৌক্তিক। কী করে বাংলা গদ্য লিখতে ও পড়তে হয় তাও যেন বাঙালি জাতিকে হাত ধরে শেখালেন। বাংলা গদ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। উচ্চতর চিন্তা ও ভাবকল্পনার বাহন হওয়ার মত গদ্য তিনি রচনা করেন। তিনিই প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের অনুশীলন করেন। তিনি বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুললেন। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গৌড়ীয় ব্যাকরণ তারই হাতে রচিত। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, পথ্যপ্রদান। এছাড়া তিনি বাংলা, ইংরেজী ও ফারসি এ তিন ভাষায় তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এভাবে ব্যাকরণ, শাস্ত্রাদি ও বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা গদ্য বিকাশে তিনি অনস্বীকার্য অবদান রেখেছেন।

২. সতীদাহ প্রথা নিয়ে রামমোহন রায়ের কলমযুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সতীদাহ প্রথা বিলোপের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন রাজা রামমোহন রায়। তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রথা অনুযায়ী হিন্দু বিধবাদের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারার বিধান ছিল। ভয়ানক এই প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেন রাজা রামমোহন রায়। বিভিন্ন শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে ১৮১৭ সালে তিনি 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি বোঝালেন হিন্দু ধর্মের কোন গ্রন্থে সতীদাহের উল্লেখ নেই। রামমোহন রায়ের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হতেই ধর্মীয় রক্ষণশীল সমাজ চরম বিরোধীতা করে। ১৮১৯ সালে রক্ষণশীল হিন্দুরা 'বিধায়ক' নামে পুস্তিকায় রামমোহনের বক্তব্যের বিরোধিতা করলে, তিনি যুক্তিগুলো খন্ডন করে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশ করেন। 'সংবাদ কৌমুদি' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেন। পরে আরও কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি পুস্তিকা প্রকাশ করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং সতীদাহ প্রথা রদ আইন পাশ করেন।

CamScanner

রিজিয়া রহমান

১. 'বং থেকে বাংলা' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'বং থেকে বাংলা'। রিজিয়া রহমান এ উপন্যাসে তুলে এনেছেন শতাব্দী পরম্পরায় প্রবহমান এই ব-দ্বীপের অবহেলিত উপেক্ষিত অধিকারহীন মানুষের যাপিত জীবন, আর সে সূত্রেই এ উপন্যাসে উঠে এসেছে বাঙালি জাতি গঠনের অতীত ইতিহাস। উপন্যাসটি সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের মন্তব্য- বাংলাদেশের জাতিগঠন ও ভাষার বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসের সৃষ্টি। আড়াই হাজার বছর আগে বং গোত্র থেকে শুরু করে উনিশশ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিব্যাপ্তির মধ্যে এ উপন্যাসের কাহিনিবিন্যাস করা হয়েছে। বাংলার সিংহাসন চিরকাল বিদেশি ক্ষমতালিপ্সু এবং সম্পদ লোভীর দ্বারা শাসিত হয়েছে। জাতি হিসেবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মর্যাদা তারা কোনদিন পায়নি। 'বং থেকে বাংলা' যেমন একদিকে ইতিহাসের সঙ্গে সেই কথাটিই প্রকাশ করেছে, তেমনি করে সুদীর্ঘ দিনে যেভাবে একটি জাতি স্বাধীনতার মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে তারই চিত্ররূপ।

শওকত আলী

১. শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসের পরিচয় দিন।

উত্তর : শওকত আলীর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে বখতিয়ার খিলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাতের পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাস। প্রদোষ হল আলো এবং আঁধারের মধ্যবর্তী সময়, সকাল বা সন্ধ্যা। লক্ষণ সেনের বিদায় অনেকের কাছে প্রদোষ বা সন্ধ্যাকাল। বখতিয়ার খিলজির আগমন অনেকের কাছে প্রদোষ বা সকাল। আর প্রাকৃতজন অর্থ প্রান্তে যারা বাস করে। অর্থাৎ এ প্রদোষে প্রান্তের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও অবস্থা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। গ্রামের মানুষের মুখে মুখে রটে গেছে সেনরাজ শাসন থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে, তুর্কী আক্রমণ আসন্ন। তুর্কী আক্রমণে তারা অনেকেই বেশ উল্লসিত। অন্তত তারা সামন্ত মহাসামন্তের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে। আবার এটিও নিশ্চিত নয় নতুন শাসক কেমন হবে। তবে তারা এটুকু দেখেছে যবনদের (মুসলমান) ধর্মে ও ধর্মীয় আচারাধি অনুষ্ঠানে জাতপাতের ভেদাভেদ নেই। একই পাত্রে প্রভু-ভৃত্য আহার গ্রহণ করে। এগুলো দেখে প্রদোষ তথা তুর্কি আগমনকে অনেকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রাচীন বাংলার কোন এক গ্রামীণ প্রান্তরে সাধারণ মানুষ কি ভাবছে সম্ভাব্য আক্রমণ নিয়ে, তারই চিত্র তুলে ধরেছেন শওকত আলী তাঁর এ উপন্যাসে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

শওকত ওসমান

১. শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৪০তম]*
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শওকত ওসমানের দুটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[২১তম]*

উত্তর : শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস চারটি-

- ✓ জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১)
- ✓ দুই সৈনিক (১৯৭৩)
- ✓ নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩)
- ✓ জলাঙ্গী (১৯৭৬)

'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে স্বদেশভূমি থেকে পলায়নপর মানসিকতার রূপায়ণ ঘটেছে। গ্রামের পটভূমিতে লেখা শওকত ওসমানের আরেকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস হল 'দুই সৈনিক'। দুই সৈনিক হচ্ছে হানাদার বাহিনীর দুই মদমত্ত অফিসার। তাদের পাশবিক ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসটির ঘটনা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই জন্যই উপন্যাসের নাম দুই সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' হায়েনারূপী পাকসেনাদের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বন্দি নারীর আলেখ্য। পাকসেনারা বন্দী নারীদের মতই পুরো বাংলাকে বন্দী করেছিল, এ নেকড়েদের অরণ্য থেকে বাঙালি মুক্ত হয়েছে অনেক রক্ত ঝরিয়ে। জলাঙ্গী উপন্যাসে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের ঢেউ শহর ছাপিয়ে গ্রামে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রতিটি সংবাদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। এতে স্বাধীনতা যুদ্ধে, শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ কী নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে শওকত ওসমানের এ উপন্যাসগুলো পুরোপুরি শিল্পসফল না হলেও সময়ের স্মারক হিসেবে এগুলো অমূল্য সম্পদ।

২. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্থ ব্যাখ্যা করুন। *[৩৭তম বিসিএস]*

উত্তর : শওকত ওসমানের লেখা উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)। এটি একটি রূপকধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের মূল চরিত্র তাতারী। আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ রাতে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন শোনেন গোলাম তাতারী ও বান্দি মেহেরজানের মনখোলা হাসি। সেই হাসি আবার শোনার জন্য তাতারীকে বন্দী করে প্রাসাদে নিয়ে এসে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু তাতারী হাসে না। শত চেষ্টায় বিফল খলিফা যখন চরম উত্তেজিত। তাতারী তখনই বলে-

'শোন হারুনুর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি না না না না।'

খলিফা হারুন অর রশীদ বুঝলেন একমাত্র স্বাধীনতাই পারে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। শওকত ওসমান রূপকার্থে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। সেই সময় গণতন্ত্র ছিল অনুপস্থিত আর বাক্ স্বাধীনতা ছিল চরম সঙ্কটে। লেখক এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে স্বাধীনতা ছাড়া আইয়ুব খানের উন্নয়নের দশক উদ্‌যাপন অর্থহীন।

৩. ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের 'বনী আদম' প্রথম উপন্যাস হলেও গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'জননী' উপন্যাস। 'বনী আদম' এবং 'জননী' উপন্যাস দু'টিতে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী, হাওড়া অঞ্চলের কৃষিপ্রধান মুসলমান সমাজ ও পারিবারিক জীবন উঠে এসেছে। 'ক্রীতদাসের হাসি'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে তৎকালীন আইয়ুবীয় সামরিক শাসনের ভয়ে পূর্ববাংলার মুখে হাসি নেই। 'চৌরসন্ধি' উপন্যাসে রূপকের আড়ালে পূর্ব পাকিস্তানের মোনেম খাঁ, পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খানের কর্মকাণ্ডকে দুই চোরের সন্ধি হিসেবে দেখিয়েছেন। 'সমাগম' উপন্যাসে বিভিন্ন যুগের মনীষীদের সমাগম করে তাদের চিন্তা চেতনা, তর্কবিতর্কের মাধ্যমে তৎকালীন সামরিক-স্বৈরাচারকে নিন্দা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন 'জাহান্নম হইতে বিদায়', 'দুই সৈনিক', 'নেকড়ে অরণ্য', 'জলংগী' ইত্যাদি। ভাষা আন্দোলনকে পটভূমি করে লিখেছেন 'আর্তনাদ'। এছাড়া 'পতঙ্গ পিঞ্জর' 'পিতৃপুরুষের পাপ' 'রাজপুরুষ' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি বাংলাদেশের সমকালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। ষাটের দশক ছিল শওকত ওসমানের জন্য সবচেয়ে সৃষ্টিশীল দশক। এসময়ের তিনি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করেন।

৪. শওকত ওসমানের গল্পে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ তুলে ধরুন।

উত্তর : শওকত ওসমানের ছোটগল্পে খণ্ডকালীন অভিব্যক্তিত্বে মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ ধরা পড়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও মুক্তিযোদ্ধার পরিণাম ও হতাশা, হানাদার বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ধর্ষিতা নারীর ক্ষোভ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'জন্ম যদি তব বঙ্গে'র সমগ্র গল্পগুলোতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা অনুষঙ্গ ও সংগ্রামমুখর দিনের ছাপ রয়েছে। 'আলোক অন্বেষা' গল্পে হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন করেছে তার চিত্র অংকিত হয়েছে। 'ক্ষমাবতী' ও 'জননী : জন্মভূমি' গল্প দুটোতে নারী নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। পশ্চিমা হানাদারদের পাশবিকতার প্রতিশোধের চিত্র রয়েছে 'তিন মির্জার দ্বিতীয় অভিসার' গল্পে। 'দুই ব্রিগেডিয়ার' গল্পে বাঙালির মানবতা ও পশ্চিমাদের বর্বরতার পরিমাপ করেছেন লেখক। মৃত্যুর সাথে সংগ্রামরত অবস্থাতেও মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার নিধনে পিছপা হয় নি। এরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে 'রক্তচিহ্ন' গল্পে। 'কেন মৌন' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালি একই পরিবারে

ছেলে মুক্তিযোদ্ধা, বাবা পাকিস্তানের সমর্থক- এই দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলোতে মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ভিন্ন সব গল্প উঠে এসেছে।

৫. শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় লিখুন ।

উত্তর : শওকত ওসমানের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'। পল্লিজীবন, পল্লির মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে পল্লির পরিবেশকে নিয়ে রচিত হয়েছে এ উপন্যাস। মহেশডাঙ্গা গ্রামের দরিদ্র কৃষক আজহার ও তার স্ত্রী দরিয়া বিবির পারিবারিক টানাপড়েন উপন্যাসের মূল অংশ। আজহারের পারিবারিক ঐতিহ্য থাকলেও, দারিদ্র্যের কষাঘাতে সে আজ সর্বস্বান্ত। পারিবারিক কলহে আজহার একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে দরিয়া বিবি সন্তানদের নিয়ে অকূল দরিয়ায় পড়ে। এ অবস্থায় আজহারের এক ধনী ফুফাত ভাই ইয়াকুব সময়ে সময়ে দরিয়াদের সাহায্য করতে থাকে। পরবর্তীতে দরিয়া বিবি ইয়াকুবের লালসার শিকার হয়। দরিয়া বিবি সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। এই সন্তান জন্ম দিয়ে দরিয়া বিবি আত্মহত্যা করে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ইয়াকুবদের মত বিত্তবানরা অসহায় মানুষদের সাথে লালসা চরিতার্থ করে। অন্যদিকে শত দারিদ্র্যের মাঝেও মাতৃত্ববোধের কারণে দরিয়া সন্তানদের ছেড়ে যেতে পারে না। এই দরিয়াই আবার সন্তানের নিকট কলঙ্কিনী মা হয়ে বেঁচে না থেকে বেছে নেয় আত্মহননের পথ।

৬. শওকত ওসমানের 'জননী' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী'র তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তর : শওকত ওসমানের 'জননী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' একই নামে দুটি উপন্যাস হলেও এই দুই ঔপন্যাসিক হিন্দু ও মুসলিম দু'রকম পরিবারের দুই মায়ের চরিত্র তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমানের 'জননী' দরিয়া বিবি। সন্তানদের লালন পালনের জন্য দারিদ্র্যের জন্য দেবররূপী লম্পট ইয়াকুবের কাছে সাহায্য নিতে গিয়ে তার লালসার শিকার হয়। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' শ্যামার প্রথম সন্তান মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো মা হবার উচ্ছ্বাসটা ঠিকভাবে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারছিল না। সে ভয়ে থাকত এ সন্তান কি স্বল্পায়ু নিয়ে এসেছে নাকি দীর্ঘায়ু।

মানিক হিন্দু পরিবারের পটভূমিতে, শওকত ওসমান মুসলিম পরিবারের পটভূমিতে জননীকে চিত্রায়ন করেছেন। তবু এই দুই উপন্যাসের জননীকে অশ্রুসিক্ত, বেদনায় রিক্ত, অথচ জননীত্বের তুলনাহীন মহিমায় মহিমান্বিত দেখা যায়। কোনো সন্তান মায়ের কলঙ্কিত পরিচয় মেনে নেয় না। এটা জেনেই দরিয়া বিবি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। দরিয়া বিবি মায়ের পরিচয়কে অক্ষুণ্ন রাখে, নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শাশ্বত জননীত্বকে জয়ী করেছে। আর ভয়-হতাশা কাটিয়ে একসময় শ্যামার মাতৃত্ব স্থায়ী হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১. 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি কার লেখা? [২২তম বিসিএস]

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)। উপন্যাসটি যমুনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি তৎকালীন ভারতীয় বাঙালি সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উপেন্দ্র, তাকে ঘিরেই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। তার স্ত্রী সুরবালা আগাগোড়াই একজন ধর্মান্ধ মানুষ। উপেন্দ্র-এর খুব কাছের অনুজ ও বন্ধু সতীশ। উপন্যাসের নায়ক সেই সতীশ এবং নায়িকা সাবিত্রী। উপন্যাসে সতীশ-সাবিত্রীর প্রণয় প্রাধান্য লাভ করলেও উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সতীশের সাথে সরোজিনীর মিলন হয়। উপন্যাসটি শুরু হয় কমেডি বা হাস্যরস দিয়ে এবং শেষ হয় ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে।

২. শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন লেখায় কী কী ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন?

উত্তর : কবি-সাহিত্যিকরা নিজেদের প্রকৃত নামের পরিবর্তে অন্যনামে যে লেখালেখি করেন সেটাকে ছদ্মনাম বা পেন নেম বলে। অনেক কবি-লেখক ছদ্মনামে এত বিখ্যাত হয়েছেন যে আসল নামে তাঁদেরকে কেউ চিনেও না। ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রাথমিক কারণ ছিল মতামত প্রকাশের জন্য রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় রোষ থেকে আত্মরক্ষা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তিনি তার বিভিন্ন লেখায় সাতটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এগুলো হলো- অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, পরশুরাম (পরশুরাম রাজশেখর বসুরও ছদ্মনাম), শ্রীকান্ত শর্মা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ লিখুন।

উত্তর : বাংলা কথাসাহিত্যে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাউণ্ডুলে জীবন অভিজ্ঞতালোকে যে রস সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও পাঠকপ্রিয়। তার উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

শরৎচন্দ্র নিতান্ত সাধারণ নর-নারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকেই তার উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চরিত্রগুলোতে চমক নেই, বিপুল আবেগ নেই, কোন আকাশস্পর্শী আদর্শ কিংবা সমাজজীবন সমন্ধে কোন মৌলিক তত্ত্ববাদের অবতারণাও নেই। যা এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। সাধারণ স্তর থেকে নেওয়া সব চরিত্র তার হাতে অসাধারণ রূপ লাভ করেছে।

শরৎ সাহিত্যের পারিবারিক চিত্রগুলো আকর্ষণীয়। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, ঈষৎ মান-অভিমান, মনোমালিন্য, একটু অশ্রু বিসর্জনের পর সে মেঘ কেটে গেলে

©Nazmus Sadat CamScanner

সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। এই ধরনের ঘরোয়া কাহিনিগুলো পাঠকচিত্তের অন্তঃপুরে গিয়ে আশ্রয় লাভ করে।

শরৎচন্দ্রের কাহিনিগুলো বাস্তবজীবন আশ্রিত হলেও এর সঙ্গে রোমান্সের অদ্ভুত মিল ঘটিয়েছেন। ফলে পাঠক তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। এছাড়া তিনি মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অত্যন্ত সহানুভূতি ও আবেগের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

৪. 'প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গৃহদাহ এক সুস্পষ্ট প্রতিবাদ।' আলোচনা করুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'গৃহদাহ' (১৯২০)। উপন্যাসের নায়িকা অচলা। মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপন্যাসের মূলসূত্র। মহিম ও অচলার বিয়ের পরেই কাহিনির সূত্রপাত। মহিম এবং সুরেশের প্রতি অচলার দোটানা আকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। বিয়ের পর মহিমকে ছেড়ে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার সুরেশের প্রতি মোহভংগের পর মহিমের উপস্থিতিতে অচলার ভয়ানক একাকীত্ব ও দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে উপন্যাসের ইতি ঘটেছে। ড. নীলিমা ইব্রাহিম বলেন-

'অচলা চরিত্রের দ্বৈত সত্তাকে অবলম্বন করেই এ উপন্যাসের আরম্ভ ও সমাপ্তি।'

একই ব্যক্তির প্রতি কখনো আসক্তি কখনো অনীহা এটা মনস্তত্ত্বের নিগুঢ় তত্ত্ব যা অচলা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। গৃহদাহ উপন্যাসে অচলা, মহিম, সুরেশ প্রত্যেকের জীবন অর্থনৈতিক পটভূমি, শিক্ষা, দুর্বলচিত্ত ও পরিবেশগত ভিন্নতার চাপে অবিন্যস্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এখানে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। কথা সাহিত্যের উপযোগী ভাষা, প্রকাশ ভঙ্গি, বিষয় নির্বাচন এবং শিল্প বিন্যাসে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

৫. শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনি লক্ষণাক্রান্ত এ উপন্যাসের খণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনির সমষ্টি। তবে প্রতিটি খণ্ডই শ্রীকান্তের স্মৃতিচারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং লেখকের বর্ণনাগুণে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থারও বাস্তব চিত্র এতে অংকিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র যখন শ্রীকান্ত উপন্যাস লেখেন তখন ভারতে ইউরোপীয় ভ্রমণ কাহিনির একপ্রকার সস্তা প্রচার ও বাজার পরিচিতি পাচ্ছিল। এজন্য ভারতের পরিবেশে ও বাস্তবতার

আলোকে সাজিয়ে তুলেন দেশীয় ভ্রমণ সাহিত্য ও আত্মজীবনীর এক ধারা। 'শ্রীকান্ত' সেই ধারার প্রথম পদক্ষেপ। ব্যক্তিগত ভাবনা ও অনুভূতির সাথে লেখক সহজেই মিলিয়ে দিতে পেরেছেন প্রকাশশৈলী, বর্ণনাচাতুর্য, কাব্যময়তা আর চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন তাদের আপন জায়গায় ।

৬. শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল কেন?

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' (১৯২৬)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কামনার প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব বার্মা মুল্লুকে গড়ে তোলেন 'পথের দাবী' নামের সংগঠন। উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র ভারতী। সব্যসাচী ও ভারতী দু'জনের লক্ষ্য এক হলেও তাঁদের মাঝে রয়েছে একটা পার্থক্য। সব্যসাচীর উদ্দেশ্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা। অন্যদিকে ভারতী নীরব বিপ্লবের পক্ষে। গল্পের ঘটনা পরিক্রমায় চরিত্রগুলোর জবানিতে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা এসেছে। উপন্যাস শেষ হয়েছে বিপ্লবী বক্তব্য দিয়ে-

> *'আমি বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র কাম্য, আমার একটিমাত্র সাধনা।'*

নান্দনিক মানদণ্ডে 'পথের দাবী' উৎকৃষ্ট সাহিত্য কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এ উপন্যাস উদ্দীপকের ভূমিকা রাখে। উপন্যাসের কাহিনিতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি আন্তরিক সমর্থন আছে। ফলে গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

৭. শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প 'মহেশ' সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প মহেশ। গল্পটির মূল চরিত্র গ্রামীণ এক দরিদ্র মুসলিম চাষী গফুর ও তার মেয়ে আমিনা, আর তাদের একমাত্র ষাঁড় মহেশ। কাশীনাথপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক গফুর। মেয়েকে সাথে নিয়ে সে কোনরকমে একটি জীর্ণ ঘরে দিন কাটায়। গ্রামের জমিদার শিববাবু ও তার পণ্ডিত তর্করত্ন তাকে গরুর প্রতি অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করে। কিন্তু তারা গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করে যবন গফুরকে বোঝালেও নিজেরা গরুকে খাওয়ার খড় দিতে অস্বীকার করে। টাকার লোভে গ্রামে গরু চড়ানোর মাঠ বিক্রি করে দেয়। গল্পের শেষে মেজাজ হারিয়ে গফুর তার মহেশকে লাঙলের ফলা দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, যে মহেশকে সে তার ছেলে বলে অভিহিত করেছিল। এরপর সে গ্রামে থাকা সবকিছু ফেলে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চলে যায়। সে যাবার পথে উপরওয়ালার কাছে যারা মহেশের খাবার ঘাস কেড়ে নিয়েছে, খাবার পানি কেড়ে নিয়েছে, তাদের মাফ না করার ফরিয়াদ জানায়। গল্পে মূলত সমাজপতিদের লোভ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দরিদ্র মানুষ ও অসহায় পশুকে নিষ্পেষিত করে তাই দেখানো হয়েছে।

CamScanner

শহীদুল্লা কায়সার

১. 'সংশপ্তক' কার লেখা? [২৩তম বিসিএস]
অথবা, শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসের বিষয়ভাবনা কী?

উত্তর : শহীদুল্লা কায়সারের এক কালজয়ী উপন্যাস 'সংশপ্তক' (১৯৬৫)। উপন্যাসের বৃহত্তম পটভূমিতে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘটনা। কাহিনিতে বাকুলিয়া গ্রামের মানুষের জীবনকাহিনি, জমিদারের শোষণ, নায়েবের কূটচাল প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে। বাকুলিয়া গ্রামে রমজান নানা কূটবুদ্ধিতে জমিদার মিয়ার ব্যাটাকে সরিয়ে নিজেই জমিদার বনে যায়। রমজান মন্বন্তরের সময় মুনাফালোভীদের সাথে হাত মিলায়, দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি দখল নেয় এবং রাজনৈতিক নানা পটপরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের বেশ বদলে ফায়দা লুটে। জাহেদ কলকাতা থেকে এসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সভা সমিতি করে। সেকান্দর মাস্টার, ফেলু মিঞা, রাবু তার সঙ্গী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গার পরিস্থিতিতে জনগণকে শোষণ করে রমজানরা যখন কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হচ্ছিল জাহেদরা তখন এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাদের নৈতিক লড়াই চালিয়ে যায়। আন্দোলন-সংগ্রাম ও মানুষের সেবা করে জাহেদরা নিঃশেষিত হয়। তবু তারা মানবতার কল্যাণের এ পথ ছাড়ে না। উপন্যাসের শেষের দিকে বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার কারণে জাহেদকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যে বীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়ে যায় সে-ই সংশপ্তক। এখানে জাহেদরা সবাই সংশপ্তক।

২. শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' উপন্যাস কী অর্থে স্বতন্ত্র?

উত্তর : শহীদুল্লা কায়সারের এক অনবদ্য সৃষ্টি 'সারেং বৌ' উপন্যাস। তার প্রগতিশীল ও মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এ উপন্যাসকে সার্থক করেছে। ভৌগোলিক আয়তনের বস্তু সমগ্রতা, সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলবর্তী জনপদের বাস্তবজীবন, প্রকৃতির দাক্ষিণ্য ও ক্রোধে সৃষ্টি ও ভাঙনশীল মানবপ্রবাহ প্রভৃতি বিষয়কে দক্ষতার সাথে রূপদান করেছেন ঔপন্যাসিক। কদম ও নবিতুনের সংগ্রাম ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যবিন্দু হলেও বর্ণনায় পারিপার্শ্বিক জীবন বাস্তবতার অনিবার্যতাও স্বীকৃতি পেয়েছে। বিরূপ জীবনস্রোত ও বিধ্বংসী প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ট্রাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জয়যুক্ত হয়েছে কদম ও নবিতুনের সংগ্রামী জীবন। সারেং জীবনের বোহেমীয় স্বভাবের বিপ্রতীপে প্রতীক্ষাকাতর, সম্ভ্রম ও অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রামশীল নবিতুন এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে আধুনিক জীবন চেতনার প্রবর্তনাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে হয়। লোকজীবনের রূপ রূপান্তর, বিশ্বাস-সংস্কারের আঞ্চলিকতা, শ্রেণিচরিত্রের বাস্তবসম্মত উপস্থাপন, সর্বোপরি উপকরণের অভিনবত্বে বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় 'সারেং বৌ' স্বতন্ত্র।

CamScanner

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

১. 'কাঞ্চনগ্রাম' কার লেখা? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস 'কাঞ্চনগ্রাম'। তার মৃত্যুর পরের বছর ১৯৯৮ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের শুরুতে কোনো কবিতা উপস্থাপন শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য। কাঞ্চনগ্রামও ব্যতিক্রম নয়। সাতাশ অধ্যায়ে বিভক্ত বিশাল আয়তনের উপন্যাস কাঞ্চনগ্রাম। দীর্ঘ কালসীমার প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, পাকিস্তানি শাসন, সামরিক জান্তা আইয়ুব-ইয়াহিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক, মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকসেনাদের অত্যাচার-নিপীড়ন কোনো কিছুই বাদ যায়নি। উপন্যাসের পটবিন্যাসে কালিক ধারাবাহিকতা তেমন গুরুত্ব পায়নি। কাহিনির পথচলায় কখনো পেছনে তাকিয়ে আবার কখনো সামনে এগিয়ে পথ হেঁটেছেন ঔপন্যাসিক। পূর্বের ও পরের নানা বিচিত্র বিষয় যেন পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে।

২. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির রচয়িতা কে? *[১৮তম]*

উত্তর : শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) বিভাগোত্তরকালের বিশিষ্ট রচনা। দক্ষিণ বাংলার নদীতীরবর্তী মানুষের সংগ্রামশীল ও গতিময় জীবন উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসের শুরুতে রোমান্টিক মানসের পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষের এই অন্বিষ্ট জীবনরূপ ঔপন্যাসিকের অন্তর্ময় অবলোকনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ গত পাঁচ শতাব্দী ধরে যে ধরনের আনন্দবেদনাময় কাহিনিতে হেসেছে, কেঁদেছে, তাকে নতুন রূপে এনেছেন লেখক। লোকগীতির আবেদনটি এখানে রক্ষিত হয়েছে। দক্ষিণ বাংলার কাশবনের দেশের মানুষ আর প্রকৃতির প্রতি লেখকের নিশ্ছিদ্র আনুগত্য। উপন্যাসের মধ্যে ব্যবহৃত লোকসংগীত, আঞ্চলিক পরিবেশ ও উপভাষার প্রতি আনুগত্য, উপন্যাসের প্রতি পর্বের সূচনায় উদ্ধৃত লোকসংগীত- এসব কিছুই লোকজীবনের প্রতি লেখকের রোমান্টিক আনুগত্যের পরিচায়ক। নদী ও মানুষের এই একীভূত রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক গীতিময় জীবনাবেগে হয়েছেন উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত।

শামসুন্নাহার মাহমুদ

১. নারী মুক্তি আন্দোলনে শামসুন্নাহার মাহমুদের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা প্রসার ও অবরোধপ্রথা রহিত করার জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুন্নাহার মাহমুদ অন্যতম। যিনি

একাধারে দেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সমাজসেবিকা। তিনি কিছুদিন নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক করে বেগম ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়। ঢাকায় নারীদের জন্য দু'একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান থাকলেও বেগম ক্লাবই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে নারীদের সমাজ উন্নয়নবিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও স্বাধীনভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ ছিল। সামাজিক বাধা, কঠোর সমালোচনার মধ্যে সাহসের সঙ্গে সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেই তারা অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৫৭ সালে বেগম ক্লাবের শিক্ষা সাব-কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ইডেন কলেজের বিভিন্ন সমস্যার চিত্র তুলে ধরে তা প্রতিকারের আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর দ্বিতীয় ছাত্রী হলটি নামকরণ করা হয় বেগম শামসুন্নাহার এর নামে। কাজী নজরুল ইসলাম তার সিন্ধু হিন্দোল কাব্যগ্রন্থ 'বাহার ও নাহার'কে (ভাই হবীবুল্লাহ বাহার ও বোন শামসুন্নাহার) উৎসর্গ করেন।

শামসুর রাহমান

১. কবি শামসুর রাহমানের চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন। *[৩৮তম]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের নাগরিক কবি শামসুর রাহমান। তিনি ঢাকার মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রামে। তিনি কবি ও সাংবাদিক। তার প্রথম কবিতা 'উনিশশো ঊনপঞ্চাশ' ১৯৪৮ সালে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় 'মজলুম আদিব' (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা লিখতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার মোট ৬৫টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য চারটি কাব্যগ্রন্থ-

- ✓ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)
- ✓ রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩)
- ✓ বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭)
- ✓ নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৭)

২. 'মজলুম আদিব' কে? এ নামে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? *[৩৪তম]*

উত্তর : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কবি শামসুর রাহমান কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় 'মজলুম আদিব' (বিপন্ন লেখক) ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। পরবর্তীতে তিনি এ ছদ্মনামে 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। এ কাব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা প্রাধান্য পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন চিহ্নিত করার প্রশ্নে, পাকিস্তানি শাসনের চব্বিশ বছরের ইতিহাসের ইশারা ধারণ করার প্রশ্নে 'বন্দী শিবির থেকে' বাংলাদেশের কবিতায় এক বিরল অভিজ্ঞতা। এ কাব্যের মাধ্যমে শামসুর রাহমান কবি খ্যাতি অর্জন করেন।

CamScanner

৩. শামসুর রাহমানের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিন? *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি প্রতিভা শামসুর রাহমান সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে চিরকালীন অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যেমন কবিতার ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। শামসুর রাহমানের কাব্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমাজ বাস্তবতা, সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, প্রেম, চিরায়ত জীবনের হতাশা-বেদনা-গ্লানি-আকাঙ্ক্ষা আর সব কিছু ছাপিয়ে প্রবল আশার স্বপ্ন বিভোরতা। কবিতার সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য। শামসুর রাহমান প্রথম আত্মপ্রকাশের কালে তিরিশের মুগ্ধতায় সবচেয়ে আবিষ্ট ছিলেন; তিনিই তিরিশের পরে বাংলা কবিতাকে সম্মুখে অগ্রসর করতে প্রধান ভূমিকাটি পালন করেছেন। নিভৃতচারী ও রোমান্টিক কবি শামসুর রাহমান হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের সমকালের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনার কাব্যভাষ্যকার।

৪. শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যের নাম কী? *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : কবি শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এ কাব্যে তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়তা, স্মৃতি ও অন্ধকার থেকে আলোতে প্রত্যাবর্তনের তৃষ্ণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গ চেতনা, প্রেম ও নতুন পৃথিবীতে প্রবেশের প্রবল স্পৃহা গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোয় নতুন জগত উন্মোচিত করেছে।

৫. শামসুর রাহমানের কবিতায় কীভাবে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমান। তার কবিতায় প্রেম, আত্মমগ্নতা, দ্রোহ, স্মৃতিকাতরতা, নাগরিক মোহ খুব শিল্পিতভাবে জায়গা করে নিলেও দেশপ্রেম, দেশভাবনা বারবার ফিরে এসেছে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তী বাস্তবতায় অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন কলমকে। রচনা করেন অজস্র অনবদ্য কবিতা। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রুপ করে লেখেন 'হাতির শুড়' নামক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দেখে লেখেন 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লেখেন 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'। ১৯৮৭ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনের কয়েক বছরে 'শৃঙ্খল মুক্তির কবিতা', 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা', 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা', 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কবিতা' প্রভৃতি কবিতাগুলো লেখেন। গণআন্দোলনের মুখে এরশাদের পতনের পর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হলে আবার লেখেন 'গণতন্ত্রের পক্ষে কবিতা।' কবি শামসুর রাহমান সে সময় পত্রিকার পাতায়

©Nazmus Sadat
CamScanner

গাতায় বা মিছিলে প্রচণ্ড সরব ছিলেন কবিতা নিয়ে। দেশের পক্ষে, প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে তিনি মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য কবিতা লিখছেন।

৬. শামসুর রাহমানের কবিতায় দেশ ও সমকাল প্রসঙ্গে লিখুন।

উত্তর : শামসুর রাহমানের কবিতায় একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে দেশ ও সমকাল। বিভাগোত্তর সময় থেকে দেশের এমন কোনো ঘটনা নেই যার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। দেশের সঙ্কটকালীন মুহূর্তে, যখনই বিপন্নতা দেখা দিয়েছে, তখনই শামসুর রাহমান প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন। বিশেষত 'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্য পর্যায় থেকেই এর সূত্রপাত। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি আন্দোলনই তাকে আলোড়িত করেছে। হরতাল, বিক্ষোভ, রবীন্দ্র বিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাকে তিনি কবিতা করে তুলতে পেরেছেন। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, আসাদের শার্ট, গেরিলা, সফেদ পাঞ্জাবী, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, শহীদ মিনারে কবিতা পাঠ, জয়দেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে। 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'স্বাধীনতা তুমি আসবে বলে' কবিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। বলা যায়, শামসুর রাহমানের কবিতা সমকালীন বাস্তবতার দলিল।

৭. শামসুর রাহমানকে 'নাগরিক কবি' বলা হয় কেন?

উত্তর : বাংলা কাব্যে সর্বসময় নাগরিকতার ধারক কবি শামসুর রাহমান। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, ব্যর্থতা, নৈঃসঙ্গ্য ও নৈরাশ্যবোধ শামসুর রাহমান ধারণ করেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের অনেক স্তবকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'। এখানে তিনি ধারণ করেছেন ঢাকার বস্তি-গ্রাম-নগরের মিশ্র জনপদ। তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ রৌদ্র করোটিতে ঢাকা ও ঢাকার পারিপার্শ্বিক জগৎ কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। শামসুর রাহমান ঢাকা শহরের বাসিন্দা। ঢাকা শহরের প্রকৃতি, পরিবেশ, চাঞ্চল্য, নিবিড়তা, যান্ত্রিকতা সবকিছুকে বাংলা সাহিত্যে একসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ধারণ করেছেন। তার কবিতায় উঠে এসেছে ঢাকা শহরের চলমান জীবন যাপনের বিচিত্র চিত্র, যাতে পুরো নগরীর ছায়াপাত ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে এজন্যই তিনি 'নাগরিক কবি' হিসেবে পরিচিত। ভারতচন্দ্র রায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাগরিক কবি। কিন্তু পুরোপুরি নাগরিক কবি নন। আজীবন ঢাকা শহরে বেড়ে ওঠা শামসুর রাহমানের মতো কেউ নাগরিকতার উপাদানে কবিতা লিখেননি। তাই শামসুর রাহমানকে পুরোপুরি নাগরিক কবি বলা হয়।

শাহেদ আলী

১. শাহেদ আলীর সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : শাহেদ আলী ইতিহাস-সচেতন বাস্তবধর্মী লেখক। তার কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্যপট, সাধারণ মানুষের জীবনকথা, সামাজিক মূল্যবোধ সাথে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ বৈচিত্যময় জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। তার সাহিত্যে মোটামুটি তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, ইসলামের আলোকে লালিত তার বিশ্বাস ও জীবনদৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে তার সাহিত্যে। তবে তা কখনো প্রচারণার রূপ লাভ করেনি, যথার্থ শিল্পসম্মতভাবে জীবনরসে জারিত হয়ে তা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন জীবন শিল্পী। বাস্তব জীবনের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। শিল্পের আশ্লেষে নির্মিত জীবন বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ রূপায়ণ তার সাহিত্যকে করেছে রসবিধুর ও পাঠকপ্রিয়।

তৃতীয়ত, আজন্ম লালিত গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রামীণ জীবনের সাধারণ জীবনচিত্র তার সাহিত্যে অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিমভাবে রূপায়িত হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণে তিনি তাদের পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, জীবনের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা-আনন্দ-বেদনার রূপ এবং সেই সঙ্গে তাদের ভাষা, স্বপ্ন-কল্পনা সবই বিশ্বস্ততার সাথে চিত্রায়িত করেছেন।

তাই শাহেদ আলী মাটি, মানুষ ও স্বপ্ন-কল্পনার সুরভীকোমল পদ্মরাগের মতো চিত্ত-মনোহর এক রসজ্ঞ জীবন শিল্পী।

সত্যেন সেন

১. সত্যেন সেনের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[২১তম বিসিএস]*

উত্তর : সত্যেন সেন একজন সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচি'র প্রতিষ্ঠাদের একজন। তার তিনটি উপন্যাস হলো- ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৯), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭), পাপের সন্তান (১৯৬৯)।

'ভোরের বিহঙ্গী' তার লেখা প্রথম উপন্যাস। ব্রিটিশ আমলে আন্দোলন করে কারাবন্দি হলে জেলে বসে বাইবেলের কাহিনি নিয়ে দুইটি উপন্যাস 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' রচনা করেছেন। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের কাহিনী। ইহুদী জাতি তথা জেরুজালেম বহু নবীর আশীর্বাদধন্য, আবার একই সঙ্গে ইহুদীদের সীমাহীন অবাধ্যতার কারণে জেরুজালেম নগরী অভিশপ্ত। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের ভূমিকাংশে ঔপন্যাসিক একে 'অভিশপ্ত নগরী'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'অভিশপ্ত নগরী'তে জেরুজালেমের পতনের কথা আছে। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে সেই পতনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

সাঈদ আহমদ

১. নাট্যকার হিসেবে সাঈদ আহমদের পরিচয় দিন।

উত্তর : উপমহাদেশের অ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ সাঈদ আহমদ। তিনি এই অঞ্চলে এ্যাবসার্ড ধারায় নাটক লিখে বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে নাম কুড়িয়েছেন। লন্ডনে থাকাকালীন স্যামুয়েল বেকেটের নাটক দেখে অ্যাবসার্ড নাট্যধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পূর্ব-বাংলার আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিকে প্রতীকী উপস্থাপন, চিহ্নিত বহুমাত্রিক সমস্যায় জর্জরিত চরিত্র রূপায়ণ, মনোজগতে তার প্রতিস্থাপিত স্বরূপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জীবন ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ পরিণতির স্বরূপটি এদেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে রূপদানের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হন নাট্যকার সাঈদ আহমদ। অভিনব এ বিষয়-প্রকল্প প্রণিধানে বাংলাদেশের নাটকে তিনি হয়ে ওঠেন ইঙ্গিতবাহী। নাটকে যোগ করেন সংক্ষুব্ধ বিষয় অনুষঙ্গি প্রকরণের। সংলাপেও তিনি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর অ্যাবসার্ড নাটক 'কালবেলা', লোককাহিনি-ভিত্তিক রূপক নাটক 'তৃষ্ণায়', দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত 'মাইলপোস্ট'। অন্যান্য নাটক 'প্রতিদিন একদিন' (১৯৭৮), শেষ নবাব (১৯৮৯) সমকালীন বাংলাদেশের পটচিত্রে নির্মিত। একালের আর্থ-সামাজিক পটে আধুনিক চেতনাকেও বাংলা নাটকে স্থাপন করেছেন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যভাবনা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি তার কবিতার মাধ্যমে দূর করতে চেয়েছেন শ্রেণিবৈষম্য। অসহায়–নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের সুখ-দুঃখ তার কবিতার প্রধান বিষয়। তিনি বলেছেন-

'মজুর দেখ নি তুমি, হে কলম দেখনি বেকার।'

অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের স্বার্থে তিনি বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন। পুরাতন ও জীর্ণকে ভেঙ্গে নতুন প্রজন্মকে 'ছাড়পত্র' দিতে চান। উচ্চতর মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সুন্দর, মানবতার, অধিকার ও সমতার পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তার কবিতা উদ্দীপ্ত করে-

সাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

তার অনেক কবিতায় পৃথিবীকে সাজানোর প্রত্যয় এবং প্রয়াস লক্ষণীয়। একটি আধুনিক কাব্য ভাষার সৃষ্টি করেছেন। কাব্যভাষাকে সহজ-সরল সৌন্দর্যে উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্যের কারণে সুকান্তের কবিতা সর্বশ্রেণির পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে নিতে পেরেছে।

সেলিনা হোসেন

১. সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড'। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র 'বুড়ি'র অল্প বয়সে বিয়ে হয় বিপত্নীক চাচাত ভাই গফুরের সাথে। গফুরের আগের দুই ছেলে সলীম ও কলীম এবং বুড়ির প্রতিবন্ধী ছেলে রইসকে নিয়ে তার সংসার। এরই মধ্যে গফুর মারা যায়। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। সলীম যায় যুদ্ধে, কলীমকে পাকিস্তানী সৈন্য ও দোসররা চোখের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। হাফেজ ও কাদের দুই মুক্তিযোদ্ধা একদিন যুদ্ধ করতে করতে বুড়ির ঘরে আশ্রয় নেয়। বুড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে নিজের প্রতিবন্ধি সন্তান রইসকে বন্দুকের নলের মুখে তুলে দেয়। বুড়ির প্রতিবন্ধী সন্তান রইসের মাধ্যমে লেখিকা হয়তো পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মুক ও বধির হয়ে যাওয়াকে বুঝাতে চেয়েছেন। আবার রমিজার কোলে ফুটফুটে বাচ্চা; মুক্তিযুদ্ধের অব্যাহতির আগে মুক্তির বার্তা করেই আনেন। সত্য ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। মুক্তিযুদ্ধের এক ব্যতিক্রমী গল্প হিসেবে উপন্যাসটি আজও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।

২. সেলিনা হোসেনের গল্পের বিষয়ভাবনা সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : সেলিনা হোসেন খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত মানুষের যাপিত জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে গড়ে তুলেছেন গল্পের জগৎ। জীবনের আহবানে, বেঁচে থাকার আকুল বাসনায় তাঁর প্রিয় মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শহরেও এরা অপাঙক্তেয়, উন্মুলিত, জীবনবিচ্যুত ও আশারিক্ত। 'উৎস থেকে নিরন্তর', 'খোল করতাল' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত নিরন্ন আশাহত মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইতিহাস ঐতিহ্যের পটে চরিত্র নির্মাণ সেলিনা হোসেনের উল্লেখযোগ্য ছোটগাল্পিক বৈশিষ্ট্য। মানব প্রগতির স্বার্থেই তিনি বিচরণ করেন ঐতিহ্য থেকে ইতিহাসে কখনো সমকালে। এই ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি বাংলাদেশের সাহিত্যে সেলিনা হোসেনের প্রাতিস্বিকতার কেন্দ্রীয় উৎস। বিষয়াংশের মতো প্রকরণ পরিচর্যাও সেলিনা হোসেনের পরীক্ষাপ্রিয় ও স্বাতন্ত্র-অন্বেষী। গল্পে অপ্রচলিত এবং আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে তাঁর নৈপুণ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পের ভাষা গীতল ও চরিত্রানুগ, প্লট সংহত, আর সংলাপ কেন্দ্র-অভিমুখী।

সেলিম আল দীন

১. নতুন নাট্যধারার প্রবক্তা হিসেবে সেলিম আল দীনের অবদান লিখুন।

উত্তর : ঔপনিবেশিক নাট্যরীতির বিপরীতে দেশজ-নাট্যরীতির নবরূপ নির্মাণ করেন সেলিম আল দীন। বাংলা নাটকের অত্যাবশ্যক রূপ হিসেবে নির্ণীত হওয়া ইউরোপীয় ঢঙ্গে নাটকের গড়ন-বৈশিষ্ট্য ভেঙে যায়। সেই সঙ্গে সংস্কৃত কিংবা ইউরোপীয় নাট্যরীতি 'বিজাতীয়' বা 'পরজীবী' নাট্যচর্চা হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিজাতীয় নাট্যচর্চার বিপরীতে একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শম্ভু মিত্র প্রমুখের নাট্য-আঙ্গিক বিকশিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সেলিম আল দীন ঐতিহ্যবাহী নাট্য-আঙ্গিকের নানা শৈলীকে নতুনরূপে সৃষ্টি করেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে বাংলা ভাষায় লিখিত হলেই বাংলা নাটক হয় না; বরং হাজার বছর ধরে বাঙালির নাট্য-নন্দন ভাবনার স্বতন্ত্র ও স্বকীয় কাঠামো ব্যবহারেই বাংলা নাটকের গড়ন-গঠন বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। নাট্যকাহিনিতে বিচিত্র চরিত্রের অধিকাংশের বিকাশ ঘটেছে সামাজিক রূপান্তর-এর ধারাবাহিকতায়। তাঁর নাট্যের প্রধানতম উপাদানরূপে বঙ্গভূমির সংস্কৃতি ও মানুষের জীবন এবং জীবিকা অবলম্বিত হয়। যেখানে বহুমাত্রিক পেশাজীবী মানুষের কর্ম ও মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায়।

২. সেলিম আল দীনের যে কোন একটি নাটক সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সেলিম আল দীন-এর লোক-নাট্যরীতি অবলম্বনে রচিত একটি মর্মান্তিক নাটক 'চাকা'। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে স্বৈরাচার সরকারের পতন ও গণতন্ত্রের বিজয় এ নাটকের প্রেক্ষাপট। এই গণআন্দোলনে অনেক যুবক মারা যায়। তাদের সকলের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায় নি, বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে অনেকের দাফন-কাফন পর্যন্ত হয় নি। নাম-পরিচয়হীন এরকমই এক যুবকের লাশ গ্রামের উদ্দেশ্যে গরুর গাড়িতে তুলে দেয়া হয়। গাড়ি রওনা হয় কাগজে অস্পষ্টভাবে লেখা ঠিকানার উদ্দেশ্যে। গাড়ির চাকা অবিরাম ঘুরে চলে কিন্তু গারোয়ান মৃত যুবকের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতে পারে না। গারোয়ানের এই অবিরাম পথ চলা ও মৃত যুবকের বাড়ির সন্ধান করাই চাকা নাটকের বিষয়বস্তু। এ নাটকের কাহিনিবৃত্তে সেলিম আল দীন গ্রাম-বাংলার নিম্নশ্রেণির ও নৃ-তাত্ত্বিক প্রান্তিক মানুষের যাপিত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিত্য অভাব, দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের আছে হৃদয়, মানবতাবোধ। তাই শেষ পর্যন্ত গারোয়ানদ্বয় বেওয়ারিশ যুবকের লাশটি শিয়াল-কুকুর খাদ্যে পরিণত হতে দেয় নি। তারা ঠিকানা খুঁজে পায় নি, কিন্তু লাশটির সৎকার করে সত্যিকারের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে। চাকা-র দুই গারোয়ান গ্রাম-বাংলার নিচুতলার মানুষ; সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক। অথচ শহুরে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক ও মানবতাবোধসম্পন্ন।

সৈয়দ আলী আহসান

১. গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন কে? তাঁর রচিত তিনটি কাব্যের নাম লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর রচিত তিনটি কাব্য- অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), রজনীগন্ধা (১৯৮৮)।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

১. উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওলীউল্লাহর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করুন। *[৪৪তম বিসিএস]*

অথবা, ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন। *[৪১তম]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এক প্রতিভাবান কথাশিল্পী। যিনি বিষয় ও আঙ্গিকে তাঁর সমকালীন তথা প্রচলিত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে অভিনব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করেছেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরে তিনি মূলত তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। তিনটি উপন্যাস রচনা করেই তিনি বাংলা উপন্যাসের এক নতুন দিক উন্মোচন করেন। প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'তে ধর্মীয় গোঁড়ামির মর্মমূলে আঘাত করেছেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতায় ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট কিভাবে প্রকট হয়ে ওঠে- তা যেমন দেখিয়েছেন, সেই সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে আত্মমুক্তির পথও খুঁজেছেন। প্রতিটি উপন্যাসে তিনি প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে নতুন ভাষাভঙ্গিতে অভিনব বিষয় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রের সৃষ্টির সাথে আর কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের মিল পাওয়া যায় না। তাঁর সব উপন্যাসে যা কমন বা বহমান তা হচ্ছে অস্তিত্ববাদ। কিন্তু এই অস্তিত্ববাদী চেতনাও একেক উপন্যাসে একেকভাবে, নানা বৈশিষ্ট্যে, নানা দিক নিয়ে উপস্থিত। এছাড়া ধর্মীয় গোঁড়ামি, ভন্ডামি, কুসংস্কারকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাঁর উপন্যাসে।

২. 'লালসালু'র লেখক কে? *[১০তম বিসিএস]*

অথবা, 'লালসালু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু লিখুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৮)। গ্রামীণ সমাজে ধর্মের নামে ভণ্ডামীর এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। সে মহব্বতনগর গ্রামে এসে একটি ভাঙ্গা কবরকে প্রখ্যাত পীরের মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তার ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

পেলে ২য় স্ত্রী হিসেবে কিশোরী জমিলাকে ঘরে আনে। সহজ-সরল কিন্তু চঞ্চলা জমিলা প্রথম থেকেই স্বামী মজিদের কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারে না। মাজারের প্রতি তার তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। এতে বিচলিত হয়ে উঠে মজিদ। জমিলাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মাজার ঘরে বেঁধে রাখে মজিদ। এদিকে ঝড় শুরু হলে মজিদ গিয়ে দেখে জমিলা মেঝেতে পরে আছে, তার বুক উন্মুক্ত এবং মেহেদি রাঙানো একটি পা কবরের সাথে লাগানো। অন্যদিকে শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে গ্রামবাসী মজিদের কাছে প্রতিকার চায়। এভাবেই বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন, ফসলের ক্ষেত এবং দরিদ্র গ্রামবাসীর হাহাকারের মধ্য দিয়ে লালসালু উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়। গ্রামীণ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে, গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড মজিদ প্রতারণাজাল বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তারই বিবরণ 'লালসালু' উপন্যাস।

৩. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন জাতীয় রচনা এবং গ্রন্থটির লেখক কে? [১৩তম]

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিখ্যাত উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা'। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আশ্রিত স্কুলশিক্ষক আরেফ আলী। এক জ্যোৎস্না রাতে আরেফ আলী ঘর থেকে বের হয়ে দেখে বাঁশঝাড়ের ভেতর এক নগ্ন যুবতীর লাশ পড়ে আছে। পাশে দণ্ডায়মান কাদের মিয়া। যে বাড়িতে সে আশ্রিত, কাদের সে বাড়ির মালিক। আরেফ আলী বুঝতে পারে কাদেরই যুবতীর হত্যাকারী। কিন্তু এই সত্য কথাটি সে বলতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। একদিকে আশ্রয় হারানো ভয়, অন্যদিকে সত্য গোপনের যন্ত্রণা। অবশেষে না বলে সে থাকতে পারে না। নিজের অস্থিত্ববিলীন করে দাদা সাহেব ও আইন কর্তৃপক্ষের কাছে আরেফ আলী এ সত্য বলে দেয়।

৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতের এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' নামের তিনটি উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাস রচনা করেছেন। 'লালসালু' উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামির মর্মমূলে আঘাত করেছেন। এতে একদিকে যেমন সমাজের মানুষের ভন্ডামীর চিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির চিত্রও নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে। 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। নিজের বিবেকের সাথে, নিজের ভেতর লালন করা ন্যায়বোধের সাথে নিজের যে লড়াই হয়, সে লড়াইয়ে সামাজিক প্রতিপত্তি কতোটা প্রভাব বিস্তার করে তার অসাধারণ এক আখ্যান এ উপন্যাস। 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতায় ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট কিভাবে প্রকট হয়ে ওঠে- তা যেমন দেখিয়েছেন,

সেই সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে আত্মমুক্তির পথও খুঁজেছেন। মূলত তিনটি উপন্যাস রচনা করেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা উপন্যাসের নতুন দিক উন্মোচন করেন। তার উপন্যাসগুলোর ভাষশৈলী ও আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তি এতোটাই জোড়ালো যে, তা কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যেও অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে।

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে সমকালীন সমাজচিত্রের বর্ণনা দিন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যরীতির অন্বয় ঘটান। লেখক হিসেবে তার পারিবারিক অবস্থা যেমন তাকে সহায়তা করেছে অনুরূপ সমকালীন সমাজ বিশ্লেষণের অসামান্য ক্ষমতা ছিল তার। তার উপন্যাসগুলোতে তৎকালীন গ্রামীণ সামাজ জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মের নামে প্রতারণা, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, বাংলার লোকায়ত ধ্রুপদী জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন। সামাজিক বিষয়, রীতি-নীতি, ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব, আশা আকাঙ্ক্ষাও প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসগুলোতে দেখা যায় পটভূমি গ্রামীণ সমাজ; বিষয় সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রচলিত ধারণা বিশ্বাস; চরিত্রসমূহ একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত, দরিদ্র গ্রামবাসী অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক-ভূস্বামী। এভাবে উপন্যাসে সবমিলিয়ে ফুটে উঠে সমাজের প্রতিচ্ছবি।

৬. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে বিধৃত চেতনা প্রবাহরীতি আলোচনা করুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনের সিংহভাগ কাটিয়েছেন ফ্রান্সে। ইউরোপীয় উপন্যাস থেকে চেতনাপ্রবাহরীতি সম্পর্কে ধারণা নেন। তারপর বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর চেতনাপ্রবাহ রীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আরেফ আলী। সে বড় বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষক যুবক। এক রাতে বাইরে গিয়ে বাড়ির ছোটকর্তা কাদেরকে দেখে। অতঃপর বাঁশঝাড়ে নারীকণ্ঠের কান্না এবং এক যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ দেখে। প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও পরে আরেফ আলী বুঝতে পারে কাদেরই যুবতীর হত্যাকারী। হত্যার বিষয়টি নিয়ে আরেফ আলীর চিন্তা-চেতনা আবর্তিত। হত্যার ঘটনাকে সংহরণ করে, ব্যক্তিকে ঘটনা অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে তার মনোজাগতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। এ উপন্যাসের বাইরের ঘটনা গৌণ, আরেফ আলীর অন্তর্লোকে সৃষ্ট ঘটনাস্রোতই মূখ্য। আরেফ আলীর অন্তর্লোকে কল্লোলিত ঘটনাকে তারই মগ্নচৈতন্যের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন। আরেফ আলীর চৈতন্যে যে প্রবহমানতা তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় 'চাঁদের অমাবস্যা' হয়ে উঠেছে চেতনাপ্রবাহ রীতিধর্মী উপন্যাস।

©Nazmus Sadat CamScanner

৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ'। এর কাহিনি আমেনাকে আশ্রয় করেই পল্লবিত। আমেনার স্বামী কুতুব রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার সামর্থ্য নেই। আমেনা ধুতুরার পাতার রস খাওয়ালে স্বামী মারা যায়। স্বামীর অবর্তমানে বাচ্চাদের অন্নের জোগাড় করতে না পারায় আমেনা কোলের শিশুটি গলাটিপে হত্যা করে। এ দুটি হত্যার জন্য আব্দুস সাত্তার বাদী হয়ে আমেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। বিচারক দেখেন দুটি হত্যার মূল অপরাধী মিঞার বিবি এবং আবদুস সাত্তার। চার সন্তানের অন্নসংস্থানে আমেনা মিঞার বিবির বাড়িতে কাজ চেয়েছিল, কিন্তু বাচ্চারা কাজে বিঘ্ন ঘটাবে বলে মিঞার বিবি তাকে কাজ দেয়নি। দুর্বিষহ চিন্তার মধ্যে আবদুস সাত্তার আমেনার কোলের শিশু হত্যায় নানাভাবে প্ররোচিত করেছে। অপরাধীর শাস্তির বিধান বিচারকের দায়িত্ব। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে বিচারক মূল অপরাধীর শাস্তিবিধানে ব্যর্থ হয়ে নিজেই আত্মহত্যা করেছে। আমেনার শাস্তিবিধানই নাটকটির মূল পরিকল্পনা কিন্তু আমেনার মুখে কোনো সংলাপ দেননি। অ্যাবসার্ডধর্মী এ নাটকের লেখক সামাজিক সংকটের গভীরতায় প্রবেশ করেছেন।

৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর' নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম নাটক 'বহিপীর' (১৯৫৫)। রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলীর জমিদারি সান্ধ্য আইনে নিলামে ওঠার উপক্রম। স্ত্রী ও পুত্র হাশেম আলীকে নিয়ে তিনি টাকা সংগ্রহের জন্য চিকিৎসার কথা বলে পারিবারিক বজরায় ঢাকা যাচ্ছেন। ঢাকার নিকটবর্তী ডেমরাঘাটে জমিদার পত্নী বিপন্ন তাহেরাকে দেখেন। তাহেরাকে তাদের বজরায় আশ্রয় দেন। তাহেরাকে জোর করে এক বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে এই বিয়ে মানে না, পালিয়ে আসে। এদিকে বহিপীর নামে এক পীর হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। সাধারণ কথ্যভাষা তার কাছে অপবিত্র হওয়ায় তিনি বহি বা বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে তার নাম বহিপীর। বহিপীর একপর্যায়ে জানতে পারেন তার স্ত্রী তাহেরা এই বজরাতেই আছে। বহিপীরের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহেরাকে তার সঙ্গে নিতে পারেন না; বরং তাহেরা হাশেমের হাত ধরে চলে যায়। এতে বহিপীর মনুক্ষুণ্ন হলেও হাতেম আলীর জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন- এমন ইতিবাচক আভাস দিয়ে নাটকটি শেষ হয়। 'বহিপীর' স্বল্পায়তনের নাটক। ঘটনার সময়কাল মাত্র একদিন। তবে এই ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বিশালতা প্রতিফলিত।

CamScanner

সৈয়দ মুজতবা আলী

১. সৈয়দ মুজতবা আলীর চারটি গ্রন্থের নাম লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাস- 'শবনম' (১৯৬০), ছোটগল্পগ্রন্থ- চাচা কাহিনী (১৯৫২), প্রবন্ধগ্রন্থ- পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২, রম্যরচনা) এবং ভ্রমণকাহিনী- দেশে বিদেশে (১৯৪৯)।

শবনম (১৯৬০) উপন্যাসের বিষয়বস্তু একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান বড়লোকের একমাত্র সুন্দরী মেয়ে শবনম-এর বিপরীতে এক বাঙালি যুবকের অসম প্রেমের কাহিনী।

চাচা কাহিনী (১৯৫২) বেশ কয়েকটা গল্পের সমাহার। গল্পগুলো জার্মানীর বার্লিন শহরের এক শক্তিমান চরিত্র চাচাকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে। এর প্রায় প্রতিটি গল্পই বিদেশের পটভূমিকায় রচিত। বিশেষ করে বার্লিন প্রবাসী বাঙালি তরুণ ছাত্রদের নিয়ে রচিত।

পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২) রম্যরচনা। বইটি দুটি পর্বে সাজানো। প্রথম পর্বে প্রবন্ধ রয়েছে মোট ৩৫টি আর দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ৩৪টি। এ বইয়ের বেশিরভাগ রচনা ত্রিশের দশকের সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে রচিত।

দেশে বিদেশে (১৯৪৯)। আফগানিস্তানের কাবুলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। এর প্রধান চরিত্র লেখকের ভৃত্য আব্দুর রহমান।

২. সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক পরিচয় দিন।

উত্তর : সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন একজন বহুমাত্রিক প্রতিভাধর সাহিত্যিক। তিনি শুধু রম্য লেখক বা সাহিত্যিক নন, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, অনুবাদক ও রম্যরচয়িতা। বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য রচনাশৈলীর প্রবর্তক। তার রচনা একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য এবং রম্যবোধে পরিপুষ্ট। শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় সেখানের বিশ্বভারতী নামের হস্তলিখিত ম্যাগাজিনে লিখতেন। পরবর্তীতে 'সত্যপীর', 'ওমর খৈয়াম', 'টেকচাঁদ', 'প্রিয়দর্শী' প্রভৃতি ছদ্মনামে দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, সত্যযুগ, মোহাম্মদীসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখেছেন। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনিসহ গ্রন্থাকারে তার মোট ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দেশে-বিদেশে, জলে-ডাঙায়, অবিশ্বাস্য, শবনম, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী এবং ছোটগল্প চাচা-কাহিনি, টুনি মেম প্রভৃতি। তিনি ভ্রমণকাহিনির জন্য বিশেষভাবে জনপ্রিয়। বিবিধ ভাষা থেকে শ্লোক ও রূপকের যথার্থ ব্যবহার, হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।

CamScanner

৩. সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : সৈয়দ মুজতবা আলী কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কাবুলে ভ্রমণ ও থাকাকালীন দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ নিয়ে লেখা গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে'। কলকাতা থেকে পেশোয়ার হয়ে কাবুল যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে কাহিনি শুরু হয়। কাবুলে তিনি বিভিন্ন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হন। বিভিন্ন রসবোধের সাহায্যে তাদের সাথে কথোপোকথন ও দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ তুলে ধরেন। কাহিনিতে তিনি শুধু স্থানের নামই উল্লেখ করেন নি, সেখানকার মানুষের ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা সবকিছু নিয়েই আলোচনা করেছেন। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রক্ষাপটে কাবুল ত্যাগের করুণ কাহিনির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ কাহিনি শেষ হয়। এর প্রধান চরিত্র লেখকের ভৃত্য আব্দুর রহমান। আব্দুর রহমান সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তি-

> *'বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আব্দুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আব্দুর রহমানের হৃদয়।'*

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণ কাহিনি হওয়া সত্ত্বেও এটি আফগানিস্তানের লিখিত ইতিহাসের একটি অনবদ্য দলিল।

সৈয়দ শামসুল হক

১. সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন। *[৪০তম বিসিএস]*

অথবা, 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কেন সফল? *[৩৭তম বিসিএস]*

উত্তর : সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। এ কাব্যনাট্যের মূল প্রতিপাদ্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অতি পরিচিত গল্প। গল্পের মাতবর পাকিস্তানপন্থী। মাতবর মিলিটারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেও নিজের মেয়েকে রক্ষা করতে পারে নাই। অপমানে মেয়ে আত্মহত্যা করে। এদিকে মুক্তিবাহিনীর আগমনের আওয়াজে সে ভাঙনের সুর শুনতে পায়। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী আসার আগেই মতবরের নিজের পাইক তাকে গুপ্তির ফলা দিয়ে মেরে ফেলে। এ সময় পাইক বলে-

> *'আপনার কোন ঈমান ছিল না।'*

'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক হলেও এতে মুক্তিযুদ্ধের কোন দৃশ্য নাই, তবে যুদ্ধের আবহ আছে। আছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মানুষের পক্ষ-বিপক্ষে যৌক্তিক-অযৌক্তিক অবস্থান। সংলাপ-প্রতি সংলাপে এগিয়ে গিয়েছে নাটকের কাহিনি। এছাড়া মাতবর চরিত্রের দ্বন্দ্ব, তার মেয়ের আত্মহত্যা ও পাইকের হাতে

তার মৃত্যু এক ধরনের নাটকীয়তা তৈরি করেছে। আর এ সবকিছু নাটকটিকে করেছে শিল্প সফল। নাটকের শেষে পীরকে বলতে দেখা যায়-

'দাগ, একটা দাগ রাইখা যায়।'

এর মধ্য দিয়ে লেখক পাঠককে একটি বার্তা দিয়েছেন।

২. 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের পরিচয় দিন।

উত্তর : সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' (১৯৮২)। নূরলদীন রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের প্রাণ পুরুষ। গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস দেবী সিংকে রংপুর অঞ্চলের ইজারাদার হিসেবে নিয়োগ করেন। দেবী সিং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করে। অতিরিক্ত কর প্রদানে ব্যর্থ হয়ে দেবী চৌধুরানীসহ বহু জমিদার তাদের জমিদারী হারান। ফলে নুরলদীনের নেতৃত্বে রংপুর অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। প্রাণপণ যুদ্ধ করে নূরলদীন বন্দী ও নিহত হন। মৃত্যুর সময় নুরুলদীন বলে যায়-

'এক নূরুলদিন যদি চলি যায়, হাজার নূরুলদীন আসিবে বাংলায়। এক নূরুলদীন যদি মিশে যায়, অযুত নূরুলদীন আসি যায়। নিযুত নূরুলদীন যেন বাচি রয়।'

নূরলদীন এ নাটকের মূল চরিত্র হলেও তার জীবন বর্ণনা এ নাটকের লক্ষ্য নয়। বরং সময়ের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে একজন নূরলদীন আত্মপ্রকাশ করে লেখক তাই দেখাতে চেয়েছেন। যখনই অন্যায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কোন এক নূরলদীনের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে-

'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?'

৩. সৈয়দ শামসুল হকের গল্প-চারিত্র্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের গল্প সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক অনতিক্রান্ত শিল্পী। তাঁর গল্পজীবনের দুটি পর্ব স্পষ্ট- প্রথম পর্বে তিনি বৃহত্তর জনজীবনের পটে গল্প লিখেছেন, আর দ্বিতীয় পর্বে মানবজীবনের অন্তঃসঙ্গতি ও অন্তঃবাস্তবতা অঙ্কনে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন। তাঁর গল্পে জীবন ভিন্ন সুর পেয়েছে, গল্পে দেখা দিয়েছে প্রাণ। নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অসঙ্গতি আর নির্বেদ অঙ্কনেই সৈয়দ শামসুল হকের মনোযোগ সমধিক। আমাদের সামাজিক অবস্থার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নাগরিক জীবনাচর্য নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে তিনি কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হয়েছেন। তার গল্পের ভাবনা ও উপাদান আরোপিত, ফলে শিল্পসার্থক হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। 'আনন্দের মৃত্যু', 'পরাজয়ের পর', 'বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যে', 'শেষ বাস' প্রভৃতি গল্পে এ ধরনের কৃত্রিমতা স্পষ্ট। শামসুল হকের গদ্যরীতির প্রধান লক্ষ্য কাব্যময়তা।

প্রতীক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে তিনি পাশ্চাত্য রীতিপ্রভাবিত সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তার কোন কোন গল্প যেমন রক্তগোলাপ এর ভাষা বিষয়ানুগ, স্বচ্ছন্দ ও গীতময়। এ সবকিছু মিলে তৈরি করেছে তার গল্পের স্বাতন্ত্র্য।

৪. বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়।

উত্তর : সব্যসাচী অর্থ যার ডান বাম দুই হাত সমানভাবে চলে। সাহিত্যের সকল শাখায় সমানভাবে যে লেখকের পদচারণা রয়েছে তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক বলতে রবীন্দ্রনাথকে বোঝায়। কারণ তিনি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে বুদ্ধদেব বসুকেও সব্যসাচী লেখক বলা হয়। যদিও তিনি রবী ঠাকুরের মতো সবদিকে অবদান রাখতে পারেন নি। সৈয়দ শামসুল হক এদের বিচারে অবশ্যই সব্যসাচী লেখক নন। তাকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে অভিহিত করার ক্ষেত্রে তার কয়েকজন অনুরাগী এবং তিনি নিজেও চেষ্টা করেছেন। তার প্রথম দিককার গ্রন্থগুলো তার ভাইয়ের 'সব্যসাচী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হওয়ায় ভক্তরা তাকে সব্যসাচী লেখক বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য যে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার প্রকাশিত গ্রন্থ থাকলেও শিল্প-সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে সমান অবদান নেই।

হাসান আজিজুল হক

১. হাসান আজিজুল হকের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : হাসান আজিজুল হক মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায়ই 'মাটি ও মানুষ' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তবে সেটি আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৬০ সালে 'বৃত্তায়ন' নামে আরও একটি উপন্যাস লেখেন। ১৯৯১ সালে সেটি উপন্যাসিকা আকারে প্রকাশিত হয়। লেখালেখির চার দশক পরে ২০০৫ সালে প্রকাশ করেন তার আরেক উপন্যাস 'শিউলি'। তবে এটিকেও তিনি উপন্যাসিকা বলেন। শেষ পর্যন্ত তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আগুনপাখি', যা ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় 'সাবিত্রী উপাখ্যান' উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রাবস্থায় রচনা করেন 'শামুক' নামে এক সামাজিক প্রতিচিত্রের বাস্তবধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হলেও বই আকারে প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লব পরবর্তী সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতভাগ, বিলেতি পণ্য বর্জন, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো বিস্তৃত পরিসরজুড়ে বিস্তৃত তার উপন্যাসের কাহিনী।

©Nazmus Sadat
CamScanner

২. হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : হাসান আজিজুল হক কথাসাহিত্যের শক্তিমান লেখক। বাঙালির জাতীয় জীবনের অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরে ঘটে যাওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সকল পরিবর্তনকেই কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংঘাত, বস্ত্রসংকট, দেশভাগ, উত্তরকালে সৃষ্ট উদ্বাস্তু ও শরণার্থী সমস্যা, পাকিস্তানের স্বৈরশাসন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল পর্যায়, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতা, গণতন্ত্রের অপমৃত্যু, সামরিকতন্ত্রের উত্থান ও বিকাশ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়। বাংলা কথাসাহিত্যের নির্মাণকৌশলের প্রতিটি অনুষঙ্গে, যেমন আখ্যান-নির্মাণ, ভাষারীতি, শব্দসৃজন, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস, সংলাপ-নির্মাণ, রূপক-উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদিতে হাসান আজিজুল হক নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেন। সময়, সমাজ, দেশ ও মানুষ যে বাস্তবতার মুখোমুখি। সে বাস্তবতাকে শিল্পায়িত করতে যে ধরনের আখ্যান ও গল্পভাষার প্রয়োজন ঠিক সে ধরনের আখ্যান ও গল্পভাষা নির্মাণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি লেখা অভিজ্ঞতার নিজস্ব রূপায়ণ। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের নামকরণ থেকে শুরু করে নির্মাণকৌশলের প্রতিটি অনুষঙ্গ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

৩. হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : হাসান আজিজুল হকের উত্তম পুরুষে লেখা উপন্যাস 'আগুনপাখি' (২০০৬)। এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা চরিত্রনির্ভর কাহিনী নয়। সময়-সমাজ-মানুষ– এই তিনে মিলে তৈরি হয়েছে এর ক্যানভাস। উপন্যাসের কাহিনি বর্ধমান জেলার বাঁকুরা অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবার ও পরিবারের আশেপাশের হিন্দু-মুসলমানদের জীবন থেকে নেওয়া। একজন গ্রাম্য নারীর বয়ানে পুরো উপন্যাসটা বর্ণিত হয়েছে। তিনিই উপন্যাসের কথক-চরিত্র, সাহিত্যের ভাষায় মূল প্রটাগনিস্ট। তিনি একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে, আবার একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ। উপন্যাসে তিনি মেঝ বউ নামে পরিচিত। তাদের একান্নবর্তী সংসারে এক সময় ভাঙ্গন ধরে, রব উঠে দেশটাও নাকি ভাগ হয়ে যাবে। অবিশ্বাস্য সেই ঘটনাও একদিন সত্য হয়। মুসলমান আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা ভিটে ছেড়ে চলে যেতে থাকে। উপন্যাসের শেষে মেঝ বউয়ের স্বামী 'কত্তা' পরিবার নিয়ে পাকিস্তানে যেতে চাইলে মেঝ বউ বেঁকে বসে। সে পাকিস্তান যেতে কিছুতেই রাজি হয় না। সে বলে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা দেশ কেন প্রয়োজন? এ দেশটি আমার নয়? তার মুখে আটপৌঢ়ে ভাষায় বলা এক বুক ভাঙ্গা দেশ ভাগের গল্প 'আগুনপাখি'।

CamScanner

৪. হাসান আজিজুল হকের গল্পের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

উত্তর : বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হাসান আজিজুল হক। তিনি গ্রামীণ (বিশেষত উত্তর বাংলার) মেহনতী মানুষের সমষ্টিগত জীবন নিয়ে বাংলা গল্পধারায় নির্মাণ করেছেন আপন উপনিবেশ। তাঁর গল্পে উঠে এসছে গ্রামীণ জনপদের ভাঙন, সামাজিক শোষণ- কখনো প্রতিবাদ বা বাঁচার সংগ্রাম। প্রথম দিকে তিনি সামাজিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় ধরতে ব্যক্তিমানুষের যৌন-জীবনের পদস্খলনকেই তাঁর গল্পের শিল্প উপাদান করেছেন। পরে তিনি রাঢ় বাংলায় বৃহত্তর জনজীবন থেকে তুলে এনেছেন বেঁচে থাকার সঞ্জিবনী সুধা, দ্রোহ-বিদ্রোহ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা। 'জীবন ঘষে আগুন' (১৯৭৩) এবং 'নামহীন গোত্রহীন' (১৯৭৫) গল্প সংকলনের গল্পগুলোতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ। তাছাড়া শীতের অরণ্য, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, সমুদ্রের স্বপ্ন, জীবন ঘষে আগুন, পাতালে হাসপাতালে, আমরা অপেক্ষা করছি, রোদে যাবো, মা-মেয়ের সংসার, রাঢ় বঙ্গের গল্প প্রভৃতিতে ভাষা প্রয়োগ এবং সংলাপ নির্মিতিতে তিনি নিরীক্ষা প্রিয় কথাশিল্পী। প্রকৃতির চিত্রাঙ্কণে তাঁর নৈপুণ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাসান হাফিজুর রহমান

১. বাংলা সাহিত্যে হাসান হাফিজুর রহমান কেন স্মরণীয়?

উত্তর : হাসান হাফিজুর রহমান কবি ও সাংবাদিক। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ঐ বছরই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'অমর একুশে' প্রকাশিত হয়। ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (মার্চ, ১৯৫৩) সম্পাদনা করেন। এতে ৬টি বিভাগে ২২ জন লেখকের লেখা আছে। বিভাগগুলো হলো- কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস। সংকলনটি পুঁথিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প'-এর প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁর সম্পাদনায় ১৬ খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলীলপত্র' প্রকাশিত (১৯৮২-৮৩) হয়। এসব কারণেই হাসান হাফিজুর রহমান বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়।

২. হাসান হাফিজুর রহমান কী অর্থে যন্ত্রণাদগ্ধ কবি?

উত্তর : হাসান হাফিজুর রহমানের সচেতন অভিজ্ঞতার প্রকাশ সবচেয়ে স্পষ্ট তাঁর কবিতায়। তাঁর সমকালে জাতির মেধা, মনন ও আবেগ জীবনে যে অস্থিরতা, ক্ষোভ, দ্রোহ, উল্লাস ও যন্ত্রণার পুঞ্জীভবন ঘটেছিল, তাঁর কাব্যসাধনার সাথে তা জড়িয়ে আছে অভিন্ন সূত্রে। আত্মসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের প্রবলতায়, সমষ্টি অস্তিত্বের যন্ত্রণা-

পীড়নের ধারাবাহিকতায় এবং ত্যাগ, সংগ্রাম ও রক্তদান সত্ত্বেও সমাজজীবনের উত্তরণহীনতায় তাঁর জীবনার্থ পরিণামে অস্থির, অমীমাংসিত। তাঁর দর্শনে শান্তি নেই, তিনি যন্ত্রণাদগ্ধ, উন্মথিত, অস্থির। ঐ যন্ত্রণা তাকে প্রগতিবিশ্বাসী করে তোলে, ঐ যন্ত্রণার প্রবলতাই তাঁর মধ্যবিত্ত মানব অস্তিত্ব চিহ্নিত করে। উন্মুল ব্যক্তি তাঁর কবিতার কেন্দ্রে, ঐ ব্যক্তি সমাজে গ্রথিত হতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমাজ অসংলগ্ন, ঐ অসংলগ্নতা, ঐ গ্রথিত হতে না পারার আর্তি কিংবা যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় প্রাণ পেয়েছে। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা কবিতার অভিজ্ঞতায় শোধন করেন। ঐ শোধনের পথেই তিনি দগ্ধ হন যন্ত্রণায়, বাসনায়, সংবেদনায়। যন্ত্রণা তাঁকে শিখিয়েছে- আত্মসন্ধান ও আত্মপরীক্ষা, ঐ আত্মসন্ধান ও আত্মপরীক্ষার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কবিতায় মনের ব্যবহারে রূপান্তর আনেন, আন্তরিক আত্মজীবনীর পর্যায়ে গেঁথে তোলেন, সময় ও জীবন।

৩. হাসান হাফিজুর রহমানের 'আর্ত শব্দাবলি' কাব্যের মূলকথা লিখুন।

উত্তর : হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্য 'আর্ত শব্দাবলি'। এ কাব্যের বিষয়গত বিস্তার গ্রীক মিথ থেকে শুরু করে সমকালীন জীবনের কল্লোলিত মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। কবি নিজেকে স্বদেশের পটে স্থাপন করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্তি অস্তিত্বের একক উপস্থিতি থাকলেও কালের প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তিগত সংকটের যন্ত্রণাকে তিনি দেশ ও মৃত্তিকার সাথে একীভূত করেছেন। কবি ব্যক্তিত্বের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বদেশের ক্ষতবিক্ষত অবয়ব, তার সমাজমনস্তত্ত্ব। রাজনৈতিক জটিলতা তাঁর কবিমানসকে অধিকতর সংকটাপন্ন করেছে। মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্লেষণ, বিষাদ, পরিচয়হীনতা, আত্মধিক্কার, বিদ্রূপ, যন্ত্রণা, পরাজয়-চেতনা, পলায়নী মনোবৃত্তি, আত্মাবর্তন, ব্যর্থতা যেভাবে ভাষারূপ পায় তাও এক বিচলিত অথচ উজ্জীবনধর্মী কবিকেই চিনিয়ে দেয়। তাই তিনিই বাংলাদেশের সবচেয়ে চৈতন্যে জাগরিত কবি। 'আর্ত শব্দাবলি' কাব্যের মিথ ও ঐতিহ্য অঙ্গীকার এ কারণে চৈতন্যের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যমুখী। বিশ্বজনীন কাব্যোপকরণের মধ্যে কবি স্বকাল উপযোগী জীবনজিজ্ঞাসাকে রূপদান করেছেন।

৪. হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্পের স্বরূপ তুলে ধরুন।

উত্তর : প্রগতিশীল সমাজচিন্তা হাসান হাজিফুর রহমানের শিল্পী মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিতার মতো গল্পেও তিনি রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁর 'আরো দুটি মৃত্যু' (১৯৭০) গল্প সঙ্কলনের গল্পগুলো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মানবাত্মার জাগরণ আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন পর্যবেক্ষণ এবং প্রাগ্রসর সমাজের আশাবাদই তাঁর গল্প সাহিত্যের কেন্দ্রীয় ভাব। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, মহামারি, শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র, জীবনের দৈনন্দিনতা এবং সর্বোপরি

©Nazmus Sadat
CamScanner

মানুষের জাগতিক ও মানসিক দ্বন্দ্ববৈচিত্র্যকে তিনি গল্পের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গল্পপ্রকরণে তিনি বিশেষ প্রযত্নবান তা বলা যায় না। তবে তাঁর কোন কোন গল্প সাংকেতিকতায় ও রূপকব্যঞ্জনায় অর্জন করেছে বিশিষ্টতা।

হুমায়ুন আজাদ

১. প্রাবন্ধিক হিসেবে হুমায়ুন আজাদের কৃতিত্ব আলোচনা করুন। *[৩৩তম]*

উত্তর : বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদ সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায়ই প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি লিখেছেন প্রবন্ধ। আশি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনায় হুমায়ুন আজাদ ভিন্নতার সৃষ্টি করেন। ভিন্নতা তৈরি করেন বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীর দিক থেকে। হুমায়ুন আজাদ পূর্ববর্তী প্রবন্ধ সাহিত্যে কবিতা বিষয়ক লেখা খুব একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি সাহিত্যজীবনের শুরুর দিকের একটি প্রবন্ধ সমগ্র 'আধার ও আধেয়' বইটি শুরু করেছেন 'কবিতার ভবিষ্যত' প্রবন্ধ দিয়ে। একইভাবে আধুনিকতাবাদ, সমকালীন সাহিত্য, রাজনীতি, বাংলা বানান, ধ্বনিমালা প্রভৃতি বিষয় তার প্রবন্ধে উঠে এসেছে। তার প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা দু'টোই স্বকীয়। তার চিন্তার স্বকীয়তাই ভাষার নিজস্বতা সৃষ্টি করেছে। প্রবল যুক্তিবোধ ভাষাকে আরো গতিশীল করেছে। তার ভাষা প্রত্যয় সৃষ্টি করতে উদ্যত। তার ভাষায় প্রবন্ধের প্রাণ হচ্ছে মৌলিক চিন্তা। আর মৌলিক চিন্তা ছিল তার প্রবন্ধ রচনার গাঁথুনি। সার্বিক বিচারে তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বলা যায়।

২. 'হুমায়ুন আজাদ প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক' ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি, সমালোচক, ভাষা বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, কিশোর সাহিত্যিক এবং উপন্যাসিক। তিনি বহুমাত্রিক লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, রাষ্ট্র বিশ্লেষণ যেমন পাঠক দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে আবার কবিতা এবং উপন্যাস রচনায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতা, উপন্যাস ও গবেষণা সাহিত্য স্বতন্ত্র ধারা ও বিপুল প্রজ্ঞানির্ভর। ষাটের দশকে হুমায়ুন আজাদ কবিতাচর্চা শুরু করেন। গতানুগতিক ধারা ভেঙে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের মানুষ তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। তিনি বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন। মানুষের মনোভঙ্গি, স্মৃতি, দুঃখ-কষ্ট, যাপিত জীবন ঘিরে কবির আগ্রহ। তাঁর ভাষা দৃঢ়, কাহিনির গঠন সংহতিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক দর্শন স্বতঃস্ফূর্ত। 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' একটি নতুন মাত্রার উপন্যাস। এছাড়া তার 'নারী' গ্রন্থের জন্য তিনি সমালোচিত ও বিতর্কিত হন। জীবনের শেষভাগে হুমায়ুন আজাদ মৌলবাদ ও সামরিক শাসন বিরোধী, নারীবাদী ও যৌনবাদী লেখালেখির জন্য পাঠক সমাজে জোরালো দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

CamScanner

হুমায়ুন আহমেদ

১. বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?

উত্তর : সায়েন্স ফিকশনকে কল্পবিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে একে উপস্থাপন করা হয়। বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আশ্রিত গল্প কাহিনি ক্রমশই জনপ্রিয় হতে থাকে। সায়েন্স ফিকশন অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞানের গল্পে কাহিনিগুলো সবসময়ই বিজ্ঞাননির্ভর হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হুমায়ুন আহমেদের 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' (১৯৭৩) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এরপর তার লেখা বেশ কিছু কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'কপোট্রনিক ভালোবাসা' নামে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি 'কপোট্রনিক' নামে সিরিজ আকারে একের পর এক গল্প লিখেন। আর এভাবেই জন্ম হয় বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালের। বাংলাদেশের কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে আরোও কিছু উল্লেখযোগ্য নাম কাজী আনোয়ার হোসেন, অনিরুদ্ধ আলম, আলী ইমাম প্রমুখ।

২. হুমায়ুন আহমদের 'দেয়াল' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : হুমায়ূন আহমেদের সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল' (২০১৩)। উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে মেজর জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত কালসীমায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি গল্পের মত করে বলে গেছেন। উপন্যাসের কিছু চরিত্র বাস্তব থেকে নেওয়া। নাম-ধাম সবই বাস্তব, ঘটনা পরম্পরাও বাস্তবেরই অংশ। লেখক যেহেতু উপন্যাস লিখেছেন, তাই কিছু কাল্পনিক চরিত্র রয়েছে। ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস হলেও হুমায়ূন আহমেদ তাঁর লেখকসত্তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষাত্মক উক্তি। মাঝে মাঝে লেখক কবিতার চরণ, খনার বচন ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। 'দেয়াল' রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। ২০১১ সালের মাঝামাঝিতে হুমায়ূন আহমেদ এ উপন্যাস রচনা শুরু করেন। অন্যদিন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে কিছু তথ্য নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়। পরে হাইকোর্টের পরামর্শ অনুযায়ী লেখক এতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

CamScanner

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্র

১. কুবের, কপিলা, শশী, কুসুম চরিত্রসমূহ কোন উপন্যাসের অন্তর্গত? উপন্যাস দুটির রচয়িতা কে? *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর :

চরিত্র	উপন্যাস	লেখক
কুবের, কপিলা,	পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দোপাধ্যায়
শশী, কুসুম	পুতুল নাচের ইতিকথা	মানিক বন্দোপাধ্যায়

২. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। *[৩৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র রোহিনী। উপন্যাসের শুরুতেই রোহিনীকে দেখা যায় একজন বাল্য বিধবারূপে। সে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক রীতির কারণে সে জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু এমন বিধান সে মেনে নিতে নারাজ। তাই প্রথমে সে কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে প্রতারণা করে হরলালকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু হরলালও প্রতারণা করে। তারপরই সে প্রেমে পড়ে কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের। রোহিনী গোবিন্দলালের জন্য নিজের করা দোষ স্বীকার করে। গোবিন্দলাল তার প্রতি করুণাবশত কৃষ্ণকান্তের শাস্তি মওকুফ চায়। তখনই রোহিনী গোবিন্দকে নিজের ভাললাগার কথা বলে ফেলে। বলে-

'আমি তো মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।'

রোহিনী গোবিন্দকে পাবে না জেনে আত্মহত্যা করতে গেলে গোবিন্দলাল রোহিনীর প্রেমে পড়ে। গোবিন্দলাল রোহিনীকে নিয়ে যশোরে থাকে। অদম্য সাহসের কারণে রোহিনী বার বার ভুল করে। সে নিশাকরকে পছন্দ করতে শুরু করলে গোবিন্দলালের কাছে হাতে নাতে ধরা পরে। গোবিন্দলাল তাকে গুলি করতে চাইলে সে জানায়- এক সময় গোবিন্দলালকে না পাওয়ার আশঙ্কায় ডুবে মরতে গিয়েছিল কিন্তু এখন মরতে চায় না। কারণ সে গোবিন্দলালকে পেয়েছে, সাথে আরেকজনকেও মনে ধরেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতি নিয়ে রোহিনীকে খল চরিত্র হিসেবে রূপায়িত করেছেন। সে কূটিল কিন্তু সেই কূটিলতার পেছনের কারনগুলোও দেখিয়েছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। যার কারণে রোহিনীকে ঘৃণা করতে চাইলেও পারা যায় না।

৩. রবীন্দ্র-ছোটগল্পভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন। *[৩৫তম বিসিএস]*

উত্তর : রবীন্দ্রসৃষ্টির কল্যাণে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে অবিস্মরণীয় সব নারী চরিত্র।

'দেনাপাওনা' গল্পের চরিত্র নিরুপমা। জমিদার রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকা পণ স্বীকার করেন বাবা।

©Nazmus Sadat CamScanner

কিন্তু পণের পুরো টাকা দিতে পারেনি। ফলে শাশুড়ির নির্যাতনের শিকার হয় নিরুপমা। শেষ সম্বল বাড়ি বিক্রি করে বাবা পণের টাকা শোধ করতে চাইলে এবার নিরুপমা বাধা দেয়। সে বলে টাকা দেয়া হবে লজ্জার কারণ। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে নিরুপমার মৃত্যু হয়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল গ্রামের মেয়ে হলেও আধুনিক, রুচিশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সে অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে। তাই শ্বশুরবাড়িতে তাকে পদে পদে হেয় করার চেষ্টা চলে। মৃণাল সেসব তুচ্ছ করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। একটা সময় ক্লান্ত হয়ে সাংসারিক বন্দীদশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে। পুরীর তীর্থক্ষেত্রে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ মৃণাল চরিত্রকে স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পের ছোট বউ চন্দরা পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রবল ক্ষোভ আর সংসারধর্মত্যাগী এক নারী। চন্দরার স্বামী ছিদামের ভাই দুখিরাম স্ত্রী রাধাকে হত্যা করে। ছিদাম ভাইকে বাঁচানোর জন্য স্ত্রী চন্দরার ওপর দায় চাপায়। স্বামীর দেয়া অপবাদে বিস্মিত এবং হতবিহ্বল হয় চন্দরা। এক সময় স্বামী সত্য প্রকাশ করে চন্দরাকে খুনের দায় থেকে বাঁচাতে চাইলেও চন্দরা বাঁচতে চায় নি।

৪. সংক্ষেপে কপালকুন্ডলা চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কপালকুণ্ডলা। পিতৃমাতৃহীন কপালকুন্ডলা এক কাপালিকের তত্ত্বাবধানে অরণ্যে মানুষ হয়। প্রথমেই তাকে পরোপকারী ও সহানুভূতিশীল হিসেবে দেখা যায়। কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে। নবকুমারের প্রতি তার উক্তি-

'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।'

নবকুমারের সাথে বিয়ে হলে স্বামীগৃহ সপ্তগ্রামে যাত্রার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা দেবীর কাছে আর্শীবাদ প্রার্থনা করে। এ থেকে তার ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ননদ শ্যামার ওষুধ সংগ্রহ করতে রাতের অন্ধকারে একাকী বনে যায়। এর মাধ্যমে তার স্বাধীনচেতা দিকটি ফুটে উঠে। একই সাথে তাকে অভিমানী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে দেখা যায়। সে বলে-

'যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসিত্ব, তবে বিবাহ করিতাম না'

কপালকুণ্ডলা অরণ্যে বড় হওয়ায় সামাজিক রীতিনীতির সাথে অপরিচিত। ফলে ভিক্ষুককে স্বর্ণের গহণা দিয়ে দেয়। নবকুমারের প্রথম স্ত্রী মতিবিবি স্বামীর উপর অধিকারপ্রাপ্তির দাবি করলে সে বাধা দেয় না, নিজেই সরে যায়। সামাজিক বন্ধনের সাথে দ্বন্দ্ব প্রথমে সে মানিয়ে নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। একপর্যায়ে স্বেচ্ছায় সমাজ সংসার থেকে হারিয়ে যায়।

৫. 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশ চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *[৩২তম]*

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রিভুজ প্রেমের উপন্যাস 'গৃহদাহ'। সুরেশ-মহিম-অচলা এই তিন চরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র ত্রিভুজ প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। সুরেশের বন্ধু মহিম হচ্ছে উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু সুরেশ চরিত্রের সক্রিয়তাই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছে। অচলা ব্রাহ্মপিতার শিক্ষিতা কন্যা এবং মহিমের বাগদত্তা। সুরেশ বন্ধু মহিমের বিয়ে ভাঙার জন্য মহিমকে বুঝাতে একসময় অচলাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু অচলাকে প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ হয়। অচলার ব্যক্তিত্বের কাছে সুরেশের সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। সুরেশ অচলার হৃদয় জয় করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর সুরেশের প্রতিরোধহীন আবেদনে অচলা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে মহিম-অচলার নিরুপদ্রব লক্ষ্য খেই হারিয়ে ফেলে। মহিম সবসময়ই ছিল নিরুত্তাপ, আবেগহীন। এ সুযোগটাই কাজে লাগায় সুরেশ। অচলা নিজের অজান্তেই সুরেশের প্রবৃত্তিতে ইন্দন যোগায়। সুরেশের অসংযত আচরণে অচলা-মহিমের ঘর পুঁড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে নায়ক মহিমের নিরুত্তাপ ও স্থির চরিত্রকে প্রকটিত করতে তার বিপরীতে চঞ্চল ও অসংযত সুরেশ চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

৬. জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর নাম লিখুন। *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের কাব্যোপন্যাস 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। শিমুলতলী গ্রাম ও সেখানকার দুই সম্প্রদায়ের দুই চরিত্রকে লেখক নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান চরিত্র সোজন ও দুলী। শিমুলতলী গ্রামের মুসলমান চাষী দমির শেখের ছেলে সোজন আর নমুদের (হিন্দু) নেতা গদাই মোড়লের কন্যা দুলালী, যার ডাকনাম দুলী। সোজন ও দুলীর প্রেম কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। সোজনের গ্রাম ছেড়ে পলায়ন, কারাবাস, বেদে জীবন এবং সবশেষে করুণ পরিণতি এতে উঠে এসেছে।

৭. গফুর, মহিম ও মজিদ কোন উপন্যাসের/গল্পের চরিত্র? *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পের চরিত্র গফুর। মহেশ তার একটি ষাঁড়। গফুর তৎকালীন সমাজের নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি। গফুর চরিত্রের অলংকার হল তার স্নেহপরায়ণতা, সরলতা, মায়ামমতা, ধৈর্য্যশীলতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়ক মহিম। সে পড়াশোনায় ভালো, নিজের চেষ্টায় আইন পাশ করেছে। কিন্তু একটা গম্ভীর ও উদাসীন আবরণে সে নিজেকে আবৃত রেখেছে। উদাসীন হলেও সে কর্তব্যপরায়ণ। মহিমের উদাসীনতা সুযোগে সুরেশ চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেছে।

CamScanner

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। তাকে ঘিরেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত। মহব্বতনগর গ্রামে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে কথিত মাজার প্রতিষ্ঠা করে। মজিদ একটি প্রতীকী চরিত্র। কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক।

৮. 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের যে কোন একটি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৩১তম]

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম পত্র 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'। এ পত্রের শকুন্তলা আশ্রমকন্যা। রাজা দুষ্মন্ত শিকারে আসে এবং মনিবের অনুপস্থিতিতে রাজার অতিথি সৎকার করে শকুন্তলা। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা গান্ধর্ব মতে তাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর রাজা দুষ্মন্ত রাজ্যে ফিরে যায়। শকুন্তলার সাথে আর কোন সংবাদ বিনিময় করে নি। এদিকে বিরহে কাতর শকুন্তলা তার অন্তরের দুঃখের কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারছে না। তার ভয়, পাছে তার দুঃখের কথা শুনে বনদেব-দেবী দুষ্মন্তকে অভিশাপ দেয়। ভারতীয় যে সংস্কার পত্নীকে পতির কল্যাণকামী করে তোলে, সেই সংস্কার শকুন্তলার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বিরহব্যথা, অন্যদিকে স্বামীর কল্যাণ কামনা এই দোলাচলে পড়ে শকুন্তলার আহারে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। চেতনা ফিরে পেলেই সামনে আসে দুষ্মন্তের মূর্তি। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙে- শোকে মুর্ছিত হয়। শকুন্তলা বিরহে কাতর হলেও দিশেহারা হয় নি, আত্মমগ্নতায় নিমজ্জিত হলেও পতিকল্যাণ কামনাকেই মুখ্য ব্রত হিসেবে সামনে রাখে। তার একমাত্র আশা দুঃখ দুর্ভাগ্য অপনোদিত হয়ে অবশেষে সে পতির চরণে আশ্রয় লাভ করবে।

৯. 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। 'বীরাঙ্গনা' তাঁর বিদ্রোহী অন্তরের ফসল। পাশ্চাত্যের কবি ওভিদের কাব্যের অনুসরণে একুশটি পত্রে কাব্য লিখতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এগারোটি পত্রের সমন্বয়ে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছেন। পুরানের এগারোজন নারী তাদের স্বামী অথবা প্রেমিকের উদ্দেশে পত্রগুলো লিখেছেন। এরা হলেন- শকুন্তলা, তারা, রুক্মিনী, কৈকেয়ী, সূর্পণখা, ভানুমতি, দ্রৌপদী, দুঃশলা, জাহ্নবী, উর্বশী, জনা। এ কাব্যের নারীরা আভিধানিক অর্থে বীরাঙ্গনা না হলেও মধুসূদন দত্তের দৃষ্টিতে এরা প্রত্যেকেই আধুনিক এবং বিদ্রোহী সত্তার অধিকারী। এ কাব্যে তারা তাদের প্রেম, ক্ষোভ, দুঃখ, তিরস্কার, বেদনা, শোক ইত্যাদি প্রকাশ করেন। পুরাণকাহিনির খণ্ডাংশগুলি একদিকে বৃহৎ পটভূমির আভাস এনেছে, অন্যদিকে গল্প রস কিছু পরিবেশন করেছে। এ কাব্যে বেজে উঠেছে প্রতিটি নারীর হৃদয় গভীর থেকে উদ্ধৃত দীর্ঘশ্বাস ও সর্বহারা বেদনা হতাশার সুর।

CamScanner

১০. 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা কোন অর্থে বীরাঙ্গনা?

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ মনে রেখে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নামকরণ করেননি। এই কাব্যের নায়িকারা অস্ত্র হাতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি, তবুও মাইকেল তাদের বীরঙ্গনা বলে অভিহিত করেছেন। তৎকালীন সমাজের নারীরা সবদিক থেকে অবরুদ্ধ ছিল। নারীর নিজের কোন ভাবনা ছিল না। আত্মমর্যাদাবোধও নারীদের বিলুপ্তপ্রায় ছিল, অন্ধ সংস্কারে চাপা পড়ে ছিল তাদের সমস্ত মানবিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা প্রত্যেকে যুক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন। যুক্তি তাদের সাহস, আত্মমর্যাদাবোধ এবং কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ যে মানবিকবোধ জাগিয়ে তুলেছিল মধুসূদনের নায়িকারা সেই মানবিক বোধে উজ্জীবিত। বনবাসিনী শকুন্তলার পক্ষে হৃদয়ের অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে দুষ্মন্তকে বলা অথবা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা এ চিরাচরিত ভারতীয় নীতিবিরুদ্ধ। মধুসূদনের নায়িকারা দৈহিক বীরত্ব ও মৌখিক আস্ফালনের জন্য বীরাঙ্গনা আখ্যা পাননি, তাদের বীরত্ব চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতির শৃঙ্খল ও জড়তার আচরণ ঘুরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের সত্য প্রকাশে। বস্তুত ভাবগত যুক্তিশীলতা অর্থেই তারা 'বীরাঙ্গনা'।

১১. 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রমীলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী নারী চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা। প্রমীলা মেঘনাদের পত্নী। সে একদিকে যেমন সহজ-সরল, কোমল স্নেহময়ী, অন্যদিকে তেমনিই সন্তান, পরিবারের চরম দুঃসময়ে দুষ্টের সামনে ভয়াল মূর্তি ধারণ করে। সেই দিক থেকে কবি প্রমীলা চরিত্রের মাধ্যমে প্রকৃতির স্বাধীন চিত্তবৃত্তিকে চিত্রায়িত করেছেন। কবি বলেছেন-

'বীরেন্দ্র রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত!'

এতে প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্রমীলা রামের মতো পুরুষকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। নারীকণ্ঠের এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ আধুনিক কালেও বিরল। প্রমীলা ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদকে জয় করেছেন সতী নারীর সর্বজয়ী প্রেমের বলে। মেঘনাদের উক্তি-

'ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে।'

©Nazmus Sadat CamScanner

প্রমীলা শুধু প্রেম-সচেতন নয়, কর্তব্য সচেতনও। যুদ্ধগামী পতিকে যুদ্ধসাজে সাজাতে না পারার জন্য আক্ষেপ করেছেন। প্রমীলা চরিত্র চিত্রণে কবির অন্যতম কৃতিত্ব এইখানে যে, স্বল্পতম আয়তনে ও কাব্যের বহুবিচিত্র তাগিদের মধ্যে তিনি প্রমীলার নারী সত্তাটির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। এমন সম্পূর্ণ জীবন- চিত্র এই কাব্যে আর একটিও নাই।

১২. আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের 'ঠকচাচা' সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা। তার কথা :

'দুনিয়া সাচ্চা নয়- মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করব?'

এর মাধ্যমে তার সত্য পরিচয়টি উদ্ঘাটিত হয়েছে। মতিলালকে সওদাগরী করার পরামর্শ দিয়ে নিজের অর্থলিপ্সাকে সে পূর্ণ করেছে। আর তা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জালিয়াতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়। শাস্তিস্বরূপ ঠকচাচার দ্বীপান্তর হয়েছে। দ্বীপান্তরে যাবার সময় ঠকচাচার দুঃখ পাঠকমনে লঘু হাস্যের সঙ্গে সমবেদনা জাগ্রত করে। ঠকচাচা তার দ্বীপান্তরের সঙ্গী বাহুল্যকে বলে,

'ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে- মোকানবি গেল- বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না- মোর বড় ডর, তেনা বি পেল্টে সাদি করে।'

ঠকচাচার এই উক্তি তাকে অতি সাধারণ করে তুলেছে। ঠকচাচা দ্বীপান্তর যাত্রী কিন্তু, গৃহসুখের লালসায় কাতর। তার আশংকা দ্বীপান্তরে গেলে স্ত্রী হয়তো অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলবে। এর মাধমে লেখক মানবজীবনের এক সুগভীর দুর্বলতাকে পরিস্ফুট করেছেন। দুষ্কার্য ও শঠতা তার চরিত্রে থাকলেও, সে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। সবমিলিয়ে ঠকচাচা চরিত্র কেবল 'আলালের ঘরের দুলাল' নয়, সে যুগের কথাসাহিত্যের একটি বিস্ময়কর জীবন্ত চরিত্র।

১৩. দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের 'আয়েষা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের শেষ অংশের প্রধান চরিত্র আয়েষা। দুর্গেশনন্দিনী ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। কিন্তু আয়েষা চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। আয়েষা নবাব কতলুখাঁর কন্যা। আয়েষা চরিত্র সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন-

'উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা। এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি।'

একজন বিধর্মী, শত্রু, বন্দি মুমূর্ষু শত্রুপক্ষের সেনাপতি জগৎসিংহের সেবা শুশ্রূষায় যেভাবে আত্মমগ্ন হয়েছে তা আয়েষার এক মহান মানবিক সেবিকার নিদর্শন হিসেবে

পরিলক্ষিত হয়। সেবা করতে গিয়ে আয়েষা জগৎসিংহের প্রেমে পরে। অভিভাবকের স্থির করে দেয়া পুরুষের শয্যা ও রন্ধনশালার অংশীদার মধ্যযুগীয় নারীর বদলে তার চরিত্রে লেখক বুনে দিয়েছেন আধুনিক হয়ে উঠতে থাকা নারীর মানসিকতা। ধর্ম, সমাজ, সংসারের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে জগৎসিংহকে ভালোবাসলো আয়েষা। তারপর আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রিয় পুরুষের সুখের জন্য তাকে তার বাঞ্ছিতার হাতে তুলেও দিলো হাসিমুখে। সে বলে-

'যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এভাবে বিদায় লইব। তাহা মনে ছিল না।'

এভাবে নিজের শরীর, মন ও আত্মার ওপর কেবলমাত্র নিজের অধিকার দাবী রেনেসাঁ-উত্তর নারীশক্তির চরিত্রচিহ্ন। উপন্যাসের পটভূমি ৯৯৭ সালের, কিন্তু আয়েষা তাঁর প্রেমের ব্যাপারে একেবারেই উনিশ শতকের রেনেসাঁর নিশানবাহিকা। তবু আয়েষা সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্তা হতে পারেন নি। জগৎসিংহকে তিলোত্তমার হাতে তুলে দেবার পর আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু যন্ত্রণা ভোগেই নারীজন্মের সার্থকতা, নিজেকে বিনষ্ট করবার অধিকার তার নেই, এই প্রাচীন সামাজিক বিধানকে শিরোধার্য করে সে আত্মহত্যা করতে পারে নি।

১৪. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবের চরিত্রের বর্ণনা দিন।

উত্তর : 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবের মাঝি। তাকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। কুবের জেলেদের প্রতিনিধি। তার স্ত্রী মালা শারীরিকভাবে পঙ্গু। মালার প্রতি বরাবরই কুবেরের অকৃত্রিম ভালোবাসা। কেউ যদি মালাকে অসম্মান করে কুবের তা কখনো সহ্য করতে পারবে না।

সম্বলহীন কুবেরকে বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে কুবের হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপে আশ্রয় নেয়। কুবের মাঝির সাথে হোসেন মিঞার সম্পর্ক, তার ময়নাদ্বীপ অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি কপিলার প্রতি তার অবৈধ প্রণয়বাসনা সব কিছুর মধ্য দিয়ে যেন গোষ্ঠীজীবনকে দূরে রেখে কুবেরের ব্যক্তি জীবন কথাই অনেক বেশি রেখাপাত হয়েছে। এই জীবন কথার অর্থ নিছকই একজন শ্রমজীবী মানুষের গোটা জীবন কাহিনি। পদ্মার জেলেদের সবার জীবনেই একই ধরনের দুর্গতি লক্ষ্য করা যায়। মহাজনদের শোষণে মালোদের জীবন বিবর্ণ। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারে না।

১৫. 'পদ্মা নদীর মাঝি'র হোসেন মিয়া চরিত্রের বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া। উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি খুব বেশি নয়, তবুও সেই উপন্যাসের প্রাণ। বাড়ি নোয়াখালী অঞ্চলে। অনেক বছর জাহাজে চাকুরী করেছে। কেতুপুর গ্রামে এসে মাঝিগিরি করেই জীবিকা নির্বাহ করত। গত কয়েক বছরে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তবে ধনী হওয়া

সত্ত্বেও সে জেলেপাড়ার লোকেদের সঙ্গে আগের মতোই মেলামেশা করে। হোসেন মিয়া পাকা মাঝি। সে ম্যাপ দেখে দ্বীপের অবস্থান নির্ণয় করতে জানে। রাতের তারার গতিপথ দেখে সময় বলতে পারে। নির্ভুলভাবে কম্পাসের ব্যবহার জানে। হোসেন মিয়াকে দেখলে মনে হবে মুন্সী-মোল্লা জাতীয় মুসলমান। কিন্তু তার মধ্যে ধর্মীয় কোনো সংস্কারের সামান্য আঁচড়ও নেই। হোসেন মিয়া একজন স্বভাবকবি। সে ইচ্ছে করলে মুখেমুখে চমৎকার গান রচনা করতে পারে। সমুদ্রের বুকে হোসেন মিয়া একটি দ্বীপের পত্তন করে। বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র মানুষদের নিয়ে ময়নাদ্বীপে লোকবসতি গড়ে তুলে। এই ময়না দ্বীপকে ঘিরেই হোসেন মিয়ার সব স্বপ্ন। সেখানে সে এমন একটা জনসমাজ গড়ে তুলতে চায় মনুষ্যত্ব ও মানবতাই হবে সে সমাজের প্রধান ভিত্তি। সে ময়নাদ্বীপে মসজিদ-মন্দির স্থাপনের পক্ষপাতী না। হোসেন মিয়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো তার অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ বির্নিমাণের কারিগড়ি সত্তার রূপায়ন করতে চেয়েছেন।

১৬. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশী চরিত্রের দ্বন্দ্ব জটিলতা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের মূল নায়ক শশী। প্রগতিপন্থী হয়েও সে অদৃষ্টের পরিহাসকে অস্বীকার করতে অপারগ। সে বহুবার ভেবেছে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে শহরে। শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। আধুনিক ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গ্রামীণ হাসপাতালে থেকে যায় এবং মানুষ অন্বেষণে জীবন জুড়ে সাধনা করতে থাকে। শশীর মধ্যে এই দ্বিবিধ দিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করে ঔপন্যাসিক লিখেছেন-

> *"শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট।"*

শশী ও কুসুমের (বন্ধুর স্ত্রী) মধ্যে প্রেমের একটা দুর্বোধ্য রহস্যময় সম্পর্ক গড়ে উঠে। শশী কুসুমকে পুরোপুরি প্রশ্রয় দেয় না ঠিকই কিন্তু একদিন না এলে ব্যাকুল হয়ে উঠে। প্রথম দিকে কুসুম বার বার শশীর দ্বারস্থ হলেও শশী সাহস করে কুসুমকে কাছে টানতে পারেনি। কিন্তু শশী যখন ডাক দিয়েছে ততদিনে কুসুম আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। শশী কুসুমকে নিয়ে গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে বহু দূরে চলে যেতে চাইলে কুসুম দৃঢ় কণ্ঠে অসম্মতি জানায়। কুসুমের অনুপস্থিতে শশী অনুভব করে গাওদিয়া গ্রাম যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তার কাছে স্বস্তি ও ভালোলাগার ব্যাপারগুলো মলিন হয়ে গেছে। উপন্যাসে বলা হয়েছে-

> *"তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার সখ এজীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।"*

©Nazmus Sadat CamScanner

১৭. শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'ইন্দ্রনাথ' চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী কিশোর চরিত্র ইন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে উজ্জ্বল চরিত্র হিসেবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। ইন্দ্রনাথের মধ্যে রয়েছে সাহস ও সরলতার এক অপূর্ব মিশ্রণ। সিদ্ধি বা সিগারেট সেবন, মাছ চুরি, সাপের সঙ্গে সহজ বিচরণ সবই সে করে। কিন্তু তার মধ্যে এগুলো লুকানোর কোন প্রবণতা নাই। সে অনায়াসে তার অপকর্মগুলো স্বীকার করে। সমাজে প্রচলিত সংস্কারে একেবারেই তার বিশ্বাস নেই। সদ্যমৃত শিশুর প্রেতাত্মা তার কাছাকাছি রয়েছে এ ধারণা তাকে কাবু করতে পারেনি। মৃতশিশুকে পরম মমতায় বুকে নিতে গেলে শ্রীকান্ত বলে-

'কি জাতের মড়া, তুমি ছোঁবে?'

সে বলে- 'মড়ার আবার জাত কি?'

ইন্দ্রনাথের নির্ভীকতা, পরদুঃখকাতরতা, সারল্যের স্নিগ্ধতা শ্রীকান্তকে মুগ্ধ করেছে। ইন্দ্রনাথ তার যুক্তিতর্ক, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে হৃদয়ে সত্যবোধের স্বচ্ছতা পোষণ করতে সমর্থ হতো। এ দিকটার ইঙ্গিত করে শ্রীকান্ত বলেছে-

'অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক কোনদিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকে পাইবে, তাহা বিচিত্র নয়।'

ইন্দ্রনাথের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শ্রীকান্ত তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। শ্রীকান্তের সারা জীবনের পথ চলায় ইন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। তবে লেখক ইন্দ্রনাথ চরিত্রের বিকাশকাল কৈশোরেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

১৮. শ্রীকান্ত উপন্যাসের 'শ্রীকান্ত' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্ত। উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ড শ্রীকান্তের স্মৃতিচারণ সূত্রে আবদ্ধ। শ্রীকান্তের জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সে সব ঘটনা ও চরিত্রের বাহুল্যের মধ্যে উপন্যাসের মূলসূত্র হিসেবে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয় কাহিনি শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের সূচনা সম্পর্কে উপন্যাসের শুরুতে নিজেই বলেন-

'কিন্তু কি করিয়া ভবঘুরে হইয়া পড়িলাম সে কথা বলিতে গেলে প্রভাত জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।'

ছোটবেলা থেকেই শ্রীকান্ত ভবঘুরে। ছোটবেলার ভীতু শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সহচর্যে হয়ে উঠেছে খেয়ালি। তাইতো জীবিকার তাগিদে গ্রহণ করা সন্ন্যাসগিরিতে ইস্তফা দেন মশার কামড় সইতে না পেরে, আবার জীবিকা অর্জনের জন্য বার্মা গেলেও

ভালোভাবে কাজ না খুঁজে দেশে চলে আসেন, আবার বার্মা যান এভাবে ঘুরে ঘুরেই জীবন কাটান, সংসারে আবদ্ধ হন না কখনো। শ্রীকান্তের জীবনে চলার পথে দেখা হয়েছে অনেক নারী চরিত্র। অন্নদাদিদি, পিয়ারী, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, কমললতা। অস্থিরতায় আচ্ছন্ন শ্রীকান্ত কোথাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি- কোন নারীর মনেও না; নারীর জন্যও না। নানা ঘটনার আবর্তে অসংখ্য নর-নারীর সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা-ই শ্রীকান্তের জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ।

১৯. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নারী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে উপস্থাপিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র নারী চরিত্র রূপায়ণে পুরুষের বিপরীতে নারীকে স্থাপন করেননি। বরং স্বতন্ত্র মানবসত্তা হিসেবে রূপায়ন করেছেন। সেসব নারীর কেউ কেউ সাধারণ মেয়ে, কেউ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, কেউ বা সমাজের দৃষ্টিতে ভ্রষ্টা। নারী চরিত্র রূপায়ণে তাঁর আখ্যানগুলো সহজ-সরল ভাষায় এবং আটপৌরে রোমান্টিক ভাবাদর্শে বিবৃত হয়েছে। 'শ্রীকান্ত'র অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া ও কমললতা। 'গৃহদাহ'র একদিকে অচলা অন্যদিকে মৃণাল, চরিত্রহীনের একদিকে সাবিত্রী অন্যদিকে কিরণময়ী, তবে 'শেষ প্রশ্ন'র কমল একেবারে আলাদা। 'পথের দাবী'র ভারতী, তারও আগে 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুবাসিনী, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী এবং'নিষ্কৃতি'র শৈলজা সরল ও স্নেহপ্রবণ নারীদের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এসব চরিত্র অনেক চরিত্রের ভিড়েও নিজস্ব প্রবণতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে আলাদা। শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম বঙ্কিম মতবাদের প্রতিবাদ করে দেখালেন যে বিধবা, পতিতা তথা সমাজ বিগর্হিত নারীর অন্তরেও আছে নিষ্পাপ প্রেম। তিনি নীতির কাছে শিল্পীর পরাজয় মেনে নেননি। কেননা নারীর সতীত্বের চেয়ে নারীর নারীত্বই শরৎসাহিত্যে নারী চেতনার মর্মবাণী।

২০. পথের দাবী উপন্যাসের 'সব্যসাচী' চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের এক উগ্র দেশপ্রেমিক চরিত্র সব্যসাচী ওরফে ডাক্তারবাবু। পুলিশের খাতায় তার নাম 'সব্যসাচী' আর সকলে 'ডাক্তার' বলে ডাকে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এ অসাধারণ বিপ্লবী সব্যসাচী। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব বার্মা মুল্লুকে গড়ে তোলেন 'পথের দাবী' নামের সংগঠন। শরৎচন্দ্র পরাধীনতার শেকল ভেঙে এক নতুন জাগ্রত সমাজ তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন, আঘাতে আঘাতে সমাজকে পরিবর্তন করতে হবে আগামীর জন্য। শরৎচন্দ্রের এই ভাবমূর্তি দেখা যায় সব্যসাচী চরিত্রের মধ্যে। তিনিই এই বিপ্লবের নায়ক। তার ভাষায়-

'ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ, এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই।'

অন্যদিকে তার মধ্যে পাওয়া যায় সনাতনী চেহারা। পরিবর্তন চায়, কিন্তু পুরাতন শেকল ভেঙে ফেলার জন্য যে বিপ্লবের দরকার, তাতে ভয়ও হয়। ভবিষ্যতের জন্য কেন আজকের সময়গুলো নষ্ট, কেন আজকের মানুষগুলোর ওপর অন্যায়, কেন শুধু তথাকথিত এলিট ক্লাস নিয়েই চিন্তা, কেন প্রান্তিক মানুষগুলো জানতেও পারবে না স্বাধীনতা কী, কেন তারাও অংশগ্রহণ করবে না?- ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মাথায় ঘোরে সব্যসাচীর মাথায়।

বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশার অভিজ্ঞতা থেকেই শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীর মধ্যে বিপ্লবীদের একটি 'টাইপ' তৈরি করেছিলেন। এই বিপ্লবী টাইপটিকেই ভয় করতেন ইংরেজ সরকার। তাদের আশঙ্কা, 'পথের দাবী'র সব্যসাচী, বাস্তব সব্যসাচীদের মনে সংগ্রামের বীজ বপন করবে। এই প্রবণতা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক।

২১. দেবদাস উপন্যাসের 'পার্বতী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাস উপন্যাসের চরিত্র পার্বতী। দেবদাস ও পার্বতী বাল্যবন্ধু। এদের প্রেমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় চিরাচরিত সমাজ। দেবদাসের সাথে পারুর বিয়ের কথা ওঠে। প্রস্তাবটা আসে পারুর মায়ের কাছ থেকেই। কিন্তু দেবদাসরা জমিদারবাড়ির হওয়ায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়-

'এই সংবাদটা পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের চিতর হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল।'

তবু পার্বতী মনে মনে দেবদাসকেই বর হিসেবে গ্রহণ করে। সই মনোরমার কাছে সে একথা স্বীকার করে। দেবদাস তাকে বিয়ে করবে কিনা এই প্রশ্ন তাকে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। এখানে এসে পার্বতীর চরিত্রের দৃঢ়তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। মেয়েরা এমন পদক্ষেপ নিতে হাজারবার ভাবে, কিন্তু পার্বতী সে দ্বিধায় ভোগেনি। গভীর রাতে পার্বতী কোনকিছুর পরোয়া না করে শুধু তার দেবদার টানে চলে যায়; কিন্তু দেবদাস তার মূল্য দিতে পারেনি। বলে-

'পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?'

এ অপমানটা পার্বতী নিতে পারেনি। তাই জবাব দিয়েছে পাল্টা আঘাতে। সেই আঘাত তাদের দুজনের জন্যই ছিল অনেক কঠিন, কিন্তু আত্মসম্মানটা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেনি। পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বড় বংশে। তবু মনে গভীরে ছিল দেবদাসের সযত্ন স্মৃতি। তাই সে সই মনোরমার কাছে চিঠিতে দেবদাসের কথা জানতে চায়। দেবদাস যখন মারা যায় তখন সে পাগলপাড়া হয়ে দেখতে যায়।

দেখতে না পেয়ে মুর্ছা যায়। এভাবে পার্বতী চরিত্রের মাধ্যমে দৃঢ় আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এক নারীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে।

২২. রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'হৈমন্তী'। বাবার সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলে মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েছে সে। কিন্তু বিয়ের পর হৈমন্তী একধরনের অবহেলার শিকার হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন মনে করেছিল হৈমন্তীর বাবা প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। যখন তারা জানতে পারল সে রকম না তখন থেকে হৈমন্তীর সাথে দুর্ব্যবহার শুরু হয়। বিয়ের সময় হৈমন্তীর বাবা অপুকে বলেছিলেন-

'যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার। ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।'

হৈমন্তীর স্বামী অপু ঠিকই মূল্য বুঝেছিল। স্বামী যে তাকে অনেক ভালোবাসতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা স্বামীর বিভিন্ন কথায় বুঝা যায়-

'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।'

স্বামী অপু বলে-

'সে আমার সাধনার ধন ছিল। সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।'

কিন্তু তখনকার সমাজে পুরুষরা নিজেদের পরিবারের বড়দের উপর কোনো কথা বলতে পারতো না। স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক ব্যবহার করা হচ্ছে না সেটি জেনেও স্বামী অপু কোন পদক্ষেপ নিতে পারে নি। নিজের স্বামীর থেকে কোনো সমর্থন না পেয়ে শ্বশুরবাড়ির মানুষের অবহেলায় বিবর্ণ ফুলের মতো হৈমন্তী অকালেই ঝরে যায়। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ সমাজের এমন কিছু দুষ্টক্ষত চিহ্নিত করেন, যার অন্যায় অনুশীলনের নির্মম শিকার হৈমন্তী এবং যুগে যুগে তার মতো নিষ্কলঙ্ক নারীরা।

২৩. 'দেনাপাওনা' গল্পের 'নিরুপমা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের চরিত্র নিরুপমা। সে মধ্যবিত্ত বাবা রামসুন্দরের আদরের মেয়ে। জমিদার রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অনেক টাকা পণ স্বীকার করেন বাবা। পণের পুরো টাকা দিতে পারায় নিরুপমা শাশুড়ির নির্যাতনের শিকার হয়। নিরুপমা সুন্দরী। কিন্তু সেই রূপের কোন কদর তার শাশুড়ির কাছে নেই। মেয়েকে সুখি করতে শেষ সম্বল বাড়ি বিক্রি করে দেন বাবা। কিন্তু এবার নিরুপমা পণের টাকা দিতে বাধা দেয়। সে বাবাকে বলে তার একটা সম্মান আছে, আত্মমর্যাদা আছে। টাকা দেয়া হবে লজ্জার কারণ-

'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।'

এই একটিমাত্র সংলাপে নিরুপমার ব্যক্তিত্ব ঝলসে উঠতে দেখা যায়। নিরুপমা চরিত্র তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে ভীতিকর সামাজিক ব্যাধি 'পণপ্রথা'র বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান। এ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি ধিক্কার এবং নারী হৃদয়ের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবহেলায় নির্যাতনে নিরুপমার মৃত্যু হয়। কিন্তু নিজের সম্মানটুকু ঠিকই বাঁচিয়ে রেখে মৃত্যুর স্বাদ নেয়। বাবার সঙ্গে শেষ দেখাও হয় না। নিরুপমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হাজার বাঙালি মেয়ের সকরুণ পরিণাম বিম্বিত হয়েছে।

২৪. রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র গল্পের 'মৃণাল' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র গল্পের চরিত্র 'মৃণাল'। মৃণাল গ্রামের মেয়ে হয়েও আধুনিক, রুচিশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অন্যায়ের প্রতিবাদে সত্য কথাটি সে সহজে উচ্চারণ করতে পারে। সে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; নারীর প্রতি স্বামীর পরিবারের অবহেলা, সংসারের সিদ্ধান্তে স্ত্রীর অংশগ্রহণকে মেনে না নেয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিবাদ করে। আর তাই শ্বশুরবাড়িতে তাকে প্রতি পদে হেয় করা হয়। তবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মৃণাল সেসব তুচ্ছ করে তার প্রতিবাদী ভূমিকা ধরে রাখে। সংসারে নারীর অবস্থান যে কত দুঃসহ তা নতুন ভাবে উপলব্ধি করে। একসময় সাংসারিক বন্দীদশা থেকে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে। সে পুরীর তীর্থক্ষেত্রে চলে যায়। এই চলে যাবার সিদ্ধান্ত পত্রের মাধ্যমে সে তার স্বামীকে জানায়-

'আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি।'

বাঙালি ঘরের এক বধূর এই সাহসী ভূমিকা ছিল চমকপ্রদ। মৃণাল নিজেই বলে সে আত্মহত্যা করবে না বরং স্বাধীনভাবে বাঁচবে। রবীন্দ্রনাথ মৃণাল চরিত্রকে স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সঙ্গে নারীরও যে সৃজনশীল প্রতিভা থাকা স্বাভাবিক সে সত্যও উন্মোচন করেছেন।

২৫. রবীন্দ্রনাথের 'চন্দরা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প 'শাস্তি'। গল্পের ছোট বউ চন্দরা পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রবল ক্ষোভ আর আত্মত্যাগে সংসারধর্মত্যাগী এক নারী। চন্দরার স্বামী ছিদামের ভাই দুখিরাম তার স্ত্রী রাধাকে হত্যা করে। ছিদাম ভাইকে বাঁচানোর জন্য স্ত্রী চন্দরার ওপর দায় চাপায়। স্বামীর দেয়া অপবাদে বিস্মিত এবং হতবিহ্বল চন্দরা স্বামীর দিকে তাকায়। এত বড় মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কোন কারণ সে খুঁজে পায় না। তারপরে স্বামীর মুখে যা শুনে তাতে আরও বিধ্বস্ত হয়।

'বউ গেলে বউ পাবো, ভাই গেলে তো আর ভাই পাবো না।'

©Nazmus Sadat CamScanner

প্রথমদিকে স্বামীর এই ঘৃণ্য নালিশে সে চমকে উঠলেও পরবর্তীতে নির্দ্বিধায় তা মেনে নেয়। এক সময় স্বামী চাইলেও চন্দরা খুনের দায়ভার থেকে মুক্তি চায় না। ফাঁসির আগে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল স্বামীকে দেখতে চায় কি না। চন্দরা উচ্চারণ করে এক রহস্যময় শব্দ 'মরণ'। শব্দটির উচ্চারণে রাগ, অভিমান ও ক্ষোভের অভিব্যক্তি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে দাম্পত্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণ মিশ্রিত অম্লমধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত।

গল্পকার তাঁর অসাধারণ নির্মাণ কুশলতায় চন্দরাকে মহিয়সী করে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন পুরুষ-প্রাধান্যের স্বার্থেই। অমানবিক, বিবেকবর্জিত এই গল্পে চন্দরার চারিত্রিক বলিষ্ঠতাই মূল অলঙ্কার। তা যেমন চন্দরার স্রষ্টাকে মহিমান্বিত করে একইভাবে পাঠক সমাজকেও বিমুগ্ধ করে।

২৬. রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্র কল্যাণী। সে সুন্দরী ও শিক্ষিতা। কল্যাণীর বাবা ডাক্তার শম্ভুনাথ তার বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবিমতো যৌতুকের টাকা ও অলংকার দিতে রাজি হন। বিয়ের আসরে পাত্রের মামা বরকর্তা হিসেবে মেয়ের গা থেকে সকল অলংকার খুলে তা মেপে নিতে চায়। দেখা যায় প্রতিশ্রুত পরিমাণের চেয়ে বেশি আছে। পাত্রপক্ষ সন্তুষ্ট হলেও শম্ভুনাথ বলে-

'আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না'।

মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি পাত্রপক্ষকে বিয়ের আসর থেকে বিদায় করে দেন। গল্পের নায়িকা কল্যাণী স্বাধীনচেতা। কাপুরুষ ও সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ অনুপমকে বিয়ে না করে আজীবন দেশমাতৃকার সেবা করার শপথ নেয়। কল্যাণীকে আমরা দেখতে পাই প্রতিবাদী রূপে। সে রেল কর্মচারীর সঙ্গে হিন্দিতে, আর ইংরেজ ভদ্রলোকের সাথে ইংরেজিতে তর্ক করে। ভুল ভাঙার পর অনুপম যখন কল্যাণীর কাছে ফিরে আসতে চায় তখন কল্যাণী দেশের কল্যাণে মনোযোগ দেয়। সে নারীর শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে। নিজের এবং অন্য অনেক নারীর মুক্তির পথ খুঁজে। গল্পের শেষে এসে কল্যাণীর কল্যাণময়ী আত্মপ্রকাশ ভবিষ্যতের নতুন নারী আগমনের ইঙ্গিত বহন করে।

২৭. পোস্ট মাস্টার গল্পের পোস্টমাস্টার ও রতন চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পে চরিত্র দুটি- পোস্টমাস্টার, রতন নামে এক গ্রাম্য কিশোরী। পোস্টমাস্টার কলকাতার ছেলে। চাকুরির সুবাধে সে এখানে এসেছে। রতন নামে অনাথা কিশোরী তার টুকটাক কাজ করে দেয়। পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়লে রতন যেন হয়ে উঠে এক পরিপূর্ণ নারী। স্নেহ ভরা

মনে পোস্টমাস্টারের সেবা করে রতন। পোস্টমাস্টার রতনকে পড়ানোর ভার নেয়ায় অনাদৃতা রতনের হৃদয় প্রশ্রয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। রতন ও পোস্টমাস্টারের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বাড়ে। শিক্ষিত শহুরে পোস্টমাস্টার হয়তো অন্তরের দিক থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন, কিন্তু স্নেহ-কাঙাল রতন পারে না। রতনের এই নৈকট্যলিপ্সু হৃদয়কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছেন একটি বাক্যের ব্যবহারে-

'এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত।'

এ ধরনের প্রকাশকে প্রেম বলা যায় না, অনাথা রতন এখনও দেহ-মনে বালিকা। পোস্টমাস্টারের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের সময় চলে আসে। বিদায়কালে পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে ভালবাসাই চেয়েছিল রতন। তাই পোস্টমাস্টারের দান রতন নিতে চায় নি। পিতৃমাতৃহীন অনাথা রতন আবার খাওয়া-পরার কষ্টের মধ্যে পড়বে। পোস্টমাস্টারের কাছে রতনের প্রত্যাশা ছিল অন্যরকম; তা আহত হয়েছে।

২৮. শেষের কবিতা উপন্যাসের লাবণ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : 'শেষের কবিতা'র নায়িকা শিলং পাহাড়ের প্রকৃতিকন্যা লাবণ্য। বাবা অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনা লাবণ্যের একমাত্র সঙ্গী। লাবণ্যের চকচকে পোশাক, একটি সাদা শাল, এর উপরে জ্যাকেট, দেহ লম্বা, টানাটানা চোখ, সামনে চুল ঝুলানো। সাধারণভাবে নায়িকা হিসাবে বিস্ময়কর নয়, তবে অভূতপূর্ব আলোতে আলোকিত। শিলং পাহাড়ের পথে আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেত ফেরত অমিত রায়ের সাথে পরিচয়। দু'জন দু'জনকে দেখে মুগ্ধ হয়। দেখা গেল বই প্রেমিক লাবণ্য ভালোবাসতেও পারে। এমন সময় অমিত লাবণ্যকে বিয়ে করতে অস্থির হয়ে উঠে। কিন্তু লাবণ্যর সায় দেয় না। তবু বিয়ে ঠিক হয়। সেই সময় অমিতের দেওয়া আংটি হাতে কেতকী শিলং এসে উপস্থিত হলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। অমিত কদিন পর এসে দেখে লাবণ্য শিলং ছেড়ে চলে গেছে। কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি। কিছুকাল পরে অমিতের সঙ্গে বিয়ে হয় কেতকীর। এর মধ্যে লাবণ্যর একটি চিঠি আসে অমিতের কাছে। সে চিঠিতে লেখা- ছয়মাস পর রামগড় পর্বতের শিখরে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে। প্রথম যৌবনে শোভনলাল লাবণ্যকে ভালোবেসে ছিল; কিন্তু লাবণ্যর অবজ্ঞা ও অপমানে শোভন দূরে চলে যায়। আর এখন সেই শোভনলালই শেষ পর্যন্ত এলো তার জীবনে। আর এ মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন; শিক্ষিত সচেতন নারী প্রেয় নয় শ্রেয়কে গ্রহণ করে।

২৯. 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্রের ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'চোখের বালি'র চরিত্র বিনোদিনী। সে উপন্যাসের মূল আকর্ষণ, এমনকি প্রাণশক্তিও বটে। প্রথমে মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর সাথে

মহেন্দ্রের বিয়ে ঠিক করলে মহেন্দ্র রাজী হয় নি। বিনোদিনীর অন্যত্র বিয়ে হলে অল্প দিনের মধ্যেই সে বিধবা হয়। রাজলক্ষ্মী তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়। মহেন্দ্র তখন সমচেতনা সম্পন্ন স্ত্রীর অভাব উপলব্ধি করে। বিনোদিনীই মহেন্দ্রকে বুঝিয়েছে নারীকে জয় করতে হয়। উপন্যাসে বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের ঈর্ষার আভাস পাওয়া যায়। মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য প্রণয় দেখে তার নিজের প্রবৃত্তিগুলো জেগে উঠে। শেষাবধি মহেন্দ্রকে আশালতার কাছ থেকে ছিনিয়েই নেয়। বিনোদিনীর এই মানসকে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি ঈর্ষা না বলে এটাকে প্রণয় ও ঈর্ষার মিশ্রিত সমসত্ত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা বিনোদিনীর অন্তরের ঈর্ষাই, তার এই ঈর্ষাপরায়ণ মনোবৃত্তির মধ্যে লুকিয়ে ছিল সমাজে প্রচলিত বিধবার জন্য নিয়ম কানুন অস্বীকার করার ইঙ্গিত। সুন্দরী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও সকল কাজে পারঙ্গম বিনোদিনী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম চরিত্র।

৩০. 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের 'বিমলা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা সনাতন হিন্দু নারীর প্রতিনিধি। স্বামীর কাছে তার নিজেকে নিবেদনের যে ভঙ্গি, পতিব্রতা হিন্দু-রমণীকেই প্রমাণ করে। যেমন-

'দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম।'

স্বামী নিখিলেশ বিমলাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছিল বদ্ধপরিকর। কিন্তু স্বামী নিখিলেশের 'পৌরুষ' নিয়ে বিমলার ক্ষোভ। বিমলার মনে হয়েছে-

'আর একটু মন্দ হওয়ার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিৎ ছিল।'

বিমলার সামনে পৌরুষ হয়ে এলো নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ। স্বদেশী আন্দোলনের ছত্রছায়ায় দেশমুক্তির শ্লোগান 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে সে আসলো বিমলার জীবনে। সন্দীপের মোহে অন্ধ হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলল বিমলা। বিমলা ক্রমে বুঝতে পারে এ মোহ 'চাঞ্চল্য মাত্র'। কিন্তু বুঝেও তা কাটাতে পারে না-

'যে নেশায় আমাকে পেয়েছে, সেই নেশাটা ছেড়ে যাক, এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে।'

নিখিলেশ বুঝতে পারে বিমলা তার থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও নিখিলেশ বিমলার সীমা-লঙ্ঘনের প্রশ্ন তোলেনি। বরং বিমলাকে মুক্তি দিয়ে সে নিজেও মুক্তি পেতে চেয়েছে। তাই বিমলাকে সে বলেছে-

'আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি, অন্তত তোমার হাতের হাতকড়া হব না।'

CamScanner

বাংলা সাহিত্যে সধবা নারীর প্রেমচিত্র সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই প্রথম অঙ্কন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। এ উপন্যাসে বিমলার চরিত্র চিত্রণে যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পর্কের টানাপোড়েন চিত্রিত হয়েছে তা অন্য চরিত্রগুলোকে ছাপিয়ে গেছে।

৩১. 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'দামিনী' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের চরিত্র 'দামিনী'। সে প্রচলিত প্রথা বিদ্বেষী এক নারী যাকে সমাজ সংস্কারের নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না। সে শুধু বিদ্রোহীই নয়, একেবারে বিপ্লবী। পুরুষশাসিত সমাজের কঠোর শাসন-শোষণকে দর্পভরে অস্বীকার করে। দামিনীর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সঙ্কল্পে অবিচলতা, প্রতিবাদী চেতনা রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক তুলিতে আরও উজ্জ্বল হয়, প্রাণবন্ত হয়, নতুন কিরণ ছড়ায়। তিনি বলেন–

'দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভেতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।'

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা দামিনী আরও জেদী, তেজী হয়ে ওঠে। নিজেকে বাঁচাতে চারপাশে যে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে সেখানে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাস দামিনীর চাওয়া-পাওয়া, আশা-আনন্দের একমাত্র সঙ্গী হয়। সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, আত্মীয়স্বজনের বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীবিলাসের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করা দামিনী নবযুগের এক সাহসী পথিক। সমাজবহির্ভূত বিধবার এমন প্রেম নারী স্বাধীনতার উজ্জ্বল দীপ্তি। অদমনীয় দামিনীকে রবীন্দ্রনাথ যে সযত্ন পরশ আর আন্তরিক সৌন্দর্যে মূর্ত করে তোলেন সেটা স্বাধীনচেতা, অধিকার সচেতন, সঙ্কল্পবদ্ধ নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ।

৩২. চার অধ্যায় উপন্যাসের 'এলা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। স্বদেশী আন্দোলনের গল্প নিয়ে লেখা এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এলা। 'চার অধ্যায়' যেন একান্তই তার নিজের জীবনের চারটি পৃথক অধ্যায়ের গল্প। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এলার পারিবারিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। পরে উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের সাথে জীবনের অধ্যায়েও পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক বাবা এবং প্রাচীনপন্থী মায়ের টানাপোড়েনে এলা পিতার আদর্শিক বোধেই উদ্বুদ্ধ হয়। শারীরিকভাবে লেখক এলাকে লক্ষ্মী প্রতিমার আদলে গড়ে তোলেন আর মানস গড়নে সে হয় নবদ্যুতির বার্তাবাহক। একসময় যাকে সবাই ছোট এলাচি বলে ক্ষ্যাপাত, সে-ই হয়ে ওঠে সকলের প্রিয় এলাদি। এলা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বিপ্লবী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত, প্রচলিত সংস্কারবিরোধী এক বিপ্লবী নারী সত্তা। সৃজন এবং মনন উভয় আঙিনায় কোন আপোসকামিতা চলেনি। একজন

নিবেদিত বিপ্লবী বিপরীত সামাজিক পরিস্থিতিতে যা যা মোকাবেলা করে এলাকেও সবটাই করতে হয়েছে। যে মেয়েটি একসময় আর দশটি সাধারণ মানুষের মত সাদাসিধে জীবনের স্বপ্ন দেখত, সে মেয়ে একসময় ভিন্ন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। প্রিয়জনের সাথে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন থেকে দেশমাতৃকার আহ্বান তার কাছে তখন বড় হয়ে ওঠে। শাসন-শোষণের বিক্ষুব্ধ আবহে উদ্দীপ্ত তরুণ বিপ্লবীদের অন্তিম পরিণাম যা হয় এলাও সেই অন্তহীন পথকে বেছে নেয়। শেষ পরিণতিতে অতীনকে সর্বস্ব দিতে চেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় অনিবার্য আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়।

৩৩. ডাকঘর নাটকের 'অমল' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিষয়ক রূপক সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘর'। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল। সে অসুস্থতার কারণে ঘরবন্দী। কবিরাজ মনে করছে তার আয়ু বেশি দিন নেই। কিন্তু তার মন চার দেওয়ালের গণ্ডি পার হয়ে ডানা মেলে সুদূর আকাশে উড়তে চায়। পৃথিবীর চিরায়ত এক ছবি রবীন্দ্রনাথ অমলের কল্পনাজগতে সাজিয়ে তুলেছেন। আর অমলকে বানিয়েছেন কোন এক চিরন্তন পৃথিবী পথিকের আদলে। অমলের মনে যুক্ত করেছেন অপার আনন্দ। তাই অমল দইওয়ালাকে বলছে-

> *'আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐরকম বাঁক কাঁধে নিয়ে- ঐরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।'*

কবিরাজের বারণ মানতে সে স্কুলে যেতে পারে না। সে অপেক্ষা করে একদিন তার নামে রাজার চিঠি আসবে। লোকে পরিহাস করত। কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন রাজা এলেন। সমস্ত নাটকেই রূপক-সংকেতের মাধ্যমে তিনি মূলত রুদ্ধ ও বদ্ধ জীবন থেকে আনন্দ সৌন্দর্য মুক্তির বাণী পৌছে দিতে চেয়েছেন অমলের মাধ্যমে। অমল এখানে মানবাত্মার প্রতীক। আত্মা মুক্তি চায়। অমলের নিদ্রা এক ধরনের প্রতীকী পরিবেশনা। এ নিদ্রা সত্যিকারের মৃত্যুকে হয়তো ইঙ্গিত করে না; যাপিত জীবনে চেতনার এক স্তর থেকে অপর স্তরে গমনের আভাস। অথবা এ নিদ্রা হতে পারে মৃত্যু বা মুক্তির প্রতীক। এই মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, তা নবজীবন লাভের মাধ্যম মাত্র। মৃত্যু পূর্ণতায় পৌছানোর সোপান। মৃত্যুর মধ্যেই মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটে।

৩৪. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপু চরিত্র সম্পর্কে লিখুন

উত্তর : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপু। উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে মূলত তাকে ঘিরেই। অপুর বড় হয়ে ওঠার মুখ্যত 'পথের পাঁচালী'র কাহিনি। যে পথ দিয়ে জীবনে সে অগ্রসর হয়েছে, যেসব মানুষের সংস্পর্শে সে এসেছে, তা সেই কাহিনির অবিচ্ছেদ্য অংশ এর পটভূমি সুবিস্তৃত। অপুর গুরু ও বন্ধু দুইই প্রকৃতি। প্রকৃতি জগৎ আর মানবজীবন এক হয়ে যেন কোনো অপরিচিত

রহস্যময় অনন্তের দিকে ছুটেছে। এতে শুধু প্রকৃতির বর্ণনাই নয়, রয়েছে গভীর জীবনবোধ। অপু বড় হতে থাকে প্রকৃতির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে। উপন্যাসে অপু যেন দুরন্ত শৈশবের প্রতীক।

অপুর বোন দুর্গা। দুজনের মধ্যে খুব ভাব। তারা কখনো কখনো চুপচাপ পুকুরপাড়ে বসে থাকে, কখনো মিঠাইওয়ালার পিছু নেয়, কখনো ভ্রাম্যমাণ বায়োস্কোপওয়ালার বায়োস্কোপ দেখে বা যাত্রাপালা দেখে। নতুন নতুন অভিযানে দুর্গা অপুর পথপ্রদর্শক, তবে অপুর মধ্যে অনুভূতির যে প্রখরতা এবং ভাবুকতার যে জ্বালা লক্ষ্য করা যায়, দুর্গার মধ্যে দেখা যায় না। দুর্গার মৃত্যু অপুর জীবনে বড় রকমের আঘাত হানে, তার অভ্যন্ততায় ছেদ টানে, কিন্তু তা অপুর স্বাধীন বিকাশ ও সৃষ্টিশীলতার পথও উন্মুক্ত করে দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপু চরিত্রে নিজেকেই পুনঃসৃষ্টি করেছেন। নিজের ফেলে আসা যাপিত জীবনকেই যেন সুনিপুণ দক্ষতায় এঁকে গেছেন পথের পাঁচালী নামের বিশাল ক্যানভাসে। 'পথের পাঁচালী' আসলে পথের না, জীবনেরই কাহিনি।

৩৫. হাজার বছর ধরে উপন্যাসের 'টুনি' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের প্রাণ মকবুল বুড়োর তিন বউ- আমেনা, ফাতেমা আর টুনি। ছোট বউ টুনি উপন্যাসের সক্রিয় চরিত্র। টুনি বয়সে কিশোরী। সে মকবুলের শাসন মানতে চায় না। সে খোলা আকাশের নিচে বেড়াতে চায়। সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় মন্তুকে। টুনি আর মন্তু সবার অগোচরে রাতের বেলায় মাছ ধরতে যায়। বর্ষায় বিলে শাপলা তুলতে যায়। শেষ রাতে কলসি নিয়ে খেজুরের রস চুরি করতে যায়। এমনি করে এক সময় টুনি-মন্তু দুজন-দুজনার কাছে চলে আসে। অব্যক্ত ভালোবাসার জোয়ারে ভাসে কিন্তু কেউ মুখ ফুটে বলতে পারে না। একদিন হঠাৎ টুনি বলে-

'কলসি গলায় দিয়া দুইজনে পুকুরে ডুইবা মরুম চলো...। আমার সঙ্গে মরতে পারবা না?'

টুনি মজার ছলে মন্তুকে একথা বললেও বুদ্ধিমান পাঠক তার মনস্তত্ত্বটা বুঝে যায়। মকবুলের মৃত্যুর পরে তার প্রতি অন্যায়ের অন্তর্দহন টুনিকে পুড়িয়ে মারে। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ি চলে যায়। যাওয়ার পথে মন্তু টুনিকে মনের কথা বলে, টুনিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু টুনি তখন বলে-

'না তা অয়না মিয়া। তা অয়না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।'

উপন্যাসটিতে টুনি মন্তু আম্বিয়ার প্রেম পরিণয়ের চিত্র অঙ্কিত হলেও টুনির জীবনের ট্রাজিক পরিণতিই মূখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এভাবেই উপন্যাসের নায়িকা টুনির জন্যও পাঠকের মনে কোথায় যেন সূক্ষ্ম সমবেদনার ভাব জেগে উঠে।

CamScanner

৩৬.লালসালু উপন্যাসের 'মজিদ' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। সে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও বাসনা-সবই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তার বিশ্বাস সুদৃঢ় কিন্তু প্রতারণা বা ভণ্ডামির মাধ্যমে যেভাবেই হোক সে তার মাজারকে টিকিয়ে রাখতে চায়। মহব্বতনগর গ্রামে তার প্রভাব প্রতিপত্তির ওপর আঘাত আসতে পারে সে বিষয়ে মজিদ অত্যন্ত সজাগ। সে আওয়ালপুরের পীরকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের জাগতিক প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে সে হিসেব করে বুদ্ধি খাটিয়ে মজবুত করে। এত কিছুর পরও মাঝে মাঝে তার মধ্যে হতাশা ভর করে। কখনো তার প্রতি মানুষের অনাস্থা দেখলে নিজের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মজিদ একটি প্রতীকী চরিত্র। কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক। প্রচলিত বিশ্বাসের কাঠামো ও প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়, ওই জীবনধারার সে প্রভু হতে চায়। এজন্য সে যেকোনো কাজ করতেই প্রস্তুত, তা যতই নীতিহীন বা অমানবিক হোক। উপন্যাসিক মজিদ চরিত্রের মনোজাগতিক চেতনা সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের সংকেত ও প্রতীককে সৃষ্টি করেছেন। শেষ পর্যন্ত মজিদ তার অস্তিত্ব সংকটে দিশেহারা হয়, মজিদরূপ বিষবৃক্ষের সমূলে উৎপাটিত হয়ে শুভ শক্তির উদয় হয়।

৩৭. লালসালু উপন্যাসের 'জমিলা' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন

উত্তর : 'লালসালু' উপন্যাসের প্রতিবাদী চরিত্র কিশোরী জমিলা। সে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। কৈশোরের চপলতার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের গাম্ভীর্য তাকে স্পর্শ করে না। এমনকি সতীন রহিমাও তার কাছে ঈর্ষার বিষয় না। মাজার সম্পর্কে রহিমার মতো সে ভীতিবিহ্বল নয় কিংবা মাজারের পবিত্রতা সম্পর্কেও নয় সচেতন। স্বামী মজিদ যখন এসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তখন সে গুরুত্ব দেয় না। তাকে শাসনের ব্যাপারে মজিদের সকল উদ্যোগই তার কাছে নিপীড়ন বলে মনে হয়। এমনকি মজিদ যখন তাকে মাজারে বন্দি করে রেখে আসে তখন তাকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখা যায়। জমিলা বিদ্রোহের প্রতীক। কোনো কিছু মেনে না নেওয়া তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। জমিলার সক্রিয়তা, অস্তিত্বরক্ষার চৈতন্য সংক্রমিত হয়েছে অন্যসব মানুষের প্রতিনিধি রহিমাতে। তাই রহিমার দৃঢ় উচ্চারণ-

'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না বাঁচে।'

জমিলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাসে একটি প্রাণময় সত্তার উপস্থিতি ঘটিয়েছেন। ধর্মীয় আদেশ নির্দেশের প্রাবল্যে পুরো মহব্বতনগর গ্রামে যে প্রাণময়তা ছিল রুদ্ধ, জমিলা যেন সেখানে এক মুক্তির সুবাতাস। রুদ্ধতার নায়ক যে মজিদ, ঔপন্যাসিক সেই মজিদের গৃহেই এই প্রাণময় সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

৩৮. সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাসের 'জয়গুন' চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের চরিত্র জয়গুন। স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম উপন্যাসের উপজীব্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সন্তানদের নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে শহরের লঙ্গরখানায় আশ্রয় নেয়। ভাগ্যের ফেরে জয়গুন দুর্ভিক্ষ থেকে নিষ্কৃতি পায়। শুরু হয় জয়গুনের সংগ্রামী পথচলা। শহর থেকে গ্রামে ফিরে এসে অপয়া ভিটা বলে পরিচিত সূর্য দীঘল বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পেট চালানোর দায়ে তাকে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু সমাজ তাকে বাঁধা দেয়। মেয়ের বিয়েতে তাকে 'তওবা' করতে হয় এই মর্মে যে, তাকে বাইরের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। এখানে তাকে প্রতিবাদী হিসেবেই দেখা যায়-

'তোবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই। মৌলবী সাব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।'

জয়গুনকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনযুদ্ধে লড়তে হয়। সমাজের শোষণ, নিপীড়নকে পায়ে দলে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের হীন সমাজপতিদের তৈরি করা হীনতর নিয়ম ভেঙে এগিয়ে যায় জয়গুন। সে বলে-

'না খাইয়া জানেরে কষ্ট দিলে খোদা ব্যাজার অয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব, তোর আত-পাও দিছিলাম কিয়ের লেইগ্যা?।'

সমাজপতিদের কুদৃষ্টি পড়ে নিঃস্ব জয়গুনের ওপর। এর চূড়ান্ত কদাকার রূপ আমরা দেখি জয়গুনের ভিটেমাটি ছাড়া করার মধ্য দিয়ে। আবু ইসহাক জয়গুনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে এক চরম বুভুক্ষার চিত্র এঁকেছেন। সমাজের গভীরে শিকড় গেড়ে বসা এ হীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখক দাঁড়া করান সাহসী জয়গুনকে।

৩৯. হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্ট চরিত্র হিমু ও মিসির আলী সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : হুমায়ুন আহমদের সৃষ্ট চরিত্র মিছির আলী ও হিমু। মিছির আলী বাস্তববাদী এবং যুক্তি নির্ভর। তবে চরিত্রটি খুবই রহস্যময়। ভারী ফ্রেমের চশমা পরিহিত মিসির আলী অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্বাস করেন না। মানুষের মন, আচরণ, স্বপ্ন এবং সংকট যুক্তির আলোকে ব্যাখা করাই হলো মিসির আলীর কাজ। মিছির আলী চরিত্রের প্রথম উপন্যাস 'দেবী' (১৯৮৫)।

হুমায়ুন আহমদের জনপ্রিয় ও কাল্পনিক চরিত্র হিমু। মিছির আলী চরিত্রের ঠিক উল্টো। হিমুর আসল নাম হিমালয়। পকেটবিহীন হলুদ পাঞ্জাবী তার পোশাক। হিমু বেকার যুবক যার আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক। উদ্ভট সব কাজই তার মূল কর্মকাণ্ড। যুক্তির ধার ধারেন না। এমন সব কাণ্ড করেন যে তার আশে পাশের মানুষ বরাবরই অবাক হয়ে যায়। মানুষকে চমকে দেওয়াই তার কাজ। নব্বইয়ের দশকে 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৯০) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে হিমুর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

পত্রিকা ও সাময়িকপত্র

১. বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৩৫তম, ৩১তম]*
অথবা, 'কল্লোল-যুগ' বলতে কী বোঝেন? এ যুগের সাহিত্যকে কেন 'ত্রিশোত্তর সাহিত্য' বলা হয়? *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৩০-এর দশক কল্লোল যুগের সমার্থক। কল্লোল যুগ বলতে বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রান্তিলগ্নকে বোঝায় যখন বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে আধুনিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকাকে (১৯২৩-৩০) ঘিরে তরুণ লেখকদের একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এ গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে সাহিত্যের একটি জগৎ সৃষ্টি করা। তখন বাংলা সাহিত্যের সর্বদিগন্তে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল প্রোজ্জ্বল। কাজী নজরুল ইসলাম কল্লোল যুগের অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ এবং বিষ্ণু দে। এদের পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। এ পঞ্চপাণ্ডবই ছিলেন মূলত কল্লোল যুগের কাণ্ডারি। কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক নবজাগরণের সূচনা করে। বাংলা কবিতায় গদ্যধারার প্রবর্তন শুরু হয় কল্লোল যুগেই। সমকালীন ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি সাহিত্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকগণ পরিচিত হয় ন্যাচারালিজম, শারীরিক ভাবনা, জীবনসংগ্রাম, রাজনীতি, সমাজনীতিসহ নানা বিষয়ের সাথে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবপ্রেমী সাহিত্যের বৃত্ত থেকে দূরে সরে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের এই ধারাকে সাধারণ পাঠক খুব সহজে মেনে নেয়নি। সেই সময়ের কল্লোল গোষ্ঠীর বিরোধী ছিল সাময়িক পত্র শনিবারের চিঠি।

২. 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : 'মোসলেম ভারত' মাসিক সাহিত্য সাময়িকী হিসেবে ১৯২০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে কবি মোজাম্মেল হকের নাম মুদ্রিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন তাঁর পুত্র এবং নির্বাহী সম্পাদক আফজালুল হক। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদে বর্ণবহুল ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত ছবি ছাপা হতো। এছাড়া প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদের শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ থাকত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বাণী-

> *"মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটীকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।"*

পত্রিকাটির নাম 'মোসলেম ভারত' হলেও এটি অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা ছিল। ১৯২০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম সৈনিক জীবন ত্যাগ করে করাচি থেকে ফিরে এসে আফজালুল হকের অনুরোধে এই পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। এই সূত্রে নজরুল ইসলামের পত্রোপন্যাস বাঁধনহারা-র প্রথম কিস্তি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৩. বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র' পত্রিকার অবদান সম্পর্কে লিখুন। *[৩০তম]*

উত্তর : বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান সাময়িক পত্রিকা ছিলো সবুজপত্র। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৯১৪ সালের ৭ মে (২৫শে বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে শুধু সবুজ রং-ই ব্যবহার করা হতো। নন্দলাল বসু অঙ্কিত একটি সবুজ তালপাতা এর প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হতো। সবুজপত্রে কখনও কোনো বিজ্ঞাপন এবং ছবি প্রকাশিত হয়নি। এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরি বলেছেন-

'কলম চালানো আমার সখ, কাগজ চালানো আমার ব্যবসা নয়।'

কথ্য বা মৌখিক ভাষাকে লেখার মাধ্যম করতে 'সবুজপত্র' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'সবুজপত্র' প্রকাশের শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল। 'সবুজপত্র'কে ঘিরে একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে ছিলেন- ইন্দিরা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র ঘটক, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটি ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে চালু হয়ে ১৯২৭ সালে বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে সবুজপত্রের সকল সংখ্যা সংরক্ষিত আছে।

৪. মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত ও পাক্ষিক বেগম পত্রিকার সম্পাদকের নাম লিখুন। *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : 'মাসিক মোহাম্মদী' মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত পত্রিকা। ১৯০৩ সালের ১৮ আগস্ট কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বল্পকালীন বিরতির পর ১৯২৭ সাল থেকে পুনরায় প্রকাশ শুরু হয়। এরপর দু'একবার বিরতিসহ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি এবং দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং শেষে পাকিস্তানি ভাবধারার প্রসার ঘটানো ছিল মোহাম্মদী প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। তবে এতে অন্য মতাদর্শের লেখকের লেখাও প্রকাশিত হতো।

'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। ১৯১৮ সালের ২ ডিসেম্বর মাসিক পত্রিকা হিসেবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন পরিবার ঢাকায় চলে আসেন। সে সময় 'সওগাত' পত্রিকাও কালকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান সম্পাদক। উল্লেখ্য, 'সওগাত' নামটি নির্বাচন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'বেগম' বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র নারী সাপ্তাহিক। সাহিত্যে মেয়েদের এগিয়ে আনার লক্ষ্যে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি সুফিয়া

কামাল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন নূরজাহান বেগম। চার মাস পর থেকে নূরজাহান বেগমই সম্পাদক হন। আমৃত্যু তিনি এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

৫. 'সমকাল' পত্রিকা বিশ শতকের কোন দশকে প্রকাশিত হয়? এর সম্পাদকের নাম কি? *[২১তম বিসিএস]*
'সমকাল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল'। সিকান্দার আবু জাফর-এর সম্পাদনায় এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। ত্রয়োদশ বর্ষে পত্রিকাটির মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মাসিক সমকাল এভাবেই ১৯৭০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। ষাটের দশকের নামী-দামী সব কবি-সাহিত্যিকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে এ পত্রিকায়। লেখার সাবধানী ও নৈর্ব্যক্তিক নির্বাচন, প্রতিভাবান নতুন লেখকদের মর্যাদা প্রদান, মনোযোগী সম্পাদনা এবং মুদ্রণ পরিপাট্যের জন্য তৎকালের সব কবি-লেখকের কাছে সমকাল স্বপ্নের পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে এটি প্রগতিশীল বাংলা সাহিত্যধারার অগ্রগামী সাহিত্য পত্রে পরিণত হয়েছিল।

৬. 'সংবাদ প্রভাকর' কত সালে, কার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়?*[১৩তম]*
অথবা, ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন এ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক। তার মৃত্যুর কারণে ১৮৩২ সালের ২৫মে প্রকাশিত ৬৯তম সংখ্যার পর সংবাদপত্রটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাপ্তাহিক তিন সংখ্যা হিসেবে আবার চালু করে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এটি বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত এটি সম্পাদনা করেন।

সাহিত্যমূল্য বিচারে 'সংবাদ প্রভাকর'র বিশিষ্টতা ছিল অনন্য। সে সময়ের একটি প্রথম শ্রেণির পত্রিকা ছিল এটি। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মতো অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল এই পত্রিকায়। এ পত্রিকার মাধ্যমেই কবিগানের বিস্তৃতি ঘটে। সাহিত্যের নানামুখী বিষয়ের পাশাপাশি সমকালীন ধর্ম ও সমাজ এবং ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ ছাপা হতো পত্রিকায়। নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিয়ে এবং কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রভাকরের অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। বাংলার নবজাগরণ ও নীল বিদ্রোহের প্রতি মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে এই সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

CamScanner

৭. 'কল্লোল' কী? [২৪তম বিসিএস]
'কল্লোল' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়? [১১তম বিসিএস]
'কল্লোল' পত্রিকার পরিচয় দিন।

উত্তর : কল্লোল মূলত একটি সাহিত্য পত্রিকা। ১৯২১ সালে গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুনীতা দেবী এবং মনীন্দ্রলাল বসু প্রমুখ কলকাতার হাজরা রোডে সাহিত্য, ললিত কলা, সংগীত ও নাটক সৃষ্টি ও চর্চার জন্য 'চার শিল্পীর গোষ্ঠী' নামে একটি আড্ডার সূচনা করেন। প্রথমে তারা ১৯২২ সালে 'ঝড়ের দোলা' একটি ছোটগল্পের সংকলন বের করেন। ১৯২৩ সালে একটি সাময়িক পত্র বের করেন, নাম দেন 'কল্লোল'। যার সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে তরুণ লেখকদের একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এ গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে সাহিত্যের একটি জগৎ সৃষ্টি করা। তারা বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক নবজাগরণের সূচনা করে। কল্লোল পত্রিকাটি ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত টিকে ছিল। কল্লোল নব্য লেখকদের প্রধান মুখপাত্র ছিল যাঁদের অন্যতম ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু। অন্যদিকে আধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচারিতা ও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে এই রকম অভিযোগে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা কেন্দ্রিক কল্লোল বিরোধী আরেকটি বলয় গড়ে উঠে।

৮. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর : 'দিকদর্শন' বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র। এটি সংবাদপত্র ছিল না। নীতি-ধর্ম-তত্ত্বমূলক মাসিক সাময়িকপত্র। এর প্রথম সংখ্যাটি ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে জর্জ ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চার পৃষ্ঠার এ সাময়িকীটি ছিল বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক পত্রিকা। এখানে বাংলা লেখার পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হতো। এতে ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দেশবিদেশের বিভিন্ন তথ্য সহজ ভাষায় পরিবেশিত হত বলে তা স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল। সংবাদ অপেক্ষা ধর্মীয় নীতিকথা ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তথ্য পরিবেশনই এতে প্রাধান্য পেতো। দিকদর্শনের সর্বমোট ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে শ্রীরামপুরের একটি নিজস্ব ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল।

৯. বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। এটি ১৮১৮ সালের ২৩ মে জর্জ ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন নামেমাত্র সম্পাদক। বাঙালি পণ্ডিতরাই আসলে সমাচার দর্পণ সম্পাদনা

করতেন। এটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় পত্রিকা। সাপ্তাহিক এ পত্রিকাটি প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হত। ১৮৩২ সাল থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হতে থাকে। সমাচার দর্পণের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৪২-৪৩) কিছুদিন এবং তৃতীয় পর্যায়ে (১৮৫১-৫২) দেড় বছর চলার পর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। সমাচার দর্পনের মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙালি প্রথম গদ্যরচনার রস গ্রহণ করতে শেখে। এর ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও খুলে গেল। সমাচারদর্পণের জনপ্রিয়তার ফলে আরো কয়েকটি সাময়িক ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রধান ছিল সংবাদকৌমুদী (১৮২১) এবং সমাচারচন্দ্রিকা (১৮২২)।

১০. 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর : গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা উনিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসিক পত্রিকা। কাঙাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার) ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। কালক্রমে পত্রিকাটি পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমদিকে মুদ্রিত হতো কলকাতার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যারত্ন প্রেস' থেকে; পরে ১৮৬৪ সালে কুমারখালিতে মথুরানাথ প্রেস স্থাপিত হলে সেখান থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা প্রকাশের জন্য এর নাম হয় 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'। তবে মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেব ও জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনি প্রকাশ করা। এছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। লালন ফকিরের গানও প্রকাশ করেছিল গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর আর্থিক সহায়তায় পত্রিকাটি দীর্ঘ ১৮ বছর প্রকাশিত হওয়ার পর আর্থিক অনটন, হরিনাথের ধর্মসাধনায় মনোনিবেশ ও সরকারের মুদ্রণ শাসন ব্যবস্থার কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

১১. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর : ১৮৭২ সালে প্রকাশিত একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রথম পর্যায়ে মাত্র চার বছর (১৮৭২-৭৬) স্থায়ী ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটি এ পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বঙ্গদর্শন। সরকারি উচ্চপদে আসীন থাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সরাসরি সরকারের বিরোধীতা করা সম্ভব ছিল না। তাই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর মনের সমস্ত ক্ষোভ ও মতাদর্শ প্রকাশ করতেন। বঙ্গদর্শনকে তখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের প্রথম মুখপত্র বলা হতো, কেননা বাঙালি জাতির আধুনিক চিন্তা ও মনন এর

মাধ্যমেই প্রথম প্রকাশ লাভ করে। সাহিত্য, সমাজ, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ এবং উপন্যাস এতে প্রকাশিত হতো। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে তাঁর ভাই সঞ্জীবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র স্বল্প সময় বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ে ৫ বৎসর প্রকাশিত হয়।

১২. 'শিখা' পত্রিকার পরিচয় দিন।

উত্তর : মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র শিখা পত্রিকা। এটি বার্ষিক পত্রিকা। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সারা বছরের কর্মকান্ডের আমলনামা শিখা। এর সর্বমোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার (১৯২৭) সম্পাদক আবুল হোসেন, দ্বিতীয় (১৯২৮) ও তৃতীয় সংখ্যার (১৯২৯) সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেন, চতুর্থ সংখ্যার (১৯৩০) সম্পাদক আবদুর রশিদ এবং পঞ্চম সংখ্যার (১৯৩১) আবুল ফজল। এ পত্রিকার শিরোদেশে লেখা থাকত-

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

পত্রিকার মূল সম্পাদনার কাজে থাকতেন আবুল হোসেন। তিনি পত্রিকাটি চালানোর অর্থও যোগান দিতেন। 'শিখা' পত্রিকার লেখাগুলো তৎকালীন সমাজের কথা বলেছে। মুসলমানদের জাগরণের কথা বলেছে। প্রতিটি সংখ্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা থাকতো। ইতিহাসের কিছু চমৎকার অধ্যায় থাকতো। সমাজের কিছু কুসংস্কারের বিষয়ে সজাগ করে দেয়া হতো। নারীদের নিয়েও তাদের ইতিবাচক মনোভাব ছিলো। তৎকালীন সমাজের মুক্তচিন্তার ধারকদের কাছে পত্রিকাটি ছিলো মত প্রকাশের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম।

১৩. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল মাসিক এবং এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল পত্রিকাকে বিশুদ্ধ ধর্মচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, কিন্তু অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান ও জড়বাদী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইতেন। ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং দর্শনবিষয়ক মূল্যবান রচনাও এতে প্রকাশিত হতো। তখনকার বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতিতে এ পত্রিকা বিশেষ অবদান রাখে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯৩২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

CamScanner

১৪. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি, শুক্রবার সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে এটি চালু হয়। ১৮৩৬ সালে সাপ্তাহিক তিন সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩৯ সালে এটি একটি দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি এতে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করত। বাংলার নবজাগরণ ও নীল বিদ্রোহের প্রতি মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলার ক্ষেত্রে এই সংবাদপত্রের বিশেষ প্রভাব ছিল। স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা, সামাজিক ও সাময়িক আন্দোলনের খবরাখবর থাকলেও, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক রচনার প্রাধান্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক নিযুক্ত হন। পত্রিকাটি বিশ শতকের প্রথম ভাগের বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

১৫. 'লাঙ্গল' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

উত্তর : 'লাঙ্গল' কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়' নামে শ্রমিক শ্রেণির একটি মুখপত্র। এর সম্পাদক কাজী নজরুল হলেও ছাপা হতো মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম। পত্রিকার প্রচ্ছদে কাঁধে লাঙলবাহী একজন কৃষকের ছবিও থাকত। পত্রিকার প্রথম পাতায় মানুষের মহত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে চন্ডীদাসের একটি উক্তি মুদ্রিত হতো। লাঙল একটি সংগঠনের মুখপত্র হলেও এর অবস্থান ছিল সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষে। এটি ছিল নজরুলের রাজনৈতিক সচেতনতার একটি প্রতীক।

১৬. বাংলা পত্রিকার প্রথম মহিলা সম্পাদকের নাম কি?

উত্তর : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতা থেকে মহিলাদের জন্য সচিত্র পত্রিকা 'বেগম' প্রকাশ করেন। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন নূরজাহান বেগম। চার মাস পর থেকে নূরজাহানই 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন। উল্লেখ্য নূরজাহান বেগমের পিতা ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

CamScanner

১৭. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলা একাডেমি থেকে বর্তমানে ছয়টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১. বাংলা একাডেমি পত্রিকা (গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক), ২. উত্তরাধিকার (মাসিক পত্রিকা), ৩. ধান শালিকের দেশ (ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা), ৪. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, (ষান্মাসিক পত্রিকা), ৫. বাংলা একাডেমি জার্নাল, (ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ষান্মাসিক পত্রিকা), ৬. বাংলা একাডেমি বার্তা, (এটি ২০০৯ সাল থেকে প্রকাশিত বাংলা একাডেমির মাসিক মূখপত্র)।

১৮. 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো কী কী?

উত্তর : ডিরোজিওর শিষ্যদের সমসাময়িক কলকাতা সমাজে ডিরোজীয়ান বা ইয়ংবেঙ্গল বলা হতো। ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র ছিল 'এনকয়ারার' (ইংরেজি), জ্ঞানান্বেষণ, পার্থেনন প্রভৃতি। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকাটি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালের ১৮ জুন এবং ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা গান ও চলচ্চিত্র

১. শাহ আবদুল করিমের গান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলার লোকায়ত ধারার গানের সর্বশেষ অধীশ্বর শাহ আবদুল করিম। কালনী নদীর পাড়ে বসে একসময় গান লিখতে আর গাইতে শুরু করেন। এভাবে গাইতে গাইতেই হয়ে ওঠেন ভাটি-বাংলার অন্যতম বাউল ও গণমানুষের কণ্ঠস্বর। বলা হয় মাত্র আট দিন ব্রিটিশদের পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে পড়েছেন। সেই পড়াশোনা আর জীবনের বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে রচনা করেন প্রায় দেড় হাজার গান। ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্রের পাশাপাশি তার গান ছিল সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তিনি শরীয়তী, মারফতি, দেহতত্ত্ব, গণসংগীতসহ বাউল গান এবং গানের অন্যান্য শাখার চর্চাও করেছেন।

তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে- 'বসন্ত বাতাসে সইগো', 'আর কিছু চায় না মনে গান ছাড়া', 'কোন মেস্তরি নাও বানাইল', 'কেন পিরিতি বাড়াইলায় রে বন্ধু', 'গাড়ি চলে না', 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো', 'আমি ফুল, বন্ধু ফুলের ভ্রমরা', 'মাটির পিঞ্জিরায় সোনার ময়না রে', 'আসি বলে গেল বন্ধু আইল না', 'কী জাদু করিয়া বন্ধে', 'তোমারও পিরিতে বন্ধু', 'আমি কুলহারা কলঙ্কিনী', 'রঙের দুনিয়া তোরে চাই না', 'তুমি বিনে আকুল পরান', 'নতুন প্রেমে মন মজাইয়া' প্রভৃতি। বাংলা একাডেমির উদ্যোগে তাঁর ১০টি গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

ভাটি অঞ্চলে তাঁর গানের জনপ্রিয়তা সবসময়ই ছিলো। কিন্তু জাতীয়ভাবে তিনি সামনে এসেছেন মৃত্যুর কয়েক বছর আগে। এই জনপ্রিয়তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০১ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

২. সিলেটের মরমী গীতিকারদের সম্পর্কে ধারণা দিন। *[৪৩তম]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লোক ঐতিহ্যের অনবদ্য ফসল মরমী সঙ্গীত। মারেফতি বা ফকিরালী গানের পোশাকী নাম মরমী সাহিত্য। সিলেটে আগত সূফী-সাধকদের মাধ্যমে সেখানে আধ্যাত্মিক ভাবধারার সূচনা হয়। যার ফলে সেখানে জন্মেছেন অসংখ মরমী কবি সাহিত্যিক। এদের মধ্যে রয়েছেন-

- ✓ সৈয়দ শাহ নূর (১৭৩০-১৮৫৪) মরমী কবি ও সূফী সাধক। তিনি সিলেটি নাগরী লিপিতে সাহিত্য রচনা করতেন। সিলেটের মরমী সাহিত্যে তাঁকে সকলের উপরে স্থান দেয়া হয়। তিনি লিখেছেন-

  'বন্ধু তর লাইগা-রে আমার তনু জর জর
  মনে লয় ছাড়িয়া যাইতাম থইয়া বাড়ি ঘর।'

- ✓ ফকির শিতালং শাহ (১৮০৬-১৮৯৯) একজন খ্যাতনামা মরমী সাধক কবি ও সাহিত্যিক। তাওহিদ, রিসালত, আখেরাত ও মানব জীবনের ভেদ রহস্য উদঘাটন হচ্ছে তার গানের মূল বিষয়বস্তু।

- ✓ শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯) সিলেট অঞ্চলের একজন মরমী সাধক ও বাউল গানের কবি। তার লিখা গানের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। তার এ কালজয়ী গানটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

  'নিশীতে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা
  নিশীতে যাইও ফুলবনে।'

- ✓ দেওয়ান হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) সিলেটের একজন বিখ্যাত মরমী কবি এবং বাউল শিল্পী। তিনি বাংলাদেশে দর্শনচেতনার সাথে সঙ্গীতের এক অসামান্য সংযোগ ঘটিয়েছেন। তার বিখ্যাত গান-

  'লোকে বলে বলেরে, ঘর বাড়ি ভালা নায় আমার
  কি ঘর বানাইমু আমি, শূন্যের-ই মাঝার।'

- ✓ সিলেটের মরমী সাহিত্যের আরেক কবি আরকুম শাহ (১৮৭৭-১৯৪১)। তিনি আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমূলক গানের রচয়িতা।

- ✓ সিলেটের আরেক প্রখ্যাত সাধক দুর্বিন শাহ (১৯২০-১৯৭৭)। তিনি বাংলাদেশের একজন মরমী গীতিকবি, বাংলা লোক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার, বাউলসাধক।

সিলেটকে বলা হয় বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী। যুগ যুগান্তর ধরে সূফী, ফকির, পীর ও আউলিয়ার ক্রমধারায় সিলেটে জন্ম হয়েছে অনেক মরমী কবি ও সাধকের।

৩. সাম্প্রতিক বাংলাদেশে লোকধারার গানের জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করুন। *[৩৫তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের লোকধারার সঙ্গীত মূলত ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, গম্ভীরা, জারি গান, সারি গান ইত্যাদি। এসব লোকধারার গান সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানব-জীবনের, পল্লী-মানুষের যাপিত জীবনের সব বৃত্তান্তই রয়েছে এসব সঙ্গীতে। জগৎ সম্পর্কে তাদের ভাবনা, তাদের লোকাচার, আধ্যাত্ম ভাবনা, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার এবং জীবনযুদ্ধ আর তার চলার ছন্দ, সব কিছুরই আশ্রয় রয়েছে এসব লোকসঙ্গীতে। জীবনের এমন কোন পর্যায় নেই যা লোকসঙ্গীতে ধরা পড়েনি। লোকধারার সঙ্গীতের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে কোন দেশে কোন কালেই লোকসঙ্গীত অনুশীলনের কোন বিধিবদ্ধ প্রণালি নেই। প্রবহমানতার মধ্যেই থাকে লোকসঙ্গীতের প্রাণশক্তি। গ্রামোফোন রেকর্ড ও ক্যাসেট ব্যবস্থা চালু হবার পর, ব্যবসায়িকভাবে এই সব লোকধারার গান মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। বেতার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর লোকধারার গানের প্রসার শুরু হয়। রেডিওতে তখন বলা হত 'পল্লীগীতি'। গ্রামফোন রেকর্ড ও বেতার ব্যবস্থা চালু হবার পর নিভৃত পল্লীর সঙ্গীত সম্পদ শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির সঙ্গীত রুচিতে স্থায়ী যায়গা করে নেয়, বহু শিল্পী লোকধারার গানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। নবীন প্রজন্মের শিল্পীরাও নানা ধারার লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। এসব কারণে লোকধারার গানগুলো সম্প্রতি জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৪. বাংলাদেশের সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।*[৩৫তম]*

উত্তর : বাংলাদেশে সাহিত্যনির্ভর বেশকিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। অদ্বৈতমল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক সিনেমা বানিয়েছেন। আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নেয়ামত আলী নির্মাণ করেন 'সূর্যদীঘল বাড়ি'। এটি বাংলাদেশের প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'হাঙর নদী গ্রেনেড' চলচ্চিত্র। জহির রায়হানের উপন্যাস অবলম্বনে কোহিনুর আক্তার সুচন্দা নির্মাণ করেছেন 'হাজার বছর ধরে' চলচ্চিত্রটি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস অবলম্বনে 'লালসালু', জাফর ইকবালের উপন্যাস অবলম্বনে 'দীপু নাম্বার টু' ও 'আমার বন্ধু রাশেদ' এবং সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাস অবলম্বনে 'গেরিলা' ইত্যাদি সিনেমা নির্মিত হয়। হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তিনি নিজেই সিনেমা বানিয়েছেন। কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন মাসুদ পথিক। কবিতা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ বোধ হয় এই প্রথম। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র তৈরির সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংযোজন-বিয়োজন হয়। তবে মূল বিষয়ের অখণ্ডতা ঠিক থাকে।

CamScanner

৫. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকসংস্কৃতির সংযোগ বর্ণনা করুন।

উত্তর : লোককাহিনি নির্ভর সিনেমা বাংলাদেশে অনেক জনপ্রিয়। লোকেরা তাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন বা পরিণতি দেখতে পায় এ জাতীয় সিনেমায়। ১৯৬৫ সালে সালাহ্উদ্দিন 'রূপবান' সিনেমার মাধ্যমে লোককাহিনিভিত্তিক সিনেমা শুরু করেছিলেন। এ ধারার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র- খান আতাউরের 'রাজা সন্ন্যাসী', আপ্পী মনসুরের 'মহুয়া', জহির রায়হানের 'বেহুলা'। পরবর্তীকালে আজিজুর রহমানের 'মধুমালা', খান আতাউর রহমানের 'সাত ভাই চম্পা', মহিউদ্দিনের 'গাজী কালু চম্পাবতী'। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত 'বেদের মেয়ে জোছনা' ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির শুধু লোককাহিনি নিয়ে কিছু সিনেমা তৈরি হয়েছে। আবহমান বাংলার মৌল জীবনধারা ও পরিবেশ, বৈচিত্র্যময় লোকজ ঐতিহ্য, ইতিহাসের সার্বিক প্রবণতাকে সিনেমায় কাজে লাগানো বড় সুযোগ রয়েছে। আদিবাসি সম্প্রদায়ের রয়েছে বৈচিত্র্যময় আচার ও উৎসব। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে সহজেই পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ইউরোপে বা আমেরিকায় খেলা নিয়ে অনেক ছবি তৈরি হতে দেখা যায়। আমাদের অন্তত জব্বারের বলি খেলা নিয়ে একটা ছবি নির্মাণ করা যায়।

৬. বাউল গানের সাহিত্যগুণ বিচার করুন।

উত্তর : বাউল গান বাঙালির প্রাণের গান। গানগুলো অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের রচনা। বাউল গানের মূল বিষয়বস্তু ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্ম সাধনার ক্রিয়াকলাপ। ফলে এর পরিধি সংকীর্ণ, সীমিত ও বৈচিত্র্যহীন। এসব সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ধর্মপথযাত্রী মানুষের রচনায় সচেতন অলঙ্করণের চেষ্টা নেই। নিতান্ত দৈনন্দিন জীবনাচরণের উপাদান, উপকরণ, উপমা, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারে ব্যক্ত করেছে। অকৃত্রিমতা বাউল গানের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। একটা সহজাত কবিত্বের অনুপ্রেরণায় ভাব যেভাবে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে তাতে কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই। ধর্মতত্ত্বকে বুঝাতে বাউলরা যেটুকু ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন সেটুকুই এর সাহিত্যমূল্য। বহুদিন ধরে এ বাউল গান ছিল অবহেলিত। রবীন্দ্রনাথসহ তার পরবর্তী কয়েকজন গবেষকের বিশেষ প্রচেষ্টায় বাউল গান বাঙালির প্রাণের সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

CamScanner

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য

১. 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। *[৪৩তম]*
অথবা, হাসান হাফিজুর রহমানের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক সংকলন গ্রন্থের নাম কি? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (মার্চ, ১৯৫৩)। যা বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অসামান্য দলিল। এটি সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান। এতে ৬টি বিভাগে ২২ জন লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়। বিভাগগুলো হলো- কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস। সংকলনটি পুঁথিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন ভাষাসৈনিক মোহাম্মদ সুলতান। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আমিনুল ইসলাম। 'একুশের নকশা' নামে দুটি বিশেষ রচনা স্থান পেয়েছিল এ সংকলনে। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটির রক্তাক্ত ঘটনা অবলম্বনে একটি নকশা লিখেছিলেন মর্তুজা বশীর ও অন্যটি সালেহ আহমদ। স্বহস্তে উৎসর্গপত্র লিখেছিলেন ড. আনিসুজ্জামান। যাতে বলা হয়-

'যে অমর দেশবাসীর মধ্যে মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছেন/একুশের শহীদেরা,/যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে/একুশের প্রতিজ্ঞা, - /তাঁদের উদ্দেশ্যে।'

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতানের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরে ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।

২. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক তিনটি গল্পের নাম লিখুন। *[৩৬তম বিসিএস]*
অথবা, ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব রচিত যে কোনো একটি ছোটগল্পের পরিচয় বিধৃত করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : ভাষা আন্দোলনভিত্তিক তিনটি গল্প-

- ✓ মৌন নয়
- ✓ মীর আজিমের দুর্দিন
- ✓ ছেঁড়া তার।

'মৌন নয়' শওকত ওসমানের গল্প। ভাষা-আন্দোলনে ছেলেহারা এক বৃদ্ধের শোকবিহ্বলতার গল্প। একটি চলন্ত বাসে সবাই নীরব। হঠাৎ এক বৃদ্ধের আর্তনাদ- 'কী দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল?' বলে বৃদ্ধ বাসের মেঝেতে পড়ে যায়। বৃদ্ধের আর্তনাদ সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়।

সেলিনা হোসেনের গল্প 'মীর আজিমের দুর্দিন'। গল্পের নায়ক মীর আজিম ষাট বছরের অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। চাকরিজীবনের প্রথমেই সে ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ

©Nazmus Sadat
CamScanner

করে। তারই সামনে পুলিশের গুলিতে সালাম নিহত হয়, সেই স্মৃতি ও স্লোগান তার মনে তীব্রতর হয় স্ত্রী-হারা একাকী অবসর জীবনে। সে আবার শহীদ মিনারে যায় ফুল দিতে। শহীদ মিনারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে স্লোগান দিয়ে ওঠে- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

'ছেঁড়া তার' মাহমুদুল হকের গল্প। মকবুল আর নজরুল দুই বন্ধু। দুজনেই একুশের আন্দোলনের সময় পোস্টার লাগাতে গিয়ে সরকারের পোষা গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নজরুল চিরতরে খোঁড়া হয়ে যায়। যার গ্লানি নিয়ে কাটাতে হয় সারাজীবন। অনেক দিন পরে অফিস-ফেরত মকবুলের সঙ্গে তার দেখা হয়। আর তখনই নজরুল তার বর্তমান গ্লানিময় জীবনের বর্ণনা দেয়।

৩. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক দুটি কবিতার নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম কবিতা- 'কাঁদতে আসি নি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। এটি রচনা করেন মাহবুবুল আলম চৌধুরী। তিনি এই কবিতায় তৎকালীন ভাষা আন্দোলনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলার মানুষের বিদ্রোহ, ক্ষোভ, গ্লানি, হাহাকার, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ, দাবি আদায়ের এক শর্তবাণী তুলে ধরেছেন। ভাষা আন্দোলনে প্রাণ দিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের শোককে শক্তিতে পরিণত করে খুনিদের ফাঁসির দাবিতে রমনার কৃষ্ণচূড়ার তলায় এই কবিতা ধ্বনিত হয়েছে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে। এটি একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য আত্মত্যাগকারী শহীদের স্মরণে প্রথম এবং ভাষিক আগ্রাসনের ওপর লিখিত দ্বিতীয় কবিতা।

কবি আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ'। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি শফিউরের হত্যাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শফিউরের পিতা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী তা ধ্বংস করে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে আলাউদ্দিন আল আজাদ কবিতাটি রচনা করেন।

৪. 'একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা কবিতায় অন্তহীন প্রেরণার উৎস'- এ প্রসঙ্গে অল্প কথায় লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলা কবিতায় ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের সাহিত্যের যে সকল শাখা একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে কবিতা অগ্রগণ্য। 'একুশ' ঘটেছিল ঢাকায় অথচ কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তার অনুরণন উঠেছিল চট্টগ্রামে। সেদিনই রচিত হয়েছিল মাহবুব উল আলম চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।' ১২০ লাইনের কবিতাটি শুধু কবিতা ছিল না। ছিল প্রতিবাদের বিস্ফোরণ-

'এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার নিচে
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে-ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের আলপনা,
সেখানে আমি কাঁদতে আসেনি।'

এরই ধারাবাহিকতায় একে একে রচিত হয় আলাউদ্দিন আল আজাদের 'স্মৃতিস্তম্ভ', হুমায়ুন হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে', আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'মাগো ওরা বলে', মহাদেব সাহার 'তোমরা কি জানো', আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা', জসীমউদ্‌দীনের 'যারা জান দিল', শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা', 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', সুফিয়া কামালের 'এমন আশ্চর্য দিন', আসাদ চৌধুরীর 'ফাগুন এলেই', সৈয়দ শামসুল হকের 'একুশের কবিতা'সহ আরো অসংখ্য কবিতা।

প্রভাতফেরিতে গাওয়া আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' প্রথমে কবিতা হিসাবেই রচিত হয়। পরে সুর দিয়ে গান হিসেবে জনপ্রিয়তা পায়। একুশের প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতায় কখনো ফুটে উঠেছে সন্তানহারা মায়ের প্রতীক্ষা, কখনো গর্জে উঠেছে তীব্র ঘৃণার অক্ষরে প্রতিবাদ। এসব কবিতার প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির ভালবাসার গভীরতার কথা।

৫. বাংলা উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : একুশের প্রথম উপন্যাস জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮)। উপন্যাসটি মূলত পঞ্চান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঢাকা, পঞ্চাশ দশকে বিভিন্ন জেলে বামপন্থি রাজবন্দিদের ওপর গুলি ও হত্যাকাণ্ডে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-আন্দোলনের কর্মী ও তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন ধারার কাহিনি। এছাড়াও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে : সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন', 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি', শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ', মোহাম্মদ আবদুল আওয়ালের 'আলো আমার আলো'। উক্ত উপন্যাসগুলোতে ১৯৫২ সালের ঘটনাপ্রবাহ সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসব উপন্যাস ছাড়াও পরবর্তীকালে বেশকিছু কথাশিল্পীর লেখায় স্বল্পমাত্রায় হলেও একুশের প্রসঙ্গ এসেছে। একুশের উপন্যাস প্রসঙ্গে অনীক মাহমুদ বলেছেন-

'একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাদর্শে লিখিত উপন্যাসের সংখ্যাধিক্য না ঘটলেও মানের ক্ষেত্রে এগুলোর বিশেষত্ব আছে। এগুলোতে বাঙালি জাতির তৎকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন সংগ্রামের নিখুঁত চিত্র ধরা পড়েছে।'

©Nazmus Sadat
CamScanner

৬. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : ১৯৫৫ সালে শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি, সরকারি বাধা ইত্যাদি অবরুদ্ধতাকে কেন্দ্র করে জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) উপন্যাসের পটভূমি রচিত। এ উপন্যাসের কাহিনির স্থিতিকাল মাত্র তিন দিন দুই রাত। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়। সরকার ছাত্রছাত্রীদের শহীদ দিবস পালন করতে দিবে না। কিন্তু ছাত্ররা যে কোনো মূল্যে শহীদ দিবস পালন করবে। পুলিশ শত শত ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করে। একজন একজন করে জেলে ঢোকানো হচ্ছিল। নাম ডাকতে ডাকতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলার সাহেব। এক সময় বিরক্তির সঙ্গে বললেন, উহ অত ছেলেকে জায়গা দেব কোথায়? কথা শুনে একজন বলল-

'এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব।'

এভাবে আন্দোলন বিস্তারের ঘোষণা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়। মূলত সবধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ কীভাবে রুখে দাঁড়ায় এবং আপন স্বার্থকে তুচ্ছ করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে, তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র প্রতিফলিত হয় পুরো উপন্যাস জুড়ে। তবে শুধু আন্দোলনের চিত্র নয়, একইসাথে মানুষের স্মৃতিকাতর মন, প্রিয়জন হারানোর বেদনা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসা ও হৃদয়ঘটিত দুর্বলতাসহ বিচিত্র অনুভূতির চিত্রায়ণ ঘটেছে এই উপন্যাসে।

৭. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একটি নাটকের মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : মুনীর চৌধুরীর ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক 'কবর'। মুনীর চৌধুরী জেলে থাকাকালে (১৯৫২-৫৪) রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে, ১৯৫৩ সালে প্রথম ভাষাদিবস পালন উপলক্ষে জেলের মধ্যে পরিবেশনের জন্য রচনা করেন। ভাষা-আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণে নিহতদের রাতারাতি কবর দিতে চায় শাসকগোষ্ঠী। একাজে নিয়োজিত পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ ও নেতা। কিন্তু ইসলাম ধর্মের রীতিবিরোধী বলে গোর খুঁড়েরা আপত্তি তোলে আর বারুদের গন্ধ থাকায় এ লাশ কবর দেওয়া হবে না বলে মত দেয় মুর্দা ফকির। এমতাবস্থায় বিপাকে পড়ে দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার এবং নেতা। লাশগুলিও কবরে যাব না বলে সমবেত প্রতিবাদ জানায়। এই হলো কবর নাটকের মূল পরিসর। 'কবর' নাটকে নেতা, পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ, মুর্দা-ফকির, কবরস্থানের একজন গার্ড ও কয়েকটি ছায়া চরিত্র রয়েছে। নাটকে লাশগুলো জীবিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কবরে যেতে না চাওয়ার দৃশ্যে রূপকার্থে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তারা মৃত নয়। তারা মরেও অমর। যা আজ সত্যি হয়েছে- ভাষা দিবস এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষা শহীদদের নাম সারা বিশ্বে উচ্চারিত হয়।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য

১. লেখকের নামসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তিনটি ছোটগল্পের নাম লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সৃজনশীল সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য। প্রতিভাবান গল্পকারগণ মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে লিখেছেন অনেক ছোটগল্প।

শওকত ওসমানের 'দুই ব্রিগেডিয়ার' গল্পে দেখানো হয় ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পলাশী এলাকায় পাকবাহিনীর লাগানো আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার সয়ীদ ভুঁইয়া পাক বাহিনীর গুলিতে সদলবলে নিহত হন।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে দেখানো হয়েছে একজন দফাদার রাজাকারের চরিত্রের অন্তরালে কীভাবে হৃদয়ের মধ্যে দেশপ্রেম লালন করেছিল। আর্থিক দৈন্য ও সরকারি চাকরির কারণে সে খানসেনাদের সহায়তা করলেও তার অন্তরে ছিল দেশমাতৃকার প্রতি দায়বদ্ধতা ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতি প্রবল ঘৃণা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প 'রেইনকোট' (১৯৯৫)। গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ে রচিত হয়েছে। এই গল্পের কথক নুরুল হুদা। তার জবানিতে গল্পের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে।

২. মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন *[৩৬তম বিসিএস]* মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। *[৩২তম, ২৯তম]*

উত্তর : শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র গাজী রহমান একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার স্কুলের নাম পাক হানাদার বাহিনীর কালো তালিকায় উঠলে সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর থেকে গ্রামে এসে পালিয়ে বেড়ায়। এ সময় সে প্রত্যক্ষ করে পাকবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনে, জ্বালানো-পোড়ানো, হত্যাযজ্ঞের কারণে প্রিয় মাতৃভূমি জাহান্নামে (দোজখে) পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগে ও নানা চড়াই উৎরাই শেষে সকলের পরামর্শে সীমান্ত পার হয়ে চলে যায়। এ যেন জাহান্নাম থেকে বিদায় নেওয়া। তবে সীমান্তের ওপার থেকে যুদ্ধে যদি কিছু ভূমিকা রাখা যায় এই আশা নিয়ে যায়। উপন্যাসের কাহিনিতে তেমন কোন চাকচিক্য নেই, দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের বিকাশও তেমন চোখে পড়ে না। অন্যান্য সমান্তরাল সব চরিত্রের মধ্যে সখিনা চৌধুরানি চরিত্রটিকে একটু উজ্জ্বল দেখা যায়। তবে তা খুব একটা বিস্তার

CamScanner

লাভ করেনি। উপন্যাসে পাক বাহিনীর নির্মমতায় আক্রান্ত স্বদেশ এবং এ পরিস্থিতিতে গাজী রহমানের মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনই প্রাধান্য পেয়েছে। গাজী রহমান চরিত্রে শওকত ওসমানের ছায়া স্পষ্ট।

৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করুন। *[৩৫তম বিসিএস]*

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির অহঙ্কার। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছে। পাকিস্তানি শোষণ, সংগ্রাম, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নাটকের মৌল বিষয়। বাংলা নাটকে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে বিভিন্নভাবে। কখনো সরাসরি যুদ্ধকে অবলম্বন করে আবার কখনো বা নাটকের বিষয়াংশ সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উজ্জীবন ঘটিয়ে। মমতাজ উদ্দীন আহমদের একটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক হচ্ছে 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭১)। পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণের ফলে দেশের হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল তারই সফল নাট্যচিত্র ফুটে উঠেছে এ নাটকে। নাটকে ছোট দারোগা নুর মোহাম্মদ ও সিপাহি দলিলুর রহমান বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে গ্রেপ্তার করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সরকার বিপ্লবীকে ধরে দেয়ার জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করে। দেশ দরদি দারোগা নুর মোহাম্মদ ছদ্মবেশী বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে পেয়েও মুক্ত করে দেয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি দোসর সহকর্মী দলিলুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করে। এ নাটকে ছদ্মবেশী মোয়াজ্জেম ও দারোগা নুর মোহাম্মদের মধ্যে দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলমুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

৪. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাসের নাম লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩)। এতে বন্দিশালায় নারীদের উপর পাক সেনাদের অত্যাচারের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। এতে লেখক একটি গুদামঘরের বর্ণনা দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র 'বুড়ি'র মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচাতে নিজের প্রতিবন্ধি ছেলেকে বন্দুকের নলের মুখে তুলে দেয়।

আনিসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'মা'। উপন্যাসের গল্পটা শহীদ আজাদের। আর সব গেরিলাদের মায়েদের, যাদের সন্তানরা হারিয়ে গিয়েছিল মধ্য একাত্তরে, আর ফিরে আসেনি।

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস 'নিষিদ্ধ লোবান'। উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধের বিশৃঙ্খল পটভূমিতে বিলকিস নামের এক নারীর সংগ্রামের কাহিনিকে কেন্দ্র করে

©Nazmus Sadat CamScanner

দেশের সর্বস্তরের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি উত্তরাঞ্চলের পটভূমিতে রচিত।

হুমায়ূন আহমেদ রচিত সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল' (২০১৩)। উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে মেজর জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত কালসীমায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি গল্পের মত করে বলে গেছেন।

৫. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা একটি স্মৃতিকথার নাম লিখুন। *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি'। ব্যক্তিগত দিনলিপি বা ডায়েরি আকারে লেখা বইটির ব্যাপ্তি ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৭ ডিসেম্বর। এতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা শহরের অবস্থা ও গেরিলা তৎপরতার বাস্তব চিত্র। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও জীবিত সকল গেরিলাদের উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে। বইটিতে তার সন্তান শফি ইমাম রুমী অন্যতম প্রধান চরিত্র। একাত্তরের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের নিছক দিনলিপি নয়, এটি একটি ইতিহাস। জাহানারা ইমাম নিজেকে আবেগের উর্ধ্বে স্থাপন করে এ ইতিহাস লিখেছেন।

৬. বাংলা উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলা উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের কথা আসলে প্রথমেই আসে আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানীদের বর্বরতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়', 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের খণ্ডচিত্র এঁকেছেন। শওকত আলীর উপন্যাস 'যাত্রা', সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস নিষিদ্ধ লোবান। সেলিনা হোসেন তার 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুড়ি তার একমাত্র সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করে। রশীদ হায়দারের উপন্যাস 'অন্ধ কথামালা', আহমদ ছফার উপন্যাস 'অলাতচক্র', আল মাহমুদের 'উপমহাদেশ', শামসুর রাহমানের 'অদ্ভুত আঁধার এক', মাহমুদুল হকের উপন্যাস 'খেলাঘর'। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস 'ফেরারী সূর্য'। আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়', হারুন হাবীবের 'প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম'। বরেন চক্রবর্তীর 'তামস' বাংলাদেশের বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতার আলোকে ফিরে দেখা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস। জাতীয় জীবনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন লালন করে সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সেই চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন সর্বার্থে কোন উপন্যাসেই উঠে আসেনি। তাই সত্যিকার অর্থেই আমাদের স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে গেলেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় আমরা কোন মহৎ উপন্যাসের দেখা পাইনি।

CamScanner

৭. বাংলা কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় মত কাব্যেও মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ফুটে উঠেছে। কবি জসীমউদ্‌দীন তার 'দগ্ধগ্রাম' কবিতায় যুদ্ধকালীন বাস্তবতা চিহ্নিত করেছেন। সেই দুঃসময়ের অনুভূতিগুলো আভাসিত হয়েছে শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে। রফিক আজাদের 'একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসমর্পণ' কবিতায় বীরোচিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। মহাদেব সাহার কবিতায় হৃদয়ের রক্তক্ষরণের আক্ষেপ ফুটে উঠেছে জোরালোভাবে- 'এতো হত্যা রক্তপাত আমি থামাতে পারি না'। আল মাহমুদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্বহারা মানুষের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। এভাবে তৎকালীন প্রায় প্রত্যেক কবির কবিতায় উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা, বিভিন্ন চিত্র। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা সংকলন 'যখন উদ্যত সঙ্গীত', ডা. মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে', অসীম সাহার 'পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মঘাতী রক্তপাত', আসাদ চৌধুরীর 'রিপোর্ট ১৯৭১', হেলাল হাফিজের 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়', মহাদেব সাহার 'ফারুকের মুখ', দাউদ হায়দারের 'বাংলাদেশ' সহ অসংখ্য কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা কবিতার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালান গ্রিন্সবার্গ 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতায় জনদুর্ভোগের চিত্র উঠে এসেছে :

৮. বাংলা ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা চিত্রিত হয়েছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত 'দুই ব্রিগেডিয়ার' শওকত ওসমানের অনবদ্য ছোটগল্প। সত্যেন সেনের 'পরীবানুর কাহিনি' মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত একটি অনন্য ছোটগল্প। আবু রুশদ রচিত 'খালাস' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র প্রতীকায়িত। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র উঠে এসেছে সরদার জয়েন উদ্দিন-রচিত 'যে ঋণে দেওলিয়া' গল্পে। আবু ইসহাকের 'ময়না কেন কয়না কথা' মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত তাৎপর্যবাহী ছোটগল্প। আলাউদ্দিন আল-আজাদ রচিত 'আমাকে একটি ফুল দাও' গল্পটি একটি দাম্পত্য জীবন বিচ্ছিন্ন হওয়ার করুণ কাহিনি। জহির রায়হান রচিত 'সময়ের প্রয়োজনে' প্রতিবেদনধর্মী ছোটগল্প। আবু জাফর শামসুদ্দীনের গল্প 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পে দেখানো হয়েছে রাজাকার চরিত্রের অন্তরালে হৃদয়ের মধ্যে লালিত দেশপ্রেম। সৈয়দ শামসুল হকের 'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে' মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে লেখা একটি অসাধারণ ছোটগল্প। হাসান আজিজুল হকের 'ভূষণের একদিন' মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত জীবনঘনিষ্ঠ তৎপর্যবাহী ছোটগল্প। হাসনাত আবদুল হাই 'একাত্তরে মোপাসাঁ' গল্পে হানাদার বাহিনীর নারী-লোলুপতার কদর্য চিত্র তুলে ধরেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট' গল্পে আঁকা হয়েছে নগরজীবনের শঙ্কিত ও রক্তাক্ত প্রতিকৃতি।

CamScanner

৯. 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : শামসুর রাহমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্য 'বন্দী শিবির থেকে'। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা একজন সন্ত্রস্ত, ব্যথিত কবির অভিজ্ঞতা ও ভাবনা বেদনার অভিজ্ঞান। নাম কবিতা 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে তিনি ভরাট গলায় উচ্চারণ করে তৃপ্তি পেতে চান। জাতীয়তাবাদের আদর্শটি সহজেই এখানে চোখে পড়ে। কবি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, স্বাধীনতার জন্য কারা কারা অপেক্ষা করছে বা আত্মত্যাগের জন্য ঘর ছেড়েছে। কবির তালিকায় স্থান পেয়েছে 'হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী', 'সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক', 'কেষ্টদাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা', 'মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি', 'রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা' আর 'রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই তেজী তরুণ'। স্বজাতির আত্মত্যাগকে গৌরবান্বিত করেছেন- 'মধুস্মৃতি', 'রক্তাক্ত প্রান্তরে' আর 'তার উক্তি' কবিতায়। 'শহীদ মিনার'-এর সূত্র ধরে বায়ান্নর স্মৃতিকেও স্মরণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা এ কাব্যের প্রতিটি শব্দ সাত কোটি বাঙালির আকাঙ্ক্ষার স্মারকে পরিণত হয়েছে। 'বন্দী শিবির থেকে' কেবল মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক বর্ণনা নয়। এই কাব্যের অনেক কবিতায় বিগত ২৪ বছরের ইতিহাসকে খোঁজা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে দেখার ক্ষেত্রে কবির দারুণ সামগ্রিকতার পরিচয় রয়েছে এখানে।

বিবিধ

১. 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে কী বোঝেন? *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মাহবুবুল আলম ***'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'*** বইয়ে লিখেছেন- 'বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে সাধারণত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের বর্তমান পরিসীমায় রচিত সাহিত্য বোঝায়।' দেশবিভাগের পর বাংলা সাহিত্যে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, বর্তমান বাংলাদেশ তারই উত্তরাধিকারী। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টতর হয়ে উঠলেও প্রায় সবক্ষেত্রে এখনও পূর্বতন বৈশিষ্ট্যেরই জের চলছে। একেবারে আলাদা করে স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করার মত সৃষ্টিসম্ভার এবং স্বরূপলক্ষণ এখনও স্বকীয়তা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। তাই ১৯৪৭ পরবর্তী সাহিত্যকেই 'বাংলাদেশের সাহিত্য' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারা বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এর ভিত্তি তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার আগের কয়েক দশকে। পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন লেখকদের নতুন প্রেরণা দিয়েছে। এই লেখকেরা স্বাধীন বাংলাদেশেও লিখেছেন আর তার সাথে যুক্ত

©Nazmus Sadat CamScanner

হয়েছে নতুন লেখক প্রজন্ম। স্বাধীনতা পরবর্তী যেসব গুণী লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যে অবদান রেখেছেন, তাঁরা হলেন- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আহমদ ছফা, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, হুমায়ুন আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, হেলাল হাফিজ, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, হুমায়ুন আহমেদ, শহীদুল জহির প্রমুখ।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত তিনটি গ্রন্থের প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দী হিসেবে কারাগারে থাকার সময় তিনটি বই রচনা করেন। তিনটি বই সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ। সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় তিনটি বইয়ে।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য			
	অসমাপ্ত আত্মজীবনী	কারাগারের রোজনামচা	আমার দেখা নয়াচীন
প্রথম প্রকাশ	জুন, ২০১২	মার্চ, ২০১৭	ফেব্রুয়ারি, ২০২০
প্রকাশক	ইউপিএল	বাংলা একাডেমি	বাংলা একাডেমি
পৃষ্ঠা	৩২৯	৩৩২	১৯৯
মূল্য	২২০ টাকা	৪০০ টাকা	৪০০ টাকা

এই বইগুলোতে কেবল একজন রাজনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, লেখকের দায়বোধও ফুটে উঠেছে। ফলে বলা যায়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শিল্পের সুষমা- এটিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বইয়ের একমাত্রিক ব্যঞ্জনা।

৩. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ প্রকাশের পটভূমি লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। গ্রন্থটি রচনার পটভূমি এরকম- বঙ্গবন্ধুকে তাঁর সহকর্মীরা কারাগারে বসে রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী লিখতে বলতেন। একদিন তাঁর সহধর্মিনী রেণুর অনুরোধ করে বলেন- 'বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।' এভাবে কারাগারে বসেই আত্মজীবনী লেখা শুরু হয়। চারটি খাতায় তা লেখা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে পরিবারের সবাইকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার বাড়িটা বন্ধ করে দেয়। খাতাগুলোও হারিয়ে যায়। এভাবে মূল খাতাগুলো কয়েক যুগের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ভূমিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন- ২০০৪ সালে আব্বার হাতের লেখা আত্মজীবনীর চারখানা খাতা আমার হাতে এলো! আমার এক ফুফাতো ভাই আমাকে এনে দিল। আমার আরেক ফুফাতো ভাই বাংলার বাণী সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণির অফিসের টেবিলের

CamScanner

ড্রয়ার থেকে সে এই খাতাগুলো পেয়েছিল। সম্ভবত আব্বা শেখ মণিকে টাইপ করতে দিয়েছিলেন, আত্মজীবনী ছাপাবেন এই চিন্তা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনিও শাহাদতবরণ করায় তা করতে পারেননি। কাজটা অসমাপ্ত রয়ে যায়।

এভাবে রক্ষা পাওয়া খাতাগুলো নিয়ে সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। সম্পাদনা ও প্রকাশনার মূল ভূমিকা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা। এছাড়াও সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন ইতিহাসবিদ সালাহ্ উদ্দীন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন, প্রয়াত সাংবাদিক বেবী মওদুদ, অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এবং অধ্যাপক ফকরুল আলম। এরপর ৯ জুলাই ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি অত্যন্ত আবেগঘন প্রকাশনা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বইটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৪. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। *[৩৬তম]*

উত্তর : ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে (বর্তমান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এদের মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা। মুসলিম সাহিত্য সমাজের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'। আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদির, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখরা ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান আর মুক্তবুদ্ধির চর্চার মধ্য দিয়ে প্রগতির পথে এ আন্দোলনের নতুন যাত্রা। মুসলমানদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও জ্ঞানের রাজ্যে আহ্বান করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। এর সদস্যরা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং যুক্তিবাদী। তারা শিল্পচর্চা, নারীশিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে উৎসাহিত করতেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান তরুণেরা এদের সান্নিধ্যে এসে নতুন করে জগতকে দেখতে শুরু করে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বহু চিন্তাশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবী বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এক সময় মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যরা ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়লে এর কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে স্থবির হয়ে পড়ে।

৫. বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ও কবে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? *[৩৪তম]*

উত্তর : ১৫৫৬ সালে পর্তুগিজরা ভারতীয় উপমহাদেশের গোয়াতে প্রথম ছাপাখানার প্রবর্তন করে। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সালে। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে ১৮৪৭ সালে রংপুরে 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৬. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সম্পর্কে তিনটি বাক্য রচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

অথবা, বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী থাকাকালে তিনি এটি লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক করে তাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে গেলে লেখা বন্ধ হয়ে যায়। বইয়ের শুরুর দিকে বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ইতিহাসের বর্ণনা আছে। যুক্তফ্রন্ট হবার পর নানাবিধ গণ্ডগোল ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ভিতর দিয়ে কাহিনি প্রবাহ আগাতে গিয়ে হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায়। অসমাপ্ত রয়ে যায়।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি একই সাথে আত্মজীবনী ও রাজনৈতিক দলিল। নিজের জীবন কাহিনির মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ। অসমাপ্ত এ লেখায় ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৫ সালের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা রয়েছে। বইটিতে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভূমিকাটি তিনি ২০০৭ সালে সাব জেলে থাকা অবস্থায় লিখেছেন। এ ভূমিকা থেকেই জানা যায় আলোচ্য গ্রন্থের রচনা ও উদ্ধারের ইতিহাস।

৭. পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা গদ্যানুবাদকের নাম লিখুন। *[২২তম]*

উত্তর : ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে পবিত্র কুরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন। ১৮৮১-১৮৮৬ পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ছয় বছর সাধনা ও পরিশ্রম করে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ কাজ সমাপ্ত করেন এবং এ অনুবাদ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ১৯৩৬ সালে এ অনুবাদের ৪র্থ সংস্করণে মওলানা আকরম খাঁ একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেন।

৮. বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'কারাগারের রোজনামচা'। সরকার বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দিনের পর দিন কারাগারের কাটাতে হয়েছে। কারাগারের নিভৃত কক্ষে তিনি লিখে গেছেন তাঁর জীবনের নানা কথা। ছয় দফা আন্দোলন ও আগরতলা মামলায় গ্রেফতারের পর ১৯৬৬ সালের ২ জুন থেকে ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুর্মিটোলা সেনানিবাসে অফিসার মেসে বন্দী ছিলেন। সেই সময়ে কারাগারে প্রতিদিন তিনি ডায়েরী লেখা শুরু করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল

পর্যন্ত সময়ের বন্দিজীবনের দিনলিপিই 'কারাগারের রোজনামচা'। ডায়েরি আকারে লেখা কথাগুলো শুধু তাঁর জীবন সম্পর্কিত নয়,পাকিস্তান আমলের নানা অজানা বিষয়ের উৎস। বঙ্গবন্ধুর ৯৭তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলা একাডেমি বইটি প্রকাশ করে।

৯. 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত গ্রন্থ 'শেখ মুজিব আমার পিতা'। প্রধানমন্ত্রী আশির দশকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে আসেন। তখন বাংলাদেশের রাজনীতি এক জটিল ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ছিল। সেদিনের স্বৈরাচার বিরোধিতার দিনগুলোতে তিনি একের পর এক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকা ও সংকলনে প্রকাশিত দশটি প্রবন্ধের সংকলন 'শেখ মুজিব আমার পিতা'। গ্রন্থটি মূলত স্মৃতিকথামূলক আত্মজৈবনিক রচনা। এতে স্থান পেয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও পরিবারের অনেক অজানা কথা। রয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। বইটির প্রথম দুই ভাগে রয়েছে পারিবারিক স্মৃতিচারণ এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। প্রবন্ধগুলো আত্মজৈবনিক রচনা হলেও সঙ্গত কারণেই এতে স্থান পেয়েছে রাজনীতি, অপরাজনীতি, ক্ষমতার লড়াই, '৭৫পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র। ঘুরে ফিরে তিনি লেখায় ধারণ করেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশকে।

১০. বাংলা একাডেমি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বনাম বর্ধমান হাউজ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন)। এটি উদ্বোধন করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। ১৯৫৬ সালে প্রথম বাংলা একাডেমির পরিচালক নিযুক্ত হন অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত প্রথম বই আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী মজনু'। ১৯৬০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম। একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজক বাংলা একাডেমি। ১৯৭৮ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলা শুরু হয়। 'মুক্তধারা' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার চিত্তরঞ্জন সাহা প্রথম বাংলা একাডেমিতে বইমেলা শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে বইমেলাকে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' নামকরণ করা হয়।

CamScanner

১১. বাংলাদেশে নাট্যচর্চার সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীন ভূখণ্ডে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালে। স্বাধীনতার পর বাঙালি পেয়েছিল মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাট্যচর্চায় এগিয়ে এলেন। নাট্যচর্চার এই আন্দোলনে যুক্ত হতে লাগল সচেতন তরুণ ছাত্রসমাজ। নাটক হয়ে উঠলো সমাজের প্রতিচ্ছবি, তরুণ নাট্যকর্মীরাও নাটকের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ হয়ে উঠলো। এই নাট্য জোয়ারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলো- নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়, আরণ্যক নাট্যদল, থিয়েটার, নাট্যচক্র, ঢাকা থিয়েটার, বহুবচনসহ অন্যান্য দল। কিন্তু উচ্চ মধ্যবিত্তের বলয়ে বেড়ে ওঠা নাট্যদলগুলির একসময়ের বৈভব অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়। যে আবেগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বাংলাদেশে নাট্যচর্চা- নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার গতি অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায়। নাট্য আন্দোলনের প্রথম সারির নাট্যকর্মীরা সিনেমা-টেলিভিশনে অভিনয় করতে আগ্রহী কিন্তু থিয়েটারকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এছাড়াও মৌলিক নাটকের অভাব, নাট্যমঞ্চের অভাব, দর্শকের অভাব, নাট্যদলে ভাঙন-গঠন ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তথাপিও বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বেঁচে থাকবে সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের পদচারণায়।

১২. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কোন কবির বাণী? *[১৫তম]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস উচ্চারণ করেছিলেন মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক বাণী-

'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

এটি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের রয়েছে বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়-অন্যায় ও ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা, যা অন্য কোনো প্রাণির নাই। মানুষ আদিকাল থেকেই নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। মেধা এবং যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি মানুষ জীবের প্রতি দয়া দেখায়। এটি কবি তার পদাবলিতে বলতে চেয়েছেন।

CamScanner

ব্যাকরণ

বাংলা লিপি ও ভাষা

১. বাংলা লিপির উৎস কি? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : লিপি হচ্ছে লিখন পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দুটি লিপির ইতিহাস পাওয়া যায়। একটি ব্রাহ্মী লিপি, অপরটি খরোষ্ঠি লিপি। ব্রাহ্মী লিপি থেকে উৎপন্ন হয়েছে বাংলা লিপি। ব্রাহ্মী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও বহুল প্রচলিত লিপি। ভারতীয় অন্য সকল ভাষার লিপিই এ লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে।

২. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম লিখুন। *[৩৪তম]*

উত্তর : ভাষা বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে কয়েকটি ভাগে (কাল্পনিক নাম দিয়ে) ভাগ করেছেন। এগুলোকে একেকটি ভাষাবংশ বা ভাষাগোষ্ঠী বলা হয়। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠী হলো-

- ✓ ইন্দো-ইউরোপীয়
- ✓ ভোটচীনীয়
- ✓ দ্রাবিড়ীয়
- ✓ সেমেটিক-হেমেটিক

৩. বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত? *[২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : পৃথিবীর ভাষাবংশ বা ভাষাগোষ্ঠীর একটি হলো ইন্দো-ইউরোপীয়। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত।

৪. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে, কোন ভাষায়, কোথায় রচনা করেন? *[১৫তম বিসিএস]*

উত্তর : পর্তুগিজ ধর্মযাজক মনোএল দা আসসম্পাসাঁউ ১৭৩৪-৪২ সালের মধ্যে গাজীপুরের ভাওয়ালে একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনকালে ভবিষ্যত ধর্মযাজকদের সুবিধার জন্য 'Vocabolario em idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ সালে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি বাংলা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার। দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। এটি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ।

CamScanner

শব্দগঠন

১. শব্দ কাকে বলে?

উত্তর : এক বা একাধিক বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে। অর্থাৎ অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিতে শব্দ গঠিত হয়। যেমন- ক, ল, ম এই তিনটি ধ্বনি একসাথে মিলে 'কলম' হয়। কলম দ্বারা লেখার একটি উপকরণকে বোঝায়। তাই এটি একটি শব্দ। একইভাবে মানুষ, আকাশ, বই ইত্যাদি শব্দ। শব্দ ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বর্ণ পাওয়া যায়।

২. অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। *[৪৪তম বিসিএস]*
অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন *[৩৮তম]*

উত্তর : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. যৌগিক শব্দ ২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ও ৩. যোগরূঢ় শব্দ।

১. যৌগিক শব্দ : যেসকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক বা প্রচলিত অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

মূল শব্দ	গঠন	ব্যুৎপত্তিগত ও প্রচলিত অর্থ
গায়ক	গৈ+ণক (অক)	যে গান করে
চালক	চল+অক	যে চালায়
কর্তব্য	কৃ+তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু+আনা	বাবুর ভাব

এরূপ আরও শব্দের উদাহরণ হলো– চিকামারা, দৌহিত্র, মধুর, গুণবান, চরণ, পক্ষী, পাঠক, পাচক, বিদ্যালয়, ভাড়াটে, মিতালি, সংবাদদাতা ইত্যাদি।

২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ : প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত সে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক বা প্রচলিত অর্থ আলাদা হয় তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।

মূল শব্দ	গঠন	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ
হস্তী	হস্ত+ইন	হস্ত আছে যার	একটি পশু, হাতি
গবেষণা	গো+এষণা	গরু খোঁজা	ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা
বাঁশি	বাঁশ+ইন	বাঁশ দিয়ে তৈরি	সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র
তৈল	তিল+ষ্ণ্য	তিল থেকে উৎপন্ন	যেকোন উদ্ভিদজাত স্নেহ পদার্থ

এরূপ আরও শব্দ হলো- অতিথি, কুশল, গবাক্ষ, দুহিতা, প্রবীণ, হরিণ, পাঞ্জাবি, সন্দেশ, রাখাল, স্নাতক ইত্যাদি।

Type text here Type text here
©Nazmus Sadat
CamScanner

৩. **যোগরূঢ় শব্দ :** সমাস নিষ্পন্ন সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একাধিক জিনিসকে বোঝাতে পারে কিন্তু শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ যদি তার মধ্যে কেবল একটিকেই বোঝায়, তবে তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন :

মূল শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	যোগরূঢ় অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল)	পদ্মফুল
রাজপুত	রাজার পুত্র	ভারতের একটি জাতি
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু
জলধি	জল ধারণ করে এমন	সমুদ্র

এরূপ আরও উদাহরণ হলো– অন্ন, আদিত্য, তুরঙ্গম, জলদ, মন্দির, সরোজ ইত্যাদি।

৩. উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। *[৪৪তম (পেশাগত)]*

উত্তর : বুৎপত্তিগতভাবে/উৎস/উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার পাঁচ প্রকার-

১. **তৎসম শব্দ :** যেসব সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতরূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোকে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বলে। যেমন : অঞ্চল, আকাশ, আগমন, আতিথ্য, স্পর্শ, স্মৃতি, হস্ত, ইত্যাদি।

২. **অর্ধ-তৎসম শব্দ :** সেসব সংস্কৃত শব্দ কিছুটা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন : আঁধার, কামার, গতর, গিন্নী, মোচ্ছব, মিত্তির, সোয়াদ, ছেরাদ্দ, পেন্নাম, নেমন্তন্ন ইত্যাদি।

৩. **তদ্ভব শব্দ :** যেসব তৎসম শব্দ (সংস্কৃত শব্দ) নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে সেসব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দগুলো প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে এসেছে বলে এগুলোকে প্রাকৃত শব্দও বলে। যেমন: আজ, কাজ, চাকা, সাঁতার, ভাত, কান, মাথা, হাত, চামার, পাথর, কানু ইত্যাদি।

☆ উল্লেখ্য তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দকে আর্যমূল শব্দ বলা হয়।

৪. **দেশি শব্দ :** আর্য জাতি আসার আগে এ দেশে দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্য জাতির বসবাস ছিল। তাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ এখনো বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এসব অনার্যমূল শব্দকে দেশি বলা হয়। যেমন : কয়লা, খড়, ঝোল, টোপর, ঠোঙ্গা, ডাব, ডাগর, ডিঙা, ডোঙা, ঢিল, সাবাড়।

৫. **বিদেশি শব্দ :** রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন দেশের মানুষ বাংলাদেশে এসেছে। তাদের ভাষার বহু শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। বিদেশি শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে-

✓ আরবি শব্দ : আল্লাহ, ইসলাম, আদালত, কলম, কানুন, তারিখ ইত্যাদি।

✓ ফারসি শব্দ : খোদা, গুনাহ, আইন, আবহাওয়া, কারখানা, হাঙ্গামা ইত্যাদি।
✓ ইংরেজি শব্দ : ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।
✓ পর্তুগিজ শব্দ : আলমারি, ইংরেজ, ইস্পাত, কামরা, কেদারা ইত্যাদি।
✓ তুর্কি : উজবুক, কুর্নিশ, কোর্মা, খাতুন, চকমক, চাকু, ঠাকুর, ইত্যাদি।
✓ জাপানি : কারাতে, জুডো, প্যাগোডা, রিক্সা, সুনামী, হারিকিরি, হাস্নাহেনা।
✓ চীনা : চা, চিনি, লিচু (লুচি সংস্কৃত), সাম্পান।

উল্লেখ্য ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে- বাংলা ভাষায় ২৫% শব্দ তৎসম, ৫% শব্দ অর্ধ-তৎসম, ৬০% শব্দ তদ্ভব, ২% শব্দ দেশি ও ৮% শব্দ বিদেশি।

৪. উদাহরণসহ ষ-ত্ব ও ণ-ত্ব বিধি আলোচনা করুন। *[৪৪তম (পেশাগত)]*

উত্তর : বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই বলে বাংলা দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ রয়েছে।

ণ-ত্ব বিধান: যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে 'ন' (দন্ত-ন) স্থানে 'ণ' (মূর্ধন্য-ণ) ব্যবহৃত হয় তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে। যেমন: তৃণ, বর্ণনা, পরায়ণ, অর্পণ ইত্যাদি।

❖ ণ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলী

১. ঋ, র, ষ -এই তিন বর্ণের পরে 'ণ' হয়। যেমন- ঋণ, কৃষাণ, আবরণ, উচ্চারণ, গবেষণা, ঘর্ষণ, ক্ষণিক, ক্ষীণ ইত্যাদি।
২. ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ঢ) ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন- কণ্টক, ঘণ্টা, উৎকণ্ঠা, কণ্ঠ, কাণ্ডারী, কুণ্ডলী ইত্যাদি।
৩. র বা র-ফলার পর পরপদে 'অয়ন' শব্দের 'ন' সবসময় 'ণ' হয়। যেমন: নারায়ণ, পরায়ণ, উত্তরায়ণ, চন্দ্রায়ণ। কিন্তু 'দক্ষিণ' শব্দের পর 'অয়ন' শব্দ যুক্ত হলে অয়ন-এর দন্ত্য-ন অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- দক্ষিণ+অয়ন=দক্ষিণায়ন।
৪. ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, ষ য় ব হ ং এবং ক বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- কৃপণ (ঋ- কারের পরে প, তার পরে ণ), হরিণ (র-এর পরে ই, তার পরে ণ), অর্পণ (র্+প্+অ+ণ), লক্ষণ (ক্+ষ্+অ+ণ)। এরূপ- রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।
৫. প্র, পরা, পরি, নির- এ চারটি উপসর্গ ও অন্তর শব্দের পর- নদ, নম, নশ, নহ, নী, নু, নুদ, অন ও হন ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধণ্য 'ণ' হয়। যেমন: পরিণত, পরিণতি, পরিণয়, পরিণাম, প্রণতি, প্রবীণ, প্রমাণ ইত্যাদি।
৬. প্র, পরা, পূর্ব, অপর- এই কটি পূর্বপদের পর 'অহ্ন' শব্দ বসলে ণত্ব বিধি অনুসারে দন্ত্য-ন এর জায়গায় মূর্ধণ্য 'ণ' হয়। যেমন: প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।
৭. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়। যেমন- আপণ, কণিকা, নিপুণ, পিণাক, মাণিক্য, লবণ, লাবণ্য ইত্যাদি।

CamScanner

❖ **ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয় যেখানে:**

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে সবসময় ন হয়। যেমন- অগ্রনায়ক, অহর্নিশ, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি, নিরন্ন ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দে 'ন' হয়। যেমন- কোরআন, জবান, ফরমান, ইরান, তুরান, জার্মান, সাইরেন, রানা, হর্ন ইত্যাদি।

বাংলা ক্রিয়া পদে অন্তঃস্থিত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না। যেমন: ধরেন, মারেন, যাবেন, খাবেন, হবেন, নিবেন ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধান: যে রীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-ব্যবহৃত হয় তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে। যেমন: কৃষক, অভিষেক, আষাঢ় ইত্যাদি।

❖ **ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম**

১. ঋ বা ঋ-কার (ৃ)-এর পর 'ষ' হয়। যেমন- কৃষক, তৃষা, বৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।

২. রেফ (র্) এর পরে 'ষ' হয়। যেমন- উৎকর্ষ, ঘর্ষণ, বর্ষীয়ান, বার্ষিক ইত্যাদি।

৩. অ, আ, ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স থাকলে ষ হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

৪. র-ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথা- পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা: পুরস্কার।

৫. ট এবং ঠ-এর পূর্বে সর্বদা 'ষ' হয়। যেমন- আবিষ্ট, কষ্ট, ঘনিষ্ঠ, গরিষ্ঠ ইত্যাদি।

৬. সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার (ি ঃ) বা উ-কারের (ু ঃ) পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গস্থানে 'ষ' হয়। যেমন: আবিঃ+কার=আবিষ্কার, দুঃ+কার=দুষ্কর।

৭. সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর 'ষ' হয়। যেমন- কল্যাণীয়েষু, প্রিয়বরেষু, শ্রীচরনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, সুজনেষু ইত্যাদি।

৮. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন- আভাষ, ঘোষণা, বিষয়, পাষাণ, মানুষ, শোষণ, সরিষা, ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি।

❖ **ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয় যেখানে:**

খাঁটি বাংলা শব্দে 'ষ' হয় না। যেমন: করিস, দেশি, মিশি, আবাস ইত্যাদি।

বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না। যেমন- অফিস, ইশারা, কমিশন, মুশকিল, শয়তান, শৌখিন, সুপারিশ, স্টেশন, হোস্টেল ইত্যাদি।

সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে 'ষ' হয় না। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

৫. সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। *[৩৬ তম বিসিএস]*

অথবা, গঠন অনুসারে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার গঠিত হয়েছে নানা প্রক্রিয়ায়। গঠন অনুসারে বাংলা শব্দ সমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. মৌলিক শব্দ ২. সাধিত শব্দ।

- **মৌলিক শব্দ:** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আর কোন শব্দ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন: গোলাপ, নাক, লাল, তিন ইত্যাদি।
- **সাধিত শব্দ:** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধিত শব্দ বিভিন্নভাবে গঠিত হলেও প্রধানত সমাস, প্রত্যয় এবং উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত হয়। যেমন : চাঁদমুখ (চাঁদের মত মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), চলন্ত (চল্+অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন) ইত্যাদি।

৬. নিচের শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন ঃ *[৩৫ তম বিসিএস]*

কিস্তি, পুলটিক্স, টোপর, সোহাগ, পাপড়, ভাত।

উত্তর : শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় হলো-

কিস্তি (নৌকা)= ফারসি শব্দ থেকে এসেছে।

পুলটিক্স= ইংরেজি Poulitce থেকে এসেছে।

টোপর= দেশি শব্দ।

সোহাগ= সংস্কৃত সৌভাগ্য থেকে এসেছে।

পাপড়= এটি সংস্কৃত পর্পট থেকে এসেছে।

ভাত= তদ্ভব শব্দ, সংস্কৃত ভক্ত থেকে এসেছে।

৭. শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। *[৪৪তম বিসিএস]*

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপায়গুলো কী কী? সমাস দ্বারা শব্দগঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের উপায়গুলো কী কী? প্রত্যয়যোগে শব্দগঠনের উপায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস (কারিগরি/পেশাগত)]*

শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। *[৪০ তম, ৩৫ তম]*

উত্তর : অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির নাম শব্দ। গঠনের দিক থেকে শব্দ দুই প্রকার। যথা- মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ। একাধিক মৌলিক শব্দ যুক্ত হয়ে বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি যোগে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় শব্দ গঠন। অর্থাৎ যেসব নিয়ম বা রীতি অনুযায়ী সাধিত শব্দ গঠিত হয়, সেসব নিয়ম বা রীতিকেই শব্দ গঠন রীতি বলা হয়। বাংলা ভাষায় শব্দগুলো নানা

উপায়ে গঠিত হয়ে থাকে। নিচে শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো :

১. সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন : মূলত বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে ভাষাকে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার একটি কৌশল হচ্ছে সমাস। পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : মহৎ যে জন = মহাজন, জায়া ও পতি = দম্পতি ইত্যাদি।

২. উপসর্গযোগে শব্দ গঠন : এ ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন : প্র+হার=প্রহার, পরা+জয়=পরাজয় ইত্যাদি।

৩. সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠন : পাশাপাশি দুটি বর্ণের একত্রীকরণের ফলে এই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়। যেমন : বিদ্যা+আলয়= বিদ্যালয়, পর+উপকার= পরোপকার ইত্যাদি।

৪. প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করেও নতুন নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন :

ক) কৃৎ প্রত্যয় যোগে : পড়+আ=পড়া, পাঠ+অক=পাঠক ইত্যাদি।

খ) তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে : কলম+দানি=কলমদানি, নাম+তা=নামতা ইত্যাদি।

৫. বিভক্তির সাহায্যে শব্দ গঠন : শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ করেও নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন : কর+এ=করে, রহিম+ এর= রহিমের ইত্যাদি।

৬. দ্বিরুক্ত শব্দের সাহায্যে শব্দ গঠন : শব্দের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ তৈরি হয়। যেমন : শনশন, মোটামুটি, রাজায় রাজায় ইত্যাদি।

৭. পদ পরিবর্তনের সাহায্যে শব্দ গঠন : পদ পরিবর্তনের মাধ্যমেও নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন : মানব (বিশেষ্য) > মানবিক (বিশেষণ), পৃথিবী (বিশেষ্য) > পার্থিব (বিশেষণ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য উপর্যুক্ত সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দ গঠিত হলেও মূলত সমাস, প্রত্যয় এবং উপসর্গের মাধ্যমে প্রধানরূপে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

৮. <u>বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।</u>

উত্তর : বাংলা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ভাষা। এই ভাষার রয়েছে বিপুল শব্দসম্ভার। বাংলা ভাষার শব্দ গঠনে নানা পদ্ধতি প্রচলিত। প্রত্যয়, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস, দ্বিরুক্ত শব্দ, পদ পরিবর্তন, বিভক্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি ব্যাকরণগত সূত্র প্রয়োগ করে বাংলা শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ ও সহজ করা হয়েছে। ভাষা বহতা নদীর মতো প্রবহমান। ভাষার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শব্দ গঠন কার্যক্রম অবিরাম সচল রাখা অপরিহার্য। পৃথিবীতে যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত বেশি সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। ভাষা হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব সমধিক। বাংলা ভাষা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। এ

ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শব্দভাণ্ডারকে করতে হবে আরও সমৃদ্ধ। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াও প্রতিশব্দ, বিকল্প শব্দ এবং পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা ভাষার শব্দ-বাক্যের পরিধি আরো সম্প্রসারণ করা সম্ভব। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও অধিক সংখ্যায় শব্দ গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৯. উপসর্গ বলতে কী বোঝায়? উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ লিখুন।

উত্তর : উপসর্গ এক ধরনের শব্দাংশ, যা শব্দের পূর্বে বসে মূল শব্দটির অর্থের প্রসারণ, সংকোচন বা অন্য কোনো রূপ পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন :

আ + হার = আহার (খাওয়া)।
বি + হার = বিহার (ভ্রমণ)।
প্র + হার = প্রহার (আঘাত)।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য :

ক. উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহার সাধারণত নেই। তবে 'অতি' ও 'প্রতি' উপসর্গ দুটি কখনো কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়।
খ. উপসর্গ মূল শব্দের আগে যুক্ত হয়।
গ. উপসর্গ নতুন নতুন শব্দ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
ঘ. উপসর্গ দ্বারা গঠিত শব্দের বানানে কখনো কখনো পরিবর্তন সূচিত হয়।

উপসর্গের প্রকারভেদ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. খাঁটি বাংলা উপসর্গ
খ. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ
গ. বিদেশি উপসর্গ।

১০. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি? খাঁটি বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন লিখুন।

উত্তর : খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট একুশ (২১)টি। যথা : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা সু, হা।

খাঁটি বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন-

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
অ	নিন্দিত অর্থে	অমানুষ, অপয়া, অকেজো
অঘা	বোকা অর্থে	অঘারাম, অঘাচণ্ডী, অঘামার্কা
অজ	নিতান্ত অর্থে	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	অভাব অর্থে	অনাহার, অনাবৃষ্টি, অনাদর

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
আ	অভাব অর্থে	আকাঁড়া, আধোয়া, আচালা
আড়	বক্র অর্থে	আড়চোখে, আড়নয়নে, আড়দৃষ্টি
আন	না অর্থে	আনকোরা, আনসেলাই, আনপাড়া
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
ইতি	এ বা এর অর্থে	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
উন(ঊনা)	কম	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ
কদ্	নিন্দিত অর্থে	কদবেল, কদাকার, কদর্য
কু	কুৎসিত অর্থে	কুকাজ, কুকথা, কুঅভ্যাস
নি	নাই/নেতি অর্থে	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
বি	ভিন্নতা/নিন্দনীয়	বিভূঁই, বিফল, বিপথ
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরপুর, ভরদুপুর
রাম	বড় অর্থে	রামছাগল, রামদা, রামসিঙ্গা
স	সঙ্গে অর্থে	সস্ত্রীক, সলজ্জ, সরাজ, সরব
সা	উৎকৃষ্ট অর্থে	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম অর্থে	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম
হা	অভাব	হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ

১১. তৎসম উপসর্গ কয়টি? তৎসম উপসর্গযোগে শব্দ গঠন লিখুন।

উত্তর : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের পূর্বে যেসব উপসর্গ বসে তাদেরকে তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ বলে। তৎসম উপসর্গ মোট বিশ (২০)টি। যথা : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

তৎসম উপসর্গযোগে শব্দ গঠন-

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
প্র	প্রকৃষ্ট অর্থে	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত,
পরা	বিপরীত অর্থে	পরাজয়, পরাভব, পরাধীন
অপ	নিকৃষ্ট অর্থে	অপকর্ম, অপসংস্কৃতি, অপসৃষ্টি
সম	সম্যকরূপে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
নি	নিশ্চয় অর্থে	নির্ণয়
অব	হীনতা অর্থে	অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা

CamScanner

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
অনু	পশ্চাৎ অর্থে	অনুশোচনা, অনুগামী
নির	অভাব অর্থে	নিরব, নির্জীব, নিরহঙ্কার
দুর	মন্দ অর্থে	দুর্ভাগ্য, দুর্নাম, দুর্ঘটনা, দুর্জন
বি	অভাব অর্থে	বিশৃঙ্খল, বিফল, বিতৃষ্ণা
সু	উত্তম অর্থে	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত
অধি	আধিপত্য	অধিকার, অধিপতি, অধিনায়ক
পরি	বিশেষ রূপ অর্থে	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
প্রতি	সদৃশ অর্থে	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিচ্ছায়া
উপ	সামীপ্য অর্থে	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপশহর
অভি	সম্যক অর্থে	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র

১২. বিদেশি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন লিখুন।

উত্তর : আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ভাষা থেকে সে সকল উপসর্গ এসেছে তাদেরকে বিদেশি উপসর্গ বলে।

বিদেশি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন-

✓ **ফারসি উপসর্গ:** কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব্, কম্।

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
কার্	কাজ অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার
দর্	মধ্যস্থ, অধীন অর্থে	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
না	না অর্থে	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
নিম্	আধা অর্থে	নিমরাজি, নিমখুন
ফি	প্রতি অর্থে	ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাস
বদ্	মন্দ অর্থে	বদমেজাজ, বদরাগী, বদহজম, বদনাম
বে	না অর্থে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা
বর্	বাইরে, মধ্যে অর্থে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
ব্	সহিত	বমাল, বনাম
কম্	স্বল্প	কমজোর, কমবখ্ত, কমপোক্ত

✓ **আরবি উপসর্গ:** আম, খাস, লা, গর্, বাজে, খয়ের।

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
আম	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা
লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ
গর্	অভাব	গরমিল, গরহাজির, গররাজি
বাজে	বিবিধ	বাজেখরচ, বাজেকথা, বাজেজমা
খয়ের	ভাল	খয়ের খাঁ

✓ **ইংরেজি উপসর্গ:** ফুল, হাফ, হেড, সাব।

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
ফুল	পূর্ণ অর্থে	ফুল-হাতা, ফুল-প্যান্ট, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু
হাফ	আধা অর্থে	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-প্যান্ট
হেড	প্রধান	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত
সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর

✓ **উর্দু-হিন্দি উপসর্গ:** হর, হরেক।

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত নতুন শব্দ
হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা
হরেক	বিবিধ অর্থে	হরেকরকম, হরেকখাবার

১৩. নিচের প্রতিটি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দগঠন করুন: *[৪১ তম বিসিএস]*

অনা, আ, পরা, অব, নির, বি

উত্তর :

উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	গঠিত শব্দ
অনা	অভাব অর্থে	অনাহার, অনাবৃষ্টি
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ
পরা	বিপরীত অর্থে	পরাজয়, পরাভব
অব	হীনতা অর্থে	অবজ্ঞা, অবমাননা
নির	অভাব অর্থে	নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়
বি	অভাব অর্থে	বিনিদ্র, বিশৃঙ্খল

CamScanner

১৪. 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : উপসর্গ বাংলা ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপসর্গ হচ্ছে কিছু ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ, যার নিজস্ব অর্থ নেই। কিন্তু কোনো শব্দের আগে বসে সেই শব্দটির অর্থকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে। এ জন্যে বলা হয়ে থাকে যে, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।" উপসর্গের নিজের অর্থ না থাকলেও সে অন্যের অর্থের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক : 'নি' একটি উপসর্গ। এর নিজের কোনো অর্থ নেই, অথচ এর অর্থদ্যোতকতা আছে। যেমন : নি + খোঁজ = নিখোঁজ, নি + লাজ = নিলাজ, নি + খাদ = নিখাদ। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, উপসর্গ যে শব্দের শুরুতে যুক্ত হচ্ছে, তার অর্থ বদলে দিচ্ছে। 'নি' উপসর্গটি যথাক্রমে 'খোঁজ', 'লাজ', 'খাদ' শব্দের পূর্বে বসে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নতুন নতুন শব্দ গঠন করেছে।

'সু' উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। তবে 'সু' উপসর্গটি যেসব শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়, উপসর্গটি তার একটি সদর্থক বা 'ভালো' জাতীয় অর্থবোধ ঘটায়। যেমন : সুখবর, সুপুরুষ, সুগন্ধ ইত্যাদি। তাই কালে কালে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, 'সু' মানে হচ্ছে 'ভালো'।

১৫. সন্ধি কাকে বলে? সন্ধির গঠন প্রক্রিয়া লিখুন।

উত্তর : সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। সন্ধি কয়েকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন:

- ✓ **ধ্বনির মিলন:** অতি+ইত=অতীত। এখানে 'অতি' শব্দের শেষে নিহিত ই-ধ্বনি এবং 'ইত' শব্দের প্রথমে ই-ধ্বনি মিলে ঈ-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
- ✓ **ধ্বনি-লোপ:** হিমালয়= হিম+আলয়। এখানে হিম শব্দের শেষে নিহিত অ-ধ্বনি এবং আলয় শব্দের প্রথমে আ-ধ্বনি মিলিত হওয়ার ফলে অ-ধ্বনি লোপ পেয়েছে এবং আ-ধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
- ✓ **ধ্বনি পরিবর্তন:** ধ্বনি পরিবর্তন তিন প্রকারের। যেমন:
  1. **পূর্বধ্বনির পরিবর্তন:** জগৎ+নাথ = জগন্নাথ, তৎ+ময়= তন্ময়। এখানে পূর্বধ্বনি 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে 'ন' হয়েছে।
  2. **পরধ্বনির পরিবর্তন:** যাচ্+না= যাচঞা, যজ্+ন= যজ্ঞ। এখানে পরধ্বনি 'ন' পরিবর্তিত হয়ে 'ঞ' হয়েছে।
  3. **উভয় ধ্বনির পরিবর্তন:** উৎ+হার= উদ্ধার। এখানে পূর্বধ্বনি 'ৎ' পরিবর্তন হয়ে 'দ' হয়েছে এবং পরধ্বনি 'হ' পরিবর্তিত হয়ে 'ধ' হয়েছে।

CamScanner

১৬. শব্দ গঠনে সন্ধির ভূমিকা কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধির ফলে একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনিটি লোপ পায় বা পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটি শ্রুতিমধুর শব্দ তৈরি হয়। সন্ধির সাহায্যে নিম্নোক্ত উপায়ে শব্দ গঠিত হয়-

✓ স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলন। যেমন- শত+এক=শতেক, রূপা+আলি= রূপালি, ধনি+এক=ধনিক ইত্যাদি।

✓ স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন। যেমন- এক+ছত্র= একচ্ছত্র, পরি+ছদ= পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

✓ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলন। যেমন- দিক+অন্ত= দিগন্ত, ষট+আনন= ষড়ানন ইত্যাদি।

✓ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন। যেমন- সৎ+চিন্তা= সচ্চিন্তা, উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ, উৎ+ঘাটন=উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি।

✓ বিসর্গযোগে। যেমন- বাচঃ+পতি= বাচস্পতি, অহঃ+অহ= অহরহ।

১৭. সমাস কাকে বলে? সমাস কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : 'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, পরস্পর অর্থসংগতিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। 'বিলাত হইতে ফেরত রাজার কুমার সিংহ চিহ্নিত আসনে বসলেন।' এ কথাটা এভাবে বললে- 'বিলাত ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন' সহজ হয়।

সমাসের প্রকারভেদ : সমাস মোট ছয় প্রকার-

দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, সংযোজক অব্যয় লোপ পায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: পিতা ও পুত্র = পিতাপুত্র। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর- এ তিনটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

কর্মধারয় সমাস : যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: পুণ্য যে ভূমি= পুণ্যভূমি। এখানে 'পুণ্য' বিশেষণ, 'ভূমি' বিশেষ্য। আর 'পুণ্যভূমি' বললে একটি ভূমিকে (পরপদ) বুঝায় পুণ্যকে (পূর্বপদ) নয়। তাই এটি কর্মধারয় পদ।

তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মধুতে মাখা= মধুমাখা, ধানের ক্ষেত= ধানক্ষেত।

CamScanner

বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য নতুন অর্থ প্রকাশ করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: অল্প বয়স যার= অল্পবয়সী। এখানে অল্পবয়সী দ্বারা 'অল্প' এবং 'বয়স' কোনটিকে বুঝাচ্ছে না। বরং এর দ্বারা অল্পবয়সী কোন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে।

দ্বিগু সমাস : যে সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে বসে সমাহার বোঝায় এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে 'দ্বিগু' সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়।

অব্যয়ীভাব সমাস : অব্যয়ীভাব অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান। অব্যয় শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ এবং পরপদে বিশেষ্য থাকে। যেমন: কূলের সমীপে = উপকূল, দিন দিন = প্রতিদিন ইত্যাদি।

উল্লেখ্য ২০২১ সালের নতুন বোর্ড ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস চার প্রকার। যথা- দ্বন্দ্ব সমাস, কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস, বহুব্রীহি সমাস।

১৮. দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে? দ্বন্দ্ব সমাসের মাধ্যমে শব্দ গঠন লিখুন।

উত্তর : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, সংযোজক অব্যয় লোপ পায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: পিতা ও পুত্র = পিতাপুত্র। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর- এ তিনটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাসযোগে নতুন শব্দ গঠন নিম্নরূপ-

- **সাধারণ দ্বন্দ্ব:** কালি ও কলম= কালিকলম, লতা ও পাতা = লতাপাতা।
- **মিলনার্থক দ্বন্দ্ব:** মা ও বাবা= মা-বাবা, মাসি ও পিসি= মাসি-পিসি।
- **সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব:** জায়া ও পতি= দম্পতি, মাতা ও পিতা= মাতাপিতা।
- **সমার্থক দ্বন্দ্ব:** রাজা ও বাদশা= রাজাবাদশা, ঘর ও বাড়ি = ঘরবাড়ি, সুখ ও শান্তি= সুখশান্তি।
- **বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব:** ছোট ও বড়= ছোটবড়, সুখ ও দুঃখ= সুখদুঃখ, দা ও কুমড়া= দা-কুমড়া।
- **একশেষ দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদের লোপ হয় এবং শেষ পদ অনুসারে যখন শব্দের রূপ নির্ধারিত হয় তখন তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব হয়। যেমন: সে, তুমি ও আমি= আমরা, সে ও তুমি= তোমরা।
- **অলুক দ্বন্দ্ব:** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোন সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব হয়। যেমন: দুধে ও ভাতে= দুধে-ভাতে, দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে, হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে।

CamScanner

- বহুপদী দ্বন্দ্বঃ তিন বা বহু পদে মিলে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমনঃ তেল, নুন ও লাকড়ি = তেল-নুন-লাকড়ি। সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ ইত্যাদি।

১৯. বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : সমাসের বহুবিধ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন-

✓ ভাষা সংক্ষিপ্তকরণ : সমাস বাক্যের সংক্ষেপ সাধন করে। যেমন 'যাদের অন্ন নেই, তারাই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়'- এ বৃহৎ বাক্যটিকে সমাসসাধিত পদ ব্যবহার করে বলা যায়- নিরন্নরা প্রতিদ্বারে ঘুরে বেড়ায়। এভাবে অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়।

✓ নতুন শব্দ গঠন : সমাস নতুন শব্দ গঠনের একটি অভিনব পদ্ধতি। যেমন- জায়া ও পতি দুটো শব্দের মিলনে সমাসসাধিত নতুন শব্দ দম্পতি। এভাবে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়ে ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

✓ পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সমাস বিশেষভাবে সাহায্য করে। যেমন- 'তিনটি বাহু দ্বারা রচিত ক্ষেত্র' না বলে 'ত্রিভুজ' বলা যায়। এখানে 'ত্রিভুজ' পারিভাষিক শব্দ।

✓ ভাষার শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধি : সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও ছন্দময় করে তোলে। যেমনঃ 'রাজা সিংহ চিহ্নিত আসনে বসে আছেন' না বলে, 'রাজা সিংহাসনে বসে আছেন' বললে বাক্যটি সুন্দর শোনায়। শ্রুতিমধুরতার পাশাপাশি ভাষার আবেদনও অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়।

✓ সহচর শব্দ গঠন : সমাসের মাধ্যমে সহচর শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সোনা ও রূপা = সোনারূপা। শব্দটি যখন বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এর দ্বারা সোনা ও রূপার মত মূল্যবান কিছু বুঝায়।

২০. সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : বাংলা ভাষায় সন্ধি এবং সমাস দুটোর সাহায্যেই নতুন শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

❖ বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন : বিদ্যা+আলয়= বিদ্যালয়। আর শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলনকে সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন।

❖ সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়। আর সমাস ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।

❖ উচ্চারণের ওপর ভিত্তি করেই সন্ধি হয়ে থাকে। আর সমাস নিষ্পন্ন হয় অর্থের ওপর ভিত্তি করে।

CamScanner

❖ সন্ধিতে বিভক্তি লোপ পায় না। আর সমাসে অলুক বাদে অন্য সমাসের বিভক্তি লোপ পায়।

❖ সন্ধির মাধ্যমে শব্দ সংক্ষিপ্ত হয়। সমাসের মাধ্যমে বাক্য সংক্ষিপ্ত হয়।

❖ সন্ধিতে বহুপদ বহুপদই থাকে। সমাসে বহুপদ একপদে পরিণত হয়।

❖ সন্ধির সঙ্গে শব্দের অর্থের সংযোগ নেই। সমাসের সঙ্গে শব্দের অর্থের সংযোগ আছে।

❖ সন্ধির ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু সমাসের ফলে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

❖ সন্ধি উচ্চারণকে পরিষ্কার করে। আর সমাস বক্তব্যকে সুন্দর, শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত করে।

২১. প্রত্যয় কাকে বলে? প্রত্যয় কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : নামপ্রকৃতি (প্রাতিপদিক) বা ক্রিয়ামূলের (ধাতু) পরে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। যেমন: ঢাকা+আই= ঢাকাই। এখানে 'ঢাকা' হল প্রকৃতি, 'আই' হল প্রত্যয়। √দুল+অনা= দুলনা। এখানে 'দুল' ক্রিয়ামূল, 'অনা' হল প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের নিজস্ব কোন অর্থ নেই। তবে কখনো কখনো প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের অর্থ ও শ্রেণিপরিচয় বদলে যায়।

প্রত্যয় দুই প্রকার: কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় বা ধাতু প্রত্যয়: ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয় তাদের কৃৎ প্রত্যয় বলে। কৃৎ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দকে কৃদন্ত শব্দ বলে। কৃৎ প্রত্যয়ে ক্রিয়ামূলের আগে সাধারণত '√' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: √চল (ধাতু)+অন্ত= চলন্ত, √কৃ(ধাতু)+তব্য=কর্তব্য।

তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয়: শব্দের (নাম শব্দ) সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। যেমন: দেশ+ঈ= দেশী, সাপ+উড়ে= সাপুড়ে।

২২. প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের ছয়টি নিয়ম উল্লেখ করুন।

উত্তর : মূল শব্দ বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে যে অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নামপদ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের নিয়ম হলো নিম্নরূপ-

❖ 'অন' প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। যেমন- √কাঁদ+অন= কাঁদন, √নাচ্+অন= নাচন, √বাড়্+অন=বাড়ন, √দোল্+অন=দোলন ইত্যাদি।

❖ 'আই' প্রত্যয়যোগে ভাববাচক ক্রিয়া ও বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। যেমন- √খুদ্+আই= খোদাই, √ঢাল্+আই= ঢালাই ইত্যাদি।

❖ 'আনি' প্রত্যয় বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন- √জান্+আনি=জানানি, √শুন্+আনি=শুনানি ইত্যাদি।

❖ 'তা' প্রত্যয় অন্য পদকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে পরিণত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এরকম ক্ষেত্রে মূল শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে তা ই-কার হয়ে যায়। যেমন- প্রতিযোগী+তা=প্রতিযোগিতা, উর্বর+তা=উর্বরতা ইত্যাদি।

❖ 'ইমন' প্রত্যয় বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- নীল+ইমন=নীলিমা, মহৎ+ইমন=মহিমা ইত্যাদি।

❖ 'ইক (ষ্ণিক)' প্রত্যয় সাধারণত বিশেষ্যকে বিশেষণ করার জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন- হেমন্ত+ইক= হৈমন্তিক, বিপ্লব+ইক=বৈপ্লবিক ইত্যাদি।

২৩. দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞার্থ লিখুন। প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিন। *[৩৭তম বিসিএস]*

উত্তর : দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ দু'বার বলা বা পুনরাবৃত্তি। বাংলা ভাষায় কোন কোন শব্দ, পদ বা ধ্বনি একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দু'বার ব্যবহার করলে সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ শব্দগুচ্ছের পুনরুক্তিতে 'দ্বিরুক্তি' বলে এবং শব্দগুচ্ছকে 'দ্বিরুক্ত শব্দ' বলে। দ্বিরুক্ত শব্দের অন্যনাম 'শব্দদ্বৈত'। যেমন : 'আমি জ্বর বোধ করছি।' এখানে জ্বর দ্বারা যথার্থ জ্বরকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু 'আমি জ্বর জ্বর বোধ করছি' বললে ঠিক জ্বর না, জ্বরের ভাবকে বোঝানো হয়। 'জ্বর জ্বর' শব্দটি দ্বিরুক্ত শব্দ। দ্বিরুক্ত শব্দ তিন প্রকার-

১. **শব্দের দ্বিরুক্তি :** একই শব্দ পর পর দু'বার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে। যেমন : দিন দিন, রোজ রোজ ইত্যাদি। শব্দের দ্বিরুক্তি গঠনের উপায়-

- ✓ একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত হয়। যেমন : ভালো ভালো ফল, বড় বড় বই।
- ✓ দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন করে। যেমন : মিটমাট, ফিটফাট।
- ✓ সমার্থক শব্দ যোগে। যেমন : টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত।
- ✓ বিপরীতার্থক শব্দযোগে। যেমন : লেন-দেন, দেনা-পাওনা।

২. **পদের দ্বিরুক্তি :** বাংলা ভাষায় কখনও কখনও বাক্যমধ্যে বিভক্তিযুক্ত একটি পদের পুনরাবৃত্তি হয়। একে পদের দ্বিরুক্তি বলে। যেমন : রাজায় রাজায় যুদ্ধ, গলায় গলায় ভাব ইত্যাদি। পদের দ্বিরুক্তি গঠনের উপায়-

- ✓ একই পদের দু'বার ব্যবহার। যেমন : ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে।

CamScanner

- ✓ দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন : হাতে-নাতে, আকাশে-বাতাসে ইত্যাদি।
- ✓ সহচর, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে। যেমন : দুধে-ভাতে, দেশে-বিদেশে, পথে-প্রবাসে ইত্যাদি।

৩. **অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি** : কোনো কিছুর স্বাভাবিক আওয়াজ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দকে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ বলে। এ জাতীয় অনুকার শব্দের দু'বার প্রয়োগের নাম অনুকার দ্বিরুক্তি। যেমন : শনশন, ঝনঝন, কলকল, টিকটিক ইত্যাদি।

২৪. বিশেষ্য পদ কাকে বলে? বিশেষ্যের প্রকারভেদ লিখুন।

উত্তর : বাক্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য বলে। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার :-

ক. নাম বাচক বিশেষ্য : নজরুল, ঢাকা, হিমালয়, অগ্নিবীণা ইত্যাদি।
খ. জাতিবাচক বিশেষ্য : মানুষ, পাখি, নদী, গরু, পর্বত ইত্যাদি।
গ. বস্তুবাচক বিশেষ্য : বই, খাতা, কলম, মাটি, পানি, লবন ইত্যাদি।
ঘ. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : সভা, জনতা, সমিতি, মাহফিল, বহর, দল।
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য : গমন (যাওয়ার কাজ), দর্শন (দেখার কাজ)।
চ. গুণবাচক বিশেষ্য : মধুরতা, তারল্য, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন।

২৫. বিশেষণ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার বিশেষণের পরিচয় লিখুন।

উত্তর : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন : চলন্ত গাড়ি, করুণাময় তুমি।

বিশেষণ দুই প্রকার-

১. **নাম বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। নাম বিশেষণের প্রকারভেদ-

- ✓ রূপবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।
- ✓ গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া
- ✓ অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।
- ✓ সংখ্যাবাচক : হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।
- ✓ ক্রমবাচক : দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা
- ✓ পরিমাণবাচক : এক কেজি চাল, দু'কিলোমিটার রাস্তা।
- ✓ অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল।

CamScanner

✓ উপাদানবাচক : বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি
✓ প্রশ্নবোধক : কতদূর পথ? কেমন অবস্থা?
✓ নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

২. **ভাব বিশেষণ** : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ চার প্রকার।

- **ক্রিয়া বিশেষণ** : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা : ধীরে ধীরে বায়ু বয়, পরে একবার এসো।
- **বিশেষণের বিশেষণ** : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন : **সামান্য** একটু পানি দাও, রকেট **অতি** দ্রুত চলে।
- **অব্যয়ের বিশেষণ** : যে ভাব বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা : **ধিক** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন।

বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোন বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যথা : **দুর্ভাগ্যক্রমে** দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

২৬. বিশেষণের অতিশায়ন কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

উত্তর : বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনা করে তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন : যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।
বিশেষণের অতিশায়ন দু'ভাবে হয়- বাংলা শব্দের অতিশায়ন, তৎসম শব্দের অতিশায়ন।

✧ **বাংলা শব্দের অতিশায়ন :**

✓ বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুইয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাতে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন : গরুর থেকে ঘোড়া দামি, বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

✓ অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোন পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে,

CamScanner

সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে কামাল সবচেয়ে বুদ্ধিমান, ভাইয়ের মধ্যে রহিমই সবচাইতে বিচক্ষণ।

✓ দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যেমন : পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর, ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।

✓ কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে, প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন : এ মাটি সোনার বাড়া।

✧ **তৎসম শব্দের অতিশায়ন :**

✓ তৎসম শব্দের অতিশায়নে দু'য়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন : গুরু-গুরুতর-গুরুতম, দীর্ঘ-দীর্ঘতর-দীর্ঘতম।

☆ কিন্তু 'তর' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু বলে 'তর' প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন : অশ্ব হস্তী অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী।

✓ বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন : মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

✓ দুইয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত 'ঈয়স' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন- লঘু > লঘিয়ান>লঘিষ্ঠ, শ্রেয়>শ্রেয়ান>শ্রেষ্ঠ। লঘিয়ান, শ্রেয়ান শব্দের ব্যবহার বাংলায় নেই।

তবে 'ঈয়স' প্রত্যয়ান্ত কোন কোন শব্দের নারীবাচক রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন : ভূয়সী প্রশংসা।

২৭. সর্বনাম কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার সর্বনামের পরিচয় লিখুন।

উত্তর : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন- রাহাত ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উপর্যুক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'সে' শব্দটি রাহাতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' হলো সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ-

✓ **ব্যক্তিবাচক :** বাক্যে ব্যাকরণিক পক্ষ বা পুরুষ (বক্তা, শ্রোতা, অন্য-এই তিনকে নির্দেশ) করে। এ জাতীয় সর্বনাম- আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।

CamScanner

✓ **আত্মবাচক** : কর্তা নিজে কাজটি করেছে- এমন ভাব প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় সর্বনাম- স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।

✓ **সমীপ্যবাচক** : বক্তার কাছ থেকে কোন কিছুর নৈকট্য, দূরত্ব নির্দেশ করে। এ জাতীয় সর্বনাম- এ, এই, এরা, এটি, ও, ওই, ওরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।

✓ **দূরত্ববাচক** : এ জাতীয় সর্বনাম- ঐ, ঐসব।

✓ **সাকুল্যবাচক** : ব্যক্তি বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝায়। এ জাতীয় সর্বনাম- সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।

✓ **প্রশ্নবোধক** : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশ্ন করতে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় সর্বনাম- কে, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে।

✓ **অনির্দিষ্টতাবাচক** : অনির্দিষ্ট ও পরিচয়হীন কোন কিছুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় সর্বনাম- কোন, কেহ, কেউ, কিছু, কোথাও ইত্যাদি।

✓ **ব্যতিহারিক** : দু'পক্ষের সহযোগ নির্ভরতা বোঝায়। এ জাতীয় সর্বনাম- আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।

✓ **সংযোগজ্ঞাপক** : দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটাতে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় সর্বনাম- যে, যিনি, যারা, যাহারা ইত্যাদি।

✓ **অন্যাদিবাচক** : নিজ ভিন্ন অন্য কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় সর্বনাম- অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

২৮. অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন। *[৩৭ তম বিসিএস]*

উত্তর : যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের/বাক্যাংশের/বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয়ের প্রকারভেদ : বাংলা ভাষায় শব্দ-প্রকৃতি, ভাবগত অর্থ ও ব্যবহারিক মূল্যের বিচারে অব্যয়কে চার ভাগে ভাগ করা হয়- সমুচ্চয়ী অব্যয়, অনন্বয়ী অব্যয়, অনুসর্গ, অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

১. **সমুচ্চয়ী অব্যয়** : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন ও সংকোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চয়ী বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। যেমন-

✓ **সংযোজক অব্যয়** : এ জাতীয় অব্যয় শব্দের সাথে শব্দের অথবা বাক্যের সাথে বাক্যের সংযোজন ঘটায়। এগুলো হলো- ও, আর, অধিকন্তু, তাই, সুতরাং ইত্যাদি। যেমন : করিম ও রহিম অনুষ্ঠানে গিয়েছিল।

CamScanner

✓ **বিয়োজক অব্যয়** : এ জাতীয় অব্যয় শব্দের সাথে শব্দের অথবা বাক্যের সাথে বাক্যের বিয়োজন ঘটায়। এগুলো হলো- কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো ইত্যাদি। যেমন : মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

✓ **সংকোচক অব্যয়** : এ জাতীয় অব্যয় একাধিক পদকে একপদে বা একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে রূপান্তর করে। অথচ, বরং, কিন্তু সংকোচক অব্যয়। যেমন : তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন।

২. **অনন্বয়ী অব্যয়** : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো অন্বয় বা সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশ করে তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। অনন্বয়ী অব্যয় বক্তার আনন্দ, উচ্ছাস, বিষাদ প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশে সহায়তা করে। যেমন :

✓ উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।
✓ সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।
✓ অনুমোদন : আপনি যখন বলেছেন, বেশ তো আমি যাব।
✓ সমর্থন সূচক : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
✓ যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে।
✓ স্বীকৃতি/অস্বীকৃতি: হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
✓ ঘৃণা/বিরক্তি প্রকাশে: কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
✓ সম্বোধনে : 'ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে।'
✓ সম্ভাবনায় : সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।

৩. **অনুসর্গ** : যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা- ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত। অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার-

✓ বিভক্তিসূচক অব্যয়
✓ বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ

৪. **অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়** : যে সমস্ত অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন : বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়, মেঘের গর্জন- গুড় গুড়, বৃষ্টির তুমুল শব্দ- ঝম ঝম, সিংহের গর্জন- গর গর ইত্যাদি।

২৯. ক্রিয়াপদ কাকে বলে? ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিন্যাস লিখুন।

উত্তর : যে পদ দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা বুঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্টকালে

কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। বিভিন্নভাবে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন-

❖ **ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার-**

- **সমাপিকা** : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের কর্তার সঙ্গে পক্ষবাচক (পুরুষভেদ) সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং ক্রিয়ার কাল ও প্রকার নির্দেশ করে। যেমন : ছেলেরা খেলা করছে। সে নিয়মিত পড়াশোনা করে।
- **অসমাপিকা** : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : প্রভাতে সূর্য উঠলে....., আমরা হাত মুখ ধুয়ে.....।

❖ **কর্মপদের ভূমিকা অনুসারে ক্রিয়াপদ চার প্রকার-**

১. **সকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াপদকে কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই ক্রিয়ার কর্মপদ। যেমন : সে ফুটবল খেলছে।

২. **অকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন : মেয়েটি হাসে। সে ভালো দৌড়ায়। এখানে ক্রিয়াপদকে কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : 'বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন'।

৪. **প্রযোজক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনায় অন্যের দ্বারা সংগঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে বলে প্রযোজক ক্রিয়া। সংস্কৃতিতে একে বলে ণিজন্ত ক্রিয়া। যেমন : করিম রহিমকে পড়াচ্ছে। উল্লেখ্য প্রযোজক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

❖ **গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া পদ দুই প্রকার-**

১. **যৌগিক ক্রিয়া** : একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন :

✓ তাগিদ দেওয়া অর্থে	:	ঘটনাটা শুনে রাখ।
✓ নিরন্তরতা অর্থে	:	তিনি বলতে লাগলেন।
✓ কার্যসমাপ্তি অর্থে	:	ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।
✓ আকস্মিকতা অর্থে	:	সাইরেন বেজে উঠল।
✓ অভ্যস্ততা অর্থে	:	শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।
✓ অনুমোদন অর্থে	:	এখন যেতে পার।

CamScanner

২. **মিশ্র ক্রিয়া** : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন :

✓ বিশেষ্যের উত্তর (পরে) : আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।

✓ বিশেষণের উত্তর (পরে) : তোমাকে দেখে প্রীত হলাম।

✓ ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে): মাথা ঝিম ঝিম করছে।

❖ **অস্তি-নেতি অনুসারে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার-**

১. **অস্তিবাচক ক্রিয়া** : এ ধরনের ক্রিয়া থাকা, অস্তিত্ব ইত্যাদির ইতিবাচকতা বোঝায়। যেমন : আমার অনেক কলম আছে। সে ঐ রুমে থাকে।

২. **নঞর্থক ক্রিয়া** : এ ধরণের ক্রিয়ায় না, নেই, নিষেধ ইত্যাদি ভাবের প্রকাশ ঘটে। যেমন : সে এখানে নেই। অঙ্কটা সহজ নয়।

৩০. ক্রিয়া বিশেষণ কাকে বলে? ক্রিয়া বিশেষণের প্রকারভেদ লিখুন।

উত্তর : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল, রূপ নির্দেশ করে বা ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা : ধীরে ধীরে বায়ু বয়, পরে একবার এসো।

❖ গঠনের দিক থেকে ক্রিয়া বিশেষণ দুই প্রকার-

১. একপদী ক্রিয়া বিশেষণ : একটি মাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন : আস্তে, ধীরে, সহজে, সানন্দে ইত্যাদি।

২. বহুপদী ক্রিয়া বিশেষণ : একের অধিক পদ দিয়ে যে ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন : আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে ইত্যাদি।

❖ অর্থ ও অন্বয়গতভাবে ক্রিয়া বিশেষণ পাঁচ প্রকার-

১. **ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ** : যেভাবে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে ধরনবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, প্রচণ্ডবেগে ঝড় আমাদের অতিক্রম করেছে, সে কাজটি ভালভাবে সম্পন্ন করেছে।

২. **কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ** : যে সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : অনেকক্ষণ ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছি, তিনি আগামীকাল সিলেটে যাবেন।

৩. **স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ** : ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : বিড়ালটি এখানে লুকিয়েছে, আমরা নদীতে গোসল করেছি।

৪. **সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ** : যে ক্রিয়া বিশেষণ একাধিক বাক্যাংশকে সংযুক্ত করে, তাকে সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন : কাজে তার মন নেই,

CamScanner

তাছাড়া সে কাজ পারেও না। এখন আমার কোনো কাজ নেই, অবশ্য থাকার কথাও নয়।

৫. **না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :** যে ক্রিয়া বিশেষণ বাক্যকে না-বাচক বৈশিষ্ট্য দেয়। যেমন : আমি বিদেশ যাব না, সে এখন ফুটবল খেলে না, আমটা তেমন মিষ্টি নয়।

৩১. অক্ষর কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর : কোন শব্দ উচ্চারণকালে তার যে পরিমাণ অংশ এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সেই পরিমাণ অংশকে বলা হয় অক্ষর (Syllable)। যেমন : 'আকাশ' এই শব্দে আ-কাশ দুটি অক্ষর আছে। আবার 'উচ্চারণ' শব্দে (উচ্-চা-রণ) তিনটি অক্ষর আছে।

- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, কোন শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি এক সময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাহাকে অক্ষর বলে।
- ✓ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মতে, নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঃস্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয়, তাকেই অক্ষর বলা হয়।
- ✓ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন, এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম অক্ষর। *[বাংলা কবিতার ছন্দ]*

অক্ষর দুই প্রকার-

- ✓ **স্বরান্ত অক্ষর :** যে অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে স্বরধ্বনির মাধ্যমে তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। এটি 'বিবৃত' বা 'মুক্তাক্ষর' হিসেবে পরিচিত। যেমন : আশা= অ্+আ+শ্+আ। ভাষা= ভ্+আ+ষ্+আ।
- ✓ **ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর :** যে সকল অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে ব্যঞ্জনধ্বনির মাধ্যমে তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে হসন্ত বা হলন্তও বলা হয়। এটি 'সংবৃত' বা 'বদ্ধাক্ষর' হিসেবে পরিচিত। যেমন : শীতল=শী+তল্, পবন=প+বন্।

অক্ষর ও বর্ণ নিয়ে অনেক সময় বিভ্রম ঘটে। অক্ষর ও বর্ণ এক নয়। অক্ষর উচ্চারণ ভিত্তিক, বর্ণ লিপি ভিত্তিক। যেমন : 'ব্যাকরণ' শব্দটিতে তিনটি অক্ষর আছে 'ব্যা-ক-রণ' কিন্তু বর্ণ আছে চারটি 'ব্যা-ক-র-ণ'।

বানান/বানানের নিয়ম

১. নিচের বানানগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: *[৪৪তম বিসিএস]*

কথপোকথোন; জ্বাজ্জল্যমাণ; রেজিষ্ট্রেশন; গর্ধব; ব্যাক্তিত্ব; নিশিথিনি।

উত্তর : শুদ্ধ বানান- কথোপকথন, জাজ্বল্যমান, রেজিস্ট্রেশন, গর্দভ, ব্যক্তিত্ব, নিশীথিনী।

২. বানান শুদ্ধ করে লিখুন: *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*
সাতন্ত্র; ফটোষ্টেট; স্বত্ত্বাধিকারী; মুমুর্ষ; জাতিয়করন; উচ্চকাংখা।

উত্তর : শুদ্ধ বানান- স্বাতন্ত্র্য, ফটোস্ট্যাট, স্বত্বাধিকারী, মুমূর্ষু, জাতীয়করণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

৩. বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের নিয়ম লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে নিচে শ, ষ ও স ব্যবহারের নিয়মগুলো আলোচিত হলো-

১. খাঁটি বাংলা শব্দে ষ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- বাসা, সোনা, খাসা ইত্যাদি।

২. বিদেশি শব্দে কখনো ষ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- নাশতা, কিশমিশ, শরম, শৌখিন, শখ, পোশাক, স্টেশন, স্টুডিও, সালাম ইত্যাদি।

৩. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি 'S' ধ্বনির জন্য স ব্যবহৃত হবে। যেমন- বাস, সল্ট, সান, পাসপোর্ট, স্কুল, স্টল ইত্যাদি।

৪. ইংরেজি থেকে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, রেশন, স্টেশন।

৪. বাংলা বানানে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস (কারিগরি/পেশাগত)]*

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে বিদেশি শব্দের বানানের নিয়ম-

১. বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

✓ ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন : আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'য' ব্যবহৃত হয় না। যেমন : নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শৌখিন, আপস, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টেশন, ইসলাম, মুসলিম, সালাত, সালাম ইত্যাদি।

৩. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, রেশন, স্টেশন।

CamScanner

৪. বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন- স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন- মার্কস, বকস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল ইত্যাদি।

৫. বিদেশি শব্দের বানানে ণ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- ইরান, কোরান, গভর্নর, জেনারেল, গুনাহ, পানাহ ইত্যাদি।

৬. আরবি বর্ণমালার হরফ সা, সিন ও সোয়াদ-এর বাংলা উচ্চারণে স ব্যবহৃত হবে এবং শীন উচ্চারণে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন-

সালাম-এ সিন-এর উচ্চারণ স
সালাত-এ সোয়দ-এর উচ্চারণ স
এশা-এ শীন-এর উচ্চারণ শ।

৫. বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের সূত্রসমূহ দৃষ্টান্তসহ লিখুন। *[৪১ তম, ৩৬তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। *[৩৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম হলো-

১. এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

২. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ি ু হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

৩. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন>অর্জন, উর্দ্ধ>উর্ধ্ব, কর্ম্ম>কর্ম, কার্ত্তিক>কার্তিক, কার্য্য>কার্য, বার্দ্ধক্য>বার্ধক্য, মূর্চ্ছা>মূর্ছা, সূর্য্য>সূর্য হবে।

৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন : অহম্+কার= অহংকার।

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

✓ সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

৫. সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন : গুণী→গুণিজন, প্রাণী→প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→মন্ত্রিপরিষদ।

✓ তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন : গুণী→গুণীজন, প্রাণী→প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→মন্ত্রীপরিষদ।

✓ ইন্- প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন : কৃতী→কৃতিত্ব, দায়ী→দায়িত্ব, প্রতিযোগী→প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→সহযোগিতা।

৬. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

✓ এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন : দুষ্ট, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

৬. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। *[৪০তম, ৩৫ তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম-

১. সকল অ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ওকালতি, কাহিনি, কেরামতি, জমিদারি, জাপানি, দাদি, মাসি, রানি, রেশমি, সরকারি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

✓ পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

✓ সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।
কীভাবে, কীরকম, কীরূপে, প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

✓ যেসব প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২. বাংলায় এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন: কেন, কেনো (ক্রয় করো), খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে, দেখা, দেখি, জেনো, যেন।

✓ তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্তরূপ বহুল পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

✓ বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

৩. বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন- কালো, খাটো, ছোটো, ভালো;
এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো;

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;

কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;

করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো;

কোনো, মতো।

✓ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন : কোরো, বোলো, বোসো।

৪. শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণত অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : গাং, ঢং, পালং।

✓ তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হয়ে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন।

☆ উল্লেখ্য বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে সবসময়ই অনুস্বার থাকবে।

৫. অতৎসম শব্দে খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

৬. অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : আঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

✓ তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। যেমন : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

✓ কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঠ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

৭. নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন ঃ *[৩৮ তম বিসিএস]*

গিতাঞ্জলি, উপকারীতা, আষার, দারিদ্রতা, শান্তনা।

উত্তর : শুদ্ধরূপ- গীতাঞ্জলি, উপকারিতা, আষাঢ়, দারিদ্র্য/দরিদ্রতা, সান্ত্বনা।

৮. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে ৫টি বিবিধ বানানের নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে ৫টি বিবিধ বানানের নিয়ম-

১. সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন : অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিত, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

✓ বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন : কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বাপ-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

২. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন : ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩. না-বাচক 'না' স্বতন্ত্র পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : করি না।

✓ কিন্তু না-বাচক 'নি' সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : করিনি।

✓ এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন : নাবালক, নারাজ, নাহক।

✓ অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন : না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৪. অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন : আজও, আমরাও, কালও।

৫. নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন : আজই, এখনই।

৯. বাংলা ভাষার শব্দের শেষে 'ই' ও 'ও' ব্যবহারের দুটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরো।

উত্তর : বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানের নিয়মানুসারে 'ই' ও 'ও' ব্যবহারের দুটি নিয়ম হলো-

১. বাংলা ভাষার নিশ্চয়াত্মক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন (ি) রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণরূপে শব্দের শেষে যুক্ত হবে। যেমন-আজি, এখনি, তখনি, যখনি, যেমনি প্রভৃতি না হয়ে আজই, এখনই, তখনই, যখনই, যেমনই হবে।

২. বাংলা ভাষায় অধিকন্তু অর্থরূপে ব্যবহৃত 'ও' শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পূর্ণরূপ শব্দের শেষে যুক্ত হবে। যেমন- আজো, কালো, তোমারো না হয়ে বরং আজও, কালও, তোমারও হবে।

১০. বাংলা ভাষার 'না' ও 'নি' ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে 'না' ও নি' ব্যবহারের নিয়মগুলো হলো-

(১) না-বাচক অর্থে 'নি' শব্দ থেকে আলাদা না হয়ে বরং একসাথে বসবে। যেমন- করিম খায় নি। (অশুদ্ধ)

©Nazmus Sadat
CamScanner

করিম খায়নি। (শুদ্ধ)
রহিম এখনো পড়তে বসে নি (অশুদ্ধ)
রহিম এখনো পড়তে বসেনি। (শুদ্ধ)

(২) না-বাচক অর্থে 'না' শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আলাদাভাবে বসবে। যেমন-
সে মনোযোগ দিয়ে পড়েনা। (অশুদ্ধ)
সে মনোযোগ দিয়ে পড়ে না। (শুদ্ধ)
রহিম করিমকে চেনেনা। (অশুদ্ধ)
রহিম করিমকে চেনে না। (শুদ্ধ)

(৩) না-বাচক অর্থে অনেক 'না' শব্দের পূর্বে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন- নারাজ, নাবালক, নালায়েক, নামঞ্জুর ইত্যাদি। তবে অর্থের বিকৃতি যাতে না ঘটে সে জন্য প্রয়োজনে না এবং শব্দের মাঝে হাইফেন (-) ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : না-বলা কথা, না-দেখা মানুষ ইত্যাদি।

১১. প্রমিত বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

উত্তর : প্রমিত বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম হলো-

১. কোনো তৎসম শব্দ যদি কোনো সময় তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত হয় তবে উক্ত শব্দের অন্তর্গত ঈ-কার ই-কারে পরিবর্তিত হবে। যেমন- বাড়ী>বাড়ি, গাড়ী> গাড়ি, সাথী>সাথি।

২. সাধারণত ভাববাচক, কর্মবাচক, বস্তুবাচক এবং প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন- মাস্টারি, আলমারি।

৩. স্ত্রীবাচক অ-তৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন- মামি, চাচি, পিসি।

৪. বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন- করি, ধরি, পড়ি, নড়ি ইত্যাদি।

৫. আধুনিক বাংলা প্রমিত বানানে জাতি ও ভাষার নামের শেষে ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- বাঙালি, পাকিস্তানি, জাপানি, আরবি, ইরানি ইত্যাদি।

১২. বাংলা বানানে উ-কার (ু) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

উত্তর : নিচে বাংলা বানানে উ-কার (ু) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম হলো-

১. যেসব তৎসম শব্দে উ বা ঊ উভয়ই শুদ্ধ সেসব তৎসম শব্দে শুধু উ-কার (ু) হবে। যেমন- যুবতি, উর্না, উষা ইত্যাদি।

২. সকল অ-তৎসম শব্দে উ-কার (ু) হবে। যেমন-ফুফু, টুপি, পুজো, মুলা।

৩. প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে উ-কার (ু) হবে। যেমন- ডুবুরি, নাচুয়া, পটুয়া ইত্যাদি।

৪. সকল ক্রিয়াবাচক শব্দে উ-কার (ু) কার হবে। যেমন- করুন, বসুন, শুন, ঘুরা ইত্যাদি।

৫. উপ, অনু, উৎ, সু প্রভৃতি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে উ-কার (ু) হবে। যেমন- উপকার, অনুচিত, উৎসুক, সুনজর, সুদিন ইত্যাদি।

১৩. বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম লিখুন।

উত্তর : নিচে বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো-

১. নাসিক্য ব্যঞ্জনের পরে ক, খ, গ, ঘ থাকলে এবং তা যদি একসাথে যুক্ত হয় তবে 'ঙ' হয়, 'ং' হয় না। যেমন- অঙ্গ, ভঙ্গ, সঙ্গ ইত্যাদি।

২. চলিত রীতিতে কিছু শব্দে 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। যেমন-লাঙ্গল>লাঙল, ভাঙ্গা>ভাঙা, রাঙ্গা>রাঙা ইত্যাদি।

৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে 'ং' বসে। যেমন- রং, ঢং, সং, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে প্রত্যয়, বিভক্তি বা অব্যয় যুক্ত হলে 'ং' ঙ তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেমন- রঙিন, রঙের, ভাঙা ইত্যাদি।

৪. সাধারণত পূর্বপদের শেষে ম থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ (য, র, ল, ব, শ, ষ, য, হ) হলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'ম' এর স্থলে 'ং' হবে। যেমন- সম + বাদ = সংবাদ, সম্ + হার = সংহার, অহম্ + কার = অহংকার ইত্যাদি। তবে সন্ধি না হলে 'ঙ' হবে। যেমন- অঙ্ক, লঙ্ঘন, কঙ্কাল ইত্যাদি।

৫. বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে 'ং'-এর ব্যবহার করতে হবে।

১৪. বাংলা ভাষায় ণ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ণ-ত্ব বিধানের বিধানগুলো আলোচনা করো।

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দে দন্ত্য ন-এর মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হওয়ার বিধানগুলোকে বলে ণ-ত্ব বিধান। এ বিধানগুলো হলো-

১. ঋ, র, ষ- কয়টি বর্ণের পর দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন- ঋণ, বর্ণ, ভাষণ ইত্যাদি।

২. ট বর্গ অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ-এর পূর্বের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়ে যায়। যেমন- বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।

৩. যদি ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরবর্ণ (অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ), ক-বর্গ (ক খ গ ঘ ঙ), প-বর্গ (প ফ ব ভ ম) এবং য ব হ ং থাকে, তবে তাদের পরের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে হয়। যেমন-কৃপণ, নির্বাণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

৪. প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের এবং 'অন্তর' শব্দের পরে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিবর্তিত হয়। যেমন-প্রণাম, পরিণাম, প্রণাব ইত্যাদি।

CamScanner

৫. প্র, পরি ইত্যাদির পর 'নি' উপসর্গের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন- প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।

❖ **স্বভাবতই 'ণ' হয় :** কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়। যেমন- চাণক্য, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বীণা, কঙ্কণ, কল্যাণ, মণি, পূণ্য, বেণী, আপণ, বিপণি, গণিকা, লাবণ্য, বাণী, নিপুণ, গৌণ, পণ, বণিক, গুণ, গণনা, পণ্য, ইত্যাদি।

❖ **'ণ-ত্ব' বিধান প্রযোজ্য নয় :** বাংলা ভাষায় যেসব ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য হয় না সেগুলো হলো-

১. খাটি বাংলা ও অ-তৎসম শব্দে কখনো 'ণ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন- কান, ধরন, কিষান, পরান, কাকন, অঘ্রান, বামুন ইত্যাদি।

২. বিদেশি শব্দে 'ণ' যুক্ত হয় না। যেমন- ইরান, গ্রিন, গভর্নর, বার্নিশ, সাইরেন, কোরান, ইস্টার্ন ইত্যাদি।

৩. সমাসবদ্ধ শব্দে 'ণ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন- দুর্নীতি, দুর্নাম, সর্বনাম, অহর্নিশ, ত্রিনয়ন, দুর্নিবার, দুর্নিরীক্ষ্য ইত্যাদি।

৪. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কখনো 'ণ' যুক্ত হয় না। যেমন- বন্ধন, গ্রন্থ, দ্বন্দ্ব, অনত অন্ত, প্রান্ত, পন্থা, গন্ধ, ছন্দ ইত্যাদি।

৫. ক্রিয়াপদে সর্বদাই ন হয়, ণ হয় না। যেমন- করেন, ধরেন, শোনা, যাবেন, পাবেন ইত্যাদি।

১৫. ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ষ-ত্ব বিধানগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা ভাষার শব্দে দন্ত্য স, মূর্ধন্য ষ-তে পরিবর্তন লাভের নিয়মগুলোকে বলে ষ-ত্ব বিধান। এই নিয়মগুলো হলো-

১. ঋ, র ও ষ-এর পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন-ঋষি, বর্ষা, কর্ষণ।

২. ট, ঠ-এর আগে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- কষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

৩. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি (ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ) এবং ক ও র-এর পরের ষ প্রত্যয়ে স' থাকলে তা মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- মুমূর্ষু, চিকীর্ষা, ভবিষ্যৎ।

৪. ই-কারান্ত উপসর্গ (অনু) ও উ-কারান্ত উপসর্গের (অতি, অভি, প্রাত) পর মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- অভিষেক, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সু উপসর্গের পরও 'ষ' হয়। যেমন- সুষম।

৫. নিঃ, দুঃ, বহিঃ- এই শব্দগুলোর পর ক খ প ফ থাকলে বিসর্গ স্থানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- নিঃ+কাম>নিষ্কাম, দুঃ+কর>দুষ্কর ইত্যাদি।

৬. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন- আষাঢ়, আভাষ, ঈষৎ, পাষাণ, মানুষ, পোষ্য, ভূষণ ইত্যাদি।

CamScanner

❖ যেসব ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহৃত হয় না সেগুলো নিম্নে উদাহরণসহ আলোচিত হলো।

১. খাঁটি বাংলা শব্দে ষ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন- বাসা, খাসা।

২. বিদেশি শব্দে কখনোই ষ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- অফিস, স্টেশন, শয়তান, সিলেবাস, খুশি, জিনিস, পোশাক ইত্যাদি।

৩. বাংলা ক্রিয়াপদে 'ষ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন- খাস, করিস, দিস ইত্যাদি।

৪. -সাৎ প্রত্যয়ের 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন- ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

৫. 'স্ফুট' ও 'স্ফুর' ধাতুর মধ্যস্থিত 'স' কখনো ষ হয় না। যেমন- পরিস্ফুট, স্ফুরণ, বিস্ফোরণ, বিস্ফোরিত ইত্যাদি।

১৬. বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী 'রেফ', 'বিসর্গ' ও 'হস চিহ্ন' সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম লিখুন।

উত্তর : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী 'রেফ', 'বিসর্গ' ও 'হস চিহ্ন' ব্যবহারের নিয়ম হলো-

১. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- কার্ত্তিক, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সূর্য্য না হয়ে যথাক্রমে কার্তিক, কর্ম, ধর্ম, সূর্য হবে।

২. শব্দের শেষে কোনো বিসর্গ থাকবে না। যেমন- কার্যতঃ, ক্রমশঃ, মূলতঃ, প্রথমতঃ, প্রধানতঃ, প্রায়শঃ ইত্যাদি না হয়ে বরং কার্যত, ক্রমশ, মূলত, প্রথমত, প্রধানত, প্রায়শ হবে।

৩. পদমধ্যস্থ বিসর্গ (ঃ) থাকবে। যেমন- দুঃখ, নিঃস্ব, মনঃকষ্ট ইত্যাদি। তবে অর্থের বিকৃতি না ঘটলে পদমধ্যে বিসর্গ (ঃ) বর্জিত হতে পারে। যেমন- নিশ্বাস, নিগৃহ, দুস্থ ইত্যাদি।

৪. হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- টক, চেক, অজ, কলকল, বনবন, শখ ইত্যাদি।

১৭. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে ই, ঈ, উ, ঊ প্রয়োগের নিয়ম লিখুন।

উত্তর : প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুসারে ই, ঈ, উ, ঊ প্রয়োগের নিয়ম হলো-

১. যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব তৎসম শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন (ি, ু) যুক্ত হবে। যেমন- শ্রেণী, শ্রেণি যেহেতু উভয়ই শুদ্ধ। তা-ই শ্রেণি-ই ব্যবহার করতে হবে। এরকম কিংবদন্তি, দাবি, ধমনি, পদবি, চিৎকার, চুলি ইত্যাদি।

২. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই, উ এবং এদের কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন- কাহিনি, খুশি, দিদি, মামি, রানি কেরানি, সরকারি, সোনালি, রুপালি, জাপানি ইত্যাদি।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৩. সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে 'ত্ব', 'তা' যুক্ত এবং সমাসবদ্ধ হলে ই-কার হবে। যেমন- মন্ত্রী→মন্ত্রিত্ব, মনোযোগী→মনোযোগিতা, কৃতী→ কৃতিত্ব, গুণী→গুণিজন, প্রাণী→প্রাণিবিদ্যা।

১৮. বাংলা বানানে রেফ ( ) ও অনুস্বার (ং) ব্যবহারের নিয়ম লিখুন।

উত্তর : বাংলা বানানে রেফ ( ) ও অনুস্বার (ং) ব্যবহারের নিয়ম হলো-

১. বর্ণের পরে 'র' থাকলে তা র-ফলা (্র) এবং পূর্বে থাকলে রেফ ( ) রূপ ধারণ করে। যেমন- ভাদর (ভাদ্র), করম (কর্ম)।

২. তৎসম, অ-তৎসম বা তদ্ভব শব্দের রেফের পর ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হবে না। যেমন- কর্তা, পর্দা, সর্দার, ফর্সা, ধর্ম, কর্ম, অর্জুন, অর্চনা ইত্যাদি।

৪. শব্দের শেষের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন- গাং, পালং, রং, সং ইত্যাদি।

৫. সন্ধিতে পূর্বপদের শেষে ম থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ (য, র, ল, ব, শ, ষ, হ) হলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'ম' এর স্থলে 'ং' হবে। যেমন- সম্+যোগ = সংযোগ, সম্+প=সংলাপ ইত্যাদি।

১৯. প্রতিবর্ণীকরণ কী? প্রতিবর্ণীকরণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : বিদেশি ভাষা থেকে আগত বাংলা ভাষার শব্দগুলো মূল উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষার্থে যে নিয়ম মেনে চলে, তা-ই প্রতিবর্ণীকরণ। নিচে প্রতিবর্ণীকরণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো

১. মূল শব্দের উচ্চারণে ই বা ঈ থাকলে বাংলা বানানেও তা দিতে হবে। যেমন-(Kin) কিন, (Tip) টিপ, (Seat) সিট ইত্যাদি।

২. ইংরেজি 'f' ও 'V' স্থানে যথাক্রমে 'ফ' ও 'ভ' হবে। যেমন- fat-ফ্যাট, foot-ফুট, volt-ভোল্ট, five-ফাইভ ইত্যাদি।

৩. ইংরেজি 's' ধ্বনির স্থলে 'স' ব্যবহৃত হবে। যেমন- বাস, ক্লাস, মাস, স্যান্ডেল ইত্যাদি।

৪. ইংরেজি থেকে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, রেশন, স্টেশন।

৫. আরবি 'সা', 'সিন' ও 'সোয়াদ'-এর উচ্চারণ বাংলা বানানে 'স' হবে। যেমন- ইসলাম, সালাত, সালাম, সিনাই, হিসাব ইত্যাদি।

©Nazmus Sadat
CamScanner

২০. বাংলা বানানের নিয়মানুসারে বাংলা ভাষায় 'কি' ও 'কী' ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা বানানের নিয়মানুসারে 'কি' ও 'কী' ব্যবহারের নিয়ম-

১. সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী ব্যবহৃত হয়। যেমন- কী খাব? কী করো? এটা কী ধরনের রং? রাফেল কী খেলে? কী যে করি? ইত্যাদি। আর অব্যয়পদরূপে 'কি' ব্যবহৃত হয়। সংশয় বা প্রশ্নসূচক- তুমি কি যাবে? অথবা ও কিংবা হিসেবে- কি শীত কি গ্রীষ্ম।

২. বাংলা ভাষায় যেসব প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর হ্যা-না হয় অথবা কেবল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, সেসব বাক্যে 'কি' ব্যবহৃত হবে। যেমন- যদি কামাল জামালকে প্রশ্ন করে-তুমি কি যাবে? এখানে জামাল হ্যাঁ অথবা না দিয়ে উত্তর দিতে পারে অথবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও জানাতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে 'কী' না হয়ে 'কি' হবে।

২১. প্রমিত বাংলা বানানরীতির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : ভাষার শুদ্ধ লিখিত রূপের অপরিহার্য অঙ্গ হল শুদ্ধ বা প্রমিত বানানরীতি। মুখের ভাষায় বানান প্রচ্ছন্ন থাকে। পড়ার জন্য বানান প্রয়োজন, কিন্তু শুদ্ধভাবে লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানান প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারণ বানানের উপরই ভাষার উচ্চারণশুদ্ধতা ও অর্থময়তা বহুলাংশে নির্ভর করে। এছাড়াও প্রমিত বাংলা বানানরীতির বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

- ✓ বাংলা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি।
- ✓ শুদ্ধ বানান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ✓ লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা।
- ✓ বাহুল্য-দোষ বর্জন করে শুদ্ধভাবে বাক্য লেখা যায়।
- ✓ বাংলা শব্দের গঠন ও স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়।
- ✓ বাংলা শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।
- ✓ বাংলা ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

ভাষা যেহেতু ভাব বিনিময় ও যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম, তাই দেশের মধ্যেই অন্তত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফোরামগুলোতে একে অপরের সার্থক যোগাযোগের প্রয়োজনেও আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবমুক্ত একটি ভাষারীতি থাকা দরকার। ভাষার একটা অভিন্ন মানদণ্ড বা প্রমিত বানানরীতি থাকা প্রয়োজন।

©Nazmus Sadat
CamScanner

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

বাংলা বানানরীতি প্রণয়নে সর্বপ্রথম দায়িত্ব পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশেখর বসুকে সভাপতি করে 'বানান সংস্কার সমিতি' গঠন করে। ১৯৩৬ সালে কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিছু পরিবর্তনের পর ১৯৩৭ সালে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটিকে আধুনিক বাংলা বানানের পথিকৃত মনে করা হয়।

১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলা বানানের সুশৃঙ্খল বিধানের লক্ষ্যে একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করে। এই কর্মশিবিরে প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকে অনুসরণের জন্য বাংলা বানানরীতির একটি খসড়া গৃহীত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত বানানরীতির সাহায্য নিয়ে ১৯৯২ সালে বাংলা একডেমি বাংলা নতুন একটি বানানরীতি দাঁড় করায়। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর পরিমার্জিত অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এটিই অনুসরণ করা হয়।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম হলো:-

❖ তৎসম শব্দ

১. এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

২. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব তৎসম শব্দে ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ি ু হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

৩. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জ্জন>অর্জন, উর্দ্ধ>উর্ধ্ব, কর্ম্ম>কর্ম, কার্ত্তিক>কার্তিক, কার্য্য>কার্য, বার্দ্ধক্য>বার্ধক্য, মূর্চ্ছা>মূর্ছা, সূর্য্য>সূর্য হবে।

৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন: অহম্+কার= অহংকার।

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

✓ সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

৫. সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন: গুণী→গুণিজন, প্রাণী→প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→মন্ত্রিপরিষদ।

✓ তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন: গুণী→গুণীজন, প্রাণী→প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→মন্ত্রীপরিষদ।

✓ ইন্- প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতী→কৃতিত্ব, দায়ী→দায়িত্ব, প্রতিযোগী→প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→সহযোগিতা।

৬. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

✓ এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুষ্ট, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

❖ অতৎসম শব্দ

১. ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন: আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি।

চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

✓ পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

✓ সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

©Nazmus Sadat
CamScanner

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে, প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

✓ যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২. এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন: কেন, কেনো (ক্রয় করো), খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে, দেখা, দেখি, জেনো, যেন।

✓ তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্তরূপ বহুল পরিচিত। যেমন: ব্যাঙ, ল্যাঠা।
এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

✓ বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

৩. ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন- কালো, খাটো, ছোটো, ভালো;
এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো;
করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;
কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;
করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো;

কোনো, মতো।

✓ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।

৪. ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণত অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: গাং, ঢং, পালং।

✓ তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হয়ে ঙ হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন।

☆ বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে সবসময়ই অনুস্বার থাকবে।

৫. ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দে খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

৬. জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

✓ ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন: আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

৭. মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: আঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

✓ তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। যেমন: কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

✓ কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঠ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন: গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

৮. শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন, আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব;

স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর।

ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম, এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

✓ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাসপোর্ট, বাস, ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, রেশন, স্টেশন।

✓ যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন- তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

৯. বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

✓ তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন: মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

©Nazmus Sadat

CamScanner

১০. হস-চিহ্ন:
হস-চিহ্ন যথা সম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।
✓ তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- উহ্, বাহ্, যাহ্ ।

১১. ঊর্ধ্ব-কমা: ঊর্ধ্ব-কমা যথা সম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে, হয়ে, দুজন।

❖ বিবিধ

১. সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন: অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিত, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।
✓ বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন: কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বাপ-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

২. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন: ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩. না-বাচক না স্বতন্ত্র পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: করি না।
✓ কিন্তু না-বাচক নি সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: করিনি।
✓ এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নাবালক, নারাজ, নাহক।
✓ অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন: না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৪. অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন: আজও, আমরাও, কালও।

৫. নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন: আজই, এখনই।

❖ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম:

১. ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

১. নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

১. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
২. সৌজন্যতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।
শুদ্ধ : সৌজন্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।
৩. শুধুমাত্র তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।
শুদ্ধ : শুধু তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।
৪. সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের কাম্য।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সম্পদশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
৫. আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়িত করা প্রয়োজন।
শুদ্ধ : আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়ন করা প্রয়োজন।
৬. আজকাল সব ছাত্রছাত্রীগণ অমনোযোগী।
শুদ্ধ : আজকাল ছাত্রছাত্রীগণ/সব ছাত্রছাত্রী অমনোযোগী।

২. বাক্য শুদ্ধ করুন: *[৪৩তম বিসিএস (কারিগরি/পেশাগত)]*

(১) করোনার প্রতিসেধক টীকা আবিস্কার মানবজাতির জন্য স্বস্তিকর।
শুদ্ধ : করোনার প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার মানবজাতির জন্য স্বস্তিকর।
(২) পরবর্তীতে আপনার আবেদন বিবেচনা হবে।
শুদ্ধ : পরবর্তীকালে/সময়ে আপনার আবেদন বিবেচনা করা হবে।
(৩) সাবিহার নিরবতা দেখিয়া তিনি বিষন্ন হলেন।
শুদ্ধ : সাবিহার নীরবতা দেখে তিনি বিষণ্ন হলেন।
(৪) তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করলেন।
শুদ্ধ : তিনি আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত পান করলেন।
(৫) ক্লাশের সকল ছাত্রছাত্রীগণ তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।
শুদ্ধ : ক্লাশের ছাত্রছাত্রীগণ/সকল ছাত্রছাত্রী তাদের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।
(৬) আজকাল অনেকেই 'সত্ত্ব', 'অন্তঃসত্তা' ইত্যাদি বানান ভুল করে।
শুদ্ধ : আজকাল অনেকেই 'স্বত্ব', 'অন্তঃসত্ত্বা' ইত্যাদি বানান ভুল করে।

৩. নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুনঃ *[৪১ তম বিসিএস]*

(১) গাছটি সমূলসহ উৎপাটন হয়েছে।
শুদ্ধ : গাছটি সমূল/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

CamScanner

(২) ষষ্টদশতম প্রতিযোগীতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।
শুদ্ধ : ষোড়শতম প্রতিযোগিতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।
(৩) আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য/কৃপণতা অনুচিত।
(৪) কেবলমাত্র তার বৈমাত্রেয় সহোদর উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ : কেবল তার বৈমাত্রেয় ভাই উপস্থিত ছিল।
(৫) দূরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যজ্য।
শুদ্ধ : দুরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যাজ্য।
(৬) পরবর্তীতে এলে তার অপমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
শুদ্ধ : পরবর্তীতে এলে তার অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৪. **নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: *[৪০তম বিসিএস]***

(১) দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।
শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত সে আসতে পারেনি।
(২) শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে দেখা হবে।
শুদ্ধ : শুধু অফিস চলাকালে দেখা হবে।
(৩) সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
শুদ্ধ : আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
(৪) দূরারোগ্য ব্যাধির স্বীকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।
শুদ্ধ : দূরারোগ্য ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়
(৫) এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্বরণে নামকরণ করা হয়েছে।
শুদ্ধ : এ স্মরণিকাটি কবি নজরুলের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।
(৬) স্বাস্থ সকল সুখের মুল।
শুদ্ধ : স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।

২. **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন ঃ *[৩৮তম বিসিএস]***

(১) পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।
শুদ্ধ : সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।
(২) আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
শুদ্ধ : আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
(৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।
শুদ্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
(৪) সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।
শুদ্ধ : সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী/ ছাত্রগণ পাঠে অমনোযোগী।

CamScanner

(৫) ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।

৩. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন। *[৩৭তম বিসিএস]*

(১) যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
শুদ্ধ : যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
(২) আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ : আপনি সপরিবার ও সবান্ধব আমন্ত্রিত।
(৩) তার পরশ্রীকারতা দেখে আমি মুগ্ধ।
শুদ্ধ : তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি বিরক্ত।
(৪) আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভাবনা আছে।
শুদ্ধ : আজ রাতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে।
(৫) তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাস্কর।
শুদ্ধ : তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
(৬) জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্বজেষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।
শুদ্ধ : জৈষ্ঠ্য মাসে তার জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হয়।

৪. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন। *[৩৬তম বিসিএস]*

(১) তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
শুদ্ধ : তার সৌন্দর্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
(২) এ নির্মম হত্যাকান্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।
শুদ্ধ : এ নির্মম হত্যাকান্ডে গ্রামবাসী স্তব্ধ/নির্বাক হয়ে গেল।
(৩) ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
শুদ্ধ : ইতোপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
(৪) মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।
শুদ্ধ : মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানানো হলো।
(৫) তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।
শুদ্ধ : তার খুব/অত্যন্ত আনন্দ হলো।
(৬) ছেলেটি অহর্নিশি তার মাকে জ্বালাতন করে।
শুদ্ধ : ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।

CamScanner

৫. বাক্যগুলো শুদ্ধ করুন : [৩৪তম বিসিএস]

১. তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।
শুদ্ধ: তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
২. এ খবরটি অত্যান্ত বেদনাদায়ক।
শুদ্ধ: এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
৩. মুখস্তবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
শুদ্ধ: মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
৪. তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।
শুদ্ধ: তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
৫. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
শুদ্ধ: সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
৬. এটি একটি অনুবাদিত গ্রন্থ।
শুদ্ধ: এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ।
৭. আমি অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ: আমি অপমানিত হয়েছি।
৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।
শুদ্ধ: এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
৯. এ তো তার দূর্লভ সৌভাগ্য।
শুদ্ধ: এ তো তার পরম সৌভাগ্য।
১০. তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।
শুদ্ধ: তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
১১. বালকটি আরোগ্য হয়েছে।
শুদ্ধ: বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।
১২. সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞান, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।
শুদ্ধ: সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

৬. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

১. এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।
শুদ্ধ: এসব লোককে আমি চিনি/এ লোকগুলোকে আমি চিনি।
২. তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।
শুদ্ধ: তুমি আমার নিকট অধিক প্রিয়।

৩. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।
শুদ্ধ: শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
৪. তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।
শুদ্ধ: তিনি নিরহঙ্কার ও নিরপরাধ মানুষ।
৫. সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।
শুদ্ধ: সে গাছ থেকে নামল।
৬. অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হইবে।
শুদ্ধ: অচিরে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
৭. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
শুদ্ধ: আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
৮. তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।
শুদ্ধ: তার দারিদ্র্যে কষ্ট পেয়েছি কিন্তু সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
৯. আমি অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ: আমি অপমানিত হয়েছি।
১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।
শুদ্ধ: ইতোমধ্যে গ্রামের সব লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিয়েছে।
১১. নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।
শুদ্ধ: নিরপরাধ লোক কাউকেই ভয় করে না ।
১২. অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
শুদ্ধ: অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।

৭. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন। *[৩২তম বিসিএস]*

১. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
শুদ্ধ: দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
২. ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
শুদ্ধ: ছাত্রীদের অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
৩. এমন অসহ্যনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
শুদ্ধ: এমন অসহ্য ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নি।
৪. আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ: আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
৫. আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
শুদ্ধ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
৬. তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।

শুদ্ধ: তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।
৭. সমুদয় সভ্যগণ এসেছেন।
শুদ্ধ: সভ্যগণ এসেছেন।
৮. পাতায় পাতায় পরে শিশির শিশির।
শুদ্ধ: পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
৯. ঝন্‌ঝা শেষ হইতে না হতে কুক্‌ঝটি অনচলটি ছাইয়া ফেললো।
শুদ্ধ: ঝঞ্ঝা শেষ হতে না হতে কুজ্‌ঝটিকা অঞ্চলটি ছেয়ে ফেললো।
১০. পৈতৃক সম্পত্বির মাদ্যমে ভদ্রস্থতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।
শুদ্ধ: পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহৎ উপকারও হয়।
১১. সকলে একত্রিত হয়ে ধুমপান পরিত্যায্য ঘোষণা করিলেন।
শুদ্ধ: সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন।
১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল।
শুদ্ধ: অনূদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

৮. **বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন।** ***[৩১তম বিসিএস]***

১. সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।
শুদ্ধ: সব প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।
২. মুমুর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিৎ।
শুদ্ধ: মুমূর্ষু লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
৩. তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
শুদ্ধ: তোমার কটূক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
৪. রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।
শুদ্ধ: রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন।
৫. কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।
শুদ্ধ: কারো জন্যই দৈন্য/দীনতা কাম্য হতে পারে না।
৬. আমি বিভূতিভূষন বন্ধোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।
শুদ্ধ: আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়ি নি।
৭. পুকুর পরিস্কারের জন্য কতৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষনা করেছে।
শুদ্ধ: পুকুর পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
৮. অদ্যক্ষ মহুদয় ঘটনার বিশৎ বিবরন জানতে চাইল।
শুদ্ধ: অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনাটির বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।
৯. বিষয়টি মস্তিষ্ক গ্রহন করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।
শুদ্ধ: বিষয়টি মস্তিষ্কগ্রাহ্য নয়, অন্তরে উপলব্ধিযোগ্য।

১০. অনুস্টানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ: অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।
১১. সেই ভীবৎসো ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পারি নি।
শুদ্ধ: সেই বীভৎস ঘটনা এখনো বিস্মৃত হতে পারি নি।
১২. লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।
শুদ্ধ: লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল, তারাই এখন চরছে ঘোড়ায়।

৯. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*

১. অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।
শুদ্ধ: অস্তমান সূর্য দেখতে পর্যটকগণ সমুদ্র-সৈকতে ভিড় করেছেন।
২. তিনি স্বস্ত্রীক বাহিরে গেছেন।
শুদ্ধ: তিনি সস্ত্রীক বাইরে গিয়েছেন।
৩. সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
শুদ্ধ: ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
৪. অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
শুদ্ধ: অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
৫. মরুভুমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
শুদ্ধ: মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরূদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
৬. আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।
শুদ্ধ: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
৭. আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।
শুদ্ধ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
৮. নতুন নতুন ছেলেগুলো বড়ই উতপাত করছে।
শুদ্ধ: নতুন ছেলেগুলো বড়ই উৎপাত করছে।
৯. তার মত কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
শুদ্ধ: তার মতো কৃতী ছাত্র খুব কমই দেখা যায়।
১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।
শুদ্ধ: রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়।
১১. সিলেটগামী বিমানের আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।
শুদ্ধ: সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরিতে ছাড়বে।
১২. ছাত্রদের কঠোর অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়।
শুদ্ধ: ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

CamScanner

১০. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন। *[২৯তম বিসিএস]*

১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনানীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ: বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
২. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত।
শুদ্ধ: সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।
৩. সকলের সহযোগিতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।
শুদ্ধ: সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
৪. ঝুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।
শুদ্ধ: ঝুড়িতে রাখা সব মাছের/মাছগুলোর আকার একই রকম।
৫. তাহার শুশ্রুষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।
শুদ্ধ: তার শুশ্রুষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।
৬. এমন অসহ্যনীয় ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।
শুদ্ধ: এমন অসহনীয়/অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করি নি।
৭. স্ব স্ব ভূমির পুস্করিনী পরিস্কার করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরষ্কার ঘোষণা করিয়াছে
শুদ্ধ: নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
৮. কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেছেন।
শুদ্ধ: কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।
৯. তিনি সানন্দিতচিত্তে সম্মতি দিলেন।
শুদ্ধ: তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।
১০. সে যে ব্যাকারণের বিভিষীকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
শুদ্ধ: সে যে ব্যাকরণের ভয়ে ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
১১. নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্ত্বাধীনে আছে।
শুদ্ধ: নদীর তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে/অধীনে আছে।
১২. ভূমিকম্পে উর্ধমুখী দালানটি ধ্বসে পড়লো।
শুদ্ধ: ভূমিকম্পে উঁচু দালানটি ধসে পড়লো।

১১. বানান, শব্দ প্রয়োগ ও বিন্যাস, ভাষারীতি ইত্যাদি শুদ্ধ করে নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

১. এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।
শুদ্ধ: এমন মধুর/ মাধুর্যপূর্ণ আচরণ সকলকে মুগ্ধ করবেই।
২. সশঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগিবে এমন ভাবছ কেমন কারণেই।
শুদ্ধ: শঙ্কিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে এমন ভাবছ কোন কারণে?
৩. কবি সামগ্রের ধারনা ত্রুটি রহিয়াছে বলে মনে হয়।

শুদ্ধ: কবির সামগ্রিক ধারণায় ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয়।

৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলীপূটে গ্রহণ করতে হয়।

শুদ্ধ: প্রতিভা ফরমাশ দিয়ে গড়া যায় না, ওটা প্রকৃতির দান, কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়।

৫. হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।

শুদ্ধ: কেঁচো খুড়তেই গর্ত থেকে বিশাল লম্বা সাপ বের হলো।

৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পার্শ্বে স্তূপিকৃত করে রাখিতেছিল।

শুদ্ধ: ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতা রাস্তার একপাশে স্তূপ করে রাখছিল ।

৭. বর্শা সজল মেঘকজ্জ্বল দিবসে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।

শুদ্ধ: বর্ষা সজল মেঘলা দিনে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য/উজ্জ্বলতা থাকে না।

৮. বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

শুদ্ধ: বাংলাদেশের জন্য কী ভালো, কী মন্দ তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।

৯. বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রোষধি।

শুদ্ধ: বৈশ্য সভ্যতার রোগ সারানোর উত্তম উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধি।

১০. মানুষের শারীরিক-ঘেষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।

শুদ্ধ: মানুষের শরীর ঘেঁষা যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরানো।

১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যতাবোধের দ্বারা যে মহাত্ন ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্চর্য্য।

শুদ্ধ: অন্যের সাথে একতাবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে, সেটি হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।

১২. এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়।

শুদ্ধ: এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্য লোকারণ্য বলে মনে হয়।

১২. <u>শুদ্ধ করে লিখুন।</u> *[২৭তম বিসিএস]*

ক. তিনি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন।

শুদ্ধ: তিনি শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।

খ. জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।

শুদ্ধ: জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।

গ. কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।

শুদ্ধ: কাব্যটির উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা প্রশংসনীয় ।
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
শুদ্ধ: রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
ঙ. তার কথার সঙ্গে কাজের সমাঞ্জস্যতা নেই।
শুদ্ধ: তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই।
চ. দারীদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
শুদ্ধ: দারিদ্র্যই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
ছ. দূর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যজ্য।
শুদ্ধ: দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
জ. নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।
শুদ্ধ: নেপালের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা কর।
ঝ. সে কৌতূক করার কৌতুহল সম্বরন করতে পারল না।
শুদ্ধ: সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
ঞ. স্বাধীনোত্তরকালে বাংলা নাটকের অত্যাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।
শুদ্ধ: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

১৩. শুদ্ধ করে লিখুন। *[২৫তম বিসিএস]*

ক. গড্ডালিকা প্রবাহ।
শুদ্ধ: গড্ডলিকা প্রবাহ।
খ. ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ: এর আবশ্যকতা নাই।
গ. এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।
শুদ্ধ: এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
ঘ. সকল সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ: সকল সদস্য/সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
ঙ. তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।
শুদ্ধ: তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বসবাস করেন।
চ. লোকটি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিয়েছে।
শুদ্ধ: লোকটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।
ছ. বর্ণিত অবস্থা প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।
শুদ্ধ: বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার আবেদন মঞ্জুর করা যায়।
জ. মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
শুদ্ধ: মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।
ঝ. স্বাক্ষরতা কর্মসূচী সফল হয়েছে।

শুদ্ধ: সাক্ষরতা কর্মসূচি সফল হয়েছে।
ঞ. উপরোক্ত।
শুদ্ধ: উপযুক্ত/উপরিউক্ত।

১৪. শুদ্ধ করে লিখুন। *[২৪তম বিসিএস]*

ক. বনান ভুল দোষনীয়।
শুদ্ধ: বানান ভুল দূষণীয়।
খ. ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।
শুদ্ধ: ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।
গ. উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।
শুদ্ধ: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।
ঘ. অধীনস্ত কর্মচারীরা করেছে।
শুদ্ধ: অধীন কর্মচারীরা করেছে।
ঙ. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
চ. জাপান উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধ: জাপান উন্নত দেশ।
ছ. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্যের উপাদান।
শুদ্ধ: বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।
জ. দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।
শুদ্ধ: দুষ্কৃতকারী সমাজের শত্রু।
ঝ. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।
শুদ্ধ: দীনতা/দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
ঞ. বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।
শুদ্ধ: বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

১৫. শুদ্ধ করে লিখুন। *[২৩তম বিসিএস]*

ক. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
শুদ্ধ: জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
খ. নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই।
শুদ্ধ: নিজের প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই।
গ. তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
শুদ্ধ: তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
ঘ. নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।

CamScanner

শুদ্ধ: নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
ঙ. সে আকণ্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।
শুদ্ধ: সে আকণ্ঠ পান করেছে।
চ. মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্কিত হল।
শুদ্ধ: মৃত্যুভয়ে সে শঙ্কিত হলো।
ছ. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।
শুদ্ধ: বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
জ. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযুজ্য নয়।
শুদ্ধ: এ প্রশংসা তার জন্য প্রযোজ্য নয়।
ঝ. তার সৃজিত ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।
শুদ্ধ: সৃজিত ভুলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো।
ঞ. সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি।
শুদ্ধ: সে বিদ্বান ব্যক্তি।

১৬. শুদ্ধ করে লিখুন। *[২২তম বিসিএস]*

ক. জমিজমার সামান্ন আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন।
শুদ্ধ: জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।
খ. শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
শুদ্ধ: শামসুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি।
গ. কলেজের পূনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।
শুদ্ধ: কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।
অথবা, কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।
ঘ. বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন।
শুদ্ধ: বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন।
ঙ. বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল।
শুদ্ধ: বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
চ. বমালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
শুদ্ধ: মালসুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে/বমাল চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
ছ. আদালত তাঁকে স্বশরীরে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন ।
শুদ্ধ: আদালত তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
জ. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।
শুদ্ধ: কঠোর পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল ।
ঝ. সে বড় দুরাবস্থায় পড়েছে।
শুদ্ধ: সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে।

CamScanner

ঞ. সাধারণ জন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে।
শুদ্ধ: জন সাধারণ গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে।

১৭. শুদ্ধ করে লিখুন। *[২১তম বিসিএস]*

ক. জ্ঞানি মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
শুদ্ধ: জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
খ. শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
শুদ্ধ: শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
গ. ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।
শুদ্ধ: ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
ঘ. অঙ্ক কষিতে ভুল করা উচিত নয়।
শুদ্ধ: অঙ্ক কষতে ভুল করা উচিত নয়।
ঙ. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।
শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
চ. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
শুদ্ধ: এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো।
ছ. তিনি স্বস্ত্রীক ষ্টেসনে গিয়েছেন।
শুদ্ধ: তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গিয়েছেন।
জ. সন্মান, সান্ত্বনা, সত্ত্বান, সমিচিন ইত্যাদি শব্দাবলী অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না।
শুদ্ধ: সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান ও সমীচীন ইত্যাদি শব্দ অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না।
ঝ. রচণাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রহিয়াছে।
শুদ্ধ: রচনাটি ভাবগম্ভীর, তবে ভাষার দীনতা/দৈন্য রয়েছে।
ঞ. তাহার বৈমাত্রের সহোদর অসুস্থ।
শুদ্ধ: তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।

১৮. শুদ্ধ করে লিখুন। *[২০তম বিসিএস]*

ক. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
খ. তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
শুদ্ধ: তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ/ উদ্ধত আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
গ. সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ: সভ্যগণ/সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

CamScanner

ঘ. অন্যায়ের প্রতিদান দুনিবার্য।
শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য/দুর্নিবার।
ঙ. তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।
শুদ্ধ: তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
চ. এ দায়িত্ব আমাকে দিও না।
শুদ্ধ: এ দায়িত্বভার আমাকে দিও না।
ছ. শরীর অসুস্থ্যের জন্য আমি কাল আসি নি।
শুদ্ধ: অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসি নি।
অথবা, শরীর অসুস্থ থাকায় আমি কাল আসি নি ।
জ. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কী বলবেন?
শুদ্ধ: আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কী বলবেন?
ঝ. আমি সকলের সহযোগীতায় আবশ্যকীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।
শুদ্ধ: আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই।
ঞ. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।
শুদ্ধ: তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

১৯. শুদ্ধ করে লিখুন। *[১৮তম বিসিএস]*

ক. ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
শুদ্ধ: ইদানীং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
খ. প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
শুদ্ধ: প্রাণে ঐকতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
গ. তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।
শুদ্ধ: তিনি প্রভাতেই বাড়ি হতে বের হয়েছেন।
ঘ. এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।
শুদ্ধ: এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
ঙ. জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
শুদ্ধ: জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
চ. পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।
শুদ্ধ: সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছে।
ছ. নীরিহ অতিথি শুধু আসির্বাদ চেয়েছিলেন।
শুদ্ধ: নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
জ. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
শুদ্ধ: সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
ঝ. ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।

শুদ্ধ: ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না।
ঞ. ব্যাধিই সংক্রমক, স্বাস্থ নয়।
শুদ্ধ: ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

২০. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোন দশটি)। *[১৭তম বিসিএস]*

ক. তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।
শুদ্ধ: তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
খ. শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকবে।
শুদ্ধ: শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
গ. মুর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
শুদ্ধ: মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
ঘ. মূহুর্তের ভূলে বিদুষীরাও বিপদে পড়ে।
শুদ্ধ: মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপদে পড়ে।
ঙ. পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।
শুদ্ধ: পুরান চাল ভাতে বাড়ে।
চ. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
শুদ্ধ: সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
ছ. তার মত কুশলী শিল্পী ইদানিংকালে বিরল।
শুদ্ধ: তার মত কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।
জ. আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।
শুদ্ধ: আমার অধীন এ কর্মচারি বেশ বিশ্বস্ত।
ঝ. তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করেছেন।
শুদ্ধ: তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করেছেন।
ঞ. একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রয়েছে।
শুদ্ধ: একবিংশ শতাব্দী আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে।
অথবা, একুশ শতক আসতে আর মাত্র চার বছর বাকি রয়েছে।
ট. সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাসের নাম হইতেছে বাজেট।
শুদ্ধ: সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট।
ঠ. স্বাধিনতা ও বিজয় দিবশে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে।
শুদ্ধ: স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা আছে।
ড. ণত্ববিধান ও ষত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না।
শুদ্ধ: ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।

CamScanner

২১. **শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোন দশটি)। *[১৫তম বিসিএস]***

ক. আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতি-সৌধ দেখিতে যাব।
শুদ্ধ: তুমি, সে ও আমি কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
খ. যিনি যথার্থ্যই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করে না।
শুদ্ধ: যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।
গ. তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশে গিয়াছে।
শুদ্ধ: তার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গিয়েছে।
ঘ. বিষয়টির বিষদ ব্যাখার প্রয়োজন নাই ।
শুদ্ধ: বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।
ঙ. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশীক্ষণ কেন্দ্র।
শুদ্ধ: এটি একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
চ. পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।
শুদ্ধ: পরিবেশ দূষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।
ছ. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
শুদ্ধ: দারিদ্র্য/ দরিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
জ. এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।
শুদ্ধ: এ সব মানুষের কোন ঠিকানা নেই/ এ মানুষগুলোর কোন ঠিকানা নেই।
ঝ. শোক সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
শুদ্ধ: শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
ঞ. মণিষী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
শুদ্ধ: মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
ট. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।
শুদ্ধ: তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।
ঠ. তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দিবে।
শুদ্ধ: তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।
ড. তোমার সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।
শুদ্ধ: তোমরা সুখে-দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।
ঢ. বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে ।
শুদ্ধ: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।

২২. শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোন দশটি)। *[১৩তম বিসিএস]*

ক. মনষ্কামনা পূর্ণ না হওয়ার সে মনোস্তাপে ভুগছে।
শুদ্ধ: মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
খ. অত্যান্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছে না কেন?
শুদ্ধ: গরমে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?
গ. আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ কি?
শুদ্ধ: আমাদের দৈন্য/দীনতা দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?
ঘ. পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা ।
শুদ্ধ: পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
ঙ. বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।
শুদ্ধ: বাবু চললেন যেন গজেন্দ্রমন।
চ. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।
শুদ্ধ: ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
ছ. সর্বদেহে অসহ্যনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়?
শুদ্ধ: সর্বদেহে অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়?
জ. কালানুক্রমানুসারে আমি সবই জানিতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
শুদ্ধ: কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
ঝ. বিস্ময়ভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখিতেছিলাম ।
শুদ্ধ: বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখছিলাম।
ঞ. মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
শুদ্ধ: নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
ট. মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন।
শুদ্ধ: মাননীয়া সভানেত্রী এবং উপস্থিত শিক্ষকগণকে/সকল শিক্ষককে লক্ষ করে তিনি কথাগুলো বললেন।
ঠ. অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।
শুদ্ধ: আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করব।
ড. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐক্যমতে পৌঁছুলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।
শুদ্ধ: রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌঁছলেন, তবু ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
ঢ. অনোন্যপায়ী হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।
শুদ্ধ: অনন্যোপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।

CamScanner

২৩. **শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোন দশটি)। *[১১তম বিসিএস]***

ক. এমন অসহ্যনীয় ব্যথা কখনও অনুভব করিনি।
শুদ্ধ: এমন অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা কখনো অনুভব করি নি।
খ. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারলো না।
শুদ্ধ: সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
গ. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
শুদ্ধ: মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
ঘ. সর্ববিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।
শুদ্ধ: সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
ঙ. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার ।
শুদ্ধ: অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার/ অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
চ. শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে।
শুদ্ধ: শশিভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।
ছ. তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন। আমার আর বাঁচাবার স্বাদ নেই।
শুদ্ধ: তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
জ. সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে।
শুদ্ধ: সে সঙ্কটে পড়েছে।
ঝ. আবাল্য হতেই সযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
শুদ্ধ: বাল্যকাল হতে/আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
ঞ. সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।
শুদ্ধ: সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি-সৎকার করা উচিত।
ট. তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।
শুদ্ধ: তার কাজ করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।
ঠ. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।
শুদ্ধ: মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।
ড. গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
শুদ্ধ: গতকাল নীলিমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
ঢ. তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
শুদ্ধ: তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

২৪. **শুদ্ধ করে লিখুন (যে কোন দশটি)। *[১০তম বিসিএস]***

ক. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।
শুদ্ধ: তিনি সানন্দ চিত্তে/সানন্দে সম্মতি দিলেন।
খ. লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।

শুদ্ধ: লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।
গ. তার দেহ আপাদমস্তক পর্যন্ত আবৃত ছিল।
শুদ্ধ: তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
ঘ. তার মত ত্বরিতকর্মী লোক আর হয় না।
শুদ্ধ: তার মত তড়িতকর্মা লোক হয় না।
ঙ. সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।
শুদ্ধ: সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম/সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়।
চ. বিবাদমান দু'টি দলের সংঘর্ষ হয়।
শুদ্ধ: বিবদমান দু'টি দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।
ছ. হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘনীয়।
শুদ্ধ: হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘ্য।
জ. তিনি এখন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
শুদ্ধ: তিনি এখন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ/প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
ঝ. সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
শুদ্ধ: সে ভিড়ে হারিয়ে গেল।
ঞ. তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।
শুদ্ধ: তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
ট. সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
শুদ্ধ: সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
ঠ. মুমূর্ষ ব্যক্তির সেবা করবে।
শুদ্ধ: মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
ড. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
ঢ. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।
শুদ্ধ: মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।

বাংলা ভাষায় কিছু অপপ্রয়োগ :

ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা নির্ভর করে শব্দ ও বাক্যের নির্ভুল ও যথাযথ প্রয়োগের উপর। ভাষা ও ব্যাকরণগত দক্ষতা ব্যতীত শব্দ ও বাক্যের নির্ভুল প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব। বাংলা শব্দ ও বাক্য লিখতে গিয়ে সচরাচর যেসব ভুল হয়ে থাকে সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো-

❖ **সন্ধিজনিত অপপ্রয়োগ :** সন্ধিজনিত কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- অত্যাধিক (হবে অত্যধিক = অতি + অধিক), ইতিপূর্বে (হবে ইতঃপূর্বে = ইতি +

পূর্বে), অদ্যবধি (হবে অদ্যাবধি = অদ্য + অবধি) ইত্যাদি। বাক্যে এর উদাহরণ নিম্নরূপ-

ভুল : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।
শুদ্ধ : জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
ভুল : আজকের সন্ধ্যা মনমুগ্ধকর।
শুদ্ধ : আজকের সন্ধ্যা মনোমুগ্ধকর।
ভুল : তিনি ততধিক বলবান নহে।
শুদ্ধ : তিনি ততোধিক বলবান নয়।
ভুল : লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।
শুদ্ধ : লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই। ।
ভুল : বাংলা ব্যাকরণ অত্যান্ত জটিল।
শুদ্ধ : বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
ভুল : ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।
শুদ্ধ : ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
ভুল : সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট।
শুদ্ধ : সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট।
ভুল : সে বড় দুরাবস্থায় পড়েছে।
শুদ্ধ : সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে।

সন্ধিজনিত আরো কিছু অপপ্রয়োগের উদাহরণ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
অনাটন	অনটন
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
আষাঢ়ন্ত	আষাঢ়ান্ত
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
উপর্যপরি	উপর্যুপরি
উল্লেখিত	উল্লিখিত
জ্যোতীন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
নিরব	নীরব
পুনজীবন	পুনর্জীবন
পৃথকন্ন	পৃথগন্ন

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
বক্ষোপরি	বক্ষ-উপরি
বহুৎসব	বহূৎসব
বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী
বিপদোদ্ধার	বিপদুদ্ধার
ব্যাতিহার	ব্যতিহার
ব্যাস্ত	ব্যস্ত
ব্যাষ্টি	ব্যষ্টি
মুখছবি	মুখচ্ছবি
মনকামনা	মনোকামনা
মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুন্ন
মনভাব	মনোভাব
যশেচ্ছা	যশ-ইচ্ছা

❖ **সমাস সংক্রান্ত অপপ্রয়োগ :** সমাস নিষ্পন্ন কিছু শব্দ বানানের ক্ষেত্রে সচরাচর ভুল হয়। যেমন- আরোরাত্রি (হবে অহোরাত্র), পিতাহীন (হবে পিতৃহীন), কুঅর্থ (হবে কদর্থ)। বাক্যে এর উদাহরণ-

ভুল : পিতাহীন শিশুটিকে অবহেলা করো না।
শুদ্ধ : পিতৃহীন শিশুটিকে অবহেলা করো না।
ভুল : তার মত করিতকর্মী লোক হয় না।
শুদ্ধ : তার মত করিতকর্মা লোক হয় না।
ভুল : সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।
শুদ্ধ : সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
ভুল : মৃত্যু ভয়ে সে সশঙ্কিত হলো।
শুদ্ধ : মৃত্যু ভয়ে সে শঙ্কিত হলো।

সমাসজনিত আরো কিছু অপপ্রয়োগের উদাহরণ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ
অর্ধরাত্রি	অর্ধরাত্র
অহর্নিশি	অহর্নিশ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
কমলাক্ষি	কমলক্ষি
গরিমামণ্ডিত	গরিমমণ্ডিত
জ্ঞানীজন	জ্ঞানিজন
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরভিমানী	নিরভিমান
নিরহংকারী	নিরহংকার
নির্ধনী	নির্ধন
নির্দোষী	নির্দোষ
নির্গুণী	নির্গুণ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ
নীরোগী	নীরোগ
যুবরাজা	যুবরাজ
দিবরাত্রি	দিবরাত্র
পিতাহারা	পিতৃহারা
ফনীভূষণ	ফণিভূষণ
ভ্রাতাবৃন্দ	ভ্রাতৃবৃন্দ
মহিমামণ্ডিত	মহিমমণ্ডিত
মাতাজাতি	মাতৃজাতি
যুবরাজা	যুবরাজ
রাজাগণ	রাজগণ
সলজ্জা	সলজ্জ
সশঙ্কা	সশঙ্ক

❖ **প্রত্যয় জনিত অপপ্রয়োগ**

ভুল : আমার অত্যন্ত কার্য্যবাহুলতা ঘটেছে।
শুদ্ধ : আমার অত্যন্ত কার্যবাহুল্য ঘটেছে।
ভুল : তার সৌজন্যতা ভুলতে পারব না।
শুদ্ধ : তার সৌজন্য ভুলতে পারব না।
ভুল : সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।
শুদ্ধ : সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।

CamScanner

ভুল : আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট।
শুদ্ধ : আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্য।
ভুল : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
শুদ্ধঃ আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
ভুল : তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।
শুদ্ধ : তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
ভুল : রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।

প্রত্যয়জনিত আরো কিছু অপপ্রয়োগের উদাহরণ

✓ সাধারণ প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্ত	অধীন
অসহ্যনীয়	অসহনীয়, অসহ্য
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
অর্থনীতিক	অর্থনৈতিক
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত
একত্রিত	একত্র
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐক্যমত	ঐকমত্য
করিতকর্মী	করিতকর্মা
গণ্যনীয়	গণ্য, গণনীয়
গ্রাহ্যযোগ্য	গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য
ঘূর্ণীয়মান	ঘূর্ণায়মান
চোষ্য	চূষ্য
জ্ঞানমান	জ্ঞানবান
তদৃষ্টে	তদ্দর্শনে
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
মন্থিত	মথিত
মুহ্যমান	মোহ্যমান

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দোষণীয়	দূষণীয়
পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
পুজ্যনীয়	পূজনীয়
পুজ্য	পূজ্য
পুষ্কর্ণী	পুষ্করিণী
বিবাদমান	বিবদমান
বাহ্যিক	বাহ্য
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
মহাত্ম	মহত্ত্ব
সত্বা	সত্তা
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধ, সম্পদশালী
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য
স্বত্ত্ব	স্বত্ব
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়
সহ্যনীয়	সহনীয়

✓ 'তা' এবং 'ত্ব' প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধৈর্যতা	অধৈর্য, অধীরতা
অজ্ঞানতা	অজ্ঞান
অনিবার্যতা	অনিবার্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রসারতা	প্রসার
পৌরুষত্ব	পৌরুষ/পুরুষত্ব
বাহুল্যতা	বাহুল্য/বহুলতা

CamScanner

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপকর্ষতা	অপকর্ষ/অপকৃষ্টতা
আতিশয্যতা	আতিশয্য
আলস্যতা	আলস্য/অলসতা
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা
কার্পণ্যতা	কার্পণ্য/কৃপণতা
কৃচ্ছ্রতা	কৃচ্ছ্র
গাম্ভীর্যতা	গাম্ভীর্য/গম্ভীরতা
গৌণতা	গৌণ
চাপল্যতা	চাঞ্চল্য/চপলতা
চাতুর্যতা	চাতুর্য/চতুরতা
চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
দ্বৈততা	দ্বৈত
দৌর্বল্যতা	দৌর্বল্য/দুর্বলতা
ধৈর্যতা	ধৈর্য/ধীরতা
নির্গুণিতা	নির্গুণতা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বৈচিত্রতা	বৈচিত্র/বিচিত্রতা
নির্দোষতা	নির্দোষিতা
বৈশিষ্ট্যতা	বৈশিষ্ট্য/বিশিষ্টতা
বৈষম্যতা	বৈষম্য/বিষমতা
ভারসাম্যতা	ভারসাম্য/ভারসমতা
মতদ্বৈধতা	মতদ্বৈধতা
মাধুর্যতা	মাধুর্য/মধুরতা
মৈত্রতা	মৈত্র/মিত্রতা
মৌনতা	মৌন
লাঘবতা	লাঘব/লঘুতা
সখ্যতা	সখ্য
সারল্যতা	সারল্য/সরলতা
সাদৃশ্যতা	সাদৃশ্য/সদৃশ্যতা
সামর্থ্যতা	সামর্থ/সমর্থতা
সৌজন্যতা	সৌজন্য/সুজনতা
সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য/সুন্দরতা
সৌহার্দ্যতা	সৌহার্দ্য
স্বাতন্ত্র্যতা	স্বাতন্ত্র্য/স্বতন্ত্রতা

✓ **উৎকর্ষবাচক তর, তম প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগ**

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কনিষ্ঠতর	কনিষ্ঠ
কনিষ্ঠতম	কনিষ্ঠ, সর্বকনিষ্ঠ
গরিষ্ঠতর	গরিষ্ঠ
গরিষ্ঠতম	গরিষ্ঠ
পাপিষ্ঠতর	পাপিষ্ঠ
পাপিষ্ঠতম	পাপিষ্ঠ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বলিষ্ঠতর	বলিষ্ঠ
বলিষ্ঠতম	বলিষ্ঠ
লঘিষ্ঠতর	লঘিষ্ঠ
লঘিষ্ঠতম	লঘিষ্ঠ
শ্রেষ্ঠতর	শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ

❖ **পুনরুক্তি বা বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ :** একই অর্থবিশিষ্ট শব্দের পুনরুক্তি বা বাহুল্য ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন : সমূলসহ বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে। এখানে সহ শব্দটি সমূল শব্দের মধ্যেই লুকায়িত; তাই সমূলসহ শব্দটি সহ শব্দ দ্বারা বাহুল্য দোষে দুষ্ট। একই ভাবে 'অশ্রুজল' নয় 'অশ্রু', 'আয়ত্তাধীন' নয় 'অধীন' বা 'আয়ত্তে', ইদানিংকালে' নয় ইদানিং' ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ-

ভুল : আকণ্ঠপর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

শুদ্ধ : আকণ্ঠ (বা কণ্ঠপর্যন্ত) ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

ভুল : হীন চরিত্রবান লোক পশুরও অধম।।
শুদ্ধ : হীনচরিত্র লোক পশুরও অধম।
ভুল : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলে (বা মূলসহ) উৎপাটিত হয়েছে।
ভুল : সশঙ্কিতচিত্তে সে কথাটা বলল।
শুদ্ধ : সশঙ্কচিত্তে (বা শঙ্কিতচিত্তে) সে কথাটা বলল।
ভুল : সবিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে....,
শুদ্ধ : সবিনয় (বা বিনয়পূর্বক) নিবেদন এই যে.....
ভুল : শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।।
শুদ্ধ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
ভুল : কেবলমাত্র দুর্নীতিই এ সংকটের জন্যে দায়ী।
শুদ্ধ : কেবল দুর্নীতিই এ সংকটের জন্যে দায়ী।
ভুল : ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়।
শুদ্ধ : ব্যাপারটা আমার আয়ত্তে (বা অধীন) নয়।
ভুল : আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশের অধীনস্থ ছিল।
শুদ্ধ : আমাদের দেশ এক সময় ব্রিটিশের অধীন ছিল।
ভুল : ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।
শুদ্ধ : ইদানীং ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।
ভুল : ততকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।
শুদ্ধ : তৎকালে (বা সে সময়ে) সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।
ভুল : চোরটি বমালসুদ্ধ ধরা পড়েছে।
শুদ্ধ : চোরটি বমাল (বা মালসুদ্ধ) ধরা পড়েছে।
ভুল : বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
শুদ্ধ : বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
ভুল : তিনি অদ্যাপিও নিরুদ্দেশ।
শুদ্ধ : তিনি অদ্যাপি নিরুদ্দেশ।
ভুল : তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
শুদ্ধ : তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
ভুল : আলোচ্যমান অংশটুকু জীবনানন্দের কবিতা থেকে নেওয়া।
শুদ্ধ : আলোচ্য অংশটুকু জীবনানন্দের কবিতা থেকে নেওয়া।
ভুল : আপনার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
শুদ্ধ : আপনার তথ্য গ্রাহ্য (বা গ্রহণযোগ্য) নয়।
ভুল : যদ্যপিও ইহা আদেশ তথাপিও ইহা পালন করা কঠিন।

CamScanner

শুদ্ধ : যদ্যপি ইহা আদেশ তথাপি ইহা পালন করা কঠিন।
ভুল : ছেলেটি দারুণ সুবুদ্ধিমান।
শুদ্ধ : ছেলেটি দারুণ বুদ্ধিমান।
ভুল : বিদেশী অতিথিদের সুস্বাগত জানানো হলো।
শুদ্ধ : বিদেশি অতিথিদের স্বাগত জানানো হলো।
ভুল : লেখাপড়ার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার।
শুদ্ধ : লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য রক্ষাও দরকার।

বাহুল্যজনিত আরো কিছু অপপ্রয়োগের উদাহরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্রস্থানে	অত্র/এইস্থানে
অদ্যাপিও	অদ্যাপি/অদ্যও
অশ্রুজল	অশ্রু
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত
আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
কদাপিও	কদাপি
বিবিধপ্রকার	বিবিধ
যদ্যপিও	যদ্যপি/যদিও
শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকাতর	কাতর/কাতরভাবে
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
সমূলসহ	সমূল/মূলসহ
সময়কাল	সময়/কাল
সলজ্জিত	লজ্জিত/সলজ্জ
সশঙ্কিত	শঙ্কিত/সশঙ্ক
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য/সাধনায়ত্ত
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি/বুদ্ধিমান
সুস্বাগত/ম	স্বাগত/ম
সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
প্রয়োজনীয়তা	প্রয়োজন

❖ **প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতিজনিত অপপ্রয়োগ :** প্রবাদ-প্রবচনের মর্মমূলে রয়েছে যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তাই যুগযুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেচ্ছা বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। এর বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূল অর্থ বদলে দেয়। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। যেমন-
ভুল : ওরা এক ঝাঁকের মাছ তো, তাই চালচলনও একরকম।
শুদ্ধ : ওরা এক ঝাঁকের কই তো, তাই চালচলনও একরকম।
ভুল : ছিঁচকে চোরটা যেন মাগুর মাছের প্রাণ: দু-চার ঘায়ে কিছু হবে না।
শুদ্ধ : ছিঁচকে চোরটা যেন কই মাছের প্রাণ; দু-চার ঘায়ে কিছু হবে না।
ভুল : তোমার খোদার ওপর কারসাজি করার অভ্যাস গেল না।
শুদ্ধ : তোমার খোদার ওপর খোদকারি করার অভ্যাস গেল না।
ভুল : অনেক হয়েছে, গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
শুদ্ধ : অনেক হয়েছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।

CamScanner

ভুল : বুড়ো নড়ছে না, যদি ময়লা ফেলতে ভাঙা কুলোর ডাক পড়ে।
শুদ্ধ : বুড়ো নড়ছে না, যদি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর ডাক পড়ে।
ভুল : পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে।
শুদ্ধ : পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সর্ষেফুল দেখে।
ভুল : ও তো ঢোলের বাঁয়া, সঙ্গে থাকাও যা না থাকাও তা।
শুদ্ধ : ও তো ঢাকের বাঁয়া, সঙ্গে থাকাও যা না থাকাও তা।
ভুল : মাখনের পুতুলটা কি আমাদের সঙ্গে অতদূর হেঁটে যেতে পারবে?
শুদ্ধ : ননির পুতুলটা কি আমাদের সঙ্গে অতদূর হেঁটে যেতে পারবে?
ভুল : তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তোমার বয়সের ইটপাথর নেই।
শুদ্ধ : তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তোমার বয়সের গাছপাথর নেই।
ভুল : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত।
ভুল : যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতল।
শুদ্ধ : যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।
ভুল : আমি কারো সাতেও নেই সতেরোতেও নেই।
শুদ্ধ : আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
ভুল : সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।
শুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

❖ **বহুবচনজনিত অপপ্রয়োগ :** বহুত্ব বোঝাতে আমরা বহুবচন ব্যবহার করি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি/ গুলো/ রা, এরা ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন তৈরি করা হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে বহুবচনের পরে দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ কোনো শব্দকে এক বার বহুবচনে রূপান্তরিত করলে পুনরায় তার বহুত্ব অপ্রয়োজনীয়। তাই অগণিত, অনেক, বহু, যাবতীয়, সব ইত্যাদি যত বহুত্ববাচক শব্দ আছে, তাদের পরে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি/গুলো ইত্যাদি যুক্ত হবে না। বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত কিছু উদাহরণ-

ভুল : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।
শুদ্ধ : ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।
ভুল : যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই গ্রহের বাসিন্দা।
শুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
ভুল : অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
শুদ্ধ : অন্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে,
/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
ভুল : সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।

CamScanner

শুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
ভুল : নতুন নতুন ছেলেগুলো বড় উৎপাত করছে।
শুদ্ধ : নতুন নতুন ছেলে বড় উৎপাত করছে,
/নতুন ছেলেরা বড় উৎপাত করছে।
ভুল : সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
শুদ্ধ : সকল দর্শককে স্বাগত জানাই। অথবা, দর্শকমণ্ডলিকে স্বাগত জানাই।
ভুল : সকল বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
শুদ্ধ : সকল বন্যার্তকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
ভুল : সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাধে।
শুদ্ধ : সমুদয় পক্ষীই নীড় বাঁধে।
ভুল : সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
শুদ্ধ : সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।

❖ <u>বাচ্যজনিত :</u> কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও 'করা' ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও 'হওয়া' ক্রিয়ার রূপ হবে। যেমন :

ভুল : সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।
শুদ্ধ : সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।
ভুল : সূর্য উদয় হয়েছে।
শুদ্ধ : সূর্য উদিত হয়েছে।
ভুল : পিতা তোমার প্রতি ক্রোধ হইয়াছেন।
শুদ্ধ : পিতা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।
ভুল : যুক্তি খণ্ডন হয়েছে।
শুদ্ধ : যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে।
ভুল : সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
শুদ্ধ : সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
ভুল : সে চমৎকার হইয়াছে।
শুদ্ধ : সে চমৎকৃত হইয়াছে।
ভুল : আমরা প্রতিপালন হইতেছি।
শুদ্ধ : আমরা প্রতিপালিত হইতেছি।
ভুল : এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।
শুদ্ধ : এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে।
ভুল : বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
শুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
ভুল : গৌরব লোপ পেয়েছে।

CamScanner

শুদ্ধ : গৌরব লুপ্ত হয়েছে।
ভুল : ঘটনা বর্ণনা হয়েছে।
শুদ্ধ : ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
ভুল : আমি সন্তোষ হলাম।
শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম।
ভুল : কথা শুনে সে বিস্ময় হয়েছে।
শুদ্ধ : কথা শুনে সে বিস্মিত হয়েছে।
ভুল : তোমাকে দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে।
শুদ্ধ : তোমাকে দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

❖ **লিঙ্গ-সংগতিজনিত :** বাংলা সাধু ভাষায় এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন সুন্দরী বালিকা, বীরাঙ্গনা নারী। এ রকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। যেমন-

ভুল : বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
শুদ্ধ : বর্তমানে বিদুষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।
ভুল : রাজা পাপিষ্ঠ রানিকে শাস্তি দিলেন।
শুদ্ধ : রাজা পাপিষ্ঠা রানিকে শাস্তি দিলেন।
ভুল : সেই সাধক নারীর কথা কে না জানে।
শুদ্ধ : সেই সাধিকা নারীর কথা কে না জানে।
ভুল : কিশোর বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।
শুদ্ধ : কিশোরী বালিকা কাতর অভিমানে ভেঙে পড়ল।
ভুল : পরপর দুবার লটারি জিতেছেন এই ভাগ্যবান মহিলা।
শুদ্ধ : পরপর দুবার লটারি জিতেছেন এই ভাগ্যবতী মহিলা।
ভুল : বেগম খায়রুন্নেসা এই বাড়ীর কর্তা।
শুদ্ধ : বেগম খায়রুন্নেসা এই বাড়ীর কর্ত্রী।
ভুল : এই মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
শুদ্ধ : এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
ভুল : ওর মতো বুদ্ধিমান বালিকা এ পাড়ায় নেই।
শুদ্ধ : ওর মতো বুদ্ধিমতী বালিকা এ পাড়ায় নেই।
ভুল : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিয়ে।
শুদ্ধ : আজ সরকার বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিয়ে।
ভুল : মমতাজ পরম সুন্দরী ছিলেন।
শুদ্ধ : মমতাজ পরমা সুন্দরী ছিলেন।

©Nazmus Sadat
CamScanner

❖ **যথাযথ শব্দ প্রয়োগজনিত ভুল :** শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় এ ধরনের ভুল হয়। যেমন: অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা)। বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ; সস্ত্রী (স্ত্রীসহ) বোঝাতে স্বস্ত্রীক (নিজের স্ত্রী) শব্দের প্রয়োগ। এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ-

ভুল : তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন।
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় থাকেন (স্ত্রীসহ)।
ভুল : আসামির অনুপস্থিতে বিচার চলছে।
শুদ্ধ : আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার চলছে।
ভুল : অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।
শুদ্ধ : অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার/অনিবার্য।
ভুল : অসুস্থবশত সে কলেজে আসতে পারে নি।
শুদ্ধ : অসুস্থতাবশত সে কলেজে আসতে পারেনি।
ভুল : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।
শুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
ভুল : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
ভুল : তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।
শুদ্ধ : তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
ভুল : কৃপুরুষের মতো কথা বলো না।
শুদ্ধ : কাপুরুষের মতো কথা বলো না।
ভুল : আমার সাবকাশ নাই।
শুদ্ধ : আমার অবকাশ নেই।
ভুল : ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
ভুল : আগত শনিবারে তাহারা যাইবে।
শুদ্ধ : আগামী শনিবারে তাহারা যাইবে।
ভুল : আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
শুদ্ধ : আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
ভুল : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।
শুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান (বা ঘূর্ণমান)।
ভুল : ডালিম ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো।
শুদ্ধ : ডালিম ফুলের রক্তিমা চোখে পড়ার মতো।
ভুল : শিক্ষকগণ চাইছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকরণ করতে।

CamScanner

শুদ্ধ : শিক্ষকগণ চাইছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয়করণ (বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) করতে।
ভুল : এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা।
শুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
ভুল : এত পরিশ্রম আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।
শুদ্ধ : এত পরিশ্রম আমার সাধ্য নয়।

❖ **সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত অপপ্রয়োগ :** বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলা হয়। এ দোষে আক্রান্ত বাক্যকে অশুদ্ধ বলেই ধরা হয়। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে মনে করা হলেও চারটি ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষায় পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-

১. সর্বনাম পদে : সাধু ভাষায় এ পদের পূর্ণরূপ ও চলিত ভাষায় সংক্ষিত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- তাহার>তার।

২. ক্রিয়াপদে : সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণ এবং চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হবে। যেমন- করিতেছি>করছি, করিয়া>করে ।

৩. শব্দ নির্বাচনে : সাধু ভাষায় সাধারণত তৎসম শব্দের আধিক্য থাকে এবং চলিত ভাষায় অ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের ব্যবহার থাকে। যেমন- হস্ত>হাত, চন্দ>চাঁদ, স্বর্ণ>সোনা।

সাধু : হস্তে স্বর্ণবালা শোভা পাইতেছে।
চলিত : হাতে সোনার চুড়ি শোভা পাচ্ছে।

৪. বানানে : সাধু ভাষায় পুরাতন বানান প্রযুক্ত হয় কিন্তু চলিত ভাষায় আধুনিক পরিমার্জিত বানানের নিয়ম ব্যবহৃত হয়। যেমন- বাঙ্গালী>বাঙালি, শ্রেণী>শ্রেণি।

বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা দিলে যেকোনো একটি রীতিতে তা রপান্তর করে নিতে হয়। যেমন-

মিশ্রিত : নাসিরুলের চিঠি দেখে মা অবাক হইলেন।
সাধু : নাসিরুলের চিঠি দেখিয়া মা অবাক হইলেন।
চলিত : নাসিরুলের চিঠি দেখে মা অবাক হলেন।
মিশ্রিত : তাহারা যেন সবাই ভুল করবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।
সাধু : তাহারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।
চলিত: তারা যেন সকলে ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
মিশ্রিত : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
সাধু : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
চলিত : কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করতে চাইলেন না।
মিশ্রিত : তাকে কলেজে যাইতে হবে।
সাধু : তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে।

CamScanner

চলিত: তাকে কলেজে যেতে হবে।
মিশ্রিত : নিলয় নিশীথে নিশির সহিত দেখা করতে গেল ।
সাধু : নিলয় নিশীথে নিশির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল ।
চলিত : নিলয় নিশীথে নিশির সাথে দেখা করতে গিয়েছিল।

❖ **বাক্যে পদবিন্যাসজনিত অপপ্রয়োগ :** বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে-

✓ **বিশেষ্য/বিশেষণ প্রয়োগজনিত :** বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদকে বিশেষণ কিংবা বিশেষণ পদকে বিশেষ্য ভেবে পদ পরিবর্তন করে এ ধরনের ভুল করা হয়। যেমন : আবশ্যক শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে ঈয় প্রত্যয় যোগ করে আবশ্যকীয় শব্দের ব্যবহার যথাযথ নয়। এ সংক্রান্ত কিছু উদাহরণ-

ভুল : অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
ভুল : ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।
ভুল : সদাসর্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনা।
শুদ্ধ : সর্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।
ভুল : দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।
শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।
ভুল : তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করছেন।
শুদ্ধ : তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ (বা উদ্ধত) আচরণ করছেন।
ভুল : রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা।
শুদ্ধ : রাঙামাটি পার্বত্য (বা পর্বতীয়) এলাকা।
ভুল : নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?
শুদ্ধ : নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
ভুল : নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী।
শুদ্ধ : নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।
ভুল : আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধ : আমাদের দেশ উন্নতিশীল (বা উন্নয়নশীল) দেশ।
ভুল : সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
লক্ষণীয়: সমৃদ্ধ অর্থ সম্পদশালী। এর সঙ্গে পুনরায় বিশেষণ শব্দ 'শালী' যোগ করার প্রয়োজন পড়ে না।

ভুল : সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কথিতব্য নয়।
শুদ্ধ : সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কহতব্য নয়।
ভুল : পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দিহান।
শুদ্ধ : পুলিশ অপরাধী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।
ভুল : যৌথবদ্ধ হস্তীদল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।
শুদ্ধ : যুথবদ্ধ হস্তীদল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে।
ভুল : সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিমান) পরিবারে তার জন্ম।
ভুল : পরিবারটি আমাদের এলাকার সম্ভ্রান্তশালী পরিবার।
শুদ্ধ : এ পরিবারটি আমাদের এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবার।

✓ **যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত :** এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন, 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে ঈয় প্রত্যয় যোগ করে 'আবশ্যকীয়' শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন, 'নিশ্চয়' বিশেষ্য। একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হবে 'নিশ্চিত'। যেমন-
ভুল : সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
শুদ্ধ : সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।
ভুল : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

বিশেষণ দ্বিত্বজনিত কিছু অপপ্রয়োগ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ
আকুলিত	আকুল
একত্রিত	একত্র
সচেষ্টিত	চেষ্টিত/সচেষ্ট
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
সলজ্জিত	লজ্জিত
সক্ষম	ক্ষম
সশঙ্কিত	সশঙ্ক
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
সকরুণ	করুণ
নিঃশেষিত	নিঃশেষ

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ
মুখরিত	মুখর
সকম্পিত	কম্পিত
সশঙ্কিত	শঙ্কিত
সানন্দিত	সানন্দ
উৎফুল্লিত	উৎফুল্ল
প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল
রুশীয়	রুশ
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে
সচিত্রিত	চিত্রিত/সচিত্র

CamScanner

✓ **সর্বনাম প্রয়োগজনিত :** বাক্যে সর্বনামের অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার, যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কারণ, কখনো কখনো সর্বনামের বদলের ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে। যেমন -

ভুল : তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।।

শুদ্ধ : তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

✓ **ক্রিয়া পদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগজনিত :** যথাযথ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না। যেমন-

ভুল : এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা যাচ্ছে।

শুদ্ধ : এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে।

ভুল : তিনি সভায় অনুপস্থিত ছিল।

শুদ্ধ : তিনি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

❖ **বানানের অশুদ্ধি :** বানানজনিত কারণে বাক্যে অপপ্রয়োগ হয়। বানানের সঠিক নিয়ম জানা না থাকলে বানান ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার। এ ছাড়াও শুদ্ধ বানানের জন্য ব্যাকরণ-জ্ঞান অপরিহার্য। নিম্নে কিছু বানানের নিয়ম আলোকপাত করা হলো-

✓ **দু/দূ-এর ব্যবহার :** নেতিবাচক বা খারাপ অর্থ প্রদান করলে দ-এর সাথে উ-কার (ু) হয়। যেমন : দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্দশা, দুঃখ, দুর্বল, দুরন্ত, দুর্দিন ইত্যাদি।

অপরদিকে ব্যবধান অর্থ বুঝালে দ-এর সাথে ঊ-কার (ূ) হয়। যেমন : দূরদুরান্ত, দূরদেশ, দূরবর্তী, দূরালাপনী, দূরদর্শন, দূরীভূত, দূরভাষ, দূরবীক্ষা, দূরশ্রুত, দূরদর্শী ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : দূষণ, দূষিত, দূষণীয়- শব্দগুলো নেতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও (ূ) কার।

✓ **কি/কী-এর ব্যবহার :** যেসব প্রশ্নের জবাব 'হ্যাঁ' বা 'না' দ্বারা দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে 'কি' ব্যবহৃত হয়। যেমন: সে কি আমাকে চেনে? করিম কি কলেজে গিয়েছিল?

যেসব প্রশ্নের জবাব 'হ্যাঁ' বা 'না' দ্বারা দেওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে 'কী' ব্যবহৃত হয়। যেমন : তোমার নাম কী?

✓ **স্ত/স্থ-এর ব্যবহার :** যেসব শব্দের শেষে 'স্থ' আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে শব্দ থেকে 'স্থ' বাদ দেওয়ার পরও শব্দটি অর্থবোধক থাকে। যেমন : অন্তস্থ, অভ্যন্তরস্থ, কণ্ঠস্থ, গর্ভস্থ, গৃহস্থ, দ্বারস্থ, ধাতস্থ, নিকটস্থ, মনস্থ, মুখস্থ, যন্ত্রস্থ, সভাস্থ, সমাধিস্থ ইত্যাদি।

যেসব শব্দের শেষে 'স্ত' আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে শব্দ থেকে 'স্ত' বাদ দেওয়ার পর শব্দটি অর্থবোধক থাকে না। যেমন : অস্ত, অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, গ্রস্ত, নিরস্ত, পরাস্ত, প্রশস্ত, বিধ্বস্ত, বিন্যস্ত, বিপর্যস্ত, বিশ্বস্ত, সমস্ত।

✓ **ব্য/ব্যা-এর ব্যবহার** : যে শব্দকে ভাঙলে দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে অ-কার পাওয়া যায় সেসব শব্দে শুধু 'ব্য' হবে। যেমন : বি+অগ্র=ব্যগ্র, বি+অবিচার=ব্যভিচার

আর যে শব্দকে ভাঙলে দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে আ-কার পাওয়া যায় সেসব শব্দে শুধু 'ব্যা' হবে। যেমন : বি+আকুল=ব্যাকুল, বি+আপক=ব্যাপক।

✓ **পরা/পড়া-এর ব্যবহার** : কেবল পরিধান করা অর্থে 'পরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন- আমি শার্ট পরেছি, তিনি চশমা পরেছেন ইত্যাদি।

বাকি সব ক্ষেত্রে 'পড়া' হয়। যেমন- আমি উপন্যাস পড়ি, বাইরে বৃষ্টি পড়ে, সে গাছ থেকে পড়েছে ইত্যাদি।

✓ **ভূত-এর ব্যবহার** : সব ভূত বানান ঊ (ূ) কার দিয়ে হয়। যেমন : অঙ্গীভূত, পরাভূত, বশীভূত, ভস্মীভূত, পুঞ্জীভূত, কেন্দ্রীভূত, দ্রবীভূত, আভির্ভূত, বিস্তৃত ইত্যাদি।

কিন্তু একমাত্র অদ্ভুত শব্দের ভূতে উ-কার (ু) হয়।

✓ **জীবি/জীবী-এর ব্যবহার** : কেবল জীবিকা শব্দের বানানে ব-এ হ্রস্ব ই-কার (ি) 'বি' হয়। বাকী সবজীবী-তে দুটোই দীর্ঘ ই-কার হয়। যেমন : আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, চাকুরিজীবী ইত্যাদি।

✓ **পরিষদ/সভা -এর ব্যবহার** : শব্দ দুটো 'মন্ত্রী' শব্দের শেষে যোগ হলে 'মন্ত্রী' বানান আর 'ঈ' কার থাকে না। যেমন : মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা।

✓ **য-ফলা (্য) এবং রেফ (র্) সম্পর্কিত** : বিশেষ্যের ক্ষেত্রে য-ফলা (্য) ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ-এর ক্ষেত্রে র-ফলা (্র) বা রেফ (র্) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এ শব্দকে বিশেষ্যে পরিণত করতে হলে য-ফলা (্য) দরকার পড়বে। যেমন- অশুদ্ধ : দারিদ্রতা, শুদ্ধ : দারিদ্র্য।

✓ **নয় তো/নয়তো-এর ব্যবহার** : 'নয় তো' মানে নয়। আর 'নয়তো' বোঝাচ্ছে বিকল্পপথ। যেমন- আজ নয়, তো কাল যাব? তোমার মন চাইলে তুমি যেও, নয়তো যেও না। একইভাবে 'হয় তো' হচ্ছে হাঁ-সূচক, আর হয়তো হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

CamScanner

অসংগতিপূর্ণ শব্দ

- তারা শব পোড়াতে গেল।
তারা শবদাহ করতে গেল।
- তিনি আরোগ্য হয়েছেন।
তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
- আগত শনিবারে তারা যাবে।
আগামী শনিবারে তারা যাবে।
- তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
তার বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।
- এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
এ দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প শুরু হলো।
- মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।
নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
- সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে।
সে সঙ্কটে পড়েছে।
- চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ দুটি বিস্ময়কর ঘটনা।
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ দুটি বিস্ময়কর ঘটনা।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ

১. নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করুন। *[৪৪তম বিসিএস]*

- কেউকেটা (তুচ্ছ, নিন্দার্থে গণ্যমান্য) : তার মতো কেউকাটা লোককে এতো গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই।

ঘরের শত্রু বিভীষণ (অভ্যন্তরীণ শত্রু) : আত্মীয় স্বজনরাই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষে কাজ করেছে। একেই বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ।

গো-মূর্খ (জড় বুদ্ধি) : ছেলেটা একেবারে গো-মূর্খ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) : আমি বুঝে-শুনে চলতে চাই, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে চাই না। *[১৫তম বিসিএস]*

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উভয় সংকট) : বাড়িতে বিবাদ, অফিসেও কাজের চাপ, আমার যেন জলে কুমির ডাঙায় বাঘ এর মতো অবস্থা।

সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক) : সবার সামনেই ঘটনা ঘটল, কিন্তু সবাই সাক্ষী গোপালের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

২. নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন করুন। *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

আটকপালে (হতভাগ্য) : উচ্চ শিক্ষিত হয়েও বেকার, এমন আটকপালে লোক আর দেখিনি।

এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ সব সময় থাকে না) : এ বিপদে আমাকে একা রেখে চলে যেও না, মনে রেখ এক মাঘে শীত যায় না।

কুল কাঠের আগুন (তীব্র মনোকষ্ট) : বাবা মারা যাওয়ার পর সে কুল কাঠের আগুনে জ্বলছে।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা) : আঠারো মাসে বছর যার, কোন কাজই শেষ হয় না তার। *[২৫তম বিসিএস]*

অজগরবৃত্তি (আলসেমি) : অজগরবৃত্তি নিজের, পরিবারের, এমনকি সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে।

নয়-ছয় (অপচয় করা) : করিম এক লক্ষ টাকা নয়-ছয় করে শেষ করল।

৩. বাগধারাগুলোর অর্থ উল্লেখ করে বাক্যে প্রয়োগ দেখান: *[৪৩তম বিসিএস]*

অষ্টরম্ভা (কিছুই না/ফাঁকি) : নেতারা জনগণকে প্রলুব্ধ করার জন্য কত কিছুই তো বলে কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) : রফিক সাহেব ইঁদুর কপালে মানুষ, সারাজীবন তার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই গেল।

কচ্ছপের কামড় (নাছোড়বান্দা/যা সহজে ছাড়ে না) : আজাদ করোনায় ব্যবসায় ক্ষতি পোষানোর জন্য কচ্ছপের কামড়ের মতো লেগে আছে।

তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড ব্যক্তি) : লোকটি কেবল সাধুর ছদ্মবেশ ধরেছে, আসলে তুলসী বনের বাঘ।

গয়ংগচ্ছ (ঢিলেমি) : কোম্পানীর চাকুরীতে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। তোমার মতো গয়ংগচ্ছ লোকের পক্ষে এ চাকুরী করা সম্ভব না।

নাটের গুরু (অপকর্মের মূল হোতা) : আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সন্ত্রাসীদের নাটের গুরুকে খুঁজছেন।

৪. নিম্নোক্ত প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লিখুন: *[৪৩তম বিসিএস (কারিগরি/পেশাগত)]*

মাছের মার পুত্রশোক : (কারো অনিষ্ট করে সান্ত্বনা দেওয়া)

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল : (প্রাপ্তির আগেই ভোগের আয়োজন)

নাই কাজ তো খই ভাজ : (প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় কাজে শক্তি নাশ করা)

আপনা মাংসে হরিণা বৈরী : (হরিণের নিজের মাংসই তার জন্য শত্রু)

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট : (অনেকে এক কাজে যুক্ত হলে বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং কাজ পণ্ড হয়)

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে: (অভিজ্ঞ লোক প্রকৃত লক্ষণ বুঝতে পারে)

CamScanner

৫. নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন করুন: *[৪১ তম বিসিএস]*

• জড়ভরত (জড়বুদ্ধি বা অকর্মণ্য ব্যক্তি) : এতো দেখছি একেবারে জড়ভরত, একে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

- হাড়হদ্দ (নাড়ী নক্ষত্র/সবকিছু) : তোমার হাড়হদ্দ সবই আমার জানা আছে। সুতরাং আমার সাথে লাগতে আসবে না।

- ডাকাবুকো (দুরন্ত/নির্ভীক) : এমন ডাকাবুকো ছেলে না হলে এ কাজ সামাধা হতো না।

- সাত ঘাটের কানাকড়ি (অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ) : আমরা গরীব মানুষ সাত ঘাটের কানাকড়ি যা যোগাড় করতে পেরেছি তাই সম্বল।

- উনা ভাতে দুনা বল (অল্প আহারে অধিক শক্তি) : স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ নিশ্চয়ই জানে উনা ভাতে দুনা বল।

- বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় (আসল লোকের চেয়ে তার অনুচরের তেজ বেশি) : অফিসের বসের চেয়ে কেরানীর দাপট বেশি। এতো দেখি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

৬. নিচের প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: *[৪০তম বিসিএস]*

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) : তোমাকে বললাম একজন দক্ষ লোক এনে দাও, আর তুমি এনে দিলে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি। *[২৭তম, ২৪তম, ১৮তম, ১৫তম]*

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (অপরাধ গোপন করা) : তোমার আয়ের উৎস সবাই জানে, শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই।

- তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) : তামার বিষে ওরা বিবেকহীন হয়ে পড়েছে।

- মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ) : মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে লাভ নেই। আমি জানি তুমি মিছরির ছুরি। *[১০ম বিসিএস]*

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় (মন্দ লোকের ভীড়ে ভালো লোক পাওয়া কঠিন): দায়িত্বটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কাকে দেই; ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হবে।

- ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ) : ছেলেটি একেবারে ননীর পুতুল, একটু পরিশ্রমেই হাঁফিয়ে ওঠে।

৭. নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন: *[৩৮তম বিসিএস]*

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) : সড়ক দুর্ঘটনায় রকিব সাহেব গতকাল অক্কা পেয়েছেন।

তালপাতার সেপাই (অতি দুর্বল ও কৃশকায়) : তোমার মতো তালপাতার সেপাইকে দিয়ে ভারী কাজ হবে না।

CamScanner

চাঁদের হাট (সুখের সংসার) : শুধু টাকা থাকলেই পরিবারে চাঁদের হাট হয় না, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়। *[১৩তম বিসিএস]*

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) : এ পৃথিবীটা তাসের ঘর, কী হবে এত বড়াই করে?

সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক) : সবার সামনেই ঘটনাটা ঘটল, কিন্তু সবাই সাক্ষী গোপালের হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৮. নিচের প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: *[৩৭তম বিসিএস]*

হরিষে বিষাদ (আনন্দের মাঝে নিরানন্দ) : বিয়ের দিন সড়ক দুর্ঘটনায় তার পা ভেঙে গেল; এ যেন হরিষে বিষাদ।

সুলুক-সন্ধান (খোঁজখবর) : ব্যবসার সুলুক-সন্ধান সে ভালোই রাখে।

মন না মতি (মানবচিত্তের অস্থিরতা) : মনের বদল তো হতেই পারে, কথায় বলে না মন না মতি।

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (বাঁচা-মরার উপায়) : শিক্ষাই মানব জীবনের সোনার কাঠি রূপোর কাঠি।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে (অন্যের যন্ত্রনা দেখে আনন্দ করা, পরে নিজে ঐ যন্ত্রনা ভোগ) : ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসো না, শেষে তোমারও এমন দিন আসবে।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া (আকস্মিক সৌভাগ্য লাভ) : বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া আর লটারিতে টাকা পাওয়া সমান কথা।

৯. নিচের প্রবাদ-প্রবচনের অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: *[৩৬তম বিসিএস]*

উড়নচন্ডী (উচ্ছৃঙ্খল) : তোমার মতো উড়নচন্ডীর কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

খন্ড প্রলয় (তুমুল কাণ্ড) : সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমাদের মধ্যে খন্ড প্রলয় হয়ে গেল।

আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া (প্রকৃত প্রয়োজন না মিটিয়ে অজায়গায় আড়ম্বর) : নিজের ঘর না সামলিয়ে পরের ব্যাপার নিয়ে ভাবছো; আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া।

যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে (যোগ্য ছাড়া কাজ হয় না, হট্টগোল হয়) : তুমি হলে ডাক্তার, বিল্ডিং নির্মাণের কি বুঝবে? জানো না যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।

একাদশে বৃহস্পতি (সুসময়) : তুমি ভালো রেজাল্ট করেছো, তোমার বাবার পদোন্নতি হয়েছে, তোমার তো এখন একাদশে বৃহস্পতি। *[১৩তম বিসিএস]*

আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড় (যোগ্য হয়ে কাজে হাত দেওয়া) : সফলতা এমনিতে আসে না, আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়ে কাজে হাত দিলে সফল হওয়া যায়।

CamScanner

১০. প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লিখুন: *[৩৫তম বিসিএস]*

- হরি ঘোষের গোয়াল : (বহু বেকার লোকের আড্ডা)

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে : (অন্যের যন্ত্রনা দেখে আনন্দ করা, পরে নিজে ঐ যন্ত্রণা ভোগ)

- চিত্রগুপ্তের খাতা : (কপালের ভবিষৎ ফলাফলের নির্ভুল হিসাব)
- ওঝার ব্যাটা বনগরু : (পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র)
- শিখণ্ডী খাড়া করা : (কাউকে আড়াল করে অন্যায় কাজ করা)
- থোর বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোর : (একঘেয়েমির চূড়ান্ত)

১১. বাগধারা ব্যবহার করে বাক্য রচনা করুন: *[৩৪তম বিসিএস]*

- টনক নড়া (সচেতন হওয়া) : পরীক্ষায় ফেল করে রফিকের এবার টনক নড়লো। *[১৭তম বিসিএস]*
- ডামাডোল (গোলযোগ) : যুদ্ধের ডামাডোলে লাখো পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। *[১৭তম বিসিএস]*
- কাষ্ঠ হাসি (কপট হাসি) : চোর কাষ্ঠ হাসি দিয়ে পুলিশকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানালো। *[১৭তম বিসিএস]*

গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল): গোড়াতেই গলদ করে বসে থাকলে, অঙ্ক মিলবে কি করে? *[১৫তম বিসিএস]*

লেফাফা দুরস্ত (বাইরে ফিটফাট) : বাইরে লেফাফা দুরস্ত দেখালে কী হবে, আসলে সে একটা গণ্ডমূর্খ।

- লেজে গোবরে (বিশৃঙ্খলা করা) : করিমকে কোন কাজ দিলে নিশ্চিত লেজে গোবরে করে ফেলবে। *[১৮তম বিসিএস]*

১২. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২৭তম বিসিএস]*

- অকালবোধন (অসময়ে জাগরণ) : শীতের সময় আমের ফলন- এতো অকালবোধন।

ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) : হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।

- পাথরে পাঁচকিল (উন্নত অবস্থা) : এম.এ শেষ করার আগেই ছেলের চাকরি হওয়ায় বাবা মার পাথরে পাঁচকিল অবস্থা।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন) : পরীক্ষা দেওয়ার আগেই ফলাফলের চিন্তা- এ যে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

চশমখোর (চক্ষুলজ্জাহীন) : বিপদের সময় চশমখোরের মতো পালিয়ে যাওয়া মানুষ কখনও প্রকৃত বন্ধু হয় না।

©Nazmus Sadat CamScanner

হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তিবোধ করা) : ছেলে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ায় পিতামাতার হাড়ে বাতাস লেগেছে।

রগচটা (অত্যন্ত বদ মেজাজি) : আমাদের মধ্যে রহিম রগচটা স্বভাবের লোক।

সোনার পাথরবাটি (অসম্ভব বস্তু) : পড়ালেখা না করে ভালো ফলাফলের আশা-তো সোনার পাথর বাটি।

ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধা (বৃথা চেষ্টা) : করিমকে দিয়ে এ কাজ হবে না, ছেঁড়া চুলে খোঁপা বেঁধে লাভ নেই।

১৩. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২৫তম বিসিএস]*

কালনেমির লঙ্কাভাগ (লাভের আগেই ভোগের চিন্তা) : চাকুরিতে যোগদান না করেই বেতন দিয়ে কী করবে সেই চিন্তা, এ যে দেখি কালনেমির লঙ্কাভাগ।

ঘর-জাত করা (ঘরে মজুত করা) : বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই কৃষকরা ফসল ঘর জাত করতে পেরেছে।

ঘাট মানা (দোষ স্বীকার করা) : বিচারে সবার সামনে ঘাট না মেনে তার উপায় ছিল না।

চড় মেরে গড় (অপমানের পর সম্মান প্রদর্শন) : বাজারে সবার সামনে অপমান করে বাসায় উপহার নিয়ে চড় মেরে গড় করতে এসেছো?

শিয়ালের ডাক (অশুভ লক্ষণ) : নিজের উপর সব সময় বিশ্বাস রাখবে। শিয়ালের ডাকে কখনও বিচলিত হবে না।

হাড়-হদ্দ (নাড়ী নক্ষত্র) : তোমার হাড়-হদ্দ আর কেউ না জানুক আমার জানা আছে।

অতি আশা বাঘের বাসা (অতিরিক্ত আশায় বিপদ) : অল্প সময়ে অধিক মুনাফার আশায় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে এখন পথের ফকির, জানা উচিত ছিলো অতি আশা বাঘের বাসা।

পেট গরম (খাবারে অরুচি হওয়া) : অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড খেলে মাঝে মধ্যে পেট গরম হয়।

ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল (অতিরিক্ত, মূল্যহীন) : সে নিজেই তো পরিবারে ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল, সে আবার তোমার জন্য কি করবে?

১৪. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২৪তম বিসিএস]*

কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি) : আগে কড়ায় গণ্ডায় আমার পাওনা বুঝিয়ে দাও, তারপর তোমার অন্য কথা। *[১৫তম বিসিএস]*

আড়িপাতা (গোপনে শোনা) : ফোনে আড়ি পেতে কথা শোনা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বটে।

কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসার) : এই কাঠের পুতুলকে দিয়ে কিছু হবে না, ব্যবসা চালাতে হলে চটপটে বুদ্ধিমান লোক দরকার। *[২১তম বিসিএস]*

CamScanner

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) : যা উড়নচণ্ডী ছেলে- পৈতৃক সম্পত্তি দু দিনেই শেষ করে দেবে।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) : তার পিছনে ঘুরে টাকা পাওয়ার আশা গুড়ে বালি ছাড়া কিছুই নয়। *[২১তম বিসিএস]*

ইতর বিশেষ (পার্থক্য) : পিতামাতার নিকট ছেলে মেয়ে উভয়ই সমান, এদের মধ্যে ইতর বিশেষ নেই।

জিলাপির প্যাঁচ (কুটিলতা) : ওর কথা বিশ্বাস করো না, বাইরে ওকে ভালো মানুষের মতো দেখালেও ভিতরে জিলাপির প্যাঁচ। *[১৭তম, ১০ম বিসিএস]*

১৫. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২৩তম বিসিএস]*

অন্ধের নড়ি (একমাত্র অবলম্বন) : শেষ পর্যন্ত বিধবার অন্ধের নড়ি ছেলেটাও সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল।

অরণ্যে রোদন (বৃথা ক্রন্দন) : হার কিপটে জামাল সাহেবের কাছে সাহায্য চাওয়া অরণ্যে রোদন। *[২০তম বিসিএস]*

আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনি) : তুমি খালি হাতে বাঘ মেরেছো- এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

এলাহী কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) : আজমল সাহেব মেয়ের বিয়েতে এলাহি কাণ্ড করেছেন।

ভেজা বিড়াল (কপটচারী) : তোমার ভেজা বিড়ালের মুখে ধর্মের কথা মানায় না।

মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ) : একি মগের মুল্লুক পেয়েছো, যা খুশি তাই করবে। *[১৭তম বিসিএস]*

মণিহারা ফণী (প্রিয় বস্তু হারানো অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি) : দুর্ঘটনায় সবকিছু হারিয়ে রফিক সাহেব মণিহারা ফণী হয়ে গিয়েছেন।

শাপে বর (অকল্যাণে কল্যাণ) : রাতের গাড়ি ফেল করে শাপে বর হয়েছে, কারণ কিছুদূর গিয়েই গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়েছে।

সবেধন নীলমণি (শেষ সম্বল) : বৃদ্ধার সবেধন নীলমণি বাড়িটাও নদী ভাঙণের কবলে পরল।

১৬. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২২তম বিসিএস]*

কানাকড়ির সম্পর্ক (তুচ্ছ সম্পর্ক) : পরস্পর আত্মীয় হলেও দুই পরিবারের মধ্যে বর্তমানে কানাকড়ির সম্পর্কও নেই।

চোখের চামড়া (লজ্জা) : আমাদের চোখের চামড়া না থাকায় দিন দিন দুর্নীতির পরিমাণ বাড়ছে।

পায়াভারী (অহংকার) : ছেলে আমেরিকা চলে যাওয়ায় তোমার তো দেখি পায়াভারী হয়ে গেছে। *[১৭তম বিসিএস]*

CamScanner

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার) : যে বারো বছর জেল খেটেছে, সে পাবে জেলের ভয়, ব্যাঙের আবার সর্দি?

ষোল আনা (সম্পূর্ণ) : মানুষের ইচ্ছা ষোল আনা কখনও পুরণ হয় না।

কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) : লোকটি ভয়ানক কান পাতলা, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে। *[১৮তম, ১০ম বিসিএস]*

ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) : হাতে টাকা নেই আবার দালান বানানোর পরিকল্পনা, এ যে গরীবের ঘোড়া রোগ। *[১৭তম বিসিএস]*

তালকানা (কাণ্ডজ্ঞানহীন) : এমন তালকানা ছেলেকে জীবনে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হবে।

১৭. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২১তম বিসিএস]*

অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) : অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটা প্রতিবছর ফেল করে, তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) : যোগ্য লোকের অভাবে তোমার ব্যবসার শিরে সংক্রান্তি দেখে আমার ভয় হচ্ছে। *[১৩তম বিসিএস]*

আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরের বখাটে ছেলে) : পরিশ্রম করতে পারে না এমন আলালের ঘরের দুলালের হাতে আমার ব্যবসার কাজকর্ম ছেড়ে দিতে পারি না। *[১৫তম বিসিএস]*

ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) : আজকাল ছোট ছেলেমেয়েরা ইউটিউব দেখে ইঁচড়ে পাকা হয়ে যাচ্ছে।

কপাল ফেরা (সুদিন আসা) : ছেলেটা বিদেশ যাওয়ায় এতদিনে তার কপাল ফিরেছে।

রাবণের চিতা (চির অশান্তি) : একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে। *[১১তম বিসিএস]*

গোবর গণেশ (মূর্খ) : ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) : আজকাল তোমাকে দেখাই যায় না, চাকরি পেয়ে কি অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে?

১৮. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন: *[২০তম বিসিএস]*

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) : আকাশকুসুম চিন্তা করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, বাস্তবে ফিরে এস। *[১৭তম বিসিএস]*

আক্কেল সেলামী (বোকামির জন্য দণ্ড) : বিনা টিকেটে যারা রেল ভ্রমণ করে তাদেরকে মাঝে মধ্যে আক্কেল সেলামী দিতে হয়।

CamScanner

খয়ের খাঁ (তোষামোদকারী) : তুমি তো সরকারের খয়ের খাঁ, আর যাই হোক তোমাকে দিয়ে আন্দোলন হবে না।

দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) : মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে তোমার যে দহরম মহরম সম্পর্ক তুমি সহজেই কাজটা বাগিয়ে নিতে পারবে।

কই মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) : কী কই মাছের প্রাণরে বাবা- এত মার খেয়েও চোরটা দিব্বি হেঁটে যাচ্ছে।

রাঘব বোয়াল (প্রভাবশালী ব্যক্তি) : পুলিশ চুনোপুঁটি ধরতে ওস্তাদ, রাঘব বোয়ালদের দেখলেও ধরে না।

কান কাটা (বেহায়া) : তার মতো কানকাটা লোক এমন মিষ্টি গালিতে অপমান বোধ করে না।

১৯. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন: *[১৮তম বিসিএস]*

রাখঢাক (গোপন রাখা) : আদালতে রাখঢাক না করে যা হয়েছে সবকিছু স্পষ্ট করে বলবে।

গা ছাড়া ভাব (গুরুত্ব না দেয়া) : তোমার সবকিছুতেই যেন একটা গা ছাড়া ভাব, কোন বিষয়ই গুরুত্ব সহকারে দেখো না।

ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) : এক সময় ঘাটের মড়ার সাথে কিশোরী মেয়ের বিয়ে হতো বলে সমাজে বিধবার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

পেট পাতলা (গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে না যে) : তার মতো পেট পাতলা লোকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে বিপদে পরার সম্ভাবনা বেশি।

২০. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন: *[১৭তম বিসিএস]*

অহিনকুল (চির শত্রুতা) : তারেক সাহের এবং সাদেক সাহেব পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন কিন্তু তাদের মধ্যে অহিনকুল-সম্বন্ধ।

২১. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন: *[১৫তম বিসিএস]*

উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অপাত্রে জ্ঞান দান) : চোরের কাছে ধর্মের কাহিনী বলা হল উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।

উভয় সংকট (দুই দিকে বিপদ) : সেখানে গেলেও বিপদ না গেলেও বিপদ। কী এক উভয় সংকটে পরলাম।

আদাজল খেয়ে লাগা (উঠে পরে লাগা) : সে তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি; তার ক্ষতি করার জন্য তুমি এভাবে আদাজল খেয়ে লেগেছ কেন?

২২. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন: *[১৩তম বিসিএস]*

ক-অক্ষর গোমাংস (বর্ণ পরিচয়হীন) : অনেক ধন-সম্পদ থাকলে কি হবে, সে একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস।

CamScanner

গণপিটুনি (প্রচণ্ড মার) : এলাকার কুখ্যাত চোর গণপিটুনিতে মারা গেল।

গোঁফ খেজুরে (অত্যন্ত অলস) : এসব গোঁফ খেজুরে লোক দিয়ে পরিশ্রমের কাজ হবে না।

পর্বতের মূষিক প্রসব (বৃহৎ আয়োজনের সামান্য ফল) : নগর উন্নয়ন নিয়ে এতো আলোচনার পর এই সামান্য প্রতিশ্রুতি মাত্র? এতো দেখছি পর্বতের মূষিক প্রসব।

বিদুরের খুদ (ভালবাসার সামান্য উপহার) : মহাশয় দয়া করে বিদুরের খুদ গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

২৩. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ বাক্য রচনা করুন: *[১১তম বিসিএস]*

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) : জীবনের কঠিন সময়ে দুধের মাছিদের পাওয়া যায় না।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (অপরিমিত অপব্যয়) : ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ কেবল অবৈধ টাকা দিয়েই সম্ভব।

গোকুলের ষাঁড় (স্বেচ্ছাচারী) : পাড়া মহল্লায় আজকাল বহু যুবককে গোকুলের ষাঁড়ের মতো ঘুরতে দেখা যায়।

পাকা ধানে মই (বিপুল ক্ষতি করা) : আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি আমার পাকা ধানে মই দিলে।

ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) : রকিব সাহেব ব্যাঙের আধুলি নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

মান্ধাতার আমল (পুরোনো আমল) : মান্ধাতার আমলের গল্প এখন দিয়ে লাভ নেই, বর্তমানে কি করছো বলো।

দূর্বা গজান (উৎখাত) : এলাকার নেতাদের সাথে সামান্য বিষয়ে মতবিরোধ হওয়াতে পরিবারটির ভিটায় দূর্বা গজাল।

সাপে নেউলে (ভীষণ শত্রুতা) : দুই ভাই বোনের মধ্যে সাপে নেউলে সম্পর্ক।

মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) : অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আজকাল প্রকৃত বিদ্যার্জন না করে ডিগ্রিধারী মাকাল ফলে পরিণত হচ্ছে। *[১০ম বিসিএস]*

২৪. যে কোন পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন: *[১০তম বিসিএস]*

মাছের মার কান্না (মমতাহীন কান্না) : সাধারণ জনগণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের দরদটা মাছের মার কান্নার মতোই।

কলির সন্ধ্যা (কষ্টের সূচনা) : এটুকু কষ্ট দেখেই ভীত হয়ে পড়েছ, কেবলতো কলির সন্ধ্যা।

লম্বা দেওয়া (পালিয়ে যাওয়া) : পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চোরটি লম্বা দিয়েছে।

সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) : যেমন বর তেমনি কনে, এ যেন সোনায় সোহাগা।

তীর্থের কাক (সাগ্রহে অপেক্ষাকারী) : শরণার্থীরা রিলিফের জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

তুলকালাম (সাংঘাতিক ঘটনা) : সামান্য ব্যাপারে কী তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটে গেল।

বি. দ্র. একই বাগধারা একাধিক পরীক্ষায় আসলেও একটি রাখা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ-প্রবচন

অনেকদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি যার মধ্যে সরলভাবে জীবনের কোন গভীরতর সত্য প্রকাশ পায় সেগুলোকে প্রবাদ বা প্রবচন বলে। বেশির ভাগ প্রবাদ-প্রবচনের জন্ম মানুষের মুখে মুখে। তাছাড়া কবি-সাহিত্যিক রচিত অনেক বাক্য প্রবচনে রূপ নিয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবাদ-প্রবচন :

অ

অজগরের দাতা রাম : (রিজিক সবার জন্য নির্ধারিত)
অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার : (লঘু ফলাফল যুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন)
অতি দর্পে হত লঙ্কা : (বেশি অহংকার করলে পতন ঘটে)
অতি দানে বলি পাতালে হল ঠাই: (সৎ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি অন্যের কৌশলে ভোগান্তির শিকার)
অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে পড়ে যাবে : (অহংকার করলে পতন অবশ্যম্ভাবী)
অতি মন্থনে বিষ উঠে : (কোন কিছু মাত্রাতিরিক্ত আলোড়নে ক্ষতি হয়)
অনভ্যাসের ফোটা কপাল চড়চড় করে : (হঠাৎ করে আসা সুখ অসহ্য লাগে)
অনাথের দৈব সখা : (ঈশ্বর দীনবন্ধু)
অন্ধকারে হাতড়ানো : (না বুঝে চেষ্টা করা)
অন্ধের হাতি দেখা : (অনুমানের উপর ভিত্তি করে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া)
অবোধের গোবধে আনন্দ : (বুদ্ধিহীন নিজের কৃতকর্মের গুরুত্ব বুঝে না)
অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা : (খালি কলস বাজে বেশি)
অর্চনের ধন চর্বণে যায় : (অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ অপব্যয়ে নষ্ট হয়)
অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপন মরণে : (ইচ্ছা করে বিপজ্জনক কাজে ধরলে অনিষ্ট অনিবার্য)
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ : (কোন কথা পরিষ্কার না বলে কিছু সত্য গোপন করা)
অসারের তর্জন গর্জন সার : (ক্ষমতাহীন ব্যক্তির গলাবাজিই সম্বল)

আ

আঁস্তাকুড়ের পাতা কখনও স্বর্গে যায় না : (নীচ ব্যক্তি কখনো উচ্চাসন লাভ করে না)
আট কুঠুরি নয় দরজা : (মানুষের শরীরের আটটি গ্রন্থির সাথে যুক্ত নয়টি দ্বার)

CamScanner

আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো : (অত্যন্ত প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি)
আপন কথাই পাঁচ কাহন : (কেবল নিজের প্রসঙ্গ ও প্রশংসা)
আপন কোটে পাই চিঁড়ে কুটে খাই :(নিজ সীমানার মধ্যে পেয়ে অন্যকে শায়েস্তা করা)
আরশির মুখে পড়শীকে দেখা : (সবাইকে নিজের মত মনে করা)

ই

ইঁদুর চেনে না ভাগবত পুঁথি : (সর্বস্ব অনিষ্টকারী)
ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে : (স্বভাব কিছুতেই বদল হয় না।)

উ

উড়ি ধানের মুড়ি/উড়কি ধানের মুড়কি : (অজ্ঞাত বস্তু)
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে : (একের দোষ অন্যের কাঁধে চাপানো)
উন বর্ষা দুনো শীত : (অল্প কাজে অধিক লাভ)
উনা ভাতে দুনা বল : (অল্পাহারে অধিক শক্তি)
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো : (অযোগ্য লোককে মূল্যবান জিনিস দেওয়া।)
উড়ো খই গোবিন্দায় নম : (না পেয়ে বাধ্য হয়ে দান করা।)

এ

এঁটোপাত না যায় স্বর্গে : (পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না)
এক কড়ার মুরোদ নেই, ভাত মারার গোঁসাই :(আয়ের ক্ষমতা নেই কিন্তু ব্যয় করে প্রচুর)
এক ক্ষুরে মাথা কামানো : (একই মতের অনুসারী)
এক পাঁঠা তিনবার কাটা : (আনাড়ির মতো কাজ করা)
এক রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর : (বিপদের উপর বিপদ)
একে মা মনসা, তাতে ধূপের ধোঁয়া : (যে যার প্রতি বিরূপ তার সামনে তাই করা)

ও

ওল বলে মান কচু তুমি বড়ো লাগো : (নিজের দোষ ঢেকে অন্যকে গালমন্দ করা)
ওঠ ছুড়ি তোর বিয়ে : (কোন প্রস্তুতি ছাড়াই বড় কাজে হাত দেওয়া)
ওঝার ঘাড়ে ভূত : (বিপদগ্রস্থ কাণ্ডারি)

ক

ক-অক্ষর গোমাংস : (বর্ণ পরিচয় হীন)
কচুর বেটা ঘেচু, বড় বাড়েন তো মান : (নীচু যতই বড় হোক নীচুই থাকে)
ক'টি ছেলে, না পুড়িয়ে খাব : (অসংগত উত্তর)
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে : (টাকায় সব সম্ভব হয়)
কদম গাছের কানাই : (লম্পট ব্যক্তি)
কনের ঘরের পিসি, বরের ঘরের মাসি : (উভয়কে লাগিয়ে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করা)
কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর : (ভাগ্যগুণে অযোগ্য লোকের বড় হওয়া)
কা কস্য পরিবেদনা : (কার কথা কে শুনে)

CamScanner

কাঙালের কথা বাসি হলেই ফলে : (নগণ্য লোকের কথা শেষ পর্যন্ত ফলে)
কাচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস : (সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়)
কাজীর গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই : (কোনরকমে হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া)
কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী : (স্বার্থ উদ্ধার করে পরে খোঁজ না নেওয়া)
কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধন : (বৃহৎ কাজে সামান্য ব্যক্তিও সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতে পারে)
কানা খোঁড়ার একগুণ বাড়া : (নির্গুণ লোকের অহঙ্কার বেশি)
কানা গরু বামনকে দান : (অকেজো জিনিষ দান করে পুণ্য লাভের প্রত্যাশা)
কানাগরুর ভিন্ন গোয়াল/পথ : (অজ্ঞান লোক নিরাপদ পথ থাকতে বিপথে যায়)
কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন : (যার যে গুণ নেই, সে গুণে তাকে অভিষিক্ত করা)
কানু ছাড়া গীত নাই : (যে সকল প্রসঙ্গেই একই কথার উত্থাপন করে)
কালনেমির লঙ্কা ভাগ : (কাজ শুরু হওয়ার আগেই ফল পাওয়ার আশা)
কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ : (টাকা দিলে বেশি মূল্যায়ণ পাওয়া যায়)
কাশীতে ভূমিকম্প : (অসম্ভব ব্যাপার)
কায়েতের ঘরের ঢেঁকি : (অপদার্থ লোক)
কিলিয়ে কাঠাল পাকানো : (জোর করে কাজের উপযোগী)
কুমড়ো কাটা বটঠাকুর : (অকর্মণ্য লোক)
কুঁড়ে গরুর আটুনি সার : (অকর্মণ্যর দ্বারা কিছু হয় না)
কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথে : (অলসরা তীর্থস্থানে ভিক্ষা করতে যায়)
কুম্ভকর্ণের ঘুম : (সাংঘাতিক ঘুম কাতুরে)
কুরুক্ষেত্র কাণ্ড : (তুমুল ঝগড়া)
কুল রাখি না শ্যাম রাখি : (উভয় সঙ্কট)
কুলায় শুইয়া তূলায় করিয়া দুধ খাওয়া : (কপট সারল্য প্রকাশ)

খ

খয়ের বন্ধনে পড়া : (কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে হতবুদ্ধি হওয়া)
খর দজ্জাল : (প্রচণ্ড অত্যাচারী এবং অনিষ্টকারী মানুষ)
খাস তালুকের প্রজা : (খুব অনুগত ব্যক্তি)
খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে : (শক্তিমানের সাহায্যে শক্তি বৃদ্ধি)
খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুব দিয়ে পার হওয়া : (পয়সা দিয়েও নিজে শ্রম করা)
খোদার মার দুনিয়ার বার : (বিধির বিধান ঘটবে যা কল্পনা করা যায় না)

গ

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা : (যার জিনিস তাকেই দান করা)
গঙ্গার দুকূল ভাঙ্গে না : (স্পষ্ট অর্থ)
গজকচ্ছপের লড়াই : (প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা)
গজ কপিত্থবৎ : (অন্তঃসার শূন্য অবস্থা)

গড্ডলিকা প্রবাহ : (অন্ধ অনুকরণ)
গন্ধমাদন বয়ে আনা :(কাউকে একটি জিনিস আনতে দিলে যদি একাধিক জিনিস টেনে আনে)
গাছে না উঠতেই এক কাঁদি : (কাজ শুরুর পূর্বেই ফল ভোগের প্রস্তুতি)
গাড়ুর দামে খাড়ু যাওয়া (অল্পের জন্য মূল্যবান জিনিস নষ্ট হওয়া)
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো : (দায়িত্ব এড়িয়ে ফুর্তি করা)
গায়ে ফোসকা পড়া : (যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা)
গো মড়কে মুচির পার্বন : (একের ক্ষতি করে অন্যের লাভ)
গেয়ো যোগী ভিখ পায় না : (স্বদেশে গুণীজনের সম্মান নেই)
গোকুলের ষাঁড় : (স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী ও পরের অনিষ্টকারী)
গোড়ে গোড় দেওয়া : (পদাঙ্ক অনুসরণ, চামচামি করা)
গোদের উপর বিষফোঁড়া : (বিপদের উপর বিপদ)
গোলে হরিবোল : (বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়া)

ঘ

ঘটি ডুবে না নামে তালপুকুর : (অসার গর্ব/যোগ্যতা ছাড়াই অহঙ্কার দেখানো)
ঘর থাকতে বাবুই ভেজা : (বোকামির দণ্ড)
ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট : (গৃহশত্রুই বিনাশের কারণ)
ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কেঁচোর পত্তন : (দরিদ্রের বড়লোকি ভাব)
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো : (নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করা।
ঘরের শত্রু বিভীষণ/ঘরসন্ধানী বিভীষণ : (অভ্যন্তরীণ শত্রু)
ঘাড়ের ভূত নামানো : (দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করা)
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া : (চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া)
ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া : (উপরওয়ালাকে ডিঙিয়ে কাজ করা)
ঘোড়া দেখে খোড়া হওয়া : (সুযোগ বুঝে সুবিধা চাওয়া)
ঘোমটার ভিতরে খেমটা নাচ : (বাইরে সাধু, ভেতরে ভণ্ড)
ঘোলা জলে মাছ ধরা : (উদ্ভূত পরিস্থিতি কাজে লাগানো)

চ

চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা : (শোনা বিষয় দেখে নিশ্চিত হওয়া)
চড়কে কাঠি পড়া : (কলহের সূত্রপাত হওয়া)
চার হাত এক করা : (বিয়ে দেওয়া)
চাল না ছুলো, ঢেঁকি না কুলো : (নিতান্তই নিঃস্ব)
চালুনি বলে ছুঁচ তোর দেখি ছ্যাঁদা : (দোষী হয়েও অপরের সামান্য ত্রুটির সমালোচনা)
চুলের টিকি না দেখা যাওয়া : (অদর্শন হওয়া)
চূড়ার উপর ময়ূর পাখা- সোনায় সোহাগা
চৌদ্দ চাকার রথ দেখানো : (বিপদে ফেলা)

চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা : (অসৎ ব্যক্তির সমর্থক অসৎ ব্যক্তি।)

ছ

ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করা : (পরিবর্তন করা)

ছাগল দিয়ে ধান মাড়ানো : (অযোগ্যকে দায়িত্ব দিয়ে কাজ হাসিল হয় না।)

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ : (তুচ্ছ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে অখ্যাতি লাভ করা)

জ, ঝ

জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ :(প্রভাবশালীর অধীনে থেকে তার সাথে বিবাদ)

জলের রেখা, খলের পিরীতি : (ক্ষণস্থায়ী)

জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া : (উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়া)

জানের উপর নওবত তোলা : (অত্যন্ত বিব্রত করা)

জোঁকের মুখে নুনের ছিটে : (দুষ্ট লোকের উপযুক্ত মোকাবিলা)

ঝাল মরিচের লাল চামড়া : (দুর্জনের সুন্দর আকৃতি)

ঝোলের লাউ অম্বলের কদু : (সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা)

ট, ঠ

ঠাকুর ঘরে কে? না, আমি কলা খাই না : (বেশি চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়া)

ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সালাম : (বিপদে পড়ে তুচ্ছ লোককে খাতির)

ড

ডানায় ভর দিয়ে চলা : (শূন্যলোকে ভাসা)

ডাল ভাঙা ক্রোশ : (দীর্ঘপথ)

ডাল ভাঙা বাঁদর : (অনিষ্টকারী লোক)

ডোবা দেখলেই ব্যাঙ লাফায় : (প্রিয় বস্তু দেখে আনন্দ করা)

ঢ

ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জন : (সর্বস্ব জলাঞ্জলি)

ঢাকে কাঠি দেওয়া : (সর্বত্র প্রচার)

ঢাকের দায়ে মনসা বিকান : (প্রধান কাজের চেয়ে অপ্রধান কাজে বেশি খরচ করা)

ঢাকের পিঠে বাঁশ : (অনাবশ্যক বস্তু)

ঢাকের বাদ্য থামলেই মিষ্টি : (যা অসহ্য তা থামলেই ভালো)

ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার : (অযোগ্য বা ক্ষমতাহীনের আড়ম্বর)

ত, থ

তালগাছের আড়াই হাত : (কোন কাজের শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ)

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা : (পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়া)

তুলসী বনের বাঘ : (ভণ্ড ব্যক্তি)

ত্রাহি ত্রাহি মধুসূদন : (বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুল আবেদন)

ত্রিশঙ্কু অবস্থা : (অনিশ্চিত অবস্থা)

থোঁতা মুখ ভোঁতা করা : (দর্পচূর্ণ করে দেওয়া)

দ

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার : (চরম হট্টগোল)
দক্ষিণে হাওয়া দেওয়া : (কোন দায়িত্ব না রাখা)
দশচক্রে ভগবান ভূত : (দশজনের চক্রান্তে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোকায় পরিণত হয়।)
দশবাই চণ্ডী : (অল্পতেই রেগে যায় এমন নারী)
দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ : (ছোট হয়ে বড়দের অনুকরণের চেষ্টা, ভণ্ডামির চিহ্ন)
দাঁতে কাঠি/দড়ি দিয়ে থাকা : (উপবাস থাকা)
দিনগত পাপক্ষয় : (উৎসাহবিহীন গতানুগতিক কাজ করা)
দুয়ারে হাতি বাঁধা থাকা : (অত্যন্ত ধনী হওয়া)
দেখছি কত, দেখার কত, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার : (অধমের অহঙ্কার)
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ : (মন্দ বংশে ভালো লোক)

ধ

ধনুক ভাঙ্গা পণ : (কঠোর প্রতিজ্ঞা)
ধন্বন্তরি বিদ্যা : (রোগ নিরাময়ে দক্ষ ডাক্তার ও অব্যর্থ ঔষধ)
ধর লক্ষ্মণ : (কোন চিন্তা না করেই আদেশ পালন করা)
ধরণী দ্বিধা হও : (অত্যন্ত হতাশ বা বিরক্ত)
ধরাকে সরা জ্ঞান করা : (গর্বে অন্ধ হয়ে সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করা)
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির : (ধার্মিকতার ভানকারী)
ধান গাছের তক্তা : (অসম্ভব বস্তু)
ধান ভানতে শিবের গীত : (অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা)
ধাপ ধাড়া গোবিন্দপুর : (অজ্ঞাত ও অখ্যাত অতি বাজে জায়গা)
ধুন্ধুমার কাণ্ড : (তুমুল কোলাহল)
ধুলা ধাপড়া উড়ানো : (ভীষণ প্রহার করা)

ন

নদীর মুখে বালির বাঁধ : (অবাস্তব পরিকল্পনা)
নব কার্তিক : (অতিরিক্ত বিলাসী)
নরক গুলজার : (অসংযত ফূর্তিবাজদের আড্ডা)
না পড়ে পন্ডিত : (কোন বিষয়ে না জেনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ)
না রাম না গঙ্গা : (চুপ করে থাকা)
নাকের বদলে নরুন : (মারাত্মক ক্ষতির বদলে তুচ্ছ ক্ষতিপূরণ)
নাড় বনে কীর্তন : (অনাবশ্যক স্থানে কার্য)
নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ : (নামসর্বস্ব, কাজের লোক নয়)
নারানাং মাতুল ক্রম : (যেমন মামা তেমন ভাগ্নে)

CamScanner

নিদানকালে হরিনাম : (সময়ে কাজ না করে অসময়ে চেষ্টা করা)
নিরন্তপাদপে দেশে এরণ্ডোপহি দ্রুমায়াতে : (যে বনে বৃক্ষ নেই সেই বনে এরণ্ডই বৃক্ষ)
নেপোয় মারে দই : (ধূর্ত লোকের ফলপ্রাপ্তি)

প

পচা শামুকে পা কাটা : (তুচ্ছ কারণে বড় বিপদ)
পরশুরামে কুঠার : (সর্ব সংহারক অস্ত্র)
পরের মুখে ঝাল খাওয়া : (অন্যের কথায় বিশ্বাস করা)
পরের পায়ে তেল দেওয়া : (তোষামোদ করা)
পর্বতের মুষিক প্রসব : (বৃহৎ আয়োজনের সামান্য ফল)
পড়িয়া বিপাকে গনেশ মাঝি গরু রাখে :(বিপদে পড়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য)
পাকা আম দাঁড়কাকে খাওয়া : (উৎকৃষ্ট বস্তুর অযোগ্য ব্যবহার হওয়া)
পাকা ঘুঁটি কেচে যাওয়া : (সুসম্পন্ন কাজ পণ্ড হওয়া)
পাণ্ডববর্জিত দেশ : (নিতান্তই অজপাড়াগাঁ)
পাততাড়ি গুটানো : (কাজ শেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্থান করা)
পাথরে পাঁচ কিল : (অতিশয় সুদিন)
পিতল সরা জাঁকে ভরা : (কাজের চেয়ে কথায় বেশি পারদর্শী)
পিপু ফিশু : (নিতান্ত অলস)
পিড়েয় বসে পেড়োর খবর : (নগণ্য লোকের গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখা)
পেঁজ-পয়জার দুইই হইল : (পেট ভরল না, পিঠেও সইতে হলো)
পেটে খিদে চোখে লাজ : (সংকোচবশত মনের ইচ্ছা গোপন)
পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি : (গরিবের বিলাসিতার শখ)

ফ

ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা : (মনের ভাব মুখের ভাব প্রকাশ করে না এমন)
ফপর/ফোপর দালালি : (গায়ে পড়ে অহেতুক অন্যের ব্যাপারে মোড়লি করা)
ফুর্তির প্রাণ বয়নার ময়দান : (উল্লাস)
ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাওয়া : (সমান্য আঘাতেই ধরাশায়ী হওয়া)
ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই : (প্রকৃত গোপন করে মিথ্যা প্রচার)
ফেলো কড়ি মাখো তেল : (অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছা পূরণ)

ব

বচনে জগৎ তুষ্ট : (মিষ্টি কথায় সবাই খুশি)
বজ্র আটুঁনি ফস্কা গেরো : (উপরে হাঁকডাক ভেতরে ফাঁকা)
বজ্রাঘাতে রামনাম : (বিপদে পড়লে তুচ্ছ ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া)
বড় গাছে নৌকা বাঁধা : (নির্ভাবনার আশায় বড়লোকের আশ্রয়ে থাকা)
বড় মাছের কাটাও ভালো : (মহৎ ব্যক্তির তুচ্ছ কথাও মূল্যবান)

CamScanner

বনমানুষের হাড় : (জাদুবিদ্যা দ্বারা প্রতারণা করা)
বাঁশবনে ডোম কানা : (দিশেহারা হওয়া)
বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা : (কোন বিষয়ে একবার লিপ্ত হলে নানা বিপদে পড়তে হয়)
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা : (শত্রুর ঘরে গোপনে অবস্থান)
বাতাসের সঙ্গে লড়াই করা : (বিনা কারণে ঝগড়া করা)
বানের জলে ভেসে আসা : (মূল্যহীনভাবে পাওয়া)
বানের জলে ভেসে যাওয়া : (নিরাশ্রয় হওয়া, মূল্যহীন হওয়া)
বানের আগে জেলে ডিঙ্গি : (প্রবল বাধার মুখে ক্ষুদ্র প্রতিকার টিকে না)
বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর : (তদারকি না থাকলে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা)
বামনের গুরু : (যে ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট অল্প ব্যয়ে প্রচুর কাজ পাওয়া যায়)
বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা : (আসল ঝুঁকি নেওয়া)
বিদুরের খুদ : (ভালোবাসার সামান্য উপহার)
বিনা দানে মথুরা পার : (সহজে কার্য উদ্ধার)
বিন্দুকে সিন্ধু জ্ঞান : (অকিঞ্চিৎকরকে মূল্যবান মনে করা)
বিন্দেদূতী : (কেউ কারো কথা পরস্পরের মধ্যে চালাচালি)
বিষ নাই তার কুলোপনা চক্কর : (অক্ষমের বৃথা আস্ফালন)
বুকে ঢেঁকির পাড় দেওয়া : (মর্মজ্বালায় ছটফট করা)
বুকে বসে দাঁড়ি উপড়ানো : (আশ্রয়দাতার সর্বনাশ)
বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ : (বৃদ্ধ বয়সে বিয়ের শখ)
বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া : (ধুমপান দিয়ে চিন্তাশক্তি বাড়ানো)
বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার : (কারো পরাজয় অসম্ভব)
বেগুন গাছে আঁকষি দেওয়া : (অতিশয় খর্বাকৃতি)
বেনের গাছে মেকি চরানো : (অভিজ্ঞকে ঠকানো)
বৈতরণী পার করা : (মেরে ফেলা, হত্যা করা)
বৈতরণী পার হওয়া : (মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, স্বর্গে যাওয়া)
বৈদ্যনাথের ষাঁড় : (কোন কাজ করে না, পরের উপার্জনে খেয়ে বেড়ায়)
ব্যাস-কাশী : (ভাল করতে গিয়ে বুদ্ধিদোষে মন্দে পরিণত হওয়া)

ভ

ভগবানের আসন বটপত্র : (উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সমাদর কম হওয়া)
ভবতি বিজ্ঞতম ক্রমশো জন : (গাইতে গাইতে গায়েন)
ভবলীলা সাঙ্গ করা : (মারা যাওয়া)
ভস্মে ঘি ঢালা : (বৃথা শ্রম)
ভাঁড়ে মা ভবানী : (শূন্য ভাণ্ডার)
ভাগের মা গঙ্গা পায় না : (ভাগাভাগির কাজ সুষ্ঠু হয় না)

CamScanner

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় : (সৌভাগ্যবানের অভাব হয় না)
ভাঙে ঝিঙে ত বলে পটল : (মান রাখার জন্য প্রকৃত গোপন করে মিথ্যা প্রচার)
ভানুমতির খেলা : (ভেল্কিবাজি, জাদুবিদ্যা)
ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক : (শত্রুতা থাকায় পরস্পরের ছায়া না মাড়ানো)
ভিটেয় ঘুঘু চরানো/ভিটে সরিষা বোনা : (সর্বনাশ করা)
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা : (অবিচল বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা)
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ : (বিশৃঙ্খল ব্যাপার, বাজে কাজে অর্থ ব্যয় করা)
ভূতের মুখে রামনাম : (স্বভাব বিরুদ্ধ কথা)
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা : (প্রতিবাদের চিন্তা না করে হৈচৈ করা)
ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল : (বিজ্ঞলোকের অভাবে বোকাই মোড়ল)
ভেরোমের টাটী : (সম্ভ্রম রক্ষার টাটী)
ভেলায় সাগর পার : (সাধ্যাতীত কাজে সফল হওয়া)
ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরময় : (ভবঘুরে)

ম

মণিহারা ফণী : (অতি প্রিয় বস্তু হারানোর অস্থিরতা)
মধুরেণ সমপয়তে : (মিষ্টি দিয়ে শেষ করতে হয়)
মরার সময় মকরধ্বজ : (শেষ মহূর্তের জন্য ক্ষীণ আশার সঞ্চার হিসেবে কোন কাজ করা)
মরার বাড়া গাল নেই : (চরম তিরস্কার)
ময়ূর ছাড়া কার্তিক : (সুদর্শন পুরুষ)
মাকড় মারলে ধোকড় হয় : (স্বার্থের প্রয়োজনে বিচার বিবেচনা পরিবর্তিত হয়)
মাছরাঙার কলঙ্ক : (সকলের অপরাধ উপেক্ষা করে একজনকে দোষী সাব্যস্থ করা)
মাছিমারা কেরানি : (বুদ্ধি বিচারহীন নকলনবিস)
মাছের মায়ের পুত্রশোক : (কারো অনিষ্ট করে সান্ত্বনা দেওয়া)
মাথা ঠোকাঠুকি হওয়া : (অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়া)
মাথায় কাঠাল ভাঙা : (অন্যকে ঠকিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করা)
মাথায় ঘোল ঢালা : (অপদস্ত করা)
মুণ্ডমালার দাঁতখামাটি : (নিষ্ফল আড়ম্বর)
মূলে হাবাত : (যার সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে)
মোঘলের সঙ্গে খানা খাওয়া : (বেকায়দায় পড়ে অপমান সহ্য করা)

য

যত দোষ নন্দ ঘোষ : (দুর্বলের প্রতি সর্বদা দোষারোপ)
যতো ছিল নাড়া বুনে, এলো সব কেত্তুনে : (অজ্ঞ অরসিকজনের মর্যাদা লাভ)
যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দই : (পরিশ্রমীকে বঞ্চিত করে ধূর্তের সুবিধা ভোগ)
যে খায় চিনি, জোগায় চিন্তামণি : (ভাগ্যে থাকলে সবই জোটে।)

CamScanner

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল : (অসৎ ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি)

র

রক্ত বীজের ঝাড়/বংশ : (অবিনাশী শক্তি)
রক্তের অক্ষরে লেখা : (ত্যাগের মাধ্যমে সৃষ্ট ইতিহাস)
রাই কুড়িয়ে বেল : (অল্প অল্প সঞ্চয়ে প্রচুর জমানো)
রাম না হতেই রামায়ণ : (অবাস্তব ব্যাপার)
রাম রাজত্ব : (যা খুশি করার একচেটিয়া অধিকার)
রামের হনুমান : (একান্ত অনুগত কর্মচারী)
রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন : (একের দোষে অপরের কষ্ট)

ল

লক্ষ্মণের ফল ধরা : (কোন চিন্তা ছাড়াই আদেশ পালন)
লঙ্কাকাণ্ড : (তুমুল ভয়ানক গোলমাল)
লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা : (সুযোগ কাজে লাগাতে না পারা)
লাগে টাকা দেবে গৌরি সেন : (অর্থের অহেতুক অপচয়)
লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না : (মিষ্টি কথায় সব সময় কাজ হয় না)
লাভের ভাগ টিয়েই খায় : (লাভে ঘাটতি পড়া)

শ

শকুনিমামা : (যে ব্যক্তি কূটবুদ্ধি দিয়ে গৃহবিবাদ বাধায়)
শাপে বর হওয়া : (খারাপ থেকে ভালো হওয়া)
শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান : (অলস ও স্থূল ব্যক্তি সবর্দা একইভাবে অবস্থান করে)
শ্যাম রাখি না কুল রাখি : (মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থা)
শিব গড়তে বাঁদর : (ভালো কিছু করতে গিয়ে খারাপ কিছু করা)
শিবরাত্রির সলতে/সবেধন নীলমণি : (একমাত্র বংশধর)
শিবের খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা ভারি : (মূল বিষয় রেখে আনুষঙ্গিক বিষয়ে মনোযোগ)
শিমুল গাছে গা ঘষা : (এমন কাজ করা যাতে নিজের ক্ষতি হয়)
শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে : (নিজের পরিচয় লোকানো)
শুঁড়ির সাক্ষ্য মাতাল : (দুষ্ট লোকের পক্ষে দুষ্ট লোক)
শুভঙ্করের ফাঁকি : (হিসেব নিকেশের মারপ্যাচে ধোঁকা দেওয়া)
শুভস্য শীঘ্রম : (ভালো কাজে দেরি করতে নেই)
শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ : (ভয়ানক লড়াই)
শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া : (আলস্যে সময় নষ্ট করা)

স

সজনে ডাঁটায় ঘি জোটে না মসুর ডালে ঘি : (গরিবের অকারণে বিলাসিতা)
সন্নিপাতের তৃষ্ণা : (যে আকাঙ্খা উপভোগেও পূর্ণ হয় না)

CamScanner

সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া : (অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন)
সমুদ্রে ঝাপ দেওয়া : (কঠিন বিপদে জড়িয়ে পড়া)
সাতঘাটের জল খাওয়ানো : (নাস্তানাবুদ করে ছাড়া)
সাত নকলে আসল খাস্তা : (নকল করতে থাকলে মূল জিনিষ বিকৃত হয়ে যায়)
সাপের ছুঁচো গেলা : (নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হওয়া)
সাপের পাঁচ পা দেখা : (অত্যন্ত স্পর্ধার ফলে অহেতুক বাড়াবাড়ি)
সাপের হাঁচি বেদে চেনে : (অভিজ্ঞ লোককে ফাঁকি দেওয়া যায় না)
সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়া : (মিষ্টি কথায় ভেতরে ঢুকে সর্বনাশ করা)
সুন্দ উপসুন্দের লড়াই : (যে যুদ্ধে দুই পক্ষই ধ্বংস হয়, ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ)
সুশীতল বারি নিক্ষেপ : (প্রশমন করা)
সোনা বাইরে রেখে আঁচলে গেরো : (অকার্যকর সাবধানতা)

হ

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী : (নির্বোধের পরামর্শে চলা নির্বোধ লোক)
হরিভক্তি উঠে যাওয়া : (শ্রদ্ধাভক্তি নষ্ট হওয়া)
হরিহর আত্মা : (অন্তরঙ্গ)
হাঁড়ি কাঠে মাথা দেওয়া : (নিশ্চিন্ত বিপদে মাথা দেওয়া)
হাঁড়ির মুখের মত সরা হওয়া : (সমানে সমান)
হাড়ে বাতাস লাগা : (স্বস্তিবোধ করা)
হাত দিয়ে হাতী ঠেলা : (অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাওয়া)
হাত ঝাড়া দিলে পর্বত : (বড়লোকের মুখের সামান্য কথার অনেক দাম)
হাতির মুখে দূর্বা ঘাস : (প্রয়োজনের তুলনায় সমান্য)
হাতে কড়ি পায়ে বল তবে চল নীলাচল : (বড় কাজে হাত দিতে সামর্থ্যের প্রয়োজন)
হাতে জল না গলা : (অত্যন্ত কৃপন)
হাতের পাঁজি মঙ্গলবার : (মীমাংসার নির্ভরযোগ্য উপায় থাকতে তর্ক-বিতর্ক বৃথা)
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা : (হেলায় সুযোগ হারানো)
হাতেরও খাবে পাতেরও খাবে : (বেশি লাভ করা)
হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া : (অন্তসারশূন্য অবস্থা)
হিসাবের গরু বাঘে খায় না : (ঠিকমত হিসাব নিকাশ রাখলে পস্তাতে হয় না)
হ্যাঁপায় পড়ে স্রোতে ভাসা : (দায়ে পড়ে কাজ করা)
হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয় : (কুকাজে পটু)

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা

বাগধারা অর্থ বিশিষ্ট অর্থবাচক বাক্যাংশ বা বাচনরীতি। প্রতিটি ভাষায়ই বিশেষ কতকগুলো বাক্যাংশ বা বাচনরীতি রয়েছে। যেগুলো আভিধানিক অর্থ প্রকাশ না করে, বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ করে, তাদেরকে 'বাগধারা' বলে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-

অ

অকটবিকট- ছটফটানি
অকাল কুষ্মাণ্ড- অপদার্থ
অকালে বাদলা- অপ্রত্যাশিত বাধা
অক্ষয় বট- বয়স্ক বা বিজ্ঞ ব্যক্তি
অগত্যা মধুসূদন- অনন্যোপায় হয়ে
অগস্ত্য যাত্রা- শেষ বিদায়
অঙ্কুশ তাড়না- উত্তেজনা বা উৎসাহ দেওয়া
অঞ্চল প্রভাব- স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব
অনুর্ভঙ্গ পণ- কঠোর প্রতিজ্ঞা
অন্তর টিপুনি- মর্মপীড়াদায়ক
অন্ধকার দেখানো- বিপদে ফেলা
অন্ধের যষ্ঠী/লড়ি/নড়ি- একমাত্র অবলম্বন
অপোগণ্ড- অযোগ্য, অপদার্থ
অমাবস্যার চাঁদ- অদর্শনীয় বস্তু, দুর্লভ বস্তু
অম্বল চাখা- ক্রমাগত জায়গা বদল
অরণ্যে রোদন- নিষ্ফল আবেদন
অলক্ষ্মীর দশা- দারিদ্র্য
অশ্বমেধ যজ্ঞ- বিপুল আয়োজন
অষ্টকপাল- হতভাগ্য
অষ্টবজ্র সম্মিলন- প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমাবেশ
অষ্টরম্ভা- ফাঁকি
অসার সুসার- সুবিধা অসুবিধা

আ

আউছিয়া করা- নিন্দে করা
আউলিয়া চাঁদ- যে অল্পেই আকুল হয়
আঁকড়ে পাওয়া- আয়ত্ত করা

আঁকুপাঁকু- অতিরিক্ত ব্যগ্রতা
আঁচল ধরা- স্ত্রী লোকের বশীভূত
আঁদরু পেঁদরু- ব্যঙ্গার্থে
আঁধার ঘরের মানিক- প্রিয়বস্তু
আকাশকুসুম- অসম্ভব কল্পনা
আক্কেল গুড়ুম- হতবুদ্ধি।
আক্কেল সেলামী- বোকামির জন্য দণ্ড
আখড়াই দেওয়া- অভিনয়াদিতে অভ্যাস করা
আগন্যাংলা - অগ্রবর্তী
আচাভুয়া বোম্বাচাক- অসম্ভব ব্যাপার
আজবখানা- জাদুঘর
আটপৌরে- সারাদিন ব্যবহার করা হয় এমন
আটপ্রহর- সারাদিন
আটাশে- দুর্বল ও অক্ষম
আঠারো আনা- বাড়াবাড়ি, সমূহ সম্ভাবনা
আড়ং ঘাটা- খেয়াঘাট
আতান্তরে পড়া- দুঃখ কষ্টে পড়া।
আদাড়ের হাঁড়ি- তুচ্ছ, অনাদৃত ব্যক্তি
আদুরে গোপাল- অতিরিক্ত আহলাদে লালিত
আমড়া গাছি করা- প্রতারণাপূর্ণ তোষামোদ
আলেয়ার আলো- দুর্লভ বস্তু
আসরে নামা- কাজে অবতীর্ণ হওয়া
আস্তাকুঁড়ের পাতা- নিচ ব্যক্তি
আহ্লাদে ফুটকড়াই- আনন্দিত হওয়া

ই

ইন্দ্রপাত/ইন্দ্রপতন- কোন মহাপুরুষের মৃত্যু
ইন্দ্রের শচী- যখন যার তখন তার
ইয়ার বকশী- রসিক লোক
ইল্লতে কাণ্ড- নোংরা ব্যাপার
ইশপিশ করা- ব্যগ্র হওয়া

উ, ঊ

উড়ো চিঠি- ভিত্তিহীন পত্র
উলুখাগড়া- গরিব বা অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি, নিরীহ প্রজা।
ঊনকোটি চৌষট্টি- প্রায় সম্পূর্ণ

ঊনপঞ্চাশ বায়ু-	পাগলামি
ঊনপাঁজুরে-	হতভাগ্য, দুর্বল
ঊরুস্তম্ভ-	ফোঁড়া জাতীয় রোগ

এ, ও

এঁড়ে তর্ক-	যুক্তিহীন তর্ক
এককে একুশ করা-	অযথা বাড়ানো
একা ঘরের গিন্নি-	কর্তৃত্ব
এলাহী কাণ্ড-	বিরাট আয়োজন
ওষুধ পড়া-	প্রভাবে পড়া
ওলা ওঠা-	কলেরা রোগ

ক

কংস মামা-	নির্মম আত্মীয়
কচুপোড়া-	অখাদ্য, কিছুই না
কচুবনের কালাচাঁদ-	অপদার্থ
কচ্ছপের কামড়-	নাছোড়বান্দা, যা সহজে ছাড়ে না।
কথা চলা-	রটনা করা
কপাল ফাঁটা-	অদৃষ্ট মন্দ হওয়া
কপোল কল্পনা-	মনগড়া কথা
কলমের খোঁচা-	অন্যের অনিষ্ট হতে পারে এমন লেখা।
কলির সন্ধ্যা-	দুঃখের আরম্ভ
কলুর বলদ-	অন্যের জন্য একটানা খাটুনি
কল্কে পাওয়া-	পাত্তা পাওয়া
কড়িকাঠ গোনা-	কাজ না করে কালক্ষেপন
কাক ভূষণ্ডি-	দীর্ঘজীবী ব্যক্তি, পুরাণে কল্পিত ত্রিকালদর্শী কাক
কাক জ্যোৎস্না-	রাত্রিশেষের অল্প আলো।
কাছা ঢিলা-	অসাবধান
কাজির বিচার-	গোঁজামিল দিয়ে বিচার
কাটনার কড়ি-	উপার্জন সামান্য
কাঁঠালের আমসত্ত্ব-	অসম্ভব বস্তু
কাঠের পুতুল-	ব্যক্তিত্বহীন মানুষ
কান কাটা-	নির্লজ্জ, বেহায়া
কানা কলসির জল-	ক্ষণস্থায়ী বস্তু
কানে ওঠা-	শুনতে পাওয়া

CamScanner

কালাপানি পার- দ্বীপান্তর দণ্ড, তদনীন্তন ভারতবর্ষে থেকে আন্দামানে নির্বাসন

কালাপাহাড়- চলিত সংস্কার বা রীতি নীতির ধ্বংসকারী বিদ্রোহী

কাষ্ঠ হাসি- শুকনো হাসি

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড- তুমুল হট্টগোল

কীচক বধ- মারত্মক প্রহার করা

কোলাব্যাঙ- বাকসর্বস্ব

কুঁজড়োপনা- ঝগড়াটে স্বভাববিশিষ্ট

কুনকি হাতি- কৌশলে অন্যকে বশ করে

কুবেরের ধন- যে ঐশ্বর্য ফুরায় না

কুমিরের সান্নিপাত- অসম্ভব ব্যাপার

কুম্ভীরাশ্রু- নকল সমবেদনা

কুল কাঠের আগুন- তীব্র জ্বালা

কূপমণ্ডুক- সীমাবদ্ধ জ্ঞান

কেঁচে গণ্ডুষ- সমাপ্ত প্রায় কাজ পুনরায় শুরু করা

কেঁচে যাওয়া- ফেঁসে যাওয়া

কেবলা হাকিম- অনভিজ্ঞ

কেষ্টবিষ্টু- বিশিষ্ট ব্যক্তি

খ

খড়ি পাতা- জ্যোতিষের গণনা

খণ্ড কপালে- দুর্ভাগ্য

খাঁদা নাকে তিলক- বেমানান সাজ

খাঞ্জা খাঁ- নবাবী চালচলন

খাবি খাওয়া- মুক্তির জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা

খুঁটে খাওয়া- স্বচেষ্টায় অন্নসংস্থান করা

খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়া- প্রকৃত বড় নয় কিন্তু গায়ের জোরে বড় হওয়া

খুঁয়ে তাঁতি- মোটা কাপড় বোনে যারা, সামান্য দরের লোক

খেউর গাওয়া- অশ্লীল গালাগালি দেয়া

খেরো খাতা- যে খাতায় নানান বিষয় লেখা হয়/বাজে হিসাবের খাতা

খোদার খাসি- হৃষ্টপুষ্ট/অলস

গ

গজপতি বিদ্যাদিগ্বজ- পণ্ডিত মূর্খ

গজেন্দ্র গমন- মন্থর গতি

গণ্ডায় আণ্ডা দেওয়া- ফাঁকি দেওয়া

গদাই লস্করী চাল-	কুঁড়েমি
গর্দভ রাগিনী-	মাধুর্যহীন চিৎকার
গরজ বড় বালাই-	প্রয়োজনে গুরুত্ব
গলগ্রহ-	অকারণে পরের বোঝা হয়ে থাকা
গলবস্ত্র-	অতিশয় বিনীত
গা তোলা-	সচেতন হওয়া
গাজির গান-	দীর্ঘ চিঠি
গোবর গনেশ-	অকর্মণ্য ও স্থূলবুদ্ধি
গোয়ার গোবিন্দ-	কাণ্ডজ্ঞানহীন
গ্যাঁড়াকল-	লোক ঠকাবার কৌশল

ঘ

ঘটিরাম-	নির্বোধ বিচারক
ঘন্টাগরুড়-	অলস বা অকর্মণ্য ব্যক্তি
ঘরভেদী বিভীষণ-	যে গৃহবিবাদ বাধায়
ঘরের ঢেঁকি কুমীর-	বলিষ্ঠ ও ভোজনপটু অথচ অলস
ঘাটের মড়া-	অতি বৃদ্ধ
ঘোড়া রোগ-	সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ
ঘোড়ার কামড়-	কঠিন আক্রমণ

চ

চকমকি ঠোকা-	ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা
চক্ষু চড়ক গাছ-	বিস্ময়ে হতবুদ্ধি
চক্ষুদান করা-	চুরি করা
চক্ষুশূল-	পীড়াদায়ক
চড়কের পিঠ-	যে সবই সহ্য করতে পারে।
চড়ুকে হাসি-	লোক দেখানো হাসি
চতুর্ভূজ হওয়া-	জীবনে উন্নতি লাভ করা।
চাপান উতোর-	পারস্পরিক সন্দেহ
চামচিকের লাথি-	নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি
চিঁড়ে চেপটা-	নাজেহাল
চিঁড়ের বাইশ ফের-	সরল জিনিষ কঠিন করা
চিনে জোঁক-	নাছোড়বান্দা
চুলোয় দেওয়া-	নিশ্চিহ্ন করা
চোখ টাটানো-	হিংসা করা
চোখ পাকানো-	ক্রোধ দেখানো

©Nazmus Sadat

CamScanner

চোরা বালি- অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা
চৌদ্দবুড়ি- প্রচুর

ছ

ছক্কা পাঞ্জা করা- লম্বা লম্বা কথা বলা
ছাতি ফুলানো- গর্ব প্রকাশ করা
ছাদনাতলা- হিন্দু বিয়েতে ব্যবহৃত ছায়ামণ্ডপ
ছুঁচোর কেত্তন- নিরন্তর কলহ
ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা- বৃথা চেষ্টা
ছেলের হাতের মোয়া- অতি সহজ ব্যাপার

জ

জগদ্দল পাথর- গুরুভার
জড়ভরত- অকর্মণ্য ব্যক্তি
জলপানি- ছাত্রবৃত্তি
জলবৎ তরলং- খুব সহজ
জলযোগ- হালকা খাবার
জলের দাগ- ক্ষণস্থায়ী
জিব কাটা- লজ্জা প্রকাশ করা
জিলাপির প্যাঁচ- কুটিলতা
জেলঘুঘু- যে ব্যক্তি বারবার জেল খাটে

ঝ

ঝড়ো কাক- দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি
ঝলসা কানা- তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে এমন
ঝাঁকের কই- একই দলের লোক
ঝিঙেফুল ফোটা- সন্ধ্যা হওয়া
ঝোলে অম্বলে এক করা- মিশিয়ে ফেলা

ট, ঠ

টপ্পা মারা- দায়িত্বহীন আমোদে জীবন যাপন
টীকা ভাষ্য- বিস্তারিত আলোচনা
টুপভুজঙ্গ- নেশায় বিভোর
টেঁকে গোঁজা- কোমরে গোঁজা বা আত্মসাৎ করা
ট্যাক ভারী করা- অধিক পয়সা কামানো
ঠোঁট কাটা- স্পষ্টভাষী বা স্পষ্টবাদী
ঠোঁট ওল্টানো- অবজ্ঞা প্রকাশ করা
ঠোঁট ফুলানো- অভিমান করা

ঠুটো জগন্নাথ- অকর্মণ্য ব্যক্তি

ড

ডকে ওঠা- বন্ধ বা বাতিল করা
ডঙ্কা পেটা/মারা- সগর্বে ঘোষণা করা
ডাকাবুকো- দূরন্ত, নির্ভীক
ডামাডোল- গোলযোগ
ডিমে রোগা- মাতৃগর্ভ থেকেই রুগ্ন
ডুরি বাঁধা- লেখাপড়া শেষ করা

ঢ

ঢক্কা নিনাদ- উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা
ঢাক ঢাক গুড়গুড়- লুকোচুরি
ঢাকের কাঠি- তোষামোদকারী
ঢাকের বাঁয়া- অকেজো সঙ্গী
ঢিটপনা- নির্লজ্জতা
ঢিমে তেতালা- অতিশয় মন্থর গতি
ঢেঁকি অবতার- নিষ্কর্মা ও নির্বোধ লোক
ঢেঁকি না কুলো- অন্নসংস্থানের অভাব
ঢেঁকির আঁকশলি- অপ্রধান কিন্তু সঙ্গে থাকলে ঝামেলা পোহাতে হয়
ঢেঁকির কচকচি- কলহ বিবাদ
ঢেঁকির রক্ত- কৃপণের ধন
ঢেঁটরা পেটা- ব্যাপক প্রচারণা

ত, থ

ত-খরচ আনুষঙ্গিক বিবিধ খরচ
তঙ্গদস্তি- অসচ্ছলতা
তরবেতর- নানারকম
তালকানা- কাণ্ডজ্ঞানহীন
তাল ঠোকা- সগর্ব উক্তি
তিন মাথা এক হওয়া- অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া
তিল কাঞ্চুনে- কৃপণ
তিলোত্তমা- অতি সুন্দরী নারী
তুকতাক- জাদুর মন্ত্র
তুর্কি নাচন- নাজেহাল অবস্থা
তুলারাম খেলারাম- দুশ্চিন্তাজনিত অতিশয় অস্বস্থি
তোলা হাঁড়ি- গম্ভীর

CS CamScanner

থাউকি বেলা- বিকালবেলা।
থোরকুচি করা- টুকরো টুকরো করা
থৈ পাওয়া- অন্ত পাওয়া

দ

দকে পড়া- হঠাৎ বিপদগ্রস্থ হওয়া
দড়ি কলসি- আত্মহত্যার উপকরণ
দন্তে তৃণ ধরা- অত্যন্ত বিনয় প্রদর্শন
দফা নিকাশ- সমূহ সর্বনাশ
দহলা নহলা করা- ইতস্তত করা
দয়ে মজানো- বিপদে ফেলা
দাঁতে কুটো করা- অত্যন্ত বিনীত হওয়া
দাঁতের বাদ্যি- খালি ঝগড়া
দাগাবাজ- প্রতারক
দাতা কর্ণ- অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি
দাদ তোলা/নেয়া- প্রতিশোধ নেওয়া
দেঁতো হাসি- কৃত্তিম হাসি
দোহাই মানা- নজির দেখানো

ধ

ধড়া চূড়া- সাজপোশাক
ধর্মের ষাড়- স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী ও পরের অনিষ্টকারী
ধামাধরা- চাটুকারিতা
ধ্যাড়ানো- কাজ পণ্ড করা
ধোপার ভাঁড়ার- প্রচুর জিনিসপত্র যা ব্যবহার করা যাবে না
ধোপার গাধা- কলুর বলদ

ন

নগদ নারায়ণ- কাঁচা টাকা
নথ নাড়া- অহংকার প্রকাশ করা
নদীকূলে বাস- ভয়ের জায়গায় অবস্থান
নবমীর পাঁঠা- প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি
নাই আঁকড়া- একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা
নাকি কান্না- কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ
নাগর দোলা- জন্ম মৃত্যু
নাড়ু গোপাল- আদরের ছেলে
নাম কাটা সেপাই- দল ছাড়া হয়েও দলের প্রতীক ধারণ

নারদের ঢেঁকি- কলহবিবাদ বাধাতে পটু
নিরানব্বইয়ের ধাক্কা- সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
নিসফিস করা- উসখুস করা
নেই আঁকড়া- একগুয়ে, নাছোড়বান্দা।

প

পগার পার হওয়া- পলায়ন করা
পঞ্চত্ব পাওয়া- মারা যাওয়া
পঞ্চম বাহিনী- যেসব লোক যুদ্ধের সময় শত্রুকে সহায়তা করে
পটল তোলা- মারা যাওয়া
পটের বিবি- সেজেগুজে বসে থাকে এমন
পত্রপাঠ- অবিলম্বে/সঙ্গে সঙ্গে
পরকাল ঝরঝর করা- সর্বনাশ করা
পল্লবগ্রাহিতা- ভাসা ভাসা জ্ঞান
পয়মন্ত- সুলক্ষণযুক্ত
পারের কড়ি- পরকালের জন্য সঞ্চিত সম্বল
পিঁপড়ের পেট টেপা- অত্যাধিক হিসাব করে চলা
পোঁ ধরা- অন্ধ অনুকরণ
পোয়া বারো- পরম সৌভাগ্য
প্রমাদ গোনা- অত্যন্ত ভীত হওয়া

ফ

ফতো নবাব/কাপ্তান- বাহ্যিক আচরণ নবাবের মত কিন্তু অন্তঃসারশূন্য
ফেউ লাগা- পেছনে লেগে ক্রমাগত বিরক্ত করা
ফুটিফাটা- সম্পূর্ণ ফেটে গেছে এমন
ফেকলু পার্টি- গুরুত্বহীন লোক
ফেঁপে ওঠা- ধনবান হওয়া
ফোঁস মনসা- রাগী লোক
ফোড়ন কাটা/দেওয়া- খোঁচা দেওয়া

ব

বউ কাটকী- যে শাশুড়ি বউকে কষ্ট দেয়
বকাণ্ড প্রত্যাশা/ন্যায়- নিষ্ফল আশা
বগল বাজানো- বিজয়োল্লাস
বড়ের চাল- কৌশল প্রয়োগ
বদনা বিয়ে- বৃষ্টি আনার জন্য গীত গাওয়া
বর্ণচোরা আম- কপট লোক

CamScanner

বাঘের আড়ি-	নাছোড়বান্দা, শত্রুতা
বাঘের দুধ-	দুষ্প্রাপ্য জিনিস
বাঘের মাসি-	নির্ভীক, বিড়াল, আরামপ্রিয় লোক
বাজখাঁই-	অতিশয় গম্ভীর ও কর্কশ
বারো ভূত-	আত্মীয় লোকজন
বাস্তুঘুঘু-	ঘনিষ্ট অথচ সর্বনাশা ব্যক্তি
বাহাত্তরে ধরা-	বুদ্ধি হ্রাস পাওয়া
বিড়ালের আড়াই পা-	বেহায়াপনা
বিন্দু বিসর্গ-	কোন কিছুর সামান্য অংশ
বিশবাঁও জলে-	কার্যসিদ্ধির অসম্ভাব্যতা
বিষবৃক্ষ-	যা লালন করলে নিজেরই সর্বনাশ হয়
বিষের পুঁটলি-	হিংসাপূর্ণ
বুক দিয়ে পড়া-	প্রাণপনে সহায়তা করা
বুড়ি ছোঁয়ে থাকা-	নামমাত্র নিয়ম পালন করা
বেলেল্লাপনা-	লাম্পট্য
ব্যাঙের আধুলি-	গরীব লোকের সামান্য সঞ্চয়
ব্যাঙের লাথি-	নগণ্য লোক দ্বারা অপমান
ব্যাঙের সর্দি-	অসম্ভব ব্যাপার
ভ	
ভট্টাচার্যের পুঁথি-	প্রয়োজনীয় জিনিস
ভরাডুবির মুষ্টি লাভ-	সব হারিয়ে সামান্য যা বাঁচে
ভরার মেয়ে-	সামাজিক হীনতা
ভাগার ফলা-	অনুর্বর
ভাড়ের কলসি-	স্বার্থসিদ্ধির উপায়
ভাতে ধুনো দেওয়া-	প্রতারিত করা
ভালুক জ্বর-	ক্ষণস্থায়ী জ্বর
ভিদভিদে-	চাপা স্বভাব
ভিরমি খাওয়া-	মূর্ছা যাওয়া।
ভুঁইফোড়-	অর্বাচীন
ভুষণ্ডী কাক-	অলস ব্যক্তি
ভূতের বেগার খাটা-	অনর্থক পরিশ্রম করা
ভেড়াকান্ত -	অন্যের কথায় নির্বোধের মত চলা
ভেরেণ্ডা ভাজা-	অকাজে সময় কাটানো
ম	

মকর সংক্রান্তি-	মাঘ মাসের শেষ দিন
মগজ দৌড়ানো-	বুদ্ধি শানানো
মধুমাস-	চৈত্র মাস
মণিকাঞ্চন যোগ-	উপযুক্ত মিলন
ম ম করা-	সুগন্ধে ভরে যাওয়া
ময়ূর পুচ্ছধারী-	যা নয় তা হওয়ার ভান করা
মাথা ঠেকানো-	প্রণাম করা
মুখ তুলে চাওয়া-	প্রসন্ন হওয়া
মেছোহাটা-	গোলযোগের স্থান
মেনিমুখো-	লাজুক ব্যক্তি
মোমের পুতুল-	সামান্য পরিশ্রমেই কাতর
য	
যক্ষের ধন-	কৃপণের ধন
যজ্ঞের ঘোড়া-	অসহায় ব্যক্তি
যদুবংশ-	বহু পরিজন বিশিষ্ট বংশ
যম যন্ত্রণা-	ভীষণ কষ্ট
যমের অরুচি-	সহজে মরে না
যমের দোসর-	ভয়ানক লোক
যশুরে/যশোরে কই-	মাথামোটা ও শীর্ণদেহ ব্যক্তি
র	
রক্ত গঙ্গা করা-	খুনাখুনি করা
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান-	বিভ্রম
রাঙা মুলা-	সুন্দর চেহারার গুণহীন ব্যক্তি
রাঙা শুক্রবার-	কোন দিনই নয়।
রাজঘোটক-	চমৎকার মিল
রামগরুড়ের ছানা-	গোমড়ামুখো লোক
রাহুর দশা-	অতীব দুঃসময়
ল	
লক্ষ্মীর বরযাত্রী-	সুসময়ের বন্ধু
লক্ষ্মীর বাহন-	পেঁচা, অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি
লগন চাঁদা-	ভাগ্যবান
লঙ্কা পোড়া-	বিভ্রাট ঘটনাকারী
লঙ্কার পায়রা-	ফুলবাবু
লবডঙ্কা-	ফাঁকি

CamScanner

লবেজান করা- পেরেশান
লেজে খেলানো- চালাকি করা

শ

শনির দৃষ্টি- কুদৃষ্টি
শরতের শিশির- সুসময়ের বন্ধু
শান্তিপুরে নৌকতা- মৌখিক ভদ্রতা
শাপে বর- অকল্যাণ থেকে কল্যাণ
শিখে ছেঁড়া- হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয় হওয়া
শিমুল ফুল- বাইরে সুন্দর, মাকাল ফল
শিরে সংক্রান্তি- আসন্ন বিপদ
শিয়ালের যুক্তি- অকেজো যুক্তি
শূন্যে সৌধ নির্মাণ- অলীক কল্পনা
শ্বেতহস্তী পোষা- কর্মচারীদের জন্য অধিক অর্থব্যয়
শ্মশান বৈরাগ্য- ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য

ষ

ষত্ব ণত্ব জ্ঞান- কাণ্ডজ্ঞান
ষণ্ডামার্কা- ষাঁড়ের মত গোয়ার
ষাঁড়ের গো- প্রচণ্ড জেদী
ষাঁড়ের গোবর/নাদ - অকর্মণ্য লোক
ষাটের কোলে- ষষ্ঠীদেবীর কৃপারূপ অঙ্কে, অধিক বয়স
ষোল কড়াই কানা- সব নষ্ট

স

স সে মি রা অবস্থা- কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থা
সরফরাজি চাল- বাইরে মিত্রতা, অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি
স্বখাত সলিলে- স্বীয় কর্মের ফল ভোগ
সাক্ষী গোপাল- নিষ্ক্রিয় দর্শক
সাতকাহন- অসংখ্য।(কাহন= ১৬পণ বা ১২৮০টি, সাতকাহন=৭x১২৮০)
সাত জন্মে- কখনো
সাপের ছুঁচো গেলা- অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে কাজ করা
সাপের হাঁড়ি- সামান্য কারণেই রেগে যায় এমন নারী
সিঁদুরে মেঘ- বিপদের আশঙ্কা
সোনার পাথর বাটি- অসম্ভব বস্তু
সোঁতের শ্যাওলা- নিরাশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি
স্বখাত সলিল- নিজ বিপদ ডাকা

CamScanner

স্বর্গে বাতি দেওয়া- বংশ রক্ষা করা

হ

হস্তামলক- করায়ত্ত সামগ্রী, যা সহজে আয়ত্ত হয়

হস্তীমূর্খ- বোকা

হাটের দুয়ারে কপাট- অসম্ভব ব্যাপার

হাড়হদ্দ- আদ্যন্ত, নাড়ি নক্ষত্র

হাড় হাভাতে- একেবারে নিংস্ব

হাড়ির হাল- মলিন

হাড়ে দুর্বা গজানো- অত্যন্ত কুঁড়ে

হাত পা পেটে ঢোকা- অত্যন্ত ভীত হওয়া

হাতের জল না গলা- অত্যন্ত কৃপণতা করা

হাতের পাঁচ- শেষ সম্বল

হ্যাপা ধরা- ঝুঁকি গ্রহণ করা

হাপিত্যেশ করা- গভীরভাবে ও দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রত্যাশা করা

হাবশি কালা- বুদ্ধি বিবেচনাহীন

হারাহারি- অনুপাত অনুযায়ী ভাগ-বাঁটোয়ারা

বাক্যগঠন

১. কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করুন। *[৪৪তম বিসিএস]*

উত্তর : তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণের উপর একটি বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে। গুণ তিনটি হলো- আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন: 'রহিম বাড়ির দিকে' এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু 'রহিম বাড়ির দিকে আসছে' বললে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

আসত্তি বা নৈকট্য: মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যের শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্থ না হয়। অর্থাৎ বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন: 'ফিরেছি থেকে আজ আমি বাড়ি' বললে বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয় নি। তাই এটি বাক্য হয় নি। 'আজ আমি বাড়ি থেকে ফিরেছি' বললে আসত্তিসম্পন্ন বাক্য হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

যোগ্যতা: বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহের সঙ্গত অর্থ প্রকাশের ক্ষমতাই যোগ্যতা। যেমন: 'অন্ধ চোখে দেখে' বললে অর্থসঙ্গত বাক্য হয় না। 'অন্ধ চোখে দেখে না' বললে বাক্যের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় পাওয়া যায়। এটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য।

২. নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন: *[৪৪তম বিসিএস (পেশাগত)]*

(১) গফুর জবাব দিল না। (অস্তিবাচক বাক্য)
উত্তর : গফুর জবাব দিতে ব্যর্থ হলো।
(২) যারা কীর্তিমান, তাদের মৃত্যু নেই। (সরল বাক্য)
উত্তর : কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।
(৩) জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। (জটিল বাক্য)
উত্তর : জগতে এমন কিছু নেই, যা অসম্ভব।
(৪) তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
(৫) এতে তার দোষ কী? (নেতিবাচক বাক্য)
উত্তর : এতে তার দোষ নেই।
(৬) ত্যাগের মহিমা বড় অপূর্ব। (বিস্ময়বোধক বাক্য)
উত্তর : কী অপূর্ব ত্যাগের মহিমা!

৩. গঠনগত দিক থেকে বাংলা বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। *[৪৩তম বিসিএস]*

উত্তর : গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার- সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য।

- **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা-

  পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।
  রহিম বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।
  ছেলেটি বই পড়ে।

- **মিশ্র বা জটিল বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন:

  যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।
  যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

✓ একটি জটিল বাক্যে পরস্পর সাপেক্ষ যে বাক্যগুলো থাকে তাদের সাধারণত খণ্ডবাক্য বলে। খণ্ডবাক্য দু'প্রকার- প্রধান খণ্ডবাক্য, আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
তুমি যদি আস	আমি যাব
যিনি পরের উপকার করেন	তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে

- **যৌগিক বাক্য:** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন-

  তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি।
  তার টাকা আছে কিন্তু দান করেন না।
  সে কাল আসবে এবং আমি যাবো।

উল্লেখ্য যে-

✓ যৌগিক বাক্যে কমপক্ষে দুটো খণ্ডবাক্য থাকবে।
✓ খণ্ডবাক্যগুলো স্বাধীন হবে, একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়।
✓ খণ্ডবাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি- অব্যয়পদ দ্বারা যুক্ত হবে। তবে কখনও কখনও এগুলো উহ্য থাকতে পারে।

৪. নির্দেশনা অনুযায়ী বাক্যের রূপান্তর করুন: *[৪৩তম বিসিএস (কারিগরি/পেশাগত)]*

(১) তুমি মোটেও খারাপ নও। (অস্তিবাচক বাক্য)
উত্তর : তুমি খুব ভালো।
(২) তিনি কাল আসবেনই। (নেতিবাচক বাক্য)
উত্তর : তিনি কাল না এসে পারবেন না।
(৩) রাইয়ান কি অতোটা পিতৃভক্ত? (বিবৃতিমূলক বাক্য)
উত্তর : রাইয়ানের পিতৃভক্তি কম।
(৪) গুণী ছেলেরা সারাদিন অনলাইনে থেকেও লেখাপড়া করে। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যারা গুণী ছেলে, তারা সারাদিন অনলাইনে থেকেও লেখাপড়া করে।
(৫) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেব না। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : দোষ স্বীকার কর, তবে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
(৬) তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য)
উত্তর : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

৫. পাশে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তর করুন: *[৪১ তম বিসিএস]*

(১) যা করবার তা করেছি। (সরল বাক্য)
উত্তর : কর্ম অনুযায়ী কাজ করেছি/ করণীয় কাজ করেছি।

©Nazmus Sadat
CamScanner

(২) আমৃত্যু এ কথা মনে রাখব। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন এ কথা মনে রাখব।
(৩) কথক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : কথক অসুস্থ, তাই তিনি অনুপস্থিত।
(৪) কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝলো না। (প্রশ্নবাচক বাক্য)
উত্তর : কেউ কি অন্ধের দুঃখ বুঝলো?
(৫) মাতৃভূমিকে সবাই ভালবাসে। (নেতিবাচক বাক্য)
উত্তর : মাতৃভূমিকে কেউ ঘৃণা করে না।
(৬) পাখিটি খুবই সুন্দর। (বিস্ময়বাচক বাক্য)
উত্তর : কী সুন্দর পাখি!

৬. **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন: *[৪০ তম বিসিএস]***
(১) শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)
উত্তর : শহিদেরা অমর।
(২) ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)
উত্তর : যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
(৩) তোমার সব জিনিসই দামি। (নেতিবাচক)
উত্তর : তোমার কোন জিনিসই সস্তা নয়।
(৪) জ্ঞানী হলেও তিনি বিনয়ী নন। (যৌগিক)
উত্তর : তিনি জ্ঞানী কিন্তু বিনয়ী নন।
(৫) ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবোধক)
উত্তর : ভুল কি সকলেই করে না?
(৬) তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না। (সরল)
উত্তর : তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।

৭. **নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন ঃ *[৩৭তম বিসিএস]***
১. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। (সরল)
উত্তর : ভিক্ষুককে দান কর।
২. ভালোবাসার দানে কোনো অপমান নেই। (অস্তিবাচক)।
উত্তর : ভালোবাসার দান সম্মানের/সম্মানজনক।
৩. যেহেতু গাড়ি আসে নাই, সেহেতু আমরা বিশ্রাম নিতে পারি। (যৌগিক)
উত্তর : গাড়ি আসে নি, অতএব আমরা বিশ্রাম নিতে পারি।
৪. আজ চাঁদ উঠেছে। (নেতিবাচক)
উত্তর : আজ চাঁদ না উঠে পারে নি।

©Nazmus Sadat
CamScanner

৫. বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য ইংল্যান্ড দলকে অল-আউট করা। (জটিল)
উত্তর : ইংল্যান্ড দলকে অল-আউট করা যেটি বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য।
৬. জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে জন্মেছেন। (প্রশ্নবোধক)
উত্তর : জীবনানন্দ দাশ কি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেননি?

৮. নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন ঃ *[৩৬তম বিসিএস]*

১. ফের যদি আসি তবে সিধকাঠি সঙ্গে করিয়াই আসিব। (সরল)
উত্তর : ফের আসিলে সিধকাঠি সঙ্গে করেই আসিব।
২. তাকে নির্দয় মনে হয় না। (অস্তিবাচক)
উত্তর : তাকে সদয় মনে হয়।
৩. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। (জটিল)
উত্তর : যারা ছাত্র অধ্যয়নই তাদের তপস্যা।
৪. জামিল বাড়িতে আছে। (নেতিবাচক)
উত্তর : জামিল বাড়িতে অনুপস্থিত নয়।
৫. যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে গর্বিত। (যৌগিক)
উত্তর : তার ধনসম্পদ আছে, এজন্য সে গর্বিত।
৬. বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। (প্রশ্নবোধক)
উত্তর : বিদ্যাসাগর কি বাংলা গদ্যের জনক নয়?

৯. নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন। *[৩৫তম বিসিএস]*

(অ) যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে। (সরল)
উত্তর : কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।
(আ) সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু ট্রেনের খোঁজ নেই এখনো। (জটিল)
উত্তর : যদিও সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবুও ট্রেনের খোঁজ নেই।
(ই) পনের মিনিট পর তিনি এলেন। (যৌগিক)
উত্তর : তিনি পনের মিনিট দেরি করলেন, কিন্তু এলেন।
(ঈ) পুকুরপাড়ে এখন কেউ নেই। (অস্তিবাচক)
উত্তর : পুকুরপাড় এখন নির্জন।
(উ) কোথাও কি তিনি আছেন? (নেতিবাচক)
উত্তর : তিনি কোথাও নেই।
(ঊ) গোলাপটি অত্যন্ত সুন্দর! (বিস্ময়সূচক)
উত্তর : বাঃ! গোলাপটি কী সুন্দর!

©Nazmus Sadat

CamScanner

১০. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

১. শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিলেন এবং বিদায় করলেন। (সরল বাক্য)
উত্তর : শিক্ষক আমাকে উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।
২. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : বিপদ ও দুঃখ একসাথেই আসে।
৩. বিদ্বান লোক সর্বত্র আদরণীয়। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।
৪. সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : সে কৃপণ এবং চালাক।
৫. সে এম.এ পাস করেছে বটে কিন্তু জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যদিও সে এম.এ পাস করেছে, তবুও জ্ঞান লাভ করতে পারে নি।
৬. যখন বৃষ্টি থামলো, তখন আমরা স্কুলে রওনা হলাম। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : বৃষ্টি থামল এবং আমরা স্কুলে রওনা হলাম।

১১. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যারা ধনী তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
২. মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে।
৩. যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল বাক্য)
উত্তর : পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
৪. সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। (প্রশ্নাত্মক বাক্য)
উত্তর : কে না অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়?
৫. আরও কথা আছে। (নেতিবাচক বাক্য)
উত্তর : কথা শেষ হয় নি।
৬. তার আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়। (অস্তিবাচক বাক্য)
উত্তর : তার আদর্শ স্মরণযোগ্য।

১২. নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলো রূপান্তর করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

১. আগে পরীক্ষা দাও, পরে চিন্তা করো। (সরল বাক্য)
উত্তর : পরীক্ষা দিয়ে চিন্তা করো।
২. এখনই না গেলে তার দেখা পাবে না। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : এখনই যাও নতুবা তার দেখা পাবে না।
৩. পিতা তো আছেন, তবু পুত্রকে খোঁজ কেন? (জটিল বাক্য)
উত্তর : পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে খোঁজ কেন?

©Nazmus Sadat
CamScanner

৪. যদি পানিতে না নাম, তবে সাঁতার শিখতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : পানিতে নাম, নতুবা সাঁতার শিখতে পারবে না।
৫. যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি। (সরল বাক্য)
উত্তর : কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।
৬. সে তার পিতার ঋণ পরিশোধ করেছে। (জটিল বাক্য)
উত্তর : তার পিতা যে ঋণ করেছিল, সে তা পরিশোধ করেছে।

১৩. সূত্রানুসারে বাক্যে রূপান্তর করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

১. না গেলে দেখতে পাবে না। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : যাও, নতুবা দেখতে পাবে না।
২. আপনি যদি চান তবে আমি আগামীকাল আসতে পারি। (সরল বাক্য)
উত্তর : আপনি চাইলে আমি আগামীকাল আসতে পারি।
৩. সৎপথে চল, দেখবে জীবনে উন্নতি হবে। (সরল বাক্য)
উত্তর : সৎপথে চললে জীবনে উন্নতি হবে।
৪. তিনি আর এ পথ মাড়ান না। (জটিল বাক্য)
উত্তর : তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আর এ পথ মাড়ান না।
৫. যদি বারণ কর তবে গান গাব না। (সরল বাক্য)
উত্তর : বারণ করলে গান গাব না।
৬. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। (না বাচক বাক্য)
উত্তর : সূর্য পশ্চিম দিক ব্যতিত অস্ত যায় না।

১৪. সূত্রানুসারে বাক্যে রূপান্তর করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

১. যদি সে নিরপরাধ হয়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : সে নিরপরাধ এবং মুক্তি পাবে।
২. পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অসম্ভব কিছু নেই। (সরল বাক্য)
উত্তর : পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।
৩. তারা একটি জীর্ণ কুটিরে বাস করে। (জটিল বাক্য)
উত্তর : তারা যে কুটিরে বাস করে, সেটি জীর্ণ।
৪. জ্ঞানীদের পথ অনুসরণ কর, দেশের কল্যাণ হবে। (সরল বাক্য)
উত্তর : জ্ঞানীদের পথ অনুসরণে দেশের কল্যাণে হবে।
৫. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন? (যৌগিক বাক্য)
উত্তর : তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম না হব কেন?
৬. তোমাকে দেওয়ার মত আমার কিছুই নেই। (জটিল বাক্য)
উত্তর : যা তোমাকে দেয়া যায়, তেমন কিছুই আমার নেই।

©Nazmus Sadat
CamScanner

১৫. বাক্য রূপান্তর করুন (সূত্রানুযায়ী)। *[২৮তম বিসিএস]*

ক. আমার দ্বারা এ কাজ করা হবে না। (হ্যাঁবাচক)
উত্তর : আমার দ্বারা এ কাজ করা অসম্ভব।
খ. আমি পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। (না বাচক)
উত্তর : আমি পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক নই।
গ. তিনি অফিসে গিয়ে কাজ করছেন। (সরল বাক্য)
উত্তর : তিনি অফিসে কাজ করছেন।
ঘ. সে এলো; কথা বললো; চলে গেল। (জটিল বাক্য)
উত্তর : সে এসে কথা বলল তারপর চলে গেল।
ঙ. সে 'কি' নিয়ে তর্ক করছে। (প্রশ্ন বাক্য)
উত্তর : কী নিয়ে সে তর্ক করছে?
চ. আমি প্রশ্ন করিনি। (উত্তর বাক্য)
উত্তর : আমি নীরব ছিলাম।

১৬. বাক্য রূপান্তর করুন (বন্ধনীর অন্তর্গত নির্দেশ অনুযায়ী)। *[২৭তম বিসিএস]*

ক. চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। (জটিল বাক্যে)
উত্তর : যে চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়েও অধম।
খ. যে মিথ্যা কথা বলে, তাকে কেউ পছন্দ করে না। (সরল বাক্যে)
উত্তর : মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
গ. তার প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেও সে সুখী নয়। (যৌগিক বাক্যে)
উত্তর : তার প্রচুর ধনসম্পদ আছে কিন্তু সে সুখী নয়।
ঘ. মন দিয়ে লেখাপড়া কর, ভবিষ্যতে সুখী হবে। (জটিল বাক্যে)
উত্তর : যদি মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তবে ভবিষ্যতে সুখী হবে।
ঙ. যেহেতু তার ধনসম্পদ আছে, তাই সে অত্যন্ত গর্বিত। (যৌগিক বাক্যে)
উত্তর : তার ধনসম্পদ আছে এবং সে অত্যন্ত গর্বিত।

বাক্য রূপান্তর

বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে এক প্রকার বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করাকে বাক্য রূপান্তর বলে। বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাক্যের রূপ পরিবর্তন হবে, অর্থ পরিবর্তন হবে না। বাক্যের রূপান্তর তিনভাবে হয়ে থাকে-

১. গঠনগত রূপান্তর
২. ভাবগত রূপান্তর
৩. উক্তির পরিবর্তনগত রূপান্তর

©Nazmus Sadat
CamScanner

❖ **গঠনগত রূপান্তর :**

- **সরল থেকে জটিল বাক্য :** সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র রয়েছে। যেমন-
  - ✓ সরল বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।
  - ✓ বাক্য দুটির প্রথমে সম্বন্ধসূচক অব্যয় (যদি-তবে, যে-সে, যখন-তখন ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে।
  - ✓ আশ্রিত খণ্ডবাক্য ও প্রধান খণ্ডবাক্যকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হবে।
  - ✓ বাক্য পরিবর্তিত হলেও মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

উদাহরণ-

সরল : ধার্মিকেরা সুখী
জটিল : যারা ধার্মিক, তারা সুখী।
সরল : দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য
জটিল : যে লোক দুর্জন, সে পরিত্যাজ্য
সরল : পরিশ্রমী লোকই সাফল্য লাভ করে।
জটিল : যে লোক পরিশ্রমী, সে সাফল্য লাভ করে।
সরল : সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে।
জটিল : যে সত্যবাদী, তাকে সবাই ভালোবাসে।
সরল : বিদ্বান ব্যক্তিরা সম্মান পায়।
জটিল : যারা বিদ্বান, তারা সম্মান পায়।
সরল : ধনীরা প্রায় কৃপণ হয়।
জটিল : যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
সরল : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
জটিল : যেহেতু সত্য কথা বলি নি, সেহেতু বিপদে পড়েছি।
সরল : আমি তোমাকে নিতে এসেছি।
জটিল : তুমি সেই, যাকে আমি নিতে এসেছি।
সরল : বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে।
জটিল : যখন বৃষ্টির অভাব হবে, তখন ফসল নষ্ট হবে।
সরল : মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।
জটিল : যে মিথ্যাবাদী, তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।

- **জটিল থেকে সরল বাক্য :** জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র-
  - ✓ জটিল বাক্যকে একটি অংশে রূপান্তর করতে হয়।
  - ✓ প্রধান খণ্ডবাক্যকে পরিবর্তন না করে অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তন করতে হয়।
  - ✓ অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে সংকোচন করতে হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

- ✓ সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা সাপেক্ষ সর্বনাম পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হয়।
- ✓ একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।
- ✓ বাক্য পরিবর্তন হলেও মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

উদাহরণ-

জটিল : অনেকের জীবনে প্রথম দুঃখ আসে, পরে সুখ আসে।
সরল : অনেকের জীবনে দুঃখের পর সুখ আসে।
জটিল : যদিও সে দরিদ্র, তবুও সে সত্যবাদী।
সরল : দরিদ্র হলেও সে সত্যবাদী।
জটিল : পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা অসম্ভব।
সরল : পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।
জটিল : যখন মেঘগর্জন করে, তখন ময়ূর নৃত্য করে।
সরল : মেঘগর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
জটিল : সে যদি কাল আসে, তবে আমি যাব।
সরল : সে কাল এলে আমি যাব।
জটিল : যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
সরল : মাংসভোজী পশুরা অত্যন্ত বলবান হয়।
জটিল : যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।
সরল : রক্ষকই ভক্ষক।
জটিল : যা বার্ধক্য, তাকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
সরল : বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
জটিল : যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।
সরল : অন্ধজনে আলো দাও।

- **সরল থেকে যৌগিক বাক্য** : সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র:
  - ✓ সরল বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হয়।
  - ✓ আশ্রিত বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়
  - ✓ খণ্ডবাক্যগুলোকে সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত করতে হয়।
  - ✓ বাক্যের পরিবর্তন হলেও বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ-

সরল : সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়।
যৌগিক : সূর্য উদিত হয়, তবে অন্ধকার দূর হয়।
সরল : পৃথিবীতে অবাস্তব বলে কিছু নেই।
যৌগিক : পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু অবাস্তব বলে কিছু নেই।
সরল : বিদ্বান হলেও তাঁর অহংকার নেই।

©Nazmus Sadat
CamScanner

যৌগিক : তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।
সরল : আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি।
যৌগিক : আমি বহু কষ্ট করেছি, তাই শিক্ষা লাভ করেছি।
সরল : দয়া করে সব খুলে বলুন।
যৌগিক : দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।
সরল : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।
যৌগিক : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল : বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই।
যৌগিক : তিনি বিদ্বান তথাপি তার অহংকার নেই।
সরল : পড়াশোনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
যৌগিক : পড়াশোনা কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
সরল : সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।
যৌগিক : সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাবে।
সরল : সে অনেক চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছে।
যৌগিক : সে অনেক চেষ্টা করেছে, তাই সাফল্য লাভ করেছে।
সরল : নদীর জল অবিরাম চল্ চল্ চলছে।
যৌগিক : নদীর জল চল্ চল্ চলছে, তার বিরাম নেই।
সরল : চেনাটার চেয়ে অচেনাটাই সত্য।
যৌগিক : চেনাটা সত্য নয়, অচেনাটাই সত্য।

- **যৌগিক থেকে সরল বাক্য** : যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :
  - ✓ বাক্য পরিবর্তন হলেও বাক্যের মূল অর্থের পরিবর্তন হয় না।
  - ✓ বাক্যটিকে একটি অংশে পরিণত করতে হয়।
  - ✓ প্রধান খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
  - ✓ আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
  - ✓ সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক ইত্যাদি অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

উদাহরণ-

যৌগিক : লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।
সরল : লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।
যৌগিক : আকাশে মেঘ ছিল না, কিন্তু বজ্রপাত হলো।
সরল : আকাশে মেঘ না থাকা সত্ত্বেও বজ্রপাত হলো।
যৌগিক : ধনের ধর্ম আছে, কিন্তু তা অসাম্য
সরল : ধনের ধর্মই অসাম্য।

©Nazmus Sadat
CamScanner

যৌগিক : সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
যৌগিক : তুমি আসবে এবং আমি যাবো।
সরল : তুমি এলে আমি যাব।
যৌগিক : ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।
সরল : ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।
যৌগিক : এত সাধনা করলাম কিন্তু তোমার মন পেলাম না।
সরল : এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
যৌগিক : লোভ পরিত্যাগ করো, তবে তুমি সুখে থাকবে।
সরল : লোভ পরিত্যাগ করলে তুমি সুখে থাকবে।
যৌগিক : অনেক দেখা হল বটে, কিন্তু দেখা শেষ হল না।
সরল : অনেক দেখেও দেখা শেষ হল না।

- **জটিল থেকে যৌগিক বাক্য** : জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের সূত্রঃ
  - ✓ জটিল বাক্যকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হয়।
  - ✓ সম্বন্ধসূচক অব্যয় পদ বিলুপ্ত হয়।
  - ✓ খণ্ডবাক্যগুলোকে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয়।
  - ✓ সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীন বাক্যগুলো যুক্ত করতে হয়।

উদাহরণ-

জটিল : যদিও তাঁর টাকা আছে, তবু তিনি দান করেন না।
যৌগিক : তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
জটিল : যেহেতু সে নিরপরাধ, সেহেতু সে মুক্তি পাবে।
যৌগিক : সে নিরপরাধ, তাই সে মুক্তি পাবে।
জটিল : যদি পানিতে নামো, তবে সাঁতার শিখতে পারবে।
যৌগিক : পানিতে নামো, তবে সাঁতার শিখতে পারবে।
জটিল : তুমি যদি না খাও তবে আমিও খাব না।
যৌগিক : তুমি খাও, নইলে আমিও খাব না।
জটিল : যদিও রামলালের বয়স কম ছিল তথাপি তার দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না।
যৌগিক : রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।
জটিল : যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক : বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে।
জটিল : যেহেতু দোষ করেছো সেহেতু শাস্তি পাবে।
যৌগিক : দোষ করেছো, অতএব শাস্তি পাবে।
জটিল : যে লোকটি এখানে এসেছিল সে আমার ভাই।

©Nazmus Sadat
CamScanner

যৌগিক : এখানে যে লোকটি এসেছিল, সে আমার ভাই।
জটিল : যদি সাফল্য চাও তাহলে পরিশ্রম করো।
যৌগিক : পরিশ্রম করো এবং সাফল্য লাভ করো।
জটিল : আমি যখন সেখানে গিয়েছি তখন তোমাকে দেখে নি।
যৌগিক : আমি সেখানে গিয়েছি, কিন্তু তোমাকে দেখি নি।

- **যৌগিক থেকে জটিল বাক্য :** যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র
  - ✓ বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।
  - ✓ সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।
  - ✓ নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে একটিকে প্রধান রেখে অন্যান্য খণ্ডবাক্যগুলোকে অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যে পরিণত করতে হবে।
  - ✓ নিরপেক্ষ বাক্য দুটির পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় পদ ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ-

যৌগিক : বেলা যায় কিন্তু গন্তব্যের খোঁজ নেই এখনো।
জটিল : যদিও বেলা যায়, তবুও গন্তব্যের খোঁজ নেই এখনো।
যৌগিক : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
জটিল : কাল যখন সে আসবে, তখন আমি যাব।
যৌগিক : লোকটির সবই আছে, কিন্তু সুখী নয়।
জটিল : যদিও লোকটির সবই আছে, তথাপি সে সুখী নয়।
যৌগিক : মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, তবে পাস করতে পারবে।
জটিল : যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, তবে পাস করতে পারবে।
যৌগিক : তুমি ধনী কিন্তু উদার নও।
জটিল : যদিও তুমি ধনী তবু উদার নও।
যৌগিক : ধনীদের নিজেদের গরজ আছে তাই তারা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।
জটিল : যেহেতু ধনীদের নিজেদের গরজ আছে, সেহেতু তারা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।
যৌগিক : সে মরবে, তবু একথা বলবে না।
জটিল : যদিও সে মরবে, তবু একথা বলবে না।
যৌগিক : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
জটিল : যদিও কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, তথাপি বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

❖ **ভাবগত রূপান্তর**

- **অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক :** অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র-
  - ✓ হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না করতে হলে মুল অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্য পরিবর্তন করতে হবে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

- ✓ বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয়যোগে অস্তিবাচক বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে (সমাপিকা ক্রিয়া) নেতিবাচক করতে হবে।
- ✓ বাক্যের বিশেষণ পদটিকে বিপরীত শব্দে রূপান্তর করতে হবে।
- ✓ প্রয়োজন মত বাক্যের অন্য শব্দকে 'না' সূচক বাক্যের প্রয়োগের আওতাভুক্ত করতে হবে।
- ✓ 'না' বাচক ক্রিয়া ও 'না' বাচক শব্দ বা 'না' বাচক অব্যয় মিলে বাক্যের অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-সূচক ভাবটি বজায় রাখতে হয়।

উদাহরণ-

অস্তিবাচক : মাতৃভূমিকে সবাই ভালোবাসে।
নেতিবাচক : মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে।
অস্তিবাচক : মানুষ মরণশীল।
নেতিবাচক : মানুষ অমর নয়।
অস্তিবাচক : মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।
নেতিবাচক : মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
অস্তিবাচক : বাড়িটা তারা দখল করেছে।
অস্তিবাচক : বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়ে নি।
অস্তিবাচক : তুমি কালকে আসবে।
নেতিবাচক : তুমি কালকে না আসলেই নয়।
অস্তিবাচক : পাখিটা মরল।
নেতিবাচক : পাখিটা বাঁচল না।
অস্তিবাচক : এভাবে সমাজ অচল হয়ে পড়ে।
নেতিবাচক : এভাবে সমাজ চলে না।
অস্তিবাচক : অনুপমার উচিত কাজ হয়েছে।
নেতিবাচক : অনুপমার অনুচিত কাজ হয়নি।
অস্তিবাচক : বাড়িটা তারা দখল করেছে।
নেতিবাচক : বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।
অস্তিবাচক : সে কথাই এরা ভাবে।
নেতিবাচক : সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
অস্তিবাচক : আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।
নেতিবাচক : আজকাল কোন জিনিসই সুলভ নয়।
অস্তিবাচক : প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।
নেতিবাচক : প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

©Nazmus Sadat
CamScanner

- **নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক :** নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :
  - ✓ বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয় তুলে দিতে হয়।
  - ✓ শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যে হ্যাঁ-সূচক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হয়।
  - ✓ বাক্যের বিশেষণ পদটিকে বিপরীত শব্দে রূপান্তর করতে হয়।
  - ✓ প্রয়োজন মত নেতিবাচক শব্দের বাক্যাংশকে অস্তিবাচক শব্দ দ্বারা অস্তিবাচকে রূপান্তর করতে হয়।

উদাহরণ-

নেতিবাচক : আমি বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানি না।
অস্তিবাচক : বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা আমার অজানা।
নেতিবাচক : রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।
অস্তিবাচক : রোগা মানুষ সমস্ত রাত উপোস থাকবে।
নেতিবাচক : আমি তোমাকে কিছুই দেব না।
অস্তিবাচক : আমি তোমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করব।
নেতিবাচক : তারা যাবে না কোথাও।
অস্তিবাচক : তারা এখানেই থাকবে।
নেতিবাচক : আমি অন্য ঘরে যাব না।
অস্তিবাচক : আমি এ ঘরে থাকব।
নেতিবাচক : দেশের প্রচলিত ধর্মে কর্মে তাহার আস্থা ছিল না।
অস্তিবাচক : দেশের প্রচলিত ধর্মে কর্মে তাহার অনাস্থা ছিল।
নেতিবাচক : হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।
অস্তিবাচক : হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।
নেতিবাচক : আমরা বাধা দিতে পারলাম না।
অস্তিবাচক : আমরা বাধা দিতে ব্যর্থ হলাম।
নেতিবাচক : সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।
অস্তিবাচক : তাকে একটু বিস্মিত হতেই হল।
নেতিবাচক : সেই কেবল কাঁদল না।
অস্তিবাচক : সে ছাড়া সকলে কাঁদল।

- **অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক :** অস্তিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :
  - ✓ মৌলিক বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।
  - ✓ কর্তার পরে প্রশ্নবাচক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

- ✓ ক্রিয়ার পরে নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়।
- ✓ বাক্য শেষে প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ-

অস্তিবাচক : পরে কী হল সে বিষয়ে জানতে চাই।
প্রশ্নবোধক : তারপর কী হল?
অস্তিবাচক : ফুলকে সকলেই ভালোবাসে।
প্রশ্নবোধক : ফুলকে কি সকলেই ভালোবাসে না?
অস্তিবাচক : শৈশবে তার বাবা মারা যান।
প্রশ্নবোধক : শৈশবে কি তার বাবা মারা যাননি?
অস্তিবাচক : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
প্রশ্নবোধক : বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?
অস্তিবাচক : ফুল সকলেই ভালোবাসে।
প্রশ্নবোধক : ফুল কি সকলেই ভালোবাসে না?
অস্তিবাচক : সুখ সকলেরই কাম্য।
প্রশ্নবোধক : সুখ কার না কাম্য?
অস্তিবাচক : দেশকে ভালোবেসে অনেক দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছে।
প্রশ্নবোধক : দেশকে ভালোবেসে অনেক দেশপ্রেমিক কি জীবন উৎসর্গ করে নি?

- **প্রশ্নবোধক থেকে অস্তিবাচক** : প্রশ্নবোধক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :
  - ✓ মূল বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।
  - ✓ প্রশ্নবোধক 'কি' অব্যয় বিলুপ্ত হবে।
  - ✓ নঞর্থক অব্যয় পদও বিলুপ্ত হবে।
  - ✓ জিজ্ঞাসা (?) চিহ্ন স্থানে দাঁড়ি (।) বসাতে হবে।

উদাহরণ-

প্রশ্নবোধক : বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?
অস্তিবাচক : বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী তা জানতে চাই।
প্রশ্নবোধক : একলা যেতে ভয় করবে না তো?
অস্তিবাচক : একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।
প্রশ্নবোধক : এরা কি অন্য জাতের মানুষ নয়?
অস্তিবাচক : এরা অন্য জাতের মানুষ।

- **নেতিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক** : নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :
  - ✓ নেতিবাচক বাক্যের না-সূচক শব্দ তুলে দিতে হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

- ✓ মূল বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।
- ✓ নির্দেশক বাক্য হলে 'কি' এবং নঞর্থক বাক্য হলে 'নাকি', 'নয়-কি'-সহ জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।
- ✓ না-সূচক অব্যয় তুলে দিয়ে হ্যাঁ-সূচক অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে হয়।
- ✓ সাধারণত বর্তমান কালের 'ল', 'ইল'- ক্রিয়া বিভক্তি থাকলে তার সঙ্গে আগে 'হয়' ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ-

নেতিবাচক : তাদের গ্রামে ফিরে আসা চলে না।
প্রশ্নবোধক : তাদের গ্রামে ফিরে আসা কি চলে?
নেতিবাচক : তাদের সে জ্বালা নাই।
প্রশ্নবোধক : তাদের সে জ্বালা আছে কি?
নেতিবাচক : এতে দোষ নেই।
প্রশ্নবোধক : এতে দোষ কী?
নেতিবাচক : টাকায় সব হয় না।
প্রশ্নবোধক : টাকায় কি সব হয়?
নেতিবাচক : আর পথ নেই।
প্রশ্নবোধক : আর কি পথ আছে?
নেতিবাচক : কেউই অন্ধের দুঃখ বুঝল না।
প্রশ্নবোধক : অন্ধের দুঃখ কেউ কি বুঝল?
নেতিবাচক : এ খবর আমরা কেউ জানতাম না।
প্রশ্নবোধক : এ খবর আমাদের কেউই কি জানত?
নেতিবাচক : সে কথা আজও ভুলতে পারি নি।
প্রশ্নবোধক : সে কথা কি আজও ভুলতে পেরেছি?
নেতিবাচক : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই।
প্রশ্নবোধক : অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা আছে কি?

- **প্রশ্নবোধক থেকে নেতিবাচক** : প্রশ্নবোধক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :
  - ✓ মূল অর্থ বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।
  - ✓ প্রশ্নবোধক অব্যয় 'কি' তুলে দিতে হয়।
  - ✓ নেতিবাচক বা নঞর্থক না, নাই, নেই, নি, জানি না, বুঝি না ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।
  - ✓ বাক্যটিকে নেতিবাচক ভাব ধারায় গঠন করতে হয়।

©Nazmus Sadat
CamScanner

উদাহরণ-

প্রশ্নবোধক : টাকায় কি সবই হয়?
নেতিবাচক : টাকায় সব হয় না।
প্রশ্নবোধক : এই বৃষ্টিতে কেউ বাইরে যেতে পারে?
নেতিবাচক : এই বৃষ্টিতে কেউ বাইরে যেতে পারে না।
প্রশ্নবোধক : তারা কি পাষাণ?
নেতিবাচক : তারা পাষাণ কিনা জানি না।
প্রশ্নবোধক : এ কেমন কথা?
নেতিবাচক : এ কেমন কথা জানি না।
প্রশ্নবোধক : তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?
নেতিবাচক : তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।
প্রশ্নবোধক : সরস্বতী বর দেবেন কি?
নেতিবাচক : সরস্বতী বর দেবেন না।
প্রশ্নবোধক : আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয়েছে কি?
নেতিবাচক : আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয় নাই।
প্রশ্নবোধক : এতে দোষ কি?
নেতিবাচক : এতে দোষ নাই।

- ❖ **উক্তির পরিবর্তনগত রূপান্তর**
  - **প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ :**
  - **পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ :**

উদাহরণ-

প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, "বইটা আমার দরকার"।
পরোক্ষ উক্তি : তিনি বললেন যে বইটা তার দরকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"
পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।
প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।"
পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন"
পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার"
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।
প্রত্যক্ষ উক্তি : ভিখারী দুঃখ করে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি"
পরোক্ষ উক্তি : ভিখারী দুঃখ করে বলল যে, তারা শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

©Nazmus Sadat
CamScanner

শীকর-এর প্রকাশিত বইসমূহ

প্রিলিমিনারি

প্রিলিমিনারি

UPCOMING

লিখিত

শীকর পাবলি
৩৭/২, বাংলাবাজ

mamunbooks.com
URYFYXP
শীকর বাংলা সাহিত্য পাঠ

©Nazmus Sadat
CamScanner